দ্বিতীয় খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা

বা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ-বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ বাণী

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৭

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ও
ব্রহ্মচারী স্নেহময়
সম্পাদিত।
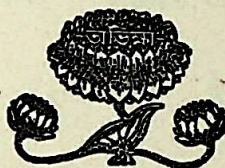
— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম,

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী—১

মূল্য চারি টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ সংখ্যা ২,০০০
প্রকাশক :— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১
[1970]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে :—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮ সি. আই. টি. রোড, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা ৫৪,

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২,

৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী, দক্ষিণেশ্বর কলিকাতা ৩৫।

প্রিণ্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

(দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথমার্দ্ধ)

বাংলা ১৩৫০ সালে, ১৯৪৩ ইংরেজীতে, অখণ্ড-সংহিতা দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে আমরা পুস্তককে প্রথমার্দ্ধ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিভক্ত করিয়া দুই অংশে প্রকাশ করিতেছি। উদ্দে —গ্রন্থখানাকে মূল্যের দিক্ দিয়া সর্ব্বসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে আমরা ১৩৩৪-এর ১৮শে ভাদ্রের পর হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত শ্রীশ্রীবাবামণির কতকগুলি উপদেশ সংযোজিত করিয়াছি। যাঁহাদের সাহায্যে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই নব সংযোজনে পুস্তকের আয়তন বাড়িয়াছে। এইজন্যও প্রথমার্দ্ধ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিতে হইল।

পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যবরিষ্ঠ, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত লোক-পাবন মধুময় উপদেশসমূহ বাংলা সন ১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে নানাস্থানে সংগৃহীত ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উৎপাতে রহিমপুর আশ্রম দগ্ধ হইবার কালে কতক নষ্ট হয়, অন্যতর উৎপাতে কতক অংশ গোমতী নদীর গর্ভে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কীটের উৎপাতে অপরাপর অংশ বিনাশ পায়। তন্মধ্যে বাংলা ১৩৩৪ সালের ১লা বৈশাখ হইতে আংশিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পরেই আচম্বিতে আসিয়া পড়ে বিশ্বগ্রাসী ইং ১৯৪১ সালের মহা-যুদ্ধ, যাহার দরুণ পাণ্ডুলিপিসমূহ একবার ফেণী হইতে পরশুরাম, পুনঃ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

পরশুরাম হইতে পুপুন্কী এবং পুপুন্কী আশ্রমও যুদ্ধার্থি-কবলিত হইবার সম্ভাবনাহেতু বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণ করিতে থাকে। এই সময়ে অন্যান্য অনেক পাণ্ডুলিপির সহিত অখণ্ড-সংহিতারও কিছু কিছু মূল্যবান্ অংশ বিনষ্ট হইয়াছে। নানাদিকের এইরূপ নানা অস্বাভাবিক অবস্থা দর্শনে পাণ্ডুলিপিসমূহের নিরাপত্তা-রক্ষার স্বাভাবিক আগ্রহ হইতেই ইহার মাত্র কয়েক খণ্ড যে-কোনও প্রকারে দ্রুত মুদ্রণ করিবার সঙ্কল্প হয়। যে-কোন প্রকারে অদ্য পর্য্যন্ত ষোড়শ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দিকের অনেকগুলি খণ্ড নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলি জনসাধারণ-মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। আত্মোন্নতিলিপ্সু নরনারীরা এই গ্রন্থকে পরম উপাদেয় বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। এ কথা বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না যে, ভারতের ধর্ম্ম-সাহিত্য-ক্ষেত্রে "অখণ্ড-সংহিতা" নিজ মহিমায় একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এতজ্জাতীয় বহু গ্রন্থের মধ্যে অখণ্ড-সংহিতা এক বিশেষ কৌলীন্যের অধিকারী হইয়াছে। জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের সমন্বয়ের মধ্য দিয়া ইহা নবভারত গঠনের এক অমোঘ ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছে। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অধিকাংশ উপদেশই প্রাত্যহিক সমস্যায় ক্লিষ্ট দুঃখ-জর্জ্জর জনসাধারণের প্রাণে শান্তির সুশীতল প্রলেপ প্রদান করিয়াছে,—সাধারণের নিকটে প্রদত্ত একান্ত ব্যক্তিগত উপদেশসমূহ এক অসাধারণ মহিমামণ্ডিত অবিনশ্বর সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের উপরে কটাক্ষ, ইঙ্গিত বা আক্রমণ না করিয়া সহজ সরল স্বাদিষ্ঠ ভাষায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নানা সম্প্রদায়ের সাধকদের হিতোপদেশ দিয়াছেন। একটী প্রাণীরও ভাবভঙ্গ হয় নাই,—যে-কোনও

সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী হইতে সংগ্রহ করিয়াছে শ্বাসের বায়ু, প্রাণের গতিশীলতা এবং স্বকীয় লক্ষ্যে একনিষ্ঠা। এই জন্যই "অখণ্ড-সংহিতা" কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। ইহা নবযুগের নূতন বেদ, নবজীবন গঠনের নূতন উপনিষদ। ইহা নবযুগের সংগ্রামমুখর রণক্ষেত্রে ক্লৈব্যাপহর নূতন গীতা।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব একদা তরুণ কৈশোরে নির্দ্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন,—"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।" যৌবনে তিনি ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।" পরিপক্ক প্রৌঢ়ে সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাব ও মৈত্রী রক্ষা করিয়া আজও তিনি বলিতেছেন,—"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।" আর তাহারই ফলে সকল মত ও সকল পথের সাধকেরা এই অসামান্য-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিবার জন্য নির্ভয়ে ছুটিয়া আসিতেছে। কাহারও ভাবভঙ্গ না করিয়া, কাহারও ইষ্ট-নিষ্ঠার হ্রাস না করিয়া, কাহারও স্বাভাবিক আনুগত্যের অভ্যস্ত লক্ষ্যে পরিবর্ত্তন না করিয়া, সকলকে নিজ নিজ মতে নিজ নিজ পথে অমিত-বিক্রমে অগ্রসর হইবার মহতী প্রেরণা দিয়া ইনি অকাতরে জীবহিত-সাধন করিতেছেন। এই জন্যই তাঁহার উপদেশ-সমূহ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।

যে সাধকের যাহা প্রয়োজন, "অখণ্ড-সংহিতা"র কোনও না কোনও স্থানে তিনি তাহা পাইবেন। খণ্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইলেও প্রত্যেক খানা খণ্ড এক একখানা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং কোনও কারণবশতঃ পূর্ব্বের বা

পরের খণ্ড পাঠকের হস্তগত না হইলেও যেখানা তিনি হাতে পাইয়াছেন, সেইখানা হইতেই তিনি প্রত্যেকটী উপদিষ্ট বিষয়ের প্রকৃষ্টতম জ্ঞান ও সম্পূর্ণতম তৃপ্তি আহরণ করিবেন। আঠারো বিশ বৎসরের যাবতীয় উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ অখণ্ড-সংহিতা এত বড় বিশালায়তন গ্রন্থ হইতেছে যে, ইহা একটা খণ্ডে প্রকাশ করার কল্পনা আমরা ত করিতে সাহসী নহিই, কোনও ধনবান্ প্রকাশক-সংস্থাও প্রকাশে সাহসী হইবেন কিনা জানি না। এই কারণেই এই বিশাল বিরাট মহাগ্রন্থকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতে অগ্রণী হইয়াছি। একটী খণ্ড পাঠে অপর খণ্ড পাঠের আগ্রহ বাড়িবে কিন্তু অপর খণ্ড কোনও কারণে হাতের কাছে পাইলেন না বলিয়া পাঠকের কোনও বিষয় বুঝিতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হইবে না।

ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৬৪ সাল।

দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয়ার্দ্ধ)

"অখণ্ড-সংহিতা"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-কালে কি কারণে আমরা ইহাকে প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মুদ্রণ করিয়াছি, তাহা প্রথমার্দ্ধের নিবেদনে বলিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ-কালে আমরা ১৩৩৪র ২৬ অগ্রহায়ণের পরবর্ত্তী কালের যে সকল নূতন উপদেশ নানা সূত্রে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সাধ্যমত সংযোজন করিয়াছি। যাঁহাদের শ্রমে নূতন তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে, ভগবচ্চরণে তাঁহাদের সুখময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

"অখণ্ড-সংহিতা" তাহার নিজস্ব মহিমায় সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের সমাদরণীয় এক মহান্ ধর্ম্মগ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটী খণ্ড এক একখানা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। যে-

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

কোনও একখানা খণ্ড হইতে আত্মকল্যাণকামী সাধক জীবন-পথের পাথেয় পাইবেন, জীবকল্যাণকামী কর্ম্মীর কর্ম্মপথের প্রেরণা মিলিবে।

শত শত ব্যক্তির সাধন-পথের দুরূহ সমস্যাসমূহের সমাধান এই মহা-গ্রন্থে রহিয়াছে। অপক্ষপাত স্থির দৃষ্টিতে ঋষি-প্রতিভা বর্ত্তমান যুগের সকল সমস্যাকে প্রেম ও সহানুভূতি সহকারে দর্শন করিয়াছেন এবং যাহার পক্ষে যেমন প্রয়োজন, তেমন মঙ্গলোপদেশ দিয়া দ্বিধাগ্রস্তের কুশল সাধিয়াছেন। মানবের শাশ্বত কুশলের দিকে তাকাইয়াই এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া "অখণ্ড-সংহিতা"র উপদেশসমূহের শাশ্বত মূল্য রহিয়াছে। এই অমূল্য উপদেশাবলি বহু খণ্ডে প্রকাশিত করিয়া জনসেবা করিতে সমর্থ হইব বিশ্বাসেই আমরা অপরিমিত-ব্যয়সাধ্য এই বিরাট কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে "অখণ্ড-সংহিতা" পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেকগুলি খণ্ড নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় আমরা নিঃশেষিত খণ্ডগুলিরই প্রথমে পুনর্মুদ্রণ করিতেছি। এইগুলির পুনর্মুদ্রণ শেষ হইলেই ষোড়শ খণ্ড হইতে ছাপা সুরু হইবে।

বিরাট পাণ্ডুলিপি ও অফুরন্ত তথ্যসমূহ (. আমরা অনুমান করিতে সমর্থ হই নাই যে, এই বিশাল গ্রন্থ মোট কত খণ্ডে শেষ হইতে পারে। এই জন্যই জানি না যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থ কত দিনে প্রকাশ সম্ভব হইবে। তবে, অন্তরের সদিচ্ছা নিয়া কাজে হাত দিয়াছি এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা বিশ্বাস করি। ইতি ১লা শ্রাবণ, ১৩৬৪।

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী।

নিবেদনমিদম্
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী,
ব্রহ্মচারী স্নেহময়।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

কি কারণে দ্বিতীয় খণ্ড অখণ্ড-সংহিতাকে তুইটী আলাদা টুকরায় বিভক্ত করিয়া ছাপান হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদনের তুই অংশেই আলাদা আলাদা বিবৃত হইয়াছে। কাগজের সঙ্কট বাজার হইতে দূর না হইলেও তাৎকালিক গুরুতর অবস্থা বর্ত্তমানে নাই। এজন্য দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয়ার্দ্ধ একত্র করিয়া একটী মাত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ আয়তনে বাড়িলেও মূল্য আমরা আনুপাতিক ভাবে বাড়াই নাই বরং প্রচারের প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া কমাইয়াই দিয়াছি। কিমধিকমিতি চৈত্র, ১৩৭৭

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী—১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়
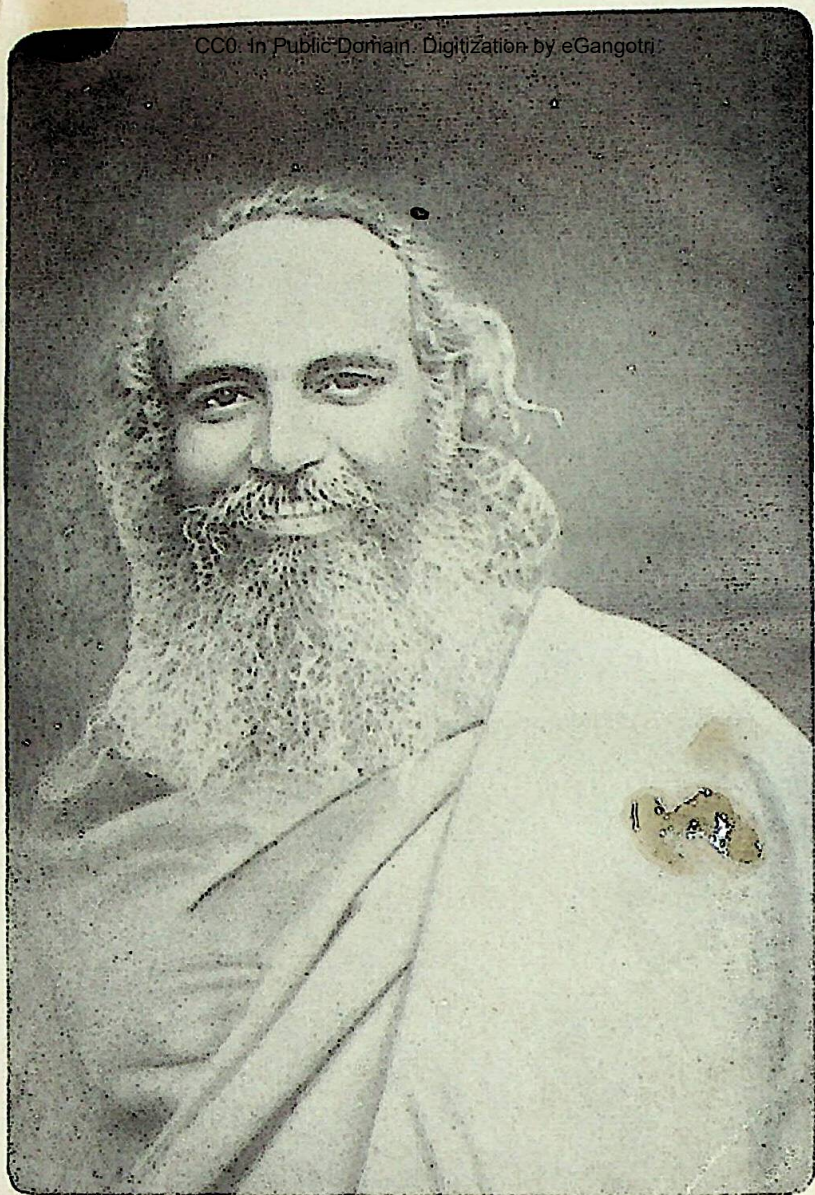
———

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কলিকাতা

১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৪

সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ

অদ্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব মৌনী নহেন, সমগ্র দিনই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সিদ্ধপুরুষের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সিদ্ধপুরুষ চেনা কঠিন। কেন না সিদ্ধ-পুরুষের প্রথম লক্ষণই হ'ল মানব জাতির সূক্ষ্ম সেবা। যার সেবা যত সূক্ষ্ম, তিনি তত বড় সিদ্ধ মহাপুরুষ।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা'হলে আমরা সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্গ কর্ব্ব কি করে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁদের সঙ্গ কাউকে কর্ত্তে হয় না, তাঁরা নিজেরাই সবাইকে সঙ্গ দেন। লোকমান তাঁদের প্রাপ্য নয়, তাঁদের

প্রাপ্য হচ্ছে লোক-কল্যাণ। যে ভাবে যাঁর সংশ্রবে এলে লোক-কল্যাণ হবে, তাঁরা নিজেরাই সে সব অবস্থা সৃষ্টি ক'রে নেন।

জীবের কুশলে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য
আপন কুশলে দৃষ্টি নাই,
সকলের সাথে সমান সখ্য,—
সিদ্ধপুরুষ সেথাই পাই।

সিদ্ধপুরুষেরা কি দীক্ষা দেন?

প্রশ্নকর্ত্তা।—সিদ্ধপুরুষেরা কি কাউকে দীক্ষা দেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দীক্ষা দেওয়া না দেওয়ার উপরে কারো সিদ্ধত্ব নির্ভর করে না, নির্ভর করে মানবজাতির অজ্ঞাতসারে তার উপকার করার শক্তিতে। যাঁর সংস্পর্শে এলে তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে সত্যের প্রতি, পবিত্রতার প্রতি, মঙ্গলের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তিনি সিদ্ধপুরুষ। যাঁর প্রাণের শুভ ইচ্ছা তোমাকে নবজীবন দান কর্ব্বে, তিনি সিদ্ধপুরুষ। দীক্ষাদান একটা অতি বাহ্য ব্যাপার। যাঁর কৃপা অন্তর্ভেদ করে, তিনিই সিদ্ধপুরুষ। কারো কৃপা দীক্ষার ভিতর দিয়েই অন্তর্ভেদ করে, কারো বা দীক্ষা ব্যতীতই অন্তর্ভেদ করে।

শিষ্যের গুরু-ত্যাগ

অপর একজন প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—অনেক সময় দেখা যায়, কোনও ব্যক্তি কোনও সাধুপুরুষের চরিত্রে মুগ্ধ হ'য়ে তার শিষ্যত্ব স্বীকার কর্ল্লে। কিন্তু পরে গুরুর জীবনে নানা অসঙ্গতি দেখে গুরুর প্রতি আস্থা তার নাশ হ'য়ে গেল। এ অবস্থায় তার কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ অবস্থায় গুরুসঙ্গ এবং গুরু-সংশ্রব ত্যাগই তার

কর্ত্তব্য। লোকতঃ ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হ'তে পারে কিন্তু যাঁকে দর্শন কর্লে মন উচ্চভাবে পূর্ণ হ'য়ে যায় না, তাঁর সঙ্গ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়।

প্রশ্ন।—কিন্তু সাধন সম্বন্ধে সে কি কর্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উৎকৃষ্টতম সাধন না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বপ্রাপ্ত সাধন নিয়েই চলা উচিত এবং ভগবানকে একমাত্র গুরু ব'লে মানা উচিত।

প্রশ্ন।—গুরু যদি চেষ্টা করেন, শিষ্য পূর্ব্বের ন্যায় বাধ্য হোক্, বিনয়ী হোক্? গুরু যদি নানা প্রকারে কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন ক'রে শিষ্যের মনকে আকৃষ্ট কত্তে চেষ্টা করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা'হলেও সেই স্নেহে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। সন্দিগ্ধ-চরিত্র স্ত্রীর সাথেও বরং ঘর করা চলে, সসর্পেও বরং গৃহবাস চলে, কিন্তু যার উপরে আস্থাহীনতা এসেছে তাঁকে গুরু ব'লে মেনে চলা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় গুরু যদি স্নেহাদি প্রদর্শন ক'রে শিষ্যের মন ভিজাতে চেষ্টা করেন, তাহ'লে শিষ্যের উচিত এই স্নেহকে মায়ামোহের জাল মনে ক'রে উপেক্ষা করা।

প্রশ্ন। – গুরু যদি শিষ্যের জন্য কেঁদে আকুল হন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মা-বাপ কেঁদে আকুল হ'লেও যেমন সন্ন্যাসী ছেলে সন্ন্যাসব্রত ত্যাগ করে না, ঠিক তেমনি অযোগ্য গুরু শিষ্যের জন্য কেঁদে বুক ফাটালেও শিষ্যের উচিত নয় সেই অনুচিত আকর্ষণে মুগ্ধ হওয়া। বাপ হওয়া সহজ, মা হওয়া সহজ কিন্তু গুরু হওয়া সহজ নয়।

প্রশ্ন।—কিন্তু যদি গুরুর উপর শিষ্যের আস্থা কখনো ফিরে আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি। – তা'হলে ত' মিটেই গেল! আস্থা এলেই আত্ম-সমর্পণ। যতক্ষণ আস্থা না আস্‌বে, ততক্ষণ উপেক্ষা। যদি কখনই আস্থা না আসে, তবে চির-উপেক্ষা।

গুরুত্যাগীর নিন্দা

প্রশ্ন।—কিন্তু লোকে যে বলে, গুরুত্যাগীকে অনন্ত নরকে বাস কত্তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গুরু যে কি বস্তু, তা আগে জেনে নাও। তারপরে কথার বিচারে বসো। স্বয়ং শ্রীভগবানই গুরু। কিন্তু তিনি মনোবুদ্ধির অগম্য লোকে নিজ স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁর কাছে পৌঁছুবার জন্য তাঁকে অবলম্বন ক'রে যে মহাভাব মনোবুদ্ধির জানিত ভাষায় অন্তরে উদিত হয়, সেই মহাভাবই গুরু। কিন্তু এই মহাভাবকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর মহানামের আবশ্যকতা পড়ে। সুতরাং তাঁর নামই তোমার গুরু। এই নামকে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণে ধ'রে রাখবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ অনেকের পক্ষেই প্রয়োজন। সুতরাং দীক্ষা-দাতা মহাপুরুষ তোমার গুরু। দীক্ষা-নিয়ে তুমি নামের অনুগত হচ্ছ, ভগবন্মুখী মহাভাবের অনুগত হচ্ছ, তাই দীক্ষা-দাতা তোমার গুরু। দীক্ষা নেবার পরে যদি তাঁর সঙ্গে সংশ্রব রক্ষার ফলে তোমার অন্তরের উদ্দীপনা ও উচ্চ-ভাবকে স্বহস্তে নিধন কত্তে হয়, তা হ'লে যে আত্মহত্যার পাপ হবে বাছা! সুতরাং নামকে একান্ত ভাবে আশ্রয় কর্‌বার জন্যই তখন তোমাকে মনুষ্যদেহী গুরুর কাছ থেকে দূরে যেতে হবে। এতে গুরুত্যাগ হয় না।

কুলগুরু ত

অপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,—আমাদের বংশ-পরম্পরায় একটী গুরুবাড়ী আছে। এই বংশ থেকেই আমাদের বংশের সকল লোকের দীক্ষা নিতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একজন কাশী না বৃন্দাবন কোথায় গিয়ে অন্য এক সাধকের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন

কচ্ছেন। এতে আমাদের কুলগুরুর বংশের লোকেরা বড় চটেছেন এবং নানারূপ অভিসম্পাত কচ্ছেন। এঁরা বল্‌ছেন যে, কুলগুরু ত্যাগ করার ফলে এত পাপ নাকি হয়েছে যে, সিদ্ধমহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়েও তার রেহাই নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এ সব শাস্ত্র কুলগুরু মশায়রা নিজেদের ব্যবসায়-বুদ্ধি থেকে রচনা করেছেন। শিষ্যের কুশল তাঁদের ততটা লক্ষ্য নয়, যতটা হচ্ছে নিজেদের পুত্র-কলত্র প্রতিপালনের জন্য নিয়মিত আর্থিক আয়ের ব্যবস্থাটাকে অব্যাহত রাখা। ছা-পোষা লোক, টাকাকড়ির আমদানীর স্থায়ী ব্যবস্থা না থাক্‌লে ভদ্রলোকেরা যাবেন কোথায়? এই জন্যই মুদীর পুত্র যেমন মুদী হয়, ছুতারের পুত্র যেমন ছুতার হয়, গুরুর পুত্রকে তেমন গুরু হ'তেই হবে। আবার এই গুরুগিরি বজায় রাখবার জন্য সংস্কৃত বচনে অনুষ্টুপ ছন্দে কয়েকটা কড়া শাসন-বাক্যও রচনা কত্তেই হবে। কিন্তু সদ্‌গুরু যদি পেয়ে যাও আর সাধন কর্ব্বার জন্য অন্তরে যদি প্রবল আগ্রহ এসে থাকে, তা হ'লে "কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে নরক হবে," এসব সেকেলে শাসন-বাক্যকে অগ্রাহ্য কত্তে ভয় পেয়ো না। তবে কুলগুরু-বংশ বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে কিছু কিছু ধন-প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখেন। সুতরাং তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত ক'রো না। দীক্ষা তাঁদের কাছ থেকে নাও নি ব'লে তাঁদের যোগ্য সম্মান কত্তে কখনো কুণ্ঠিত হয়ো না।

শিষ্যাগ্রহী গুরু

অপর একজন বলিলেন,—সম্প্রতি অমুক জেলায় একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি বল্‌ছেন, তাঁর গুরুদেব তাঁকে হিমালয় থেকে

নিম্নভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই ব'লে যে, এক লক্ষ লোককে তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তবে গুরুধামে হিমালয়ে ফিরে যাবার তাঁর অধিকার আস্‌বে। নইলে গুরুদেব এই মহাপুরুষ-শিষ্যকে গুরুধামে ফিরে যেতে দিবেন না। বাধ্য হ'য়ে চিরতা গেলার মত নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তিনি মন্ত্র দিয়ে দিয়ে কেবল শিষ্যের পর শিষ্য কচ্ছেন। এই সব গুরুদেবদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মতামত আবার কি হবে বাবা ? জগতে অনেক গুরু সত্য সত্যই বাধ্য হয়ে শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধন করেন। কেউ করেন নিজ নিজ গুরুদেবদের আদেশে। কেউ করেন জীব-উদ্ধারের প্রবল প্রেরণায়। কেউ করেন সংখ্যা-বৃদ্ধি-জনিত নানা সুযোগ-সুবিধার লোভে। কেউ করেন নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিতান্তই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। কেউ করেন শিষ্যদেরই আগ্রহের দরুণ বাধ্য হ'য়ে। কেউ করেন নিজ প্রেমময় স্বভাবের স্বাভাবিক ঝোঁকে। কারো কার্য্যেই আগে থেকে অভিসন্ধি আরোপ ক'রে তাঁকে হেয় জ্ঞান করা ঠিক নয়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জগতের প্রায় সকল গুরুপদাধিকারীরাই কিছু না কিছু জগদ্ধিত সাধন কচ্ছেন। এই জন্য যেখানেই যাঁর গুরুকে দেখ্‌তে পাও, নিজের গুরু মনে ক'রে মনে মনে শ্রদ্ধা দেবে।

গুরু, দুর্নীতি ও সমাজ

প্রশ্ন।—কিন্তু এই সকল গুরুদেবদের কারো দ্বারা যদি ধর্ম্মের ছলনায় অসামাজিক পাপের প্রশ্রয় চলতে থাকে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। সমাজের বিরুদ্ধে যাঁর ক্রিয়াকর্ম্ম, সমগ্র সমাজের লোকেরা তাঁকে নিশ্চয়ই বাধা দেবে। মৃত সমাজই সামাজিক পাপের

প্রশ্রয়দাতাকে অন্ধের মত পূজা করে। জীবিত সমাজ পাপের সঙ্গে আপোষ করে না, পাপকে সে শাসন করে, সংযত করে, সম্ভব হ'লে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে!

জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়াম

অপর একজন ভক্তের সহিত জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়াম সম্বন্ধে কথা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজিত অবস্থায় কখনো সন্ধিনী, সংযোগিনী, যোনি-যোগিনী প্রভৃতি মুদ্রা অভ্যাস কত্তে যাবে না। অভ্যাস কত্তে হ'লে প্রথমে একুশবার অশ্বিনীমুদ্রা ক'রে উপস্থকে শান্ত ক'রে নিতে হবে। একুশবারে যার উপস্থ শান্ত হবে না, তাকে উপস্থ শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অশ্বিনীমুদ্রা কত্তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—প্রতিবার প্রস্রাব কর্ব্বার সময়ে থেমে থেমে প্রস্রাব কর্ব্বার অভ্যাস কর্ল্লেও জননেন্দ্রিয়ের কিছু ব্যায়াম হবে। যারা মুদ্রাগুলি কর্ব্বে না, তাদের পক্ষে এই ব্যায়ামটুকুও বেশ হিতকর হবে। ফুস্‌ফুসের যদি কোনও ব্যাধি না থেকে থাকে, তা হ'লে প্রস্রাব আটকাবার সময়ে দমও বন্ধ করে রাখ্‌বে। যতবার প্রস্রাব থামাবে, ততবার দম আট্‌কাবে।

নামের অর্থ

শ্রীযুক্ত স—র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামের নিগূঢ় অর্থ নিজে সাধন ক'রে বুঝে নিতে হয়। শব্দ থাকলেই তার একটা অর্থ থাকে। কিন্তু এই অর্থ দ্বিবিধ। একটা হচ্ছে—প্রকাশতঃ, আর একটা হচ্ছে—নিগূঢ়। শব্দে মনঃসন্নিবেশ কর্ল্লেই প্রত্যেক শব্দেরই সাধারণ অর্থ ধরা যায়। কিন্তু নিগূঢ় অর্থ বুঝতে হ'লে ঐ সঙ্গে সাধন কত্তে হয়।

চর্ব্বণ না কর্লে যেমন ইক্ষুদণ্ডের রসাস্বাদ পাওয়া যায় না, সাধন না কর্লেও তেমন নামের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। যতই সাধন কর্বে, ততই নামের নূতন নূতন অর্থ তোমার কাছে প্রকাশ পেতে থাকৃবে। প্রণবের সাধারণ অর্থ ব্রহ্ম, সর্ব্বেশ্বর, পরাৎপর, পরমাত্মা। গূঢ়ার্থ সাধন কত্তে কত্তে ধরা পড়্বে।

নামের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশের স্তর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিভিন্ন সাধকের কাছে নামের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ বিভিন্ন স্তরে হতে থাকে। এক এক জনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার অনুযায়ী নামের অর্থ নানা বিম্বে নানা প্রতিবিম্বে প্রকট হতে থাকে। এ ভাবে একই নামেই বহু অর্থের দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ও সম্প্রসারণের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ সাধক নামের গূঢ়াদপি গূঢ় অর্থে গিয়ে পৌঁছেন। সেই অর্থ কখনো মুখের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই অর্থ উপলব্ধির ভিতর দিয়ে, অন্তরঙ্গ সাধকের দেহ-মনের অবর্ণনীয় পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মনুষ্য-ভাষায় তার বর্ণনা নেই, কিন্তু মনুষ্য-মনের শুদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত পটে তার অপূর্ব্ব সুন্দর আলেখ্য ফুটে ওটে। অবিরাম সাধন করে যাও, সাধন কত্তে কত্তেই মন শুদ্ধ হবে, মন সংস্কার-প্রমুক্ত হবে, তখন নামের নিগূঢ়তম অর্থ তোমার কাছে বিনা ব্যাখ্যায় সুপ্রকাশিত হবে। সাধনের গোড়ায় তোমাকে প্রচলিত সাধারণ অর্থ ধরেই কাজ সুরু কত্তে হচ্ছে ; সাধন কত্তে কত্তে ভাষাতীত বর্ণনাতীত সুনিগূঢ় অর্থ আপনি ধরা পড়বে।

প্রণব ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

প্রশ্ন।—কেউ কেউ বলেন, ওঙ্কারের অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব। প্রণব সাধনকালে কি এই তিন জন দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান কত্তে হবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।— প্রণব-মন্ত্রের যেদিন আবির্ভাব, সেদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরের কল্পনাও ভারতের আর্য্য-ঋষিদের মনে জাগে নি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরকে পৃথক্ তিন জন দেবতা ব'লে ভারতীয় সাধক-সমাজ তার সহস্র সহস্র বৎসর পরে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রণবের অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব'লে তুমি গ্রহণ কত্তে পার না। অ—উ—ম, এই তিনটী বর্ণের প্রকৃত মানে আদি, মধ্য, অন্ত্য। সকলের আদি যিনি, সকলের মধ্য যিনি, সকলের অন্ত্য যিনি, তিনিই প্রণব। অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত সব কিছু ব্যেপে যিনি কালাতীত হয়ে বিরাজ কচ্ছেন, তিনিই প্রণব। দেশ-কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন না হয়ে যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় এক, তিনিই প্রণব। পরবর্ত্তী কালে তান্ত্রিক সাধকেরা প্রণবের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা প্রণবের আদি ব্যাখ্যা নয়।

প্রশ্নকর্ত্তা ঃ—আমাদের পারিবারিক পুরুত মশায় একদিকে বলেছেন যে ওম্ কথাটার মানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন দেবতা, অপর দিকে বলেছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণ নই বলে ওম্ উচ্চারণ কত্তে বা প্রণবের সাধন কত্তে পার্ব্ব না। আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—আমি "ব্রহ্মা" "ব্রহ্মা" বলে জপ কর্‌লে তাতে পাপ হবে? তিনি বল্লেন,—না। আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—আমি "বিষ্ণু" "বিষ্ণু" বলে জপ কর্ল্লে তাতে পাপ হবে? তিনি বল্লেন,—"না"। আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—আমি "মহেশ্বর" "মহেশ্বর" বলে জপ কর্ল্লে তাতে পাপ হবে? তিনি বল্লেন,—"না"। আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—আমি এক সঙ্গে যদি "ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর" "ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর" ব'লে জপ কত্তে থাকি, তাতে পাপ হবে? তিনি বল্লেন,—"না"। তখন আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম যে,—আপনি বল্‌ছেন, ওম্ মানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, আবার বলছেন, ব্রহ্মার নাম জপ করলেও পাপ হয় না,

বিষ্ণুর নাম জপ কল্লে'ও পাপ হয় না, মহেশ্বরের নাম জপ কর্লেও পাপ হয় না, আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নাম একত্র ক'রে জপ কল্লে'ও পাপ হয় না। তা হ'লে ওম্ এই নামটী জপ কল্লে'ই আমার পাপ হতে যাবে কেন—পুরুত ঠাকুর কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ চ'টে গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শত সহস্র দেবদেবীর পূজা যে প্রচলিত হ'ল, তার সবগুলিই আর্য্যদের নিজস্ব দেবতা নন। অনার্য্যকে আর্য্যদের অঙ্গীভূত ক'রে নেবার জন্য তাঁরা তাদের বহু দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে মেনে নিয়ে-ছিলেন। নইলে আর্য্যাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগকে বহু অনার্য্য-বংশকে উচ্ছেদ করে দিতে হ'ত। সেই নৃশংস পন্থায় চল্‌বেন না বলেই তাঁরা অনার্য্যদের দেবতা ও অনার্য্যদের ব্রাহ্মণকে নিজেদের দেবতা ও নিজেদের ব্রাহ্মণদের পংক্তিভুক্ত ক'রে নিলেন। কিন্তু মনে মনে আশা রাখলেন যে, আর্য্যেতর সাধকদের প্রত্যেকটী মন্ত্রকেই যখন প্রণবযুক্ত ক'রে নেওয়া হচ্ছে, তখন একদা বাকী সব কিছু আকাশে মিলে যাবে, একমাত্র পরমবেদ্য আদিমন্ত্র ওঙ্কারই থেকে যাবেন। ধর্ম্মোপাসনায় বাহ্যাড়ম্বরের বাহুল্যের ফলে তাঁদের সে আশা আজ পর্য্যন্ত আর পূর্ণ হ'ল না, দু-চারজন বাদ-ছাদ গিয়ে পুরাতন দেবতারা মন্দিরে মন্দিরে ত' রইলেনই, আবার যুগে যুগে নূতন নূতন দেবতার আবির্ভাব হ'তে লাগ্‌ল। এত সব দেব-দেবীর দারুণ জনতার মাঝখানে একটা শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ব্রহ্মাকে সৃষ্টির কর্ত্তা, বিষ্ণুকে পালনের কর্ত্তা এবং মহেশ্বরকে লয়ের কর্ত্তা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন হ'ল। নইলে পৌরাণিক কালের লোকহিত-বুদ্ধিতে রচিত নানা কাহিনীর মর্য্যাদা থাকে না। কিন্তু বাছা, সৃষ্টি যিনি করেছেন, পালনও তিনিই ক'চ্ছেন, লয়-বিধানও তিনিই কর্ব্বেন,—এক জনেরই অসীম ক্ষমতা রয়েছে, এজন্য তিনজন কর্ম্মচারীর কোনো প্রয়োজন হয়

না। সেই একজন ব্যতীত আর কেউ নেই, সেই এইজন অপরের সাহায্য ব্যতীতই সৃষ্টির রথ চালাতে পারেন, স্থিতির বীর্য্য ধারণ কত্তে পারেন, সংহারের বহ্নি জ্বালাতে পারেন। প্রণব মন্ত্র তাঁরই নাম।

প্রণব ও ব্রাহ্মণ

প্রশ্ন।—প্রণব কি শুধু ব্রাহ্মণেরই মন্ত্র?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ, প্রণব ব্রাহ্মণেরই মন্ত্র। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মকে জান্‌তে চান, তিনিও ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। সুতরাং নম্রহৃদয়, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত, একাগ্রচিত্ত সাধক মাত্রই প্রণব-মন্ত্র-জপে অধিকারী। অধিকার আসে সাধনের আগ্রহ থেকে। সাধনে অনাগ্রহ থেকে অধিকার হ্রাস পায় এবং লোপ পায়। ফলে, ব্রাহ্মণও অব্রাহ্মণ হয়।

প্রণবের উচ্চারণ

প্রশ্ন।—প্রণবের প্রকৃত উচ্চারণটা কি? কেউ বলেন ওম্, কেউ বলেন অউম্।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মৌখিক উচ্চারণ ওম্ এবং অউম্ এই দুটীর মাঝামাঝি। কিন্তু প্রণব ত' উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের মন্ত্র নয়। মনে মনে এঁকে জপতে হয়। মনে মনে বারংবার উচ্চারণ কত্তে কত্তে ওঙ্কারের অবিচ্ছেদ নাদ স্বতঃশ্রুত হয়। সেইটীই ওঙ্কারের প্রকৃত উচ্চারণ। তোমাদের চেষ্টা-বিরহিত স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে যদি লক্ষ্য দাও, তাহলে তার আওয়াজের ভিতরে ওঙ্কারের কতকটা উচ্চারণের আমেজ পাবে।

সাধন-কালে মনঃসংস্থান

প্রশ্ন—নাম-সাধন কালে মন রাখব কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মন রাখ্‌বে নামের অর্থটীতে। যখন নামের অর্থ যেমন ভাবে তোমার কাছে ধরা পড়বে, তখন তদনুযায়ী রূপের প্রকাশ আপনা-আপনিই হবে। আর, যদি রূপের প্রকাশে বিলম্ব হয়, তবে নিজ রুচি অনুযায়ী রূপের ধ্যানেও দোষ নেই। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, যীশু, বুদ্ধ যাকে ইচ্ছা ধ্যান কর। তবে, চ'খের দৃষ্টি দেবে ভ্রূ-মধ্যে। সাধন কত্তে হ'লে আগে দেহ ঠিক করে নিতে হয়। 'একটী উৎকৃষ্ট আসন ক'রে, সরল মেরুদণ্ডে বসবার অভ্যাস আগেই ক'রে নেবে। মন যাতে সহজেই ভ্রূ-মধ্যে এসে স্থির হ'তে পারে, তার জন্য ক্রমাগত অভ্যাস কর্ব্বে।

নামার্থ-ভাবনা ও ভ্রূমধ্য-সংস্থান

প্রশ্ন।—একই সময়ে নামের অর্থে ও ভ্রূ-মধ্যে মন রাখা কষ্টকর।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার জন্যে আগে মনকে ভ্রূ-মধ্যে রাখবার জন্য একটু চেষ্টা ক'রে নেবে। যখন দেখ্‌বে মন ভ্রূ-মধ্যেই থেকে তার কল্পনাজাল সৃষ্টি কচ্ছে, তখন কল্পনার স্থানে নামকে স্থাপন কর্ব্বে। তাহ'লেই আর কষ্টবোধ হবে না। দু'দিন অভ্যাস কর্লেই দেখবে, সব ঠিক্ হয়ে যাচ্ছে।

প্রণব-জপের প্রণালী

প্রশ্ন।—প্রণব-জপের প্রণালী কি? মালায় জপ কর্‌ব, না করে?

উত্তর।—প্রণব হচ্ছেন স্বপ্রকাশ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অকাল্পনিক মন্ত্র। তাই তার জপের প্রণালীও নিতান্ত স্বাভাবিক। মালায় জপ কর, ভাল কথা। করে জপ কর, তাও আচ্ছা, কিন্তু শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ তার শ্রেষ্ঠ প্রণালী। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েই জন্মেছ; যতক্ষণ জীবিত থাকৃবে, এই শ্বাস-প্রশ্বাস তোমার নিত্যসঙ্গী হ'য়েই থাকৃবে; সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রণব-জপই শ্রেষ্ঠ জপ।

শ্বাস-প্রশ্বাস বনাম ভ্রূমধ্য

প্রশ্ন।—শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করার সময়ে মন কি শ্বাসে আর প্রশ্বাসে রাখ্‌ব না, ভ্রূমধ্যে রাখ্‌ব? একসঙ্গে দুটী স্থানে রাখ্‌তে গেলে যে ...ম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়।

উত্তর।—শ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। ভ্রূমধ্য হচ্ছে উপলব্ধি-রাজ্যের সিংহদ্বার। প্রাণের স্পন্দনে নামকে যুক্ত ক'রে শ্বাস ও প্রশ্বাসকে নিজের গতিতে স্বচ্ছন্দে চল্‌তে দাও। মাত্র এতটুকু লক্ষ্যই তখন তোমার থাকা প্রয়োজন যে, একটী শ্বাস বা একটী প্রশ্বাসও যেন নামের বীজ বপন ছাড়া না আসে, না যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে তোমার দায়িত্ব এতটুকুই। কিন্তু ভ্রূমধ্য হচ্ছে তোমার অনুভূতি-রাজ্যের সদর দরজা। মন এখানে থাকলে অনন্ত জ্ঞান সান্ত মানবের সামর্থ্যের অনুযায়ী হ'য়ে নিজেকে প্রকাশ ক'রে ধরে। বড়শীতে টোপ দিয়ে জলে ফেলেছ,—এর নাম শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ। মাছ ধরল কিনা, তার জন্য ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছ,—এর নাম ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য দেওয়া। ফাত্‌না থেকে মন অন্য দিকে গেলে যদি মাছ পালিয়ে যায়?

ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশের প্রতিক্রিয়া

প্রশ্ন।—ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশের দরুণ কখনো যদি মাথা একটু গরম বোধ হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মাথা গরম অন্য কারণেও হ'তে পারে। যেমন, অতিশ্রম, অতিনিদ্রা, আলস্য, অতিভোজন, রাত্রিজাগরণ, অত্যন্ত ক্ষুধা, অমিতাচার ইত্যাদি। সেই সব স্থলে এই সকল মূল কারণ আগে দূর করবে। তার পরেও যদি মাথা গরম বোধ কর, তবে জান্‌বে, খুব

সম্ভবতঃ ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন করার কালে চক্ষুকে উৎপীড়িত কচ্ছ। তদবস্থায় চক্ষুকে বিশ্রাম দিয়ে ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন কর্ব্বে। ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন-কালে চক্ষুকে নিয়ে জবরদস্তির কোনও আবশ্যকতা ত' নেই! অভিলষিত ধ্যান ভ্রূমধ্যে কর্ল্লেই মন ভ্রূমধ্যে যায়। সে কার্য্য চক্ষু-নিরপেক্ষ হ'য়েই কর্ব্বে। এত সব করার পরেও যদি দেখ, মাথা যেন একটু গরম গরম বোধ হচ্ছে, তাহ'লে ধ্যানের কেন্দ্র ভ্রূমধ্য থেকে কয়েক দিনের জন্য সরিয়ে নেবে বক্ষে, আর গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাসমূহের সবলতা সাধনের জন্য দুইবেলা নিয়মিত লঘু-মহামুদ্রা অভ্যাস কর্ব্বে।

কতক্ষণ নাম জপনীয়?

প্রশ্ন।—নাম জপ কত্তে হবে কতবার?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর আর সীমা-সংখ্যা নাই। যতক্ষণ না চিত্ত স্থির হচ্ছে, ততক্ষণ নাম কত্তে হবে। সঙ্কল্প নিয়েই বসবে যে, বাহ্যজ্ঞানরহিত না হওয়া পর্য্যন্ত নাম জপ ছাড়া হবে না। পেট না ভরতে কি কেউ ভাতের থালা ছেড়ে ওঠে?

জপ ও নিদ্রা

প্রশ্ন।—জপ কত্তে বসেই ঘুম এসে যায় যে!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা আসুক। ঐ নিদ্রাও প্রথম সময়ে লাভেরই কথা, ক্ষতির কথা নয়। নাম কত্তে কত্তে কখনো দেখ্‌বে একটা নেশার ভাব আসছে, কখনো বা তন্দ্রার ভাব আসছে, কখনো বা মোহের ভাব, কখনো স্বপ্নদর্শন হচ্ছে। এইগুলিকে কাজের সহায় বা বিঘ্ন ব'লে মনে করো না। এইগুলি হ'লে বুঝ্‌বে, কিছু কাজ হচ্ছে, এই মাত্র। কিন্তু

সব কাজ ত হচ্ছে না,—সব কাজ হবে ভগবদ্দর্শন হ'লে। তাই এ সব সত্ত্বেও শুধু অগ্রসর হ'তেই চেষ্টা কর্‌বে। অম্‌নি নাম জপ করার চাইতে নেশার ভাব নিয়ে জপ করা ভাল, কিন্তু এই নেশাটার ভিতর দিয়ে নেশা-হীন ভাবের ভিতরে পৌঁছুতে হবে। চতুর্দ্দিকের সহস্র গোলমালের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে এক ধার থেকে জপ ক'রে যাওয়ার চাইতে তন্দ্রার ভাব আসা ভাল, কিন্তু এই তন্দ্রাকে ভেদ করে অতন্দ্রিত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছান চাই। নাম জপ কত্তে কত্তে মোহ এল, তাতে দোষ নেই, কেননা, এই সাময়িক মোহটা নামকেও যেমন ভুলাচ্ছে, বাইরের জগতের বিশৃঙ্খল চিন্তাগুলিকেও তেমন ভুলাচ্ছে, কিন্তু এই মোহের ভিতর দিয়ে বিগত-মোহ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছান চাই। স্বপ্নদর্শন হচ্ছে হোক, চোখ বুজে অন্ধকার দেখার চাইতে স্বপ্নদর্শন ভাল, কিন্তু এই স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়ে সত্যদর্শনে গিয়ে পৌঁছা চাই। নাম কত্তে কত্তে নিদ্রা এসেছে, কিন্তু নাম ছেড় না, মোহ এসেছে, কিন্তু নাম ভুলো না, নানা রকম দর্শনাদি হচ্ছে, কিন্তু নামটীতেই মনঃপ্রাণ নিবদ্ধ ক'রে রেখো। তন্দ্রা বা মোহ দেখে হতাশ হয়ে যারা যায়, তারা পরিচয় দেয় দুর্ব্বলতার। আর যারা স্বপ্নাদি দর্শনে পুলকিত হ'য়ে সাধন ছেড়ে দেয়, তারা পরিচয় দেয় মূর্খতার।

জপ ও আলস্য

প্রশ্ন।—কিন্তু আলস্য এসে যায় যে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আলস্য এলে খুব কয়েকবার লঘুমহামুদ্রা ক'রে নেবে, তার পরে পুনরায় নাম-সাধন কত্তে থাক্‌বে। সাধন কত্তে ব'সে মনের সঙ্গে তোমাকে প্রতিনিয়ত কঠোর সংগ্রাম কত্তে হবে। সংগ্রামে জয়ী হবেই,—এই সুকঠোর সঙ্কল্প নিয়ে নাম-জপে বস্‌বে। মনের দুরন্তপণার

কছে পরাজয় স্বীকার কর্‌বে না, এই জিদ্ রাখ্‌তে হবে একেবারে সদা-জাগ্রত। আলস্য এলেই বল্‌বে, "রে দুষ্ট, দূরমপসর"। মনে রাখ্‌বে, আলস্যের মত শত্রু নাই, আলস্যের মত বিপদ নাই।

স্ত্রী-সঙ্গমের লিপ্সা-দমন

দ্বিপ্রহরে একটী যুবকের সহিত শ্রীশ্রীবাবার কতকগুলি বিষয়ের সুবিস্তারিত আলোচনা হইল। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীসঙ্গমের প্রলোভন দমন করিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—স্ত্রীসঙ্গমের লিপ্সা ব্যাপারটা দ্বিবিধ। এ লিপ্সার কতকটা দৈহিক, কতকটা মানসিক। পুরুষ দেহে যখন সন্তান-জননের সামর্থ্যগুলি একটু একটু ক'রে আস্‌তে থাকে, শুক্রকোষে এসে শুক্র জম্‌তে থাকে, তখন দেহের মধ্যে মনের কারসাজি ছাড়াও সম্ভোগ-সুখের প্রতি একটা অকারণ প্রবৃত্তি আসে। একে দমন করার উপায় হ'ল দেহকে এমন সব নিরাপদ যৌগিক প্রক্রিয়ায় সাধনে নিয়োজিত করা, যাতে স্ত্রী-সম্ভোগ না ক'রেও সম্ভোগের সুখটা অনুভূত হ'তে পারে। আর, স্ত্রী-সম্ভোগের মানসিক লিপ্সাটা দূর করার উপায় হ'ল জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, অবস্থা, বয়স ও সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে সকল স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাবের অনুশীলন।

ঊর্দ্ধরেতা

যুবক।—সঙ্গলিপ্সার দৈহিক কারণ যদি হ'ল সন্তান-জননের সামর্থ্য, তা হ'লে স্ত্রীসঙ্গম ক'রে শুক্রকোষ থেকে শুক্রকে বের করে না দেওয়া পর্য্যন্ত কি করে এ লিপ্সা কম্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে শুক্র অণ্ডকোষ থেকে পৃথক্ হ'য়ে শুক্রকোষে এসে জম্‌ছে, তাকে পুনরায় এর মধ্যে পরিগৃহীত করার কৌশলের উপরেই

সব নির্ভর কচ্ছে। যৌগিক প্রক্রিয়াদির অনুশীলনে শুক্রকোষে সঞ্চিত শুক্রকে দেহের মধ্যে পুনরায় absorb (শোষণ) করে নেওয়ার ক্ষমতা জন্মে। অণ্ডকোষ রক্ত থেকে শুক্রকে পৃথক্ করে শুক্রকোষে পাঠিয়ে দেয় ব্যয়ের জন্য। যৌগিক প্রণালীর অভ্যাসের ফলে এই ব্যয়ার্থ সঞ্চিত শুক্রই অধোগামী না হয়ে ঊর্দ্ধগামী হয়, একেই বলে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া। ঊর্দ্ধ-রেতা হবার জন্য যে সব মুদ্রা অভ্যাস কত্তে হয়, তাতেও সঙ্গম-সুখের ন্যায় একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভূত হয়। এই সুখ অনুভবের কারণ এই যে, শুক্রকোষ থেকে শুক্র উর্দ্ধ মুখে গমন কচ্ছে। শুক্র অধোগামী হ'লেও জীব যে সুখ পায়, ঊর্দ্ধগামী হ'লেও সেই সুখ পায় বরং বল্‌তে গেলে সহস্রগুণ অধিক সুখ পায়।

কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুক্র শরীরের একটা জান্তব অংশ মাত্র; কিন্তু তার একটা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্তা আছে। শুক্র সেই আধ্যাত্মিক সত্তার বাস্তব প্রতীক, শুক্র সেই চৈতন্য-সত্তার জড়ীয় রূপ। সেই সূক্ষ্ম সত্তার নাম কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই শক্তি স্ত্রী-দেহে পুরুষ-দেহে সমভাবে ক্রিয়মাণা। যে যৌগিক কৌশলে পুরুষদেহে শুক্রের উর্দ্ধগমন ঘটে, সেই যৌগিক কৌশলেই নারী-দেহেও কুলকুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধগমন হয়,—যদিও নারী-দেহ আর পুরুষ-দেহের গঠনগত পার্থক্যের দরুণ নারী-শক্তির সত্তা শুক্রের জড়ীয় রূপ ধারণ করে না। ওজঃশক্তি উভয়েরই এক এবং তাহারই ঊর্দ্ধগমন সর্ব্বদেহমনে বিপুল আনন্দোচ্ছল অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। তারই নাম কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। আর, এই জাগরণ যার ঘটে, পুরুষ হ'লে তার স্ত্রীসঙ্গের আসক্তি লোপ পায়, স্ত্রীলোক হ'লে তার পুরুষ-সংসর্গের লোলুপতা নাশ পায়। সে কাম-মোহের অতীত হয়, সে জিতেন্দ্রিয় হয়, শিব হয়।

স্ত্রীসঙ্গমে বিরতি ও অস্বাস্থ্য

যুবক।—মাঝে মাঝে স্ত্রীসঙ্গম না কর্লে নাকি শরীর খারাপ হ'য়ে যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এসব হচ্ছে ল্যাজকাটা শিয়ালের কথা। যারা নিজেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত তারা দল বাড়াবার জন্যেই এ সব কথা ব'লে বেড়ায়। এ সব মতামতের আধপয়সাও দাম নেই! শোন নি, একদল লোক ব'লে বেড়ায়, হরীতকী খেলে পুরুষত্ব-হানি হয়? অথচ আয়ুর্ব্বেদ খুলে দেখ, হরীতকীর মত এমন হিতকর, এমন উপকারী জিনিষ আর কিছু নেই। দেখনি, যারা মাংসাশী, তারা নিরামিষ আহারকেই ভারতের পরাধীনতার কারণ ব'লে গাল দেয়? অথচ, ইতিহাস পড়ে দেখ, নিরামিষের সঙ্গে পরাধীনতার কোনো সম্পর্কই নেই।

স্ত্রীসঙ্গমী ও মাতৃভাব

যুবক।—যারা স্ত্রীসঙ্গম করেছে, তাদের পক্ষে কি স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ সম্ভব। তবে, যার স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধপথে হয়েছে, অর্থাৎ নিজ বিবাহিতা স্ত্রীতে হয়েছে, তার পক্ষে সহজে সম্ভব, আর যার সম্ভোগ অবৈধ পথে হয়েছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অপরের সাথে হয়েছে, তার পক্ষে একটু বিলম্বে সম্ভব। মাতৃভাব একটা আশ্চর্য্য ভাব। এ ভাবটীর যতই অনুশীলন কর্বে, ততই এর শক্তি বাড়্বে, তীব্রতা বাড়্বে, সূক্ষ্মতা বাড়্বে। তখন সব স্ত্রীলোকের উপরেই মাতৃভাব আনা যাবে।

উপভুক্তা স্ত্রীতে মাতৃভাব

যুবক।— যে স্ত্রীলোককে একবার উপভোগ করা হয়েছে; তার প্রতি কি মাতৃভাব আনা সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন সম্ভব হবে না? সাধনের বলে সবই সম্ভব। যাকে দেখে তোমার মনে কখনও কুভাব ছাড়া আর কিছু জাগে নি, সাধনের বলে এমন অবস্থা সহজেই এসে যাবে যে, তাকে দেখলে মাতৃভাব ছাড়া আর কোনো ভাব মনে আস্‌বে না। তার কথা শুন্‌লে মনে হবে, মায়ের কথা শুন্‌ছ, তার রূপ দেখ্‌লে মনে হবে, মায়ের রূপ দেখছ।

যুবক।—যার প্রতি কুভাব ছিল, তার প্রতি সুভাব সহজেই আসতে পারে, তা বুঝি। কিন্তু যার সঙ্গে চূড়ান্ত কদাচার হয়েছে, তার প্রতি মাতৃভাব আস্‌বে কেমন করে? তাকে মা বলে ভাব্‌তে গেলে যে মনের মধ্যে একটা বিদ্রূপের ভাব জেগে ওঠে। মনে হয়, স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব একটা মিথ্যা কথা, একটা উপন্যাস।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এক যুগে উপন্যাসই ছিল, কিন্তু সেই যুগটাকে আমরা অতিক্রম করে এসেছি। বিশেষ ভাবে হিন্দুরা দীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমিক ভাবে মাতৃবুদ্ধির যে সাধনা ক'রে এসেছে, তাতে বর্ত্তমান মানবের পক্ষে এই সংগ্রাম অনেক সহজ, অনেক সরল হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবকে অসম্ভব বলে মনে করি, তবে সেটা শুধু আমাদের সাময়িক দুর্ব্বলতারই ফল। তোমার মনে যে উপহাসের ভাব জাগে, তা শুধু তোমার হতাশার রূপান্তর। কিন্তু বাছা, হতাশ হবার কিচ্ছু নেই। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কৌশল অবলম্বন ক'রে চল্‌তে পারলে সবই সম্ভব। অতীতে যে কদাচার হয়েছে, তাকে ভাবতে থাক স্বপ্ন ব'লে। স্বপ্নে মানুষ কি না করে, তাতে জাগ্রদবস্থায়

দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ কি? অতীত ঘটনাকে বেমালুম ভুলে ফেলবার চেষ্টা কর্‌বে। সে সব ঘটনা স্মরণে থাক্‌লে মানুষ সাধারণতঃ যে ভাবে চলে বলে, তেমন চলা বলা একেবারে বর্জ্জন কর্ব্বে। মনকে বিস্মৃতির একটা ভঙ্গিমার মধ্যে এনে দাঁড় করাবে। কালক্রমে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কালক্রমে কি না হয়? মাতা পুত্রশোক ভোলে, পত্নী স্বামীর শোক ভোলে, কৃপণ ধনের শোক ভোলে, দেশত্যাগী দেশের মায়া ভোলে,—কালক্রমে সবই হয়। কদর্য্য অতীতকে বারংবার স্মরণ করার কদভ্যাস একেবারে ত্যাগ ক'রে ফেল্‌বে। তা'হলেই দেখ্‌বে মাতৃভাবের আরোপ কত সহজ হ'য়ে এসেছে।

বিদেহ-ভাবনা ও মাতৃভাবের সাধন

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এর অন্য উপায়ও আছে। অতীতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পাচ্ছ না ব'লে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। সবাই অতি সহজে অতীতকে বিস্মৃত হ'তে পারে না। পূর্ব্বোপভুক্তা রমণীতে মাতৃভাবের সাধন কত্তে হ'লে, আগে তাদের বিদেহ-ভাবনা অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। মনটাকে দেহের বাইরে স্থির ক'রে ভাবতে হয়, "দেহটা আমি নই, দেহ আমার আমিত্ব প্রকাশের যন্ত্র মাত্র।" দেহের বাইরে নিজের রূপটাকে ধ্যান ক'রে ভাব্‌তে হয়,—"দেহটা আমি নই, দেহের রূপটা আমার রূপ নয়, দেহের রূপটা আমার অনন্ত রূপের সাময়িক একটা প্রকাশ মাত্র।" দেহ আর তুমি যে এক নও, অভিন্ন নও, এই ধারণাটা যখন বেশ স্পষ্ট রকমে হ'তে থাকবে, তখন আবার ভাবনা আরম্ভ কর্ব্বে, ঐ যে রমণী যার দেহ ইতঃপূর্ব্বে উপভুক্ত হয়েছে, সেই রমণী আর তার দেহ এক নয়, সে আর তার দেহ অভিন্ন নয়। ভাবতে হবে—তার দেহ সহস্র পুরুষে এসে উপভোগ ক'রে যেতে পারে, কিন্তু তাতে

দেহটারই যা-কিছু হ'ল, ঐ নারী তাতে নির্লিপ্তা, তার তাতে কিছু যায় আসে নি, তার পবিত্রতা তাতে নষ্ট হয় নি। এই ভাবটা যখন দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে এল, তখনি তাঁর কথা স্মরণ করে ডাকো – 'মা', ভাবো'—'মা', জপ কর – 'মা'। তখন দেখবে, এক ডাকে মনের সকল ময়লা দূর হয়ে গেছে, অতীতের ভোগস্মৃতি, অতীতের সংস্পর্শের কথা মলিন হয়ে গেছে, দীপ্ত সূর্য্যের তীব্র আলোর সমক্ষে কাম-বুদ্ধির অন্ধ-তমসা মরে গেছে।

পথে ঘাটে নামজপ

একজন প্রশ্ন করিল,—উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া পথে ঘাটে চলতে বা কাজ কর্ম্ম কত্তে কত্তে নাম-জপ কত্তে হলে কি ভাবে করব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, পথ চলতে চলতে নাম-জপ কত্তে হলে পায়ের তালে তালে করবে। কাঠ কাটা, মাটি কাটা আদি কর্ম্মকালে নাম-জপ কত্তে হলে হাতের তালে তালে কর্ব্বে। হস্তপদের নিয়মিত সঞ্চালন-হীন অবস্থায় বসে বসে নাম কল্লে শ্বাসে-প্রশ্বাসেই অনায়াসে নাম-জপ করা যায়। কিন্তু সেই অবস্থায় চোখ খোলা থাকলে ভ্রূ-মধ্যে মন রাখা কারো পক্ষে অসুবিধাজনকও হতে পারে। তেমন অবস্থায় দৃষ্টি যখন যে বস্তুর উপরেই পড়ুক না কেন, তাতেই ওঙ্কার বিরাজমান আছেন, এই ভাবটী অন্তরে জাগরূক রেখে নাম-জপ ক'রে যেতে থাকবে। যে বস্তুতেই দৃষ্টি পড়ুক, সেই বস্তুটী যে তোমার ভ্রূমধ্যেই অবস্থিতি কচ্ছে, একথা ধ্যানের বলে ভেবে নেওয়া তেমম শক্ত ব্যাপার কিছু নয়। সামান্য অভ্যাস করলেই এটী অনায়াসে আয়ত্ত হতে পারে। কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার ভ্রূমধ্যে বিরাজ কচ্ছে,— একটা গাছ, একটা গরু কিম্বা একটা পাহাড়ের সেখানে জায়গা হবে না ? সাধন-কালে সাধকের নানা রকম অসুবিধা

বা সমস্যাই আসে। কিন্তু তাতে ঘাব্‌ড়ে যেতে নেই। কাজ কত্তে কত্তেই কাজের পথ সহজ হয়, পথ পরিষ্কার হয়। সাধন কত্তে কত্তেই সাধন-সমস্যাসমূহের সমাধান আপনা আপনি এসে যায়। ব্যস্ত না হ'য়ে কেবল বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে যেতে হয়।

কলিকাতা
২০শে ভাদ্র, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ

অদ্যও শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী নহেন। সুতরাং যখন যিনি আসিতেছেন তখনই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে উপদেষ্টার সংখ্যা বাড়্‌ছে কিন্তু তথাপি নরনারীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব সুপ্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নরনারীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক ব্রহ্মচর্য্যে অবিশ্বাসীর সন্তান বিশ্বাসী হচ্ছে, অনেক ব্রহ্মচর্য্যে অনভ্যাসীর সন্তান অভ্যাসে যত্নবান্ হচ্ছে। এ কথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই। স্বদেশ-সেবার জন্যে স্বার্থত্যাগী-দের সংখ্যা যে বর্দ্ধিত হচ্ছে, তা' দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাসও বাড়্‌ছে। কারণ, বীর্য্যবান্ না হ'লে ত্যাগী হওয়া যায় না। শরীরের শ্রেষ্ঠ ধাতুকে যে যত কম ত্যাগ করে, জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বার্থকে পরার্থে সে তত বেশী ত্যাগ কত্তে পারে। তবে একটা কথা বল্‌তে পার যে, ব্রহ্মচর্য্যের ভাব আরো বেশী দেশব্যাপী এবং আরো বেশী গাঢ়মূল হওয়া

উচিত ছিল, পরন্তু তা' এখনো হয় নি। এর কারণ হচ্ছে, প্রচারকদের স্বকীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। কুক্কুর-চর্ম্মে যদি ক্ষীর পরিবেশিত হয়, তবে সে ক্ষীর কার মনকে আকৃষ্ট করে? তস্করের মুখে যদি বেদের ভাষ্য বিনির্গত হয়, তবে তা' কার প্রজ্ঞাচক্ষুকে উন্মীলিত করে? জিতেন্দ্রিয় না হ'য়ে আমরা ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকগণ জিতেন্দ্রিয়ত্বের মহিমা প্রচার কত্তে লেগে গেছি, তাই আশানুরূপ ফল হয় নি।

উপদেষ্টার অসংযম

প্রশ্ন।—উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে যাতে অসংযম দূর হ'য়ে যায়, তার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার উপায় উপদিষ্টদের বিদ্রোহ। যাই শিষ্য দেখবে, গুরুর জীবনে সংযম নেই, ব্রহ্মচর্য্য নেই, তখনি সে তাকে বর্জ্জন কর্ব্বে। শিষ্য যদি হয় খাপখোলা তলোয়ার, তবেই গুরু তাঁর প্রকৃত পদবীতে আরোহণ কত্তে পারেন। নতুবা একপাল গরু-ছাগলের গুরু হ'তে গিয়ে উন্নতমনা মহান্ গুরুকেও নীচে নেমে আস্তে হয়, নিজের পায়ে নিজে কুঠার হানতে হয়।

মহাপুরুষ ও শিষ্য-সংগ্রহ

প্রশ্ন।—অনেক মহাপুরুষকে দেখ্তে পাই, শিষ্য-সংগ্রহের জন্য বড়ই ব্যাকুল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রকৃত মহাপুরুষেরা কখনো শিষ্য-সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হন না, জীবের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা ব্যাকুল। কিন্তু মঙ্গল কত্তে হ'লেই যে মন্ত্র দিয়ে শিষ্যই কত্তে হবে, তার কোনো মানে নেই। যেখানে মঙ্গল কর্ব্বার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা শুধু মন্ত্রদানের মধ্যেই নিবদ্ধ হ'য়ে পড়ে, সেখানে মহাপুরুষ তাঁর মহত্ত্ব থেকে ভ্রষ্ট হন। অনেক সময়ে মন্ত্রদীক্ষা না

দিয়েই জীবের বেশী উপকার করা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত মহাপুরুষ মন্ত্রদীক্ষাদান বর্জ্জন করেন। মন্ত্রলাভের জন্য যার আগ্রহ জাগে নাই, মন্ত্রলাভের মহিমায় যার আস্থা আসে নাই, তাকে মন্ত্রদান ত' দীক্ষার অপব্যবহার! অবশ্য অনিচ্ছুক, তথাকথিত অপাত্রেও অনেক শিষ্যসংগ্রহে অরুচিমান্ মহাপুরুষকে জোর ক'রে দীক্ষা দিতে দেখা গিয়েছে কিন্তু সেগুলি তাঁদের অসীম কৃপারই নিদর্শন, শিষ্যসংগ্রহের আগ্রহ নয়।

যথার্থ মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠার মূল

প্রশ্ন।—অনেক মহাপুরুষকে অবতার ব'লে প্রচারিত করা হয় এবং বিচারবুদ্ধিহীন সহজ-বিশ্বাসীর দল এসে সেখানে ধন্না দেয়। এও ত' দেখা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দূর বোকা! দালালের সহায়তা দিয়ে কি মহাপুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে? মহাপুরুষেরা যে লোক-সমাজের উপরে নিজেদের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার মূল হ'ল তাঁদের নিষ্কাম নিঃস্বার্থ জীব-প্রীতি, তাঁদের গভীর তপস্যা এবং তাঁদের লোক-প্রতিষ্ঠায় বিরাগ। এই যে সব লক্ষাধিক শিষ্যের গুরুদের দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, বড় বড় মঠের প্রতিষ্ঠাতাদের দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, এঁদের মহাপুরুষত্ব প্রমাণ হবে কবে জানিস্? হাজার বছর পরে। হাজার বছর পরের ভারতবর্ষ এঁদের মধ্যে যে কয়জনকে মনে রাখ্‌তে পার্ব্বে, জান্‌বি, যথার্থ তপস্যার শক্তি নিয়ে তাঁরাই লোক-কল্যাণে নেমেছিলেন। জোগাড়ের বল সাময়িক প্রতিষ্ঠা আন্‌তে পারে কিন্তু জাতীয় ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত কর্ব্বে তপস্যার শক্তি।—দেখ্, লোকে যে মহাপুরুষদের কাছে আসে, সেটা তাদের অবতারত্বের টানে নয়, যথার্থ সত্যান্বেষী শিষ্য মহাপুরুষদের কাছে আসে তাঁদের আদর্শের টানে।

দীক্ষার শক্তি

একজন প্রশ্ন করিলেন,—দীক্ষা কি একটা দেশ-প্রচলিত চিরাচরিত লোক-প্রথা মাত্র, না দীক্ষার কোনও শক্তিও আছে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ দৃষ্টিতে দীক্ষা-দান ও গ্রহণকে লোকপ্রথা ছাড়া আর কি বল্‌বে ? বালবধূকে শ্বাশুড়ী দীক্ষা নেওয়াচ্ছেন কেবল হাতের জল শুদ্ধ করার জন্য, অন্য কোনও উদ্দেশ্যই তাঁর এতে নেই ! বৃদ্ধবৃদ্ধারা দীক্ষা নিচ্ছেন কেবল এই ভেবে যে, কি জানি হঠাৎ কখন ম'রে যান, ফলে অদীক্ষিত অবস্থায় মরলে ত' যমরাজা অনেক বেশী কষ্ট দেবেন। কেউ দীক্ষা নিচ্ছেন এই ভেবে যে, অদীক্ষিত রয়েছেন শুন্‌লে সমাজের লোকেরা একটু অনাদরের চোখে দেখবেন, দীক্ষিত হয়েছেন জান্‌লে কেউ কেউ একটু সমীহ করে চল্‌বেন। কেউ কেউ অনেক বেছে খুব নামজাদা গুরুর কাছে দীক্ষা নেন মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে তা হ'লে অমুক জজের গুরুভাই, অমুক ম্যাজিষ্ট্রেটের গুরুভাই, অমুক রাজা বাহাদুরের বা প্রফেসারের গুরুভাই ব'লে নিজেকে জাহির করা যাবে। এ সব ক্ষেত্রে দীক্ষা নেওয়া প্রথার দাসত্ব করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দীক্ষার প্রতাপে জগতে অনেক মাতাল মদ ছেড়েছে, অনেক অসতী সতীধর্ম্মে ফিরে এসেছে, অনেক প্রবঞ্চক ও প্রতারক সৎ, সাধু, সজ্জনে পরিণত হয়েছে। দীক্ষা অনেক দোদুল্যমান-চিত্ত নরনারীকে একনিষ্ঠ, একলক্ষ্য, একমুখ, একাগ্র ও অধ্যবসায়ী করেছে। দীক্ষা অনেক দুর্ব্বলকে বল দিয়েছে, অনেক পাপীর পাপহরণ করেছে, অনেক দুঃশাসন দুর্ম্মতিকে সুসংযত ও সুন্দর করেছে। দীক্ষা একটা প্রথা হ'লেও সুপ্রথা। জীবের কুশলকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রথার আবির্ভাব।

মাতৃভাবের ছদ্মবেশে অনঙ্গ

অপর একজনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব ব্রহ্মচারীর এক ব্রহ্মাস্ত্র। এ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়্‌লে প্রাণভয়ে কাম পালিয়ে যায়। কিন্তু কাম অনঙ্গ ব'লে কথনো কখনো আবার ইন্দ্রজিতের মতন মেঘের আড়ালে থেকেও যুদ্ধ করে। খুব হুঁশিয়ার যে নয়, ভগবানের প্রতি খুব তীব্র লক্ষ্য যে না রাখে, সে অনেক সময় এ মায়া-যুদ্ধে হেরে যায়। এইমাত্র এখানে একটী ছেলে এসেছিল, তার জীবনের একটুখানি শুন্‌লেই এই মায়াযুদ্ধের রকমটা বুঝ্‌তে পার্ব্বে। ছেলেটী কামের উন্মাদনায় অধীর হ'য়ে তিন চার্‌বার তিন চারিটী যুবতীকে কুপথে টেনে আন্‌বার চেষ্টা করেছিল, কোথাও কোথাও আংশিক সফলও সে হচ্ছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় পরিশেষে সে সব জায়গাতেই ব্যর্থকাম হ'য়ে ফিরে আসে। সেই অবধি তার জীবন ব্যর্থতার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়েই রইল। একদিন সে এক বন্ধুগৃহে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হ'ল, তাঁকে মা ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল। সে মনে কর্ল্ল, এ মাতৃভাবটা খাঁটি জিনিষ, ভেজাল কিছু নেই। বন্ধু-পত্নীকে একদিন না দেখ্‌লে আর সে বাঁচে না, একবারের জায়গায় দশবার ক'রে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকে, পত্র লিখতে পঞ্চাশবার নিরর্থক হা-হুতাশ প্রকাশ ক'রে লিখে। এই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে এখন সে সহসা দেখ্‌তে পাচ্ছে যে, বন্ধু-পত্নীর প্রতি তার আকর্ষণ তেমনই আছে কিন্তু মাতৃভাবটা যেন নেই নেই গোছের। এর কারণ জান? বন্ধু-পত্নীকে দেখা অবধি তার মনে গোড়া থেকে যে ভাবটা এসেছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা কামভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তিন চারটী যুবতীকে নিয়ে খেল্‌তে গিয়ে কামভাব যথেষ্ট ব্যর্থতা পেয়েছে, তাই এবার কাম আর

নিজ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ কর্ল্ না, সে প'রে নিল মাতৃভাবের মস্ত বড় একটা আল্‌খাল্লা। যতক্ষণ আল্‌খাল্লাটা নূতন ও দৃঢ় থাকবে, ততক্ষণ কাম চুপ ক'রে থাকবে। কিন্তু বেশী মাখামাখির ফলে যখন আল্‌খাল্লার সেলাইগুলি খুলে যেতে আরম্ভ কর্ব্বে, আল্‌খাল্লার দৃঢ়তা কম্‌বে, তখন একটা সামান্য ফাটলের মধ্য দিয়ে কাম মাথা গলিয়ে বেরিয়ে পড়বে এবং যা করবার নয়, তাই ক'রে ফেলবে।

মাতৃভাবের যাথার্থ্যের প্রমাণ

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কারো প্রতি কখনো মাতৃভাব এলে, সে ভাবটা যথার্থ কি না, তা বুঝ্‌ব কি করে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বোঝ্‌বার উপায় আছে। সোণা যেমন কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে, মাতৃভাবেরও তেমনি দু'খানা কষ্টিপাথর আছে। সে পাথর দু'খানার নাম হচ্ছে,—চাঞ্চল্যহীনতা ও প্রসারশীলতা। কাউকে মা ব'লে ডাকলে যদি দেখ যে, ডাকাডাকির বাড়াবাড়ি কত্তে ইচ্ছে হচ্ছে, ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার জন্য ভিতরে ভিতরে নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যাকুলতা হচ্ছে, তখন বুঝ্‌বে, মাতৃভাব ঠিক পথে যাচ্ছে না। দ্বিতীয় লক্ষণটী এই যে, একজনের প্রতি মাতৃভাব এলে যদি তার প্রভাবে আর এক জনের প্রতি মাতৃভাব না আসে, প্রাণটা যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট একজনকে নিয়েই পড়ে থাকে, তবে বুঝবে, ডোবায় পড়েছ; স্রোতোহীনতা পঙ্কই সৃষ্টি কর্ব্বে।

মাতৃনামের মহিমা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মা-নাম যে কত বড় নাম, তা' কি ক'রে বুঝ্‌বে যদি না এ নামের সাধন কর? তোমার রিপুদীপ্ত কঠোর পশুমূর্ত্তি মা-নামের মহিমায় নিমেষে হ'য়ে যাবে যেন জরায়ু-শয্যায় শায়িত চিরনিদ্রায় সুখসুপ্ত ভ্রূণ-শিশুর মত।

মা কে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কোন্ মায়ের কথা বল্‌ছি ? গর্ভ-ধারিণী মায়ের কথা ত' নিশ্চিতই বলছি, কিন্তু তাঁর পবিত্র প্রতীককে আশ্রয় ক'রে জগদ্ব্যাপিনী যে জগদম্বার শাশ্বত অনুভূতি লাভ কচ্ছি, তাঁর কথাও বল্‌ছি। একটী ক্ষুদ্র সংসারের সন্ততি-মণ্ডলীর সকল কল্যাণ যিনি স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে আগ্‌লে বসে আছেন, তাঁরই স্নেহ বিশ্বতোমুখ হ'য়ে জগজ্জননীর রূপ ধরেছে। ভূমিকম্পে, ঝঞ্ঝাবাতে, বজ্রপাতে, আসন্ন মৃত্যুকালে সকল অহং ভুলে গিয়ে সকল জীব যাঁর পদতলে নিজেকে দেয় বিনা সর্ত্তে ছেড়ে, আমি সেই মায়ের কথা বল্‌ছি। যাঁর নাম রোগের ঔষধ, বিপদের প্রতিষেধ, শোকের সান্ত্বনা, দুঃখের আশ্রয়, সেই মায়ের কথাই বল্‌ছি।

মাতৃময়ী বসুন্ধরা

অদ্য বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি ভবানীপুরে কোনও ভক্ত-গৃহে গমন করি-লেন। মহিলারা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতৃময়ী বসুন্ধরা, আর জগন্ময়ী মা। যে মায়ের পায়ে প্রণাম ক'রে সমগ্র জগৎকে পেয়েছি, তিনিই আবার ভক্ত হ'য়ে আমায় প্রণাম কচ্ছেন। যিনি আমাকে জঠরে ধরেছেন, বুকের স্তন্য পান করিয়ে জীবিত রেখেছেন, তিনিই আবার কারো কন্যা, কারো বধূ, কারো পত্নী হ'য়ে জগৎ জুড়ে রয়েছেন। একই মা ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে বিরাজ কচ্ছেন, একই মা শত সহস্র রূপ ধারণ করেছেন। তোমরা আমার মা, আমার গর্ভধারিণী মা, আমার প্রসবকারিণী মা, আমার স্তন্যদায়িনী মা, আমার চৈতন্যসঞ্চারিণী মা। তোমরা আমার মা, আমার প্রণবরূপিণী মা, আমার

আদ্যাশক্তি মা, আমার পরমানন্দদায়িনী মা, আমার ব্রহ্মরূপা মা। মাকে যে প্রণাম করে, তার কোটি জন্মের কর্ম্মফল কেটে যায়, তার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়, তার লৌহ-শৃঙ্খল খ'সে যায়।

কলিকাতা
২১শে ভাদ্র, ১৩৩৪

প্রেমের সংজ্ঞা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সমগ্র দিনই মৌনী আছেন। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত শ —শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ-মানসে আসিলেন।

শ—জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রেম জিনিষটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি একটা চিত্র অাঁকিলেন। শ—উহার অর্থ বুঝিতে না পারায় শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া দিলেন,—যে জিনিষটাকে তুমি "কিছু না" বলিয়া মনে করিতেছ, সেই জিনিষটীর মধ্য দিয়া "সব কিছু"কে পাইবার অবস্থার নামই হইতেছে প্রেম।

স্বপ্নে দেবতাদি দর্শনে কর্ত্তব্য

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—আমি প্রায়ই স্বপ্নে নানা রকমের দেবতাদের দর্শন ক'রে থাকি। অথচ প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁরা কেউ আমার আরাধ্য দেবতা নন। আমার ধ্যানের বস্তু এঁদের থেকে আলাদা, আমার জপের মন্ত্র প্রত্যক্ষ ভাবে এঁদের মূর্ত্তির স্মারক নয়। এতে কি আমার কোন দোষ হচ্ছে ? অথবা এগুলি কি আমার ইষ্টনিষ্ঠার হানির চিহ্ন ? স্বপ্নে দেবতাদি দর্শন হ'লে আমার কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—দেবতারা প্রতি জনে হইলেন এক এক যুগের এক এক সম্প্রদায়ের একাগ্র সাধকগণের সুতীব্র সাধন-ভজন-ধ্যান-

আরাধনার দিব্য প্রতীক। দিব্যভাবেরই তাঁরা বাহক ও সঞ্চারক। তোমার মনের পবিত্রতা-বৃদ্ধির জন্যই তাঁহারা তোমাকে স্বপ্নে, কাহাকেও কাহাকেও জাগ্রতে, দেখা দিয়া থাকেন। ভাসুর, দেবর, শ্বশুর আদিকে দেখিলে যেমন প্রথমেই পতির চিন্তা মনে আসা স্বাভাবিক, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবতাদের দর্শনেও তোমার মনে তেমন তোমার ইষ্টের স্মৃতি জাগরিত হওয়াই স্বাভাবিক। তোমার ইষ্টের সহিত ইঁহাদিগকে আত্মীয় সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখিলে তোমার ইষ্টনিষ্ঠা হ্রাস পাইবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং ইহাতে তোমার পক্ষে দোষ কল্পনা করা একান্তই অবান্তর। স্বপ্নে দেবতাদি দর্শন তোমার মনের পবিত্রতার দ্যোতক। কারণ দেবতারা পবিত্রতারই প্রতীক। যিনি যেই সম্প্রদায়েরই নিকটে পূজ্য হউন, সকলেই তোমার সম্মানের পাত্র। এক এক জন দেবতার প্রতীক আশ্রয় করিয়া জগতে কত কত সিদ্ধ তাপসের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং তুমি কাহারও প্রতিই অনাদর করিতে পার না। কিন্তু স্বপ্নে, জাগ্রতে যে দেবতাই যখন দর্শন কর না কেন, নিজ ইষ্টমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে তাঁহার সমাদর করিতে যাইও না। স্বপ্নে দেবতাদি দর্শন করিলে মনে মনে তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইবে যে, তোমার মনের কলুষ হরণ করিবার জন্য ক্ষণকালের জন্যও তাঁহারা তাঁহাদের দিব্য-সঙ্গ-সুখ তোমাকে দিয়াছিলেন এবং সেই কৃতজ্ঞতার চরমফলরূপ ইষ্টে অধিকতর প্রগাঢ় নিষ্ঠা লাভের সঙ্কল্প লইয়া প্রাণ ভরিয়া মন ভরিয়া ইষ্ট-নাম জপ করিতে লাগিয়া যাইবে। দেবতারা স্বপ্নে দর্শন দিয়া তোমাকে তোমার সাধন আরও পরাক্রম-সহকারে করিয়া যাইবার কথাই বলিয়া গেলেন বা তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। ইহাই তুমি বুঝিও। তাঁহারা তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠার হানি করিয়া তোমার কাছে পূজা আদায় করিবার জন্য স্বপ্নে দেখা

দিয়াছিলেন, অত ক্যাংলা বলিয়া তাঁহাদের মনে করিও না। দেবতারা মহান্ উদার, কাহারও পূজার প্রত্যাশী তাঁহারা নহেন। প্রতি সাধকের মনে দিব্য ভাবের উন্মাদনা জাগানই তাঁহাদের কাজ। তুমি তোমার ইষ্টে নিষ্ঠাশীল হইলেই তাঁহারা সমধিক প্রীত হন।

মানুষ হইবার পথ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দৃঢ়তা সহকারে কর বিদ্যার্জ্জন, নিষ্ঠা সহকারে কর সাধন-ভজন, মহাপরাক্রমে কর ব্রহ্মচর্য্য পালন। ধৈর্য্য-সহকারে কর বিপত্তি-বরণ, বীর্য্য সহকারে কর পুরুষকার-পরিচালন, নির্ভরতা সহকারে কর কর্ত্তব্য-পালন। সর্ব্বদা মনে রাখিও, ইহাই মানুষ হইবার পথ, অন্য কোনও পথ নাই।"

জপ বনাম ধ্যান

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নামজপের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইতেছে মনকে ইষ্টে একান্তভাবে লগ্ন করা। সুতরাং নামজপের পদ্ধতি এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে মন অতীব সহজে ধ্যানাবিষ্ট হইতে পারে। কলিতে ধ্যান নাই, শুধু জপই আছে, এই কথার কোনও অর্থ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। জপ করিতে করিতে ধ্যান আসে। প্রতিবার জপের সাথে সাথে এক বার করিয়া সূক্ষ্ম ধ্যান হইয়া থাকে। এই পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম ধ্যানাবস্থাগুলিকে একত্র সংযোজিত করিয়া নিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপক ধ্যানপ্রবাহে পরিণত করিবার জন্যই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নামজপ প্রয়োজন। জপাবস্থা ধ্যানাবস্থাকে সহজায়ত্ত করে। জপের সহিত ধ্যানের বিরোধ নাই। জপ ধ্যানকে সুগম করে। জপ ধ্যানের অনুপূরক।

জপ বনাম কীৰ্ত্তন

"অতীব উচ্চৈঃস্বরে জপ চলে না। মনকে জপে অনুরক্ত করিবার জন্য, জপের অনুকূল অবস্থা ও রুচি মনের মধ্যে সৃষ্টি করিবার জন্য উচ্চ-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়া থাকে। কীর্ত্তন জপের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কীর্ত্তনের ইহাই এক সুমহতী উপযোগিতা এবং অবিসংবাদিত মহিমা। কীর্ত্তনকে মাতালের চীৎকার বলিয়া গালি দেওয়া বদ্ধ-প্রলাপীর অসম্বদ্ধ ভাষণ মাত্র। প্রাণের গভীর আবেগ নিয়া প্রেমব্যাকুল কণ্ঠে অকপট বিনয় এবং সরলতা নিয়া যে ব্যক্তি নিজে কখনও কীর্ত্তনের মধুর ও অমৃতময় রস আস্বাদন করে নাই, সে এরূপ ভ্রান্ত মন্তব্য করিবেই। তোমরা সেই সকল অর্ব্বাচীনজনোচিত কদুক্তিতে কর্ণপাতও করিও না, বিচলিতও হইও না। তোমরা কীর্ত্তনকে জপ-ক্ষেত্র-নির্ম্মায়ক বলিয়া গ্রহণ করিও এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে মন একটু স্থির হইয়া আসিলেই জপে বসিয়া যাইও, জপ করিতে করিতে মন ক্লান্ত বা বিক্ষিপ্ত দেখিলেই কীর্ত্তন সুরু করিও।"

নামজপ করিবার নিয়ম

"জপ মনে মনেই করিবে। সেই সময়ে ঠোঁট নাড়িবে না, মুখ নাড়িবে না, দন্ত-ঘর্ষণ করিবে না, জিহ্বাকে আলোড়িত করিবে না। তোমার পরমপ্রেমদয়িত পরমেশ্বরের নামরূপ বিগ্রহে নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয়কে একেবারে ডুবাইয়া দিবে। বাহিরের পানে চাহিবে না, বাহিরের কথা ভাবিবে না। সম্ভব হইলে জিহ্বাকে উল্টাইয়া আলজিহ্বার সহিত সংযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। কেন না, তাহা দ্বারা মনঃসংযোগের গভীরতা সম্পাদিত হয়। জপ করিতে বসিয়া হেলিবে না, দুলিবে না, হাত-পা নাচাইবে না, হাতের পায়ের নখ খুঁটিবে না।"

কলিকাতা
২২শে ভাদ্র, ১৩৩৪

কাম ও প্রেম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রতাবলম্বনেই আছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে যে পত্র লিখিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কাম ও প্রেম পরস্পর-বিরোধী অবস্থা। একই অনুরাগ কখনও কামে কখনও বা প্রেমে পরিণত হয়। কখনও কখনও একই সঙ্গে কাম ও প্রেম মাখামাখি অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইহাকে কাম ও প্রেমের মিলন বলা চলে না। যখন প্রেমটুকুর সংস্পর্শহেতু কাম প্রেমে পরিণত হইয়া যায়, তখনই প্রকৃত মিলন হয়। অনেক সময়ই কামের সহিত প্রেম এবং প্রেমের সহিত কাম এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে, অ-যোগী ব্যক্তি কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু ভগবানের কঠিন দণ্ড এক দিন বুঝাইয়া দেয় যে, কাম ও প্রেম চিরকাল এক ঠাঁই থাকিতে পারে না। কামুকও প্রেমিক হয়, কিন্তু প্রচণ্ড অন্তর্দ্দাহ এবং তীব্র যাতনা সহিবার পরে, কঠিনতম বিচ্ছেদ-অনলে দগ্ধ হইবার পরে। অনেকের জীবনে একাধারে কাম ও প্রেম বাস করে; কিন্তু কামটুকু যেদিন প্রেমের রূপ ধরে, তার অনেক আগে হইতেই সোণা গলাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য স্বর্ণকার বিশ্বকর্ম্মা প্রচণ্ড অগ্নির সৃষ্টি করেন। আগুনে পুড়িয়া কাম প্রেম হয় এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া কাম প্রবর্দ্ধিত হইতেছিল, অনেক সময় চিরতরে তাহাকে হারাইয়া কামুক ব্যক্তি প্রেমিক হয়। কামের মধ্য দিয়া প্রেমের সাধনা অতি কঠোর এবং অতি কষ্টপ্রদ। এই দুঃখ এবং কষ্টের বর্ণনা নাই, বর্ণনা সম্ভব নয়।"

সাধু চিনিবার চারিটী উপায়

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধু চিনিবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া দিলেন,—

"সাধন দিয়া সাধু চিনিতে হয়, কিন্তু অযোগী ব্যক্তি সাধন অসাধন বুঝিবে কি করিয়া ? তাহাকে সাধু চিনিতে হইবে অন্য লক্ষণের দ্বারা। প্রথম লক্ষণ—জীবে দয়া, দ্বিতীয় লক্ষণ—টাকা পয়সায় নির্লোভতা, তৃতীয় লক্ষণ—ভোগসুখে অনাস্থা, চতুর্থ লক্ষণ—নাম-যশে বিতৃষ্ণা। এই চারিটী লক্ষণ দিয়া সাধু চিনিবে।"

জগৎ-কল্যাণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বলিখিত একখানা নোটবুকের একটা পৃষ্ঠা দেখাইলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া রাখিয়াছেন,—

"সাধনের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-কল্যাণ সম্বন্ধে তোমার ধারণাও অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-কল্যাণ কর্ম্মের ধারাও পরিবর্ত্তন লাভ করিবে। বিভিন্ন জনের পক্ষে, এমন কি, একই জনের পক্ষে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মের ধারা বিভিন্ন হইবেই। ভগবৎ-সেবার অকপটতা যত অধিক হইবে, তোমার জগৎ-কল্যাণে আগ্রহ তত একান্ত এবং রুচি তত স্বচ্ছ হইবে।"

প্রাণায়ামে সতর্কতা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রাণায়াম করিতে করিতে যদি মনে হয়, তোমার অস্বস্তি বোধ হইতেছে, তাহা হইলে জানিও, তোমার প্রাণায়াম ঠিক্ হইতেছে না।

প্রাণায়াম-অভ্যাসে যদি কিছু দিন পরে তোমার আহারে অরুচি জন্মে, তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ বা জ্বালা অনুভব হয়, নিদ্রাহীনতা জন্মে কিম্বা শরীর শীর্ণ হয়, তবে জানিও, প্রাণায়াম ঠিক্ হইতেছে না। ভ্রান্ত পথে প্রাণায়াম করিয়া ভারতের শত শত সাধক জীবনকে বিপন্ন করিয়াছেন। অতি-আগ্রহশীলেরা দ্রুত পারমার্থিক শক্তি সঞ্চয়ের লোভে অনেক সময় নিজেদেরই অজ্ঞাতসারে প্রাণায়াম সম্বন্ধে ভুল করিয়া বসে। আবার, অনেক সাধক গুরূপদেশ ঠিক্ ঠিক্ স্মরণে রাখিতে না পারিয়া ভুল করিয়া থাকে।”

কলিকাতা

২৩শে ভাদ্র, ১৩৩৪

অদ্যও শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রত পালন করিতেছেন।

বধূ-নির্য্যাতন ও দুঃখসহিষ্ণুতা

বগুড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“তোমার ভগ্নীকে মনের দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে উপদেশ দাও। শ্বশুর-গৃহে যাইয়া কুলবধূদের কতক দিন একটু উৎপীড়ন ও শাসন সহিতেই হয়। কিন্তু এই উৎপীড়ন চিরকাল চলে না। বধূদের চরিত্রে ধৈর্য্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপন্যাস পড়িতে পড়িতে মেয়েগুলির স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্মিয়া থাকে। তাই তাহারা কথায় কথায় আত্মহত্যা করিতে চাহে। বধূ-নির্য্যাতন অতীব জঘন্য কুপ্রথায় আসিয়া পরিণত হইয়াছে, ইহা সত্য কিন্তু বধূমাতাদের মনে দুর্জ্জয় সাহস ও অপরাজেয় সহিষ্ণুতার সঞ্চার করাই এই ক্ষেত্রে প্রধান প্রয়োজন। তাহাদের

দুর্ব্বলতাতে ইন্ধন দিও না। তাহাদের মনকে দৃঢ়, সতেজ এবং সবল করিবার জন্য চেষ্টা কর। পরাজিতের মনোবৃত্তি জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্মক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। দুঃখ সহিয়া জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ না হইয়া দুঃখ দ্বারা যে জীবনের মূল্য ও গৌরব বাড়িতেছে, এই বোধে তা'হারা উজ্জীবিত হউক। জীবনে দুঃখ সহিবারও প্রয়োজন আছে। কেবল আদরে মানুষ অমানুষ হইয়া যায়।"

সৎকর্ম্মে রুচি সৃষ্টি করিবার উপায়

পাবনাবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকার্য্যে মানুষের রুচি নাই দেখিয়া মানব-জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইও না। তোমরা চেষ্টা করিয়া প্রাণে প্রাণে সেই অত্যাবশ্যক রুচির সৃষ্টি কর। এই রুচিসৃষ্টির সদুপায় আছে। জোর করিয়া কাহারও রুচিকে সৎকার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। তার জন্য মধুময় পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। তোমার শ্রোতার সৎকার্য্যে অরুচির প্রতি বিন্দু-মাত্র কটাক্ষ, শ্লেষ, বিদ্রূপ বা দ্রোহভাব না করিয়া সৎকার্য্যে রুচিমান্ ব্যক্তিদের সঙ্গত প্রশংসা কর। সৎকার্য্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তগুলি প্রীতি, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাষায় বর্ণনা কর। একজনের সৎকর্ম্মে রুচি কি করিয়া দশজনের জীবনের দুঃখ দূর করে, দশজনের বিষণ্ণ মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটায়, তাহা আলোচনা কর। সৎকর্ম্মে রুচিশীল দশজনের মিলনে কি করিয়া জগতের বড় বড় অশান্তি বিদূরিত হইতে পারে, তাহার মোহন আলেখ্য রচনা করিয়া সকলের চখের সম্মুখে ধর। পৃথিবী জুড়িয়া সকলে মিলিয়া আমরা কেবল আত্মপরায়ণ, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, পরস্বাপহারী, প্রবঞ্চক ব্যক্তিদের জুড়ি-গাড়ীর চমকপ্রদ চিত্র

দেখাইয়াছি আর এই জঘন্য লোকগুলির জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছি। শিশুকাল হইতে ইহা দেখিতে দেখিতেই মানুষ সৎকার্য্যে রুচি হারাইয়াছে। ইহার বিপরীত আচরণ কর। প্রকৃত সৎকর্ম্মীদের জয়োচ্চারণ কর।"

পাঁচটী ব্যক্তির শক্তি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পাঁচটী মাত্র ব্যক্তি একআত্মা একপ্রাণ হইয়া একটী লক্ষ্যে কাজে লাগিলে যাহা করিতে পারে, তোমরা কোথাও ঐক্যবদ্ধ ও একমত হইতেছ না বলিয়াই তাহা অনুমান করিতে পারিতেছ না। পাঁচটী মস্তিষ্ক এবং দশটী বাহু একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।"

কলিকাতা

২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৪

ভগবৎ-সাধনা ও রূপধ্যান

শ্রীযুক্ত সু—কে লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি হেদোতে গিয়া বসিলেন। সু— জিজ্ঞাসা করিলেন—নামজপ করার সময়ে কার রূপ ধ্যান কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যার রূপে মন যায়।

সু।—এক এক সময়ে যে এক এক রূপে রুচি যায়! কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট রূপে যে মন স্থির করা যায় না!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এই জন্যই রূপকে প্রধান না জেনে নামকেই প্রধান ব'লে গণ্য কর্ব্বে। যত প্রকারের রূপ ও ভাবনাই মনে আসুক না কেন, কারো প্রতি বিরূপ হবে না। সবাইকে সমান আদর কর্ব্বে। কিন্তু

নিজেকে সমর্পণ কর্ব্বে নামের কাছে, রূপের কাছে নয়। ভগবান্ বিশ্বরূপ। তাঁকে তাঁর নাম ধ'রে যতই ডাক্‌বে, ততই তাঁর অধিকতর মনোহর মূর্ত্তি-গুলি তোমার মনশ্চক্ষুর সামনে ফুটে উঠ্‌বে। তাঁর ত' রূপ একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু নেই! যেখানে যত রূপ, সব তাঁরই রূপ। তাঁর অপরিমেয় রূপ কেউ বর্ণনা ক'রে শেষ কত্তে পারে না। নাম সাধন কত্তে কত্তে দেখ্‌বে, এমন কত রূপই প্রকটিত হচ্ছে, যা কোনো চিত্রকর কোনো দিন আঁকে নি।

অসাম্প্রদায়িক নামের উপযোগিতা

সু।—কিন্তু আমি যদি কোনো একটী নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিকেই অবলম্বন ক'রে চলি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতেও কোনো দোষ নেই।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কালী-মন্ত্রে কৃষ্ণরূপ ভাবনা হয় না, কৃষ্ণমন্ত্রে কালীরূপ ভাবনা হয় না। যীশুমন্ত্রে বুদ্ধরূপ ভাবনা হয় না, বুদ্ধমন্ত্রে যীশুরূপ ভাবনা হয় না। গুরুমন্ত্রে মাতৃরূপ ভাবনা হয় না, মাতৃমন্ত্রে গুরুরূপ ভাবনা হয় না। হয় না—মানে, সাধারণ অবস্থায় হয় না, সহজে হয় না, উন্নত অবস্থায় না পৌছান পর্য্যন্ত হয় না। অসাধারণ অবস্থায় অসাধারণ ব্যক্তি কালীমন্ত্রেও কৃষ্ণ-ধ্যান কত্তে পারেন, সামান্য লোকে পারে না। এইজন্যই জপনীয় নাম হওয়া উচিত অসাম্প্রদায়িক, তাতে রূপধ্যানের রুচি স্বাধীন পথে চলতে পায়।

নাম-পন্থা ও রূপ-পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন—সাধনের দুইটী পন্থা। রূপপন্থা ও নামপন্থা। রূপ-পন্থী সাধক একটী নির্দ্দিষ্ট রূপের আশ্রয়ে থেকে সাধন করেন। নামপন্থী সাধক একটী নির্দ্দিষ্ট নামের আশ্রয়ে থেকে সাধন

করেন। রূপপন্থীর রূপেই অভিনিবেশ, নাম আনুষঙ্গিক মাত্র, রূপানুভূতির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে নাম পরিবর্ত্তন পায়। নামপন্থীর নামেই অভিনিবেশ, রূপ আনুষঙ্গিক মাত্র, নামনিষ্ঠার অবস্থান্তরে রূপ পরিবর্ত্তন পায়। রূপ অবলম্বন করেও সাধন হয়, নাম অবলম্বন করেও সাধন হয়। উভয়েরই চরম অবস্থা এক। কিন্তু রূপের পথের চাইতে নামের পথ সুগম এবং অধিকতর নিঃসংশয়।

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

সু।—নাম জপ কত্তে কত্তে যদি কখনো আপনার মূর্ত্তি জাগে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।-জাগুক, তাকেও অনাদর কর্ব্বার দরকার নেই। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে,—ন ইতি, এখানেই শেষ নয়। ভগবানের নাম জপ কর্‌লে বিনা চেষ্টায় যে-কোনো রূপ তোমার চক্ষের সমক্ষে এসে দাঁড়াবে, জান্‌বে, এটা ভগবানেরই রূপ। তাঁর নাম কত্তে ব'সে বিনা চেষ্টায় যদি কুলটা নারীর রূপও জাগে, জান্‌বে এটা ভগবানের রূপ। তাঁর নাম কত্তে ব'সে যদি মৈথুনাদি কদাচারে রত পশুপক্ষি-সরীসৃপের মূর্ত্তিও জাগে, তবে জান্‌বে এটাও ভগবানেরই রূপ। যত রূপ যেখানে আছে, সবই ভগবানেরই রূপ। কালীমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, কৃষ্ণমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, জননীমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, জনকমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, দরিদ্রমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ। ভগবান্ রূপের মহাসমুদ্র। কালী, কৃষ্ণ, জনক, জননী, গুরু, গুর্ব্বী, দীন, দরিদ্র, অনাথ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, পুত্র, শিষ্য, স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, শত্রু, মিত্র, রাজা, প্রজা, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সবই সেই অনন্ত রূপ-সমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ মাত্র। নাম জপ কত্তে কত্তে এঁদের যাঁকেই যখন দেখ না কেন, জেনো, ভগবদ্দর্শনই হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণ ভগবানকে

দেখ্‌ছ না, তাই এইটুকু দর্শনেই তুষ্ট থাক্‌লে চল্‌বে না, আরো দেখ্‌তে হবে। এবং তারই জন্য কষে নাম-সাধনা কত্তে থাক্‌বে।

কৌপীন পরিধানের নিয়ম

অতঃপর কৌপীনের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—কৌপীন পর্‌বার আগে কৌপীনটীকে দুই হাতে অঞ্জলির মত ক'রে ধ'রে শ্বাস ও দৃষ্টি স্থির ক'রে দৃঢ়চিত্তে বারংবার বলবে,—"হে কৌপীন, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনেরই জন্য আমি তোমাকে পরিধান কর্ব্ব,—তুমি আমার সহায় হও, সচ্চিন্তা ও মহৎ ভাবের তুমি পোষক হও।" বারংবার বল্‌বে,—"যতক্ষণ কৌপীন-পরিহিত থাক্‌ব, ততক্ষণ কোনও কু-ভাবকে, কোনও দুষ্ট চিন্তাকে, কোনও দুর্ম্মতিকে মনের কাছে আস্‌তে দিব না।" বারবার সঙ্কল্প কর্ব্বে,—"কোনও প্রকারের পাপবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'য়েই আমি সংযমবিচলিত হব না, কু-মতির প্রভাব আমার পক্ষে ব্যর্থ হবে।" কৌপীন পরা হয়ে গেলে পুনরায় কিছুকাল মন লিঙ্গমূলে স্থির ক'রে দৃঢ়স্বরে বল্‌তে থাক্‌বে,—"আমার অধোমুখিনী শক্তি ঊর্দ্ধগামিনী হোক্, আমার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অবসান হোক্, দেহমনের সকল চাঞ্চল্য বিদূরিত হোক্, সংযম ও জিতে-ন্দ্রিয়ত্ব আমার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক্।" আবার যখন কৌপীন খুলে রাখবার সময় হবে বারংবার সঙ্কল্প কর্ব্বে,—'আমি কামের দাস নই, ভোগ সুখের দাস নই, আমি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, আমি অজর, অমর, সর্ব্ব-শক্তিমান্, প্রবৃত্তিনিচয় আমার দাস, আমি তাদের প্রভু।"

সু।—কৌপীন পর্‌তে হবে কি ভাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ঊর্দ্ধমুখলিঙ্গে অর্থাৎ কৌপীন পর্‌বার সময়ে অণ্ড-কোষ থাক্‌বে নীচের দিকে, আর পুরুষেন্দ্রিয় থাক্‌বে ঊর্দ্ধদিকে। কিন্তু

এতে যার বিশেষ অসুবিধা বোধ হবে, সে অধোমুখ লিঙ্গেও পর্তে পারে। সন্ন্যাসীদের অনেকে এভাবেও পরেন।

সু।—কৌপীন বা লেঙ্গট কি দিবারাত্র পরা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, সর্ব্বদা পরা ঠিক নয়। রাত্রিকালে খুলে রেখে শয়নই উচিত। বিশেষ প্রয়োজন হ'লে রাত্রিতে শিথিল ক'রে পর্তে পার। আর কখনও দদ্রুরোগ জন্মালে তার জন্যেও সাবধান হবে। দদ্রু এবং কোষ্ঠবদ্ধতা এই দুই রোগ ব্রহ্মচর্য্যের পরম শত্রু জান্‌বে।

কলিকাতা
২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৪

সংযমের ষোল আনা প্রমাণ

অদ্য ভারতের বাহির হইতে আগত একটী চির-কৌমার-ব্রতধারী যুবক বলিলেন,—যে দিকে তাকাই, সে দিকেই স্ত্রীলোক, এমন এক দেশে বাস। এদের স্বাধীনতা আছে, সংযম আছে, অসম্ভব রকম অসংযমও আছে। কতবার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, কতবার মর্তে মর্তে বেঁচে গেছি। পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে পতন-ভয়। চারিদিক থেকে আমাকে নিয়ে ভীষণ টানাটানি চলেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মরণের সহস্র সম্ভাবনার মধ্যেও যে বেঁচে থাকা, এরই মধ্যে বাঁচবার প্রমাণ ষোল আনা। যেখানে প্রলোভন নাই, সেখানে শুকদেব গোস্বামী সবাই হতে পারে। তাতে আর বাহাদুরী কি? কোলের উপরে ষোড়শী রূপসীকে বসিয়ে রেখেও যার চিত্ত-বিকার হয় না, তিনিই যথার্থ ঊর্দ্ধরেতা।

সাধিয়া পরীক্ষা দিও না

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু সংযমের পরীক্ষা দেবার জন্য সেধে প্রলোভনের মধ্যে যাওয়া ঘোরতর মূর্খতা। সেধে পরীক্ষা দেওয়ার প্রবৃত্তি কামার্ত্ততারই একটা ছদ্মরূপ। জীবনকে প্রলোভন থেকে দূরে রাখ্‌বার চেষ্টাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক, কিন্তু প্রলোভন যদি এসে পড়ে, তখন বীরের মতই লড়াই দিতে হবে।

জঠরে সন্তান-ধারণের সার্থকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—আমরা যখন প্রলোভন থেকে দূরে দূরে থাকি, তখন মাতৃশক্তি আমাদের অনুকূল হয়। যখন প্রলোভনের মাঝে পড়ি, তখন মাতৃশক্তি প্রদীপের আলোর মত চঞ্চল হয়। যখন আমরা প্রলোভনকে জয় করি, তখন মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, মা যে একদিন আমাদিগকে জঠরে ধারণ করেছিলেন, সেই অসহ্য ক্লেশ সার্থক হয়, গর্ভ শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

কলিকাতা
২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৪

স্বাধীনতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে শ্রীযুক্ত ব—'র প্রকোষ্ঠে বসিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন,—যেখানে বিধি-নিষেধের বাড়াবাড়ি বেশী, সেখানে আইন-অমান্য হবার সম্ভাবনাও বেশী। যেখানে মানুষকে প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সেখানে দুটী একটী বিধি-নিষেধ সে প্রাণ দিয়েই প্রতিপালন করে। স্বাধীনতাই মানুষের প্রকৃত জীবন। তাই, দেহে, মনে, কর্ম্মে, ইচ্ছায় - সর্ব্বপ্রকারে মানুষ যুগে যুগে স্বাধীনতাই লাভ কত্তে চেয়েছে। স্বাধীনতার জন্য মানুষ হাসিমুখে ফাঁসীকাঠে উঠেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসটা আর কিছুই নয়, ওটা শুধু মানুষের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টারই ইতিহাস। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, চিন্তার স্বাধীনতার জন্যও মানুষ কত কষ্ট, কত নির্য্যাতন, কত দুঃখকে বরণ করেছে। আজ কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ, কাল বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ, পরশু পটল ভক্ষণ নিষেধ, —এত নিষেধের বাড়াবাড়িতে বিধির সম্মান থাকে না। মনু-সংহিতা আর পিনালকোড সমাজের যতই কল্যাণ করুন, মনুষ্যত্বের সহজ বিকাশ-টাকেও অনেক জায়গায় ব্যাহত ক'রেছেন।

সুনির্ব্বাচিত সঙ্গীত

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীতের কথা তুলিলেন। বলিলেন,— সুনির্ব্বাচিত সঙ্গীত চরিত্রকে গঠন করে! কতকগুলি গান আছে, যার রচনা ধোঁয়াটে, কিছুই অর্থ-বোধ হয় না। কতকগুলি গান আছে, যার ভিতরের বস্তুটা প্রেম, কিন্তু অনাবিল ভগবৎ-প্রেম না ব'লে নরনারীর কলুষিত প্রেম ব'লেই মনে হবার সম্ভাবনা বেশী। এ সব সঙ্গীত কর্ব্বে না। এমন গান গাইবে, যাতে বুকে জোর বাঁধ্‌বে। এমন গান গাইবে, যাতে মন ভোগ-সুখের ঊর্দ্ধলোকে ধেয়ে চল্‌বে। এমন গান গাইবে, যাতে স্বার্থের প্রতি আকর্ষণ কম্‌বে, পরার্থের প্রতি প্রাণের টান বাড়্‌বে।

সঙ্গীতের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সঙ্গীতের উপযোগিতা সুস্বীকৃত। নিরানন্দ মনে আনন্দ পরিবেশন কত্তে এর তুল্য জিনিষ আর নেই। কোনও একটা উন্নত সংস্কারকে মনের মধ্যে সুকৌশলে চিরস্থায়ী ক'রে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সঙ্গীত এক অসাধারণ বস্তু। সঙ্গীত কুটিলকে সবল কত্তে পারে, পাষাণকে বিগলিত কত্তে পারে, ভীরুকে সাহসী কত্তে পারে।

সঙ্গীতের অপব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সঙ্গীতের অপব্যবহারও আছে। শোকার্ত্তকে শোক ভুলাবার জন্য যার সৃষ্টি, রুদ্ধ প্রাণের স্তব্ধ আবেগকে নিঃক্ষোভ সরসতার স্রোতোধারায় নিঃসরিত ক'রে হৃদয়কে ব্যথামুক্ত দুঃখরিক্ত করাই হচ্ছে যার কাজ, সেই সঙ্গীত জীবে জীবে হিংসা, জাতিতে জাতিতে বৈর, মানুষে মানুষে অমিত্রতাও সৃষ্টি করেছে। এ সঙ্গীত ব্যর্থ। সঙ্গীত তপস্যার সুন্দরতম মূর্ত্তি। অথচ পঙ্কিল, কুৎসিত, জঘন্য ভাবে হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে দিয়ে অমরা-পুরীতে নরকোৎসবের মাতন সে সৃষ্টি করে নি, এমন নয়। এ ক্ষেত্রে সঙ্গীত অসার্থক ও মিথ্যা।

ভারতে সঙ্গীতের ব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিশুর চিত্ত-বিনোদন, সামাজিক অনুষ্ঠানের আনন্দবর্দ্ধন, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-নিবেদন বা প্রণয়-স্মরণ, নাগরিক মাত্রেরই দেশ বা জাতির প্রতি কর্ত্তব্যবোধের উদ্বোধন, অন্তরের শোক, দুঃখ, আনন্দ, হতাশা, উচ্ছ্বাস, অবসাদ প্রভৃতির প্রকাশ,—ইত্যাদি ক'রে বহু উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সঙ্গীত-রচনার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু কোনও কোনও জাতি প্রণয় নিয়েই সব চেয়ে বেশী গান লিখেছে, প্রণয় নিয়েই সব চেয়ে বেশী গান গেয়েছে।

ভারতের সঙ্গীত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষ সব চেয়ে বেশী গান গেয়েছে ভগবানকে নিয়ে। গানের ভিতর দিয়ে সে পরমদেবতার মোহন বংশী শোনে। প্রার্থনা, ধ্যান, জপ প্রভৃতির মত সে গানকেও ভগবৎ-সাধনার শ্রেষ্ঠ এক পথ ব'লে গ্রহণ ক'রেছে, গানকে ভগবল্লাভের এক শ্রেষ্ঠ উপায়

ব'লে স্বীকার ক'রেছে। অন্য দেশে আদিরসের কবির বেশী সম্মান, এ দেশে ভগবৎ-প্রেমিক গীতিকারের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন। সেই দেশের ছেলে তোমরা, তোমাদের কণ্ঠে কোন্ গান শোভা পায়, তা' তোমরা ভুলে যেও না।

নামকীর্ত্তন

অদূরে এক গৃহের ছাদে কতক ভদ্রলোক সমস্বরে ভগবানের নাম গাহিতেছিলেন। তাহার সামান্য সামান্য সুরাভাস অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে কখনও কখনও পৌছিতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—ঐ শোন! একটী মাত্র নাম, তাই কত সুরে কত লয়ে প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে ওখানে কয়েকজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গাইছেন। লক্ষ্য এঁদের ভগবৎ-প্রীতি, কারো বা দুঃখমুক্তি। কিন্তু একমাত্র নাম-গানের ভিতর দিয়েই এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এত আনন্দ আহরণ কর্ব্বেন, যা' হয়ত সমস্ত পৃথিবীর সকল প্রণয়-সঙ্গীত একত্র শুন্‌লেও কেউ পাবে না। গানের ভিতর দিয়ে মনোলয় ক'রে যে সাক্ষাৎ-ভগবদ্দর্শন মিলে, এ-বিশ্বাস ভারতের অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জায় গ্রথিত। এই জন্যই একটী মাত্র নামকে নিয়ে সুরের লয়ের এত রকমারি বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েও রস-স্বরূপ পরমেশ্বরের আপন পুরে প্রবেশ করার এই প্রয়াস। পৃথিবীর অন্য দেশ নাম-কীর্ত্তনের এই মহিমা জানে না। শুধু একটী মাত্র নামের মধ্য দিয়ে ভগবানের কাছে পৌছুবার এই চেষ্টা এ-দেশে অনাদি ও সনাতন। যেদিন বৈদিক ঋষি সর্ব্বমন্ত্রের সাররূপে ওঙ্কার-মন্ত্রকে দর্শন কর্ল্লেন আর সেই একটী মন্ত্র থেকেই যেদিন বেদের লক্ষ লক্ষ মন্ত্রের প্রকাশ ঘট্‌তে লাগ্‌ল, ভারতবর্ষে নামকীর্ত্তনের মহিমা সেই দিনই স্বীকৃত হ'য়ে গেছে।

পদকীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বৈদিক ঋষি কেবল আর্য্য জাতিকে নিয়েই চিরকাল যজন-যাজন কত্তে পারেন নি। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের অনার্য্য জাতিদের মধ্যে যেমন কখনো হয়ত ঘটে নি, তেমন এক একটা অত্যুন্নত অভ্যুন্নত প্রদীপ্ত-গরিমাময় সভ্যতা নিয়ে এই ভারতের সবুজ বুকে বহু বহু অনার্য্য-গোষ্ঠী বাস কচ্ছিলেন। বৈদিক সভ্যতা সেই সকল প্রাক্তন সভ্যতার সঙ্গে প্রণয়ের বন্ধন সৃষ্টি করল। বেদ ও তন্ত্র মিলিত হ'ল,—যেন গঙ্গাযমুনার মিলন। বেদান্ত ও সাংখ্য মিলিত হ'ল, যেন পদ্মা আর মেঘনার মিলন। ভাবধারার সঙ্গে ভাবধারা মিলিত হ'ল, রক্তের সঙ্গে রক্ত, বংশের সঙ্গে বংশ, জাতির সঙ্গে জাতি, ভাষার সঙ্গে ভাষা, সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতা, মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র। সকল জাতির সকল মন্ত্র ওঙ্কারের শুভসিঞ্চন পেয়ে পেল প্রাণ, আর, ওঙ্কার হ'য়ে গেল মন্ত্ররাজ, মহামন্ত্র, সকল মন্ত্রের মধ্যে সে হ'ল কুলীন। যা' ছিল সকলের পক্ষে সমান, তা' হল শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ কোনও জিনিষ সর্ব্বসাধারণের নিকট সমান থাকে, ততক্ষণ তাকে আর সিন্দুকে ভ'রে রাখবার আবশ্যকতা-বোধ জন্মে না। কিন্তু যাই সে কুলীন হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তালাচাবী লাগানোর বুদ্ধি এল। ওঙ্কারের নাম-কীর্ত্তন ক্রমশঃ অনাদৃত হ'ল এবং এল ভাব-প্রধান বা ভাব-বিস্তার-প্রধান কীর্ত্তন। গায়ত্রী-গান সেই পদ-কীর্ত্তনের প্রথম রূপ, রামলীলা, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণলীলা আদি হচ্ছে তার পরবর্ত্তীকালীন রূপ। তান্ত্রিক মহাপুরুষের রচিত পদ, শাক্ত-সাধকের রচিত পদ, বৈষ্ণব মহাজনের রচিত পদ, নানা সুরে গেয়েই গায়ক সন্তুষ্ট হলেন না, তাঁরা সময়োচিত ব্যাখ্যাও গেয়ে গেয়ে লোকের মনে নিজ নিজ সাধনপন্থানুযায়ী রুচি সৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন। সকলেরই লক্ষ্য একমাত্র

ভগবৎ-সাধন। এই জন্যই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যে সঙ্গীত অনুবাদ ক'রে শুনালে ভিন্ন দেশের লোকে যৌন-প্রেমের সরস কবিতা ছাড়া অন্য ধারণাই কত্তে পার্ব্বে না, সেই সঙ্গীত এদেশে সহস্র সহস্র লোকের ধর্ম্মবিষয়িণী রুচি বৃদ্ধি করেছে।

লীলাকীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে এ কথাও অবশ্য স্বীকার কত্তে হবে যে, বৈষ্ণবদের লীলা-কীর্ত্তনের সবগুলি পদই সাধারণ লোকের পক্ষে সুপাচ্য নয়। এজন্যই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের সঙ্গে লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করেছিলেন গোপনে ও নিভৃতে। আজকালও দুই চারজন খ্যাতিমান বৈষ্ণব আচার্য্যকে একথা প্রচার কত্তে শুনেছি যে, যাদের ইন্দ্রিয়-সংযম লাভ হয়েছে, যাদের মন একান্তই ঈশ্বর-পরায়ণ হয়েছে, যাদের চিত্তের বহির্ম্মুখতা দূর হয়েছে, কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনের একমাত্র তারাই অধিকারী।

বাহিরের সদাচার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,— ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণই হ'ল চিত্তশুদ্ধি বা মনের পবিত্রতা। কিন্তু তাই ব'লে মনে কত্তে হবে না যে, বাইরের সদাচার রক্ষার প্রয়োজন নেই। পথ দিয়ে এক যুবতী স্ত্রীলোক যাচ্ছেন, তোমার মনে পাপ নেই; চিত্ত পবিত্র, তুমি মাতৃবুদ্ধি নিয়েই তাঁর প্রতি বারংবার তাকাতে লাগ্‌লে। এতে তোমার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হ'ল না কিন্তু জনসমাজের অনিষ্ট হ'ল। একজন, যার মনে মাতৃবুদ্ধি নেই, যার চিত্ত পাপ-কলুষিত, সে তোমার দৃষ্টান্ত দেখে স্ত্রীলোকের প্রতি বারংবার দৃষ্টি দিতে উৎসাহিত হ'ল। আর সদাচার লঙ্ঘন কর্‌লে তোমাকেও যে বিপদে পড়তে হবে না, এমনও মনে করো না। সদাচার লঙ্ঘনের ফলে অনেক সময় পবিত্রচেতা ব্যক্তিরও মনে

কুৎসিত ভাব জন্মে কিম্বা অন্য প্রকারে তিনি বিশেষ বিপন্ন হন। একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ব'সে অর্জ্জুন উর্ব্বশীর নৃত্য দেখ্‌ছিলেন। উর্ব্বশীকে দেখে তাঁর মনে হতে লাগ্‌ল—এঁর জঠর থেকেই পুরু-বংশের উদ্ভব হয়েছে, ইনি আমার পূজ্যা, আমার মাতৃস্থানীয়া। অর্জ্জুনের মনে কোন অসদভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তবু তিনি বারংবার উর্ব্বশীর পানে তাকাতে লাগ্‌লেন। ইন্দ্র ভুল বুঝ্‌লেন, তিনি ভাব্‌লেন, অর্জ্জুন উর্ব্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি গোপনে রজনীযোগে উর্ব্বশীকে পাঠিয়ে দিলেন অর্জ্জুনের কাছে। ভেবে দেখ দেখি, অর্জ্জুনের কি বিপদ। উর্ব্বশী গিয়ে অর্জ্জুনের কাছে যখন তাঁর পাপ-বাসনা জানালেন, অর্জ্জুন তখন কাণে হাত দিলেন। অর্জ্জুন বললেন,—বলেন কি, এসব কথা আমার পক্ষে নিতান্তই অশ্রাব্য, কেননা, আপনি যে আমার জননীস্থানীয়া, কুন্তী, মাদ্রী ও ইন্দ্রাণী আমার যেমন গুরু, আপনিও তেমন গুরু, আমি আপনার পুত্রস্বরূপ। উর্ব্বশী তখন ক্রুদ্ধ হ'য়ে অর্জ্জুনকে ক্লীব হ'য়ে থাকার অভি-সম্পাত কর্লেন।

সন্ন্যাস ও প্রচ্ছন্ন ভোগলিপ্সা

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীবাবামণি হেদুয়াতে আসিয়া বসিলেন। জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সবাইকে সন্ন্যাসী ক'রে ফেল্‌তে হবে, এমন মারাত্মক ঝোঁক যদি কারো হয়, তবে বল্‌তে হবে যে, তাকে দানায় পেয়েছে। যেখানে দেখ্‌বে দলে দলে সন্ন্যাসী জুটেছে, সেখানেই জান্‌বে, সন্ন্যাসে অনধিকারী কত ব্যক্তি গেরুয়া প'রে তাদের কামের আর্ত্তভাটাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছে। বাইরে ত' সন্ন্যাস বেশ জমেছে, জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা জ্ঞান ক'রে পদতলে ভক্তের দল গড়াগড়ি দিচ্ছে, কিন্তু ভিতরটা যে লালসার দংশনে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে

গেল! এই সব জায়গায় সন্ন্যাসের ভণ্ডামীকে পালিয়ে যাবার পথ দিয়ে সরল, অকপট, সুসংযত গার্হস্থ্য জীবনের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। মস্ত মস্ত মঠ, মস্ত মস্ত মহাত্মা,—কিন্তু বুকটার ভিতরে কিলিবিলি কচ্ছে ভোগসুখ আর ইন্দ্রিয়-লিপ্সা। এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্ত্তন কর্ত্তেই হবে এবং তার উপায় হচ্ছে, দেশের প্রত্যেক বালক ও কিশোরকে সংযম-সাধনায় ব্রতী করা। সংসারের পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখ দেখে যারা সংসার ত্যাগ করে, তেমন কাপুরুষেরা সন্ন্যাসের অনধিকারী। কেননা, দুর্ব্বলের সন্ন্যাস হয় না, মাঝপথে ভেঙ্গে যায়। নিজের মোক্ষ বা জগতের হিতই যাদের সংসার-ত্যাগের একমাত্র কারণ, তারাই সন্ন্যাসের প্রকৃত অধিকারী। কারণ, মোক্ষাকাঙ্ক্ষা বা জগৎ-প্রেম সাধককে মোহজাল থেকে রক্ষা কত্তে যত সমর্থ, দুঃখভয় তত নয়। যথার্থ অধিকারী ব্যক্তিই সন্ন্যাসী হোক্, এইটুকুই প্রার্থনীয় হ'তে পারে। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদ্‌মায়েস সবাই এসে দিনের বেলা ফোঁটা-তিলক কেটে নামাবলি গায়ে দিয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করুক, আর, রাত্রিতে সিঁদকাটি নিয়ে গলিতে গলিতে ঘুরুক, এমনটা কিছুতেই প্রার্থনীয় হ'তে পারে না। বরং জগতে একজনও সন্ন্যাসী থাকবে না, তাতে কি যায় আসে? লক্ষ লক্ষ অনাচারী, অধার্ম্মিক অযোগ্য সন্ন্যাসী থাকার চাইতে একজনও না থাকা ভাল।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও ব্রহ্মচর্য্য

ভদ্রলোক বলিলেন,—ব্রহ্মদেশে আমি স্ত্রীজাতির অদ্ভুত স্বাধীনতা দেখেছি। আমার মনে হয়, স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলা দেশেও নারীজাতির মধ্যে সতীত্ব সম্পর্কে ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যভিচার আস্‌বে। পরে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আন্দোলনের ফলে আবার সংযম প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি ।—আগে ব্যভিচার এসে তারপরে সংযম আস্‌বে, এমন বোকার মত কাজ কত্তে আমরা যাব কেন ? স্ত্রীজাতিকে আমরা স্বাধীনতা দিব, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা দিলেই কি কেউ স্বাধীন হ'তে পারে, যদি স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কারো না থাকে ? স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা কেন, স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখ্‌তে হয় কি ক'রে, স্বাধীনতা লাভ করার যোগ্যতা বলে কাকে, এসব যারা বুঝ্‌বে না, তাদের শুধু "তোমরা স্বাধীন" বল্লেই কি স্বাধীনতা এসে যাবে ? আইন কাউকে স্বাধীনতা দিতে পারে না, যোগ্যতাই তা দেয়।

স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়ার মানে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়ার প্রকৃত মানেটা কি জানো ? স্ত্রীজাতির প্রাণে সকল প্রকার উচ্চ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই স্ত্রী-স্বাধীনতা দানের প্রথম কথা। উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা যদি কোনও স্ত্রীলোককে ঘরের বাইরে টেনে নেয়, নিক্, বাধা দিব না—এরই নাম স্ত্রী-স্বাধীনতা। প্রাণের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, দেশপ্রীতি নেই, পরার্থ-প্রেরণা নেই; ত্যাগলিপ্সা নেই, আত্মোৎসর্গের বুদ্ধি নেই, অথচ ঘরের বউ বিবি সেজে বেরুলেন স্বাধীনতার পরিচয় দিতে, বেরুলেন স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে এয়ার্‌কি ঠুকতে, বেরুলেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়া খেল্‌তে, বেরুলেন গ্রাণ্ডহোটেলে নিভৃত অতিথির মর্য্যাদা রাখতে, এর নাম স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়।

স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থকদের শ্রেণীভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এই যে ব্যভিচারপন্থী স্বাধীনতা,

এর জনক হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা স্বাধীনতা কথাটার যেমন অর্থ বোঝেন নি, তেমন আবার নিজেরাও চরিত্রের অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধিবান্ নন্। দু'বোতল ব্র্যাণ্ডি উদরে ঢেলে নিয়ে তারপরে যে ব্যক্তি স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থন কর্‌বে, বল দেখি, স্ত্রীলোকদের আচরণ কতখানি জঘন্য হ'লে পরে তবে তার স্বাধীনতাবুদ্ধি তৃপ্তি পাবে? আর একদল স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থনকারী আছেন, যাঁদের সমর্থন কোনো প্রকার মত্ততা-প্রযুক্ত নয়, বিদেশী গুরুর মন্ত্রপ্রযুক্ত নয়, পরানুকরণযুক্ত নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-ভোগ-প্রার্থনা-প্রযুক্ত নয়। পরন্তু নরনারী-নির্ব্বিশেষে মানবাত্মার পূর্ণ স্বাধীনতার বিশ্বাসপ্রযুক্ত। এঁরাই যথার্থ স্বাধীনতাপন্থী, অপরেরা ইন্দ্রিয়-পন্থী মাত্র।

স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সফল করিবার উপায়

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলনকে যদি ভারতের মাটীতে সফল কত্তে হয়, তবে জমিতে আগে দিতে হবে ত্যাগ-বুদ্ধির সার। ত্যাগবুদ্ধি যার গোড়ায়, এ মাটীতে তারই বীজ অঙ্কুরিত হবে, পল্লবিত হবে, শাখা-পত্রে সুশোভিত হবে, অমৃতময় ফুল-ফল প্রসব কর্ব্বে। ব্যভিচারমূলক স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলন সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, কিন্তু সাংখ্য-পাতঞ্জলের দেশে, শুক-শঙ্কর-বুদ্ধের দেশে, ভীষ্ম-হনুমান-লক্ষ্মণের দেশে, সীতা-সাবিত্রী দময়ন্তীর দেশে এ ব্যভিচারের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তাতে ভোগবাদী ঋষি-মহর্ষিরা তাঁদের পুঞ্জীকৃত কাব্য ও দর্শন নিয়ে চিরতরে তলিয়ে যাবেন।

কলিকাতা
২৭শে ভাদ্র, ১৩৩৪

যৌগিক পরিভ্রমণ

অন্য জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— আপনি দেহের মধ্যে পরিভ্রমণ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেইটী স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি নি। একটু বিস্তারিত ভাবে বল্‌লে বোঝ্‌বার সুবিধে হত।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথমে জেনে নাও যে, দেহটা আর মনটা এক জিনিষ নয়। মনটার অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায় বটে, কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ ধরা-ছোঁয়া যায় না। কিন্তু দেহটাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। মনটা এই দেহটার মধ্যে ইচ্ছা কর্ল্লে যে কোনও এক জায়গায় স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে, চঞ্চল হ'য়ে দেহের এক অঙ্গ হতে অন্য অঙ্গে পরিভ্রমণও কত্তে পারে, আবার দেহের বাইরে গিয়ে অন্যত্রও অবস্থান কত্তে পারে। ইচ্ছা কর্ল্লে মনটাকে তুমি তোমার ভ্রূ-মধ্যেও স্থাপিত কত্তে পার, গুহ্যমূল থেকে মস্তিষ্ক আর মস্তিষ্ক থেকে গুহ্যমূল পর্য্যন্ত তাকে বারংবার উঠাতে নামাতেও পার, আবার দেহের বাইরের যে কোনও বস্তু, মূর্ত্তি, ভাব বা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ বা বিচরণশীল কত্তেও পার। মনকে এক জায়গায় স্থির করা খুব শক্ত ব্যাপার,—কতক দিনের নিয়মিত অভ্যাস-সাপেক্ষ। দেহের মধ্যে একটা জায়গায় স্থির করাও যেমন শক্ত, দেহের বাইরে কোনও একটা চিহ্নে, রূপে বা ভাবে স্থির করাও তেমন শক্ত। কিন্তু মনকে ত' স্থির কত্তেই হবে! দেহের মধ্যে স্থির কত্তে পার্ল্লেই বেশী সুবিধে। সাধক-সমাজে দেহস্থিত ধ্যানকেন্দ্রগুলিই বেশী সমাদর পেয়েছে। তুমি হয়ত মনকে

ভ্রূ-মধ্যে স্থির কত্তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছ। কিন্তু চঞ্চল মন তোমার কথা শুন্‌ছে না। তাই তোমাকে কৌশল অবলম্বন কত্তে হবে। যে মনটা সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছিল—উচ্ছৃঙ্খলভাবে, সেই মনটাকে যদি ঘুরে বেড়াবার পথে কোনও বাধা না দিয়েও ঘোর্‌বার পথটুকু শুধু একটু নিয়ম-বন্ধনে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহ'লে সহজে মন বশে আসে। দুরন্ত ছেলে যখন কাজের জিনিষ নিয়ে খেলা কত্তে চায়, তখন যেমন মা খেল্‌না দিয়ে তাকে ভুলান, কিন্তু ছেলের খেলা-ধূলার আবেগটাকে দমন করেন না, এও তেমনি! ছেলে ত' খেলাই কচ্ছে, কিন্তু খেল্‌না নিয়ে কচ্ছে, খেল্‌নার মধ্য দিয়েই তার যাবতীয় চাঞ্চল্যের স্ফূর্ত্তি হচ্ছে, খেল্‌নার বাইরের সব বস্তু তার কাছে বিস্মৃত। তারপরে খেল্‌তে খেল্‌তে ধীরে ধীরে যখন শিশুর নিদ্রাকর্ষণ হ'ল, মা তখন খেলনাটিকেও সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তোমার মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাকে হঠাৎ হাতে পায়ে বাঁধলে না বটে, কিন্তু ব'লে দিলে—"দেখ্ মন, কেন ভাই মিছামিছি ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, এই দেহটা বড় সুন্দর জিনিষ, ব্রহ্মাণ্ডের সব লোভনীয় রমণীয় জিনিষ এর ভেতরে আছে, এর ভেতরেও সূর্য্য আছে, চন্দ্র আছে, রাহু আছে, কেতু আছে, এর ভেতরেও কাশী আছে; প্রয়াগ আছে, গয়া আছে, শ্রীক্ষেত্র আছে, এর ভেতরেও মথুরা আছে, বৃন্দাবন আছে; রামেশ্বর আছে, বদরিকাশ্রম আছে, এর ভেতরেও কামরূপ-কামাখ্যা আছে, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী আছে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আছে,—এইসব একবার দেখে নয়ন সার্থক কর্ না ভাই!" মন বল্‌লে,—"তাই নাকি? তবে ত' একবার দেখে নিতে হয়! বল্‌ত' দেখি ভাই, কোথায় আছে, কেমন ক'রে দেখ্‌তে হয়!" তুমি তাকে প্রকৃত প্রণালীটা ব'লে দিলে। মনও ভ্রমণ কত্তে আরম্ভ কর্ল্ল, নিজ ইচ্ছামত উচ্ছৃঙ্খলভাবে নয়,

যে অঙ্গের পর যে অঙ্গে যাবার বিধান রয়েছে, সে সেই অঙ্গের পর সেই অঙ্গ পরিভ্রমণ কত্তে লাগ্‌ল। প্রথম প্রথম ক্লান্তিবোধ হ'তে আরম্ভ কর্ল, কিন্তু দু'দিন না যেতেই মন দেখ্‌লে,—"এ ত' বেশ মজার ব্যাপার! রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, ক্লেদ, পূয প্রভৃতি দিয়ে নির্ম্মিত এই নরদেহ, আর তারই ভিতরে অত রূপ, অত গন্ধ অত স্পর্শ, অত সঙ্গীত, অত মধু!" তখন মনের নেশা আরম্ভ হ'ল। নেশার গাঢ়তার সময়ে দেখা গেল, কে একজন এসে মনটার হাত থেকে দেহরূপ খেল্‌নাখানা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আর মন ভ্রূ-মধ্যে স্থির হ'য়ে শান্ত হয়ে পরমানন্দ সম্ভোগ কচ্ছে। এই টুকুই হ'ল পরিভ্রমণের আসল ব্যাপার।

নিম্ন অঙ্গ ও কুভাব

ভক্ত।—জননেন্দ্রিয়, অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ কর্ব্বার সময়ে কামোত্তেজনা হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, তা' হবে না। মন যখন কুভাবকে আশ্রয় ক'রে নিম্ন অঙ্গে আসে, সাধারণতঃ তখনই কামোত্তেজনা হয়। মন তখন আর জননাঙ্গ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেতে চায় না, তাই কামও তাকে ছাড়ে না। কিন্তু পরিভ্রমণশীল মনকে ভ্রমণের ঝোঁকেই পেয়ে ব'সে আছে, তাই উপস্থের মধ্য দিয়েও যখন সে চ'লে যাচ্ছে, তখনো তার কাম জাগ্রত হয় না। উপস্থে স্থিত হ'লেই কামভাব জাগরণের বেশী সম্ভাবনা। কিন্তু পরিভ্রমণকালে মন শুধু উপস্থকে স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে,—এবং তাও আবার মহৎ সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে। পরিভ্রমণের সময়ে তুমি ত' বার বার কেবল এই সঙ্কল্পই কচ্ছ,—"ওঁজগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি,—আমি জগতের মঙ্গলকারী হচ্ছি।" এতবড় মহৎ সঙ্কল্পের কাছে কাম দাঁড়াতে পারে না।

প্রাক্‌পারিভ্রমণিক মুদ্রাভ্যাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরিভ্রমণ আরম্ভ কর্ব্বার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে অশ্বিনী, যোনি, সন্ধিনী; যোগিনী, যোনিযোগিনী প্রভৃতি গুহ্য ও লিঙ্গ-সংক্রান্ত মুদ্রাগুলির প্রত্যেকটী একুশবার ক'রে অভ্যাস করার বিধান আছে, তারও অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে, পরিভ্রমণকালে উপস্থগামী মন যেন কামোদ্দীপিত না হয়।

যৌগিক পরিভ্রমণের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের এই জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণ-ক্রিয়াটী একটী আশ্চর্য্য জিনিষ। সে জননাঙ্গসমূহ থেকে মনের পঙ্কিলতাকে দূর করে দেয়। উপস্থ বা যোনিকে অত কদর্য্য জিনিষ ব'লে কেন জ্ঞান করা হয়? উপস্থ বা যোনি দ্বারা যে অসুন্দর কাজগুলি করা হয়, তা'ত কখনো হস্তের পদের, কোমরের বক্ষের সহায়তা ছাড়া করা যায় না। তবু হস্ত, পদ, কটিদেশ বা বক্ষোদেশ:কে কেন জঘন্য অঙ্গ ব'লে গণনা করা হয় না? তার কারণ এই যে, উপস্থ বা যোনিকে একমাত্র ইতর সুখ-ভোগের প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনে কেউ কখনো ভাবেনি। নতুবা পবিত্রচেতা ব্যক্তির উলঙ্গ থাক্‌তেও লজ্জা নেই বা অন্যকে উলঙ্গ দেখ্‌তেও লজ্জা নেই। উদ্দেশ্যের তারতম্য হিসাবে জননকার্য্য কখনো পবিত্র, কখনো অপবিত্র। কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই জননাঙ্গকে কদর্য্য, জঘন্য, ঘৃণ্য, ব'লে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঘৃণ্য তারা নয় এবং চিরকাল ঘৃণ্য হয়ে থাক্‌তেও পারে না। হস্ত-পদ-চক্ষু-মুখাদির মতই জননাঙ্গ শরীরের একটা অংশ মাত্র। তাকেও জগৎ-কল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব এবং তার সঙ্গেও জগৎ-কল্যাণের স্মৃতিকে চির-অলোপ্য ভাবে সংযুক্ত ক'রে

দেওয়া সম্ভব। তোমাদের যৌগিক পরিভ্রমণ সেই কার্য্যটী ক'রে দিতে বড়ই সুপটু। নিত্য যার জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণের অভ্যাস, তার দেহের কোনও অঙ্গই কখনও জগতের অহিতকর কর্ম্মে নিয়োজিত হতে পারে না, তার দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একমাত্র জগৎ-কল্যাণের জন্যই নিয়ত উন্মুখ হয়ে থাকে। একটা দেশ বা জাতি যদি আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম-সাধনের মত-পথের সহস্র বিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে দিয়ে দীর্ঘ-কাল, ধর দশ বৎসর কাল, এই জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণটী অভ্যাস করাতে পারে, তাহ'লে সমস্ত পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা এক মহত্তর জাতি তার দৈব ঐশ্বর্য্য নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে। নিজের জীবন কেবল নিজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর জন্য, প্রতিটি অণুপরমাণুর জন্য। যে সকল প্রাণীদের অস্তিত্বের কথা আজও বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার কত্তে পারেন নি, এমন কি তাদেরও জন্য—এই প্রত্যয়ের উপরে যে মানুষ দাঁড়াতে পেরেছে, তার পক্ষেই ত মনুষ্য-জন্মলাভ অন্বর্থ হয়েছে। অন্যের পক্ষে মানুষ হ'য়ে জন্মান আর পশু-পক্ষি কীট-পতঙ্গ হ'য়ে জন্মান'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কৌপীন পরিধানকালীন কামোত্তেজনা

ভক্ত বলিলেন,—আমার যে কৌপীন পর্‌বার সময়েও কামোত্তেজনা হয়। এর কি করি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওটা হয় অনভ্যাসে এবং মহৎসঙ্কল্পের অভাবে। কৌপীনটা পর্‌বার সময়ে দৃঢ়চিত্তে বারবার বল্‌বে,—"কৌপীন, তুমি জিতেন্দ্রিয়ত্বের সাধক, ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতীক, ব্রহ্মচর্য্যের বন্ধু; তুমি প্রতারক নহ।" তারপরে ভক্তিভরে নাম জপ কত্তে কত্তে কৌপীন পর্‌বে। যদি প্রয়োজন বোধ কর, তাহ'লে কৌপীন পরিধানের পূর্ব্বে

একুশবার এবং পরিধানান্তে একুশবার অশ্বিনীমুদ্রা কর্লেও বেশ কাজ হবে।

স্ত্রীলোকের দর্শনে কামোত্তেজনা

ভক্ত। আর একটী কথা বল্‌তে আমার বড়ই সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু না ব'লেও পাচ্ছি না। স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই তার প্রতি তৎক্ষণাৎ আমার এমন ভয়ানক কামভাব এসে যায় যে, বল্‌বার নয়। এর উপায় কি ক'র্‌ব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিজের দেহের মধ্যে পরিভ্রমণের প্রণালীটী আগে বেশ ক'রে অভ্যস্ত ক'রে নাও। যখন মনের এমন অভ্যাস হবে যে, পরিভ্রমণ আরম্ভ কর্‌লে সে অনায়াসে তার ক্রম অনুযায়ী চল্‌তে পারে,—জান্‌বে, তখন থেকে কামদমন তোমার কাছে একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তোমাদের বয়সে কামের চেহারাটা নিতান্ত স্থূল। সে কাম, হয় স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, নয় তোমার নিজ উপস্থকে নিয়েই, বিব্রত থাকে। সুতরাং এ'কে দমন করা ত' কটাক্ষের কাজ! যাই দেখ্‌লে কামোত্তেজনা হ'য়েছে, অম্‌নি পরিভ্রমণ আরম্ভ ক'রে দাও। লিঙ্গমূল থেকে লিঙ্গাগ্রে, সেখান থেকে বাম অণ্ডকোষে, সেখান থেকে মেরুদণ্ডে, এই ভাবে ক্রমানুযায়ী মন পরিভ্রমণ কত্তে থাকুক,—দেখ্‌বে, কামচিন্তা শত যোজন দূরে চ'লে গিয়েছে এবং তুমি জগৎ-কল্যাণের সঙ্কল্পে আরূঢ় হ'য়ে তোমার অজ্ঞাতসারেই এক মহচ্চিন্তার রাজ্যে বাস কচ্ছ। *

* যৌগিক পরিভ্রমণের সঠিক ক্রম "সংযম-সাধনা" এবং "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থদ্বয়ে আছে।

যোনি-সঞ্চারী কাম

ভক্ত।—এক এক সময় এমন ভয়ানক অবস্থা হয় যে, যার প্রতি কামোদ্রেক হ'য়েছে, তার জঘন্য অঙ্গগুলির কথা চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি। - এতেও ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। এসব স্থূল কাম দমন অতি সহজ। যে কাম প্রেমের, দয়ার, সহানুভূতির, শ্রদ্ধার বা প্রশংসার ছদ্মবেশ প'রে আসে, সেই কামই হচ্ছে অতি কুটিল এবং তাকে দমন করাই হচ্ছে খুব কঠিন। তুমি যে-কামের কথা বলছ, এ'কে দমন করা অতি সুসাধ্য ব্যাপার। যার জঘন্য অঙ্গে মনটা লেগে র'য়েছে, তারই সমগ্র দেহের মধ্যে তুমি পরিভ্রমণ কত্তে থাক। যে মন একটা অঙ্গের ধ্যানেই মগ্ন, সেই মনটাকে স্ত্রী-শরীরের সবগুলি অঙ্গের মধ্য দিয়ে পরিচালিত কর। জনন-যন্ত্র থেকে পা, পা থেকে পদাঙ্গুষ্ঠ, সেখান থেকে মেরুদণ্ডের শেষ-প্রান্ত দিয়ে স্কন্ধে, সেখান থেকে হাত ঘুরে মস্তিষ্কে—এই ভাবে ঐ স্ত্রীদেহটারই সর্ব্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াও আর বারংবার মনে মনে সঙ্কল্প কর,—"ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি, আমি জগতের কল্যাণকারী হচ্ছি।" এভাবে দু'চার বার ঘুর্‌তেই দেখবে, জঘন্য অঙ্গের প্রতি তোমার আকর্ষণের তীব্রতা কমে গিয়েছে। আরো কয়েকবার পরিভ্রমণ কর্ল্লে দেখ্‌বে, তোমার নিজ দেহের রূপ যেমন তোমাকে কামার্ত্ত কত্তে পারে না, নারী-দেহের রূপও তেমন তোমাকে কামার্ত্ত কত্তে অক্ষম হচ্ছে। তখন মনকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আন, খুব কতক্ষণ নিজের দেহের মধ্যে পরিভ্রমণ কর এবং তারপর ভগবানের নাম জপ কত্তে কত্তে নিশ্চিন্ত হও। তবে, নারীদেহের মধ্যে এ ভাবে পরিভ্রমণ না ক'রে পার্ল্লেই ভাল; অগত্যাপক্ষে কর্‌বে।

পুমঙ্গ-সঞ্চারী কাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষদের চিত্ত যতগুলি উদ্দাম ভাব নিয়ে নারীর প্রতি ধাবিত হয়, নারীদের চিত্তও ততগুলি উদ্দাম ভাব নিয়েই পুরুষদের প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু নারীকে ভগবান স্নেহ, মমতা, ভাল-বাসা আদি অতি কোমল কতকগুলি সামাজিক ভাব দিয়ে এমন ভাবে গ'ড়ে দিয়েছেন যে, সে তার কামকে স্নেহের খাতে, মমতার প্রণালীতে প্রবাহিত ক'রে দিয়ে নিজের অন্তরের উদ্দাম উত্তেজনাকে সহজে শান্ত ক'রে নেয়। পুরুষেরা এই বিষয়ে নারীদের তুলনায় কম পটু। পুরুষের ভিতরে স্বাভাবিক কমনীয়তা কম, সে তার অন্তরের উদ্দাম পাশব বাসনাকে রূপান্তরিত ক'রে ক্ষয়িত ক'রে দিতে তুলনায় বেশী অসমর্থ। কাঁচা রক্ত-মাংস না হ'লে তার রসনা তৃপ্ত হয় না, তাই, পুরুষের কাম উদ্ধত হ'য়ে গিয়ে নারীর উপরে উৎপাতের মত পতিত হয়। বলা হয়, নারীর কাম বেশী, কিন্তু স্নেহমমতাময় স্বভাব ব'লে সে তার কাম দমনেও সুদক্ষা বেশী। তথাপি কামচিন্তার এমন একটা দুর্ব্বার অবস্থা আছে, যখন পুমঙ্গ নারীর স্মৃতিতে বারংবার জেগে জেগে ওঠে এবং তাকে অধীর, চঞ্চল, হিতাহিতবোধশূন্য ক'রে ফেলে। নিজ শরীরের ভিতর দিয়ে জগন্মঙ্গল যৌগিক পরিভ্রমণ তখন এক আশ্চর্য্য হিত সম্পাদন করে। পুরুষের শরীরের ভিতর দিয়ে কল্পনা-বলে দূরে থেকে পরিভ্রমণ ক'রে এই দুর্ব্বার বাসনা-স্রোতকে স্তব্ধ করা একটা চরম উপায় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ও সুকুমারতার আধারস্বরূপা রমণী জাতিকে এই উপায় অনুসরণ কত্তে আমি সাধারণ ক্ষেত্রে উপদেশ দেই না।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ

অপরাপর আবশ্যকীয় বিষয়ের উপদেশ লইয়া উক্ত ভক্ত বিদায়

হইলে শ্রীযুক্ত সু—এবং অপর একটী যুবক আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে লইয়া হেদুয়ার পার্কে বেড়াইতে গেলেন।

সঙ্গীয় যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধের কারণটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথম কারণ, অতীত ইতিহাস। দ্বিতীয় কারণ, মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থা ও শিক্ষার অভাব। তৃতীয় কারণ, ১৯২০—২১ খ্রীষ্টাব্দের খিলাফৎ আন্দোলন। চতুর্থ কারণ, হিন্দুর অনুদারতা।

যুবক।—খিলাফৎ আন্দোলন কি ক'রে কারণ হ'ল?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খিলাফৎ আন্দোলনকে জাতীয়তার রসে পুষ্ট করা হয় নি, পুষ্ট করা হ'য়েছিল ধর্ম্মনামধেয় extra-territorial patriotism (বিদেশের প্রতি স্বদেশবোধ) দিয়ে। ভারতবর্ষ বহু ধর্ম্মের দেশ। এদেশে জাতীয় ঐক্য সাধন কত্তে হ'লে তার মূল হবে, দেশাত্মবোধ। ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্যাক্‌ট রচনা ক'রে প্রকৃত ঐক্য হবে না।

বিধবা-বিবাহ ও মহাত্মা গান্ধী

তারপর বিধবা-বিবাহের কথা উঠিল। সু—বলিলেন,—মহাত্মা গান্ধী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কত্তে গিয়ে মাদ্রাজে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে বলেছেন, প্রত্যেক যুবক যেন বিধবাই বিবাহ করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এটা তাঁর অসামান্য হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। বাল-বিধবাদের দুঃখ তাঁকে বিচলিত করেছে, বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাত্মাজীরও দয়ার সাগর উথ্‌লে উঠেছে। অধিকন্তু বিধবাদের মধ্যে যারা ভ্রষ্টাচারিণী, তাদের অস্তিত্ব যে জাতির যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড গোপনে গোপনে

চর্ব্বণ কচ্ছে, সেই চিন্তাও তাঁকে একান্ত ক্লিষ্ট ও আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু এই বিষয়েতে অত্যধিক উৎসাহ-প্রযুক্ত মহাত্মাজী একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন যে, এত যে বালিকা অকালে বিধবা হচ্ছে, যুবকেরা শুধু বিধবা-বিবাহ কল্লে'ই কি তার মূল কারণ দূর হ'য়ে যাবে? যে যুবক বাল-বিধবাকে বিবাহ কর্ব্বে, সে-ই যে পুনরায় স্ত্রীকে বিধবা রেখে ম'রে যাবে না, তার স্থিরতা কি? বাংলার এক বিখ্যাত মহাপুরুষের কন্যা ত' এই ভাবে দুইবার বিধবা হ'য়েছিলেন। সেইটা বন্ধ করার পথ কি?

বিধবা-সমস্যার মৌলিক সমাধান

প্রশ্ন।—আপনি কি তবে বিধবা-বিবাহের বিরোধী?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একটা হিসাব আছে, যে হিসাবে আমি বিরোধী। আবার আর একটা হিসাবও আছে যে হিসাবে আমি সমর্থনকারী। * কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজকে বাঁচাতে হ'লে জল ঢাল্‌তে হবে গাছের গোড়ায়। গোড়াটা হচ্ছে—যুবকদের দীর্ঘায়ুষ্কতা-সম্পাদন আর তার আবার গোড়া হচ্ছে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য, ব্যায়াম-সাধনা ও ভগবৎ-পরায়ণতা। যে সকল যুবক অকালে ম'রে স্ত্রীকে বিধবা রেখে যাচ্ছে, তাদের অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে, বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যে এরা সব নানা কুৎসিত কদর্য্য অভ্যাসে আসক্ত ছিল, তাই। বৈধব্যের সম্ভাবনাটাকেও দেশ থেকে দূর কত্তে হবে,—শুধু বিধবা বিয়ে দিলেই হবে না। এমন আন্দোলন সৃষ্টিও কত্তে হবে, যাতে কোনো যুবক অকালে না ম'র্‌তে পারে। বসন্ত একুশ বৎসর বয়সে কুঞ্জলতাকে বিয়ে কল্লে, ছয় মাস বা এক বছর না যেতেই কুঞ্জলতা বিধবা হ'ল। স্বামী-

* কৌতূহলী পাঠক শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস রচিত "বিধবার জীবন-যজ্ঞ" গ্রন্থ পড়িতে পারেন।

স্ত্রীর ছয় মাসের বা এক বৎসরের অসংযমই কুঞ্জলতার এই বৈধব্যের কারণ হ'তে পারে না। আট বৎসর বয়স হ'তে আরম্ভ ক'রে একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বসন্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে সকল অস্বাভাবিক কদর্য্য কাজ ক'রে এসেছে, এই অকাল-মৃত্যুর জন্য সেইগুলিই প্রধানতঃ দায়ী। কুঞ্জলতার বয়স অল্প, সুতরাং তাকে পুনরায় বিয়ে দেওয়া হ'ল পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক ললিতের সাথে। ললিত হয়ত আটাশ বছর পার না হ'তেই পরকালের ডাকে চ'লে গেল। কুঞ্জলতার দ্বিতীয়বার বৈধব্য ঘট্‌ল। এখন ভেবে দেখ দেখি, কুঞ্জলতাকে আবার বিয়ে দেওয়া দরকার বেশী, না, বসন্ত এবং ললিতের অকালমৃত্যু নিবারণ করা'রই দরকারটা বেশী। আদর্শ হিসাবে বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে কিছুতেই স্বীকার করা যেতে পারে না। তবু যে বিধবার বিবাহ সমর্থন করি, সেটা শুধু আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে। ব্রহ্মচর্য্যকেও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্ব না, অথচ বিধবার পুনর্ব্বিবাহকেও সমর্থন কর্ব্ব,—এই অবস্থা চল্‌লে ব্যাপার কি দাঁড়াবে জানো? একই নারী বাজারের পণ্য-দ্রব্যের মত এক মনিবের মৃত্যুর পরে অন্য মনিবের গৃহ সজ্জিত কর্ব্বে। একে গালভরা নাম দেওয়া হবে নারীর স্বাধিকার, নারীর স্বাধীনতা বলে, কিন্তু পণ্যা নারীর জীবনে আর এর জীবনে পার্থক্য থাক্‌বে মাত্র বাহ্যতঃ। এই কদর্য্য দৃশ্য দেখ্‌তে কি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর দেশের মানুষেরা পার্ব্বে? সুতরাং যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার পথই প্রকৃত প্রতিকারের পথ। অসংযমের রাহু-গ্রাস থেকে অবিবাহিত কুমারদিগকে রক্ষা কর, তাদের বাহুতে বল, মনে শক্তি, হৃদয়ে সাহস, প্রাণে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাকে জাগ্রত কর। তাদের ভিতরে সংযম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও নিষ্কামত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর। দেখ্‌বে দেশের অধিকাংশ নারীই বৈধব্যের দুঃখ থেকে মুক্তি

পেয়েছেন, আশী বছরের বুড়ীর কপালেও সিন্দূরের ফোঁটা ঝক্‌ঝক কচ্ছে, পত্যন্তর গ্রহণ ক'রে কাউকে সধবার ঠাট বজায় রাখ্‌তে হচ্ছে না, এক স্বামীকে নিয়েই ঘর ক'রে সে স্বচ্ছন্দে সানন্দে পরম পরিতৃপ্তিতে তার জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

কলিকাতা
২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৪

ভগবানের নাম শ্রেষ্ঠ মহৌষধ

শ্রীশ্রীবাবামণি হেদুয়াতে আসিয়া বসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের একটী ছাত্র শ্রীশ্রীবাবামণিকে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—ঘন ঘন বীর্য্যক্ষয়ে আমার জীবন একেবারে ধ্বংস হ'য়ে গেল। আপনি একটা ঔষধ ব'লে দিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। একমাত্র এই ঔষধেই সর্ব্বরোগ নিরাময় হবে।

চাই সবল প্রয়াস

প্রশ্ন।—কিন্তু নামে যে বিশ্বাস হয় না। আরো একজন সাধু আমাকে একথা ব'লেছিলেন, কিন্তু কোনো ফলই হয় নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রাণপণে চেষ্টা পেতে হয়। চাই সবল প্রয়াস, কাছা-ঢিলা চেষ্টায় সাফল্য আস্‌বে কেন? নামের উপরে বিশ্বাস হোক্ আর নাই হোক্, তাতে বেশী আসে যায় না। অবিশ্বাস সত্ত্বেও যদি নাম কত্তে থাক, তাহ'লে ধীরে ধীরে নামের শক্তি যখন প্রত্যক্ষ হ'তে থাকবে, তখন আপনি বিশ্বাস আসবে। প্রথমটাতে জোর ক'রে মনকে নামে লাগিয়ে রাখ্‌তে হবে, শেষটায় দেখ্‌বে, ইচ্ছা ক'রেও আর নাম

থেকে মনকে সরিয়ে আনা যাচ্ছে না। এ'কেই বলে সিদ্ধাবস্থা। এখন যেমন তোমার মনটা স্বভাবতঃই শুধু ইন্দ্রিয়সুখের দিকে ধাবিত হচ্ছে, টানাটানি ক'রেও তাকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে পাচ্ছ না, তখন দেখ্‌বে, মন ঠিক্ তেমনিভাবে শুধু পরমেশ্বরের দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে, চেষ্টা ক'রেও কু-পথে তাকে চালান যাচ্ছে না।

নামজপ ও অবিশ্বাস

প্রশ্ন।—অবিশ্বাস ক'রে নাম জপ্‌লে কি ফল হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই, এখন তুমি তা' বিশ্বাস কর আর না কর। দগ্ধ করাই আগুনের ধর্ম্ম। নামের ধর্ম্ম মনকে স্থির করা, চিত্তকে মলমুক্ত করা, হৃদয়কে বিস্তারিত, ভয়-বিরহিত ও আনন্দযুক্ত করা। নামের সঙ্গে যদি মনটার স্পর্শ ঘটে, অর্থাৎ নাম-জপ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি নামের অর্থও ভাবনা হ'তে থাকে, তবে এতেই আস্তে আস্তে নামে রুচি এবং আস্থা এসে যায়। এসব প্রত্যক্ষের ব্যাপার, অনুমানের কথা নয়। পরীক্ষা কর, নামের শক্তির প্রমাণ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। বিশ্বাস কত্তে না পার ত' ক'রো না যে, নামের বলে অসাধ্য সাধন হয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে, অসাধ্য সাধন প্রকৃতই হয় কিনা, তার প্রমাণ জীবনের বিনিময়ে হ'লেও পেতেই হবে। প্রমাণ না পেলে যদি বিশ্বাস কত্তে না পার, প্রমাণ না পেয়ে অবিশ্বাসই বা কর্‌বে কেমন করে?

নাম-জপ ও বীর্য্যক্ষয়

প্রশ্ন।—ভগবানের নামে বীর্য্যক্ষয় রুদ্ধ হবে, এর যুক্তি কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যুক্তি অনেকই আছে কিন্তু প্রত্যক্ষ কখনও যুক্তির

অপেক্ষা রাখে না। খাটো না ছয় মাস প্রাণপণে,—হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবে। নাম-জপ কর্ব্বে, আর মনকে উর্দ্ধ অঙ্গে ভ্রূ-মধ্যে সতত রক্ষা ক'র্ব্বে। নিম্ন অঙ্গে মনকে নামতেই দেবে না। ছুনিয়ার সকল ঔষধ-পত্র যা কত্তে পারে না, ভগবানের নাম তাই ক'র্ব্বে দেখো। বীর্য্য মনের চঞ্চলতাকে আশ্রয় ক'রে স্থানভ্রষ্ট হয়। নামজপ মনের চঞ্চলতা হ্রাস করে। নিজের ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস ক'রে নাম-জপ ক'রে যাও এবং আশ্বস্ত হও।

বৈধব্যের প্রতিষেধ

যুবকটী বিদায় লইলে অপর একজন আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পার্শ্বে বসিলেন। আগন্তুকের হস্তে একখানা সংবাদ-পত্র ছিল, তাহাতে বর্ত্তমান বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধটী শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিধবার বিবাহ খুব সময়োচিত আন্দোলন, বর্ত্তমানে এ'র আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এ'র চাইতে গভীরতর আবশ্যকতা হচ্ছে এমন এক আন্দোলনের, যাতে বৈধব্যের প্রতিষেধ হবে। prevention is better than cure. রোগ হ'য়ে তারপর সেরে যাওয়ার চাইতে রোগ না হওয়াই ভাল। বৈধব্যকে নিবারণ কত্তে হ'লে বাল্য-বিবাহকে বন্ধ কত্তে হবে, প্রাগ্‌বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচারী হ'য়ে থাক্‌বার শিক্ষা বালকদিগকে দিতে হবে, বিবাহের পরে স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও যাতে স্ত্রী তার ভোগ-কামনাতে ইন্ধন না জুগিয়ে চল্‌তে পারেন, মেয়েগুলিকে সে রকম সুকৌশলী ও সুপটু ক'রে তুল্‌তে হবে। ছেলেদের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বয়স যদি চব্বিশ হয়, তাহ'লে তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত যত ছেলে প্রতি বৎসর মারা যায়, তাদের পক্ষে একটী ক'রে বিধবা রেখে যাওয়া সম্ভবই হয় না। কত বিধবা আমি দেখেছি, যাদের

বিয়ে হ'য়েছিল তিন মাস, চার মাস, ছয় মাস বয়সে, আর বৈধব্য হ'য়েছিল এক বৎসর, তুই বৎসর, তিন বৎসর বয়সে। চৌদ্দ পনের বৎসরের নীচে যারা বিধবা হ'য়েছে, বাল্য-বিবাহ বন্ধ হ'লেই তাদের মত মেয়েদের বৈধব্যের সম্ভাবনা উঠে যাবে। তারপরে ছেলেরা যদি বাল্য বয়স থেকেই সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় হবার জন্য চেষ্টা করে, তাদের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি সবল ও সতেজভাবে উদ্দীপিত হয়, তাদের যদি বাহুতে শক্তির চর্চ্চা আর হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের চর্চ্চা চলতে থাকে, তাহ'লে সাধ্য কি যমের যে, অকালে তাদের স্পর্শ করে? যমের সঙ্গে লড়াই দিয়ে জয়ী হবার জন্য আজ সমগ্র জাতিটাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে, তাতে শুধু বিধবা-সমস্যারই সমাধান হবে, তা নয়, পরন্তু জাতির নৈতিক দুর্গতি, সামাজিক দুর্গতি, আধ্যাত্মিক দুর্গতি ও রাজনৈতিক দুর্গতি সবই একটী ফুৎকারে উড়ে যাবে। বল্‌তে পার, কেন আমরা পুরুষকার-বিমুখ, দৈবনির্ভর ও ভবিষ্যতে আস্থাহীন? কেন আমরা নিজের সমাজ নিজে গড়্‌তে পারি না, নিজে ভাঙ্গতে পারি না, নিজে সুসংস্কৃত কত্তে পারি না? কেন আমরা শতধা-বিচ্ছিন্ন, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিদ্বেষ-পরায়ণ, পরানুকরণ-প্রয়াসী ও ক্রীতদাস? বল্‌তে পার, কেন আমরা আত্ম-মর্য্যাদাবুদ্ধিহীন, পরপদবিদলিত ও নিয়ত পরানুগ্রহকামী? বল্‌তে পার, কেন আমরা জাতিভেদরিক্ত, সাম্যবন্ধনাশ্লিষ্ট অখণ্ড-মহাজাতির কল্পনা কত্তে সাহস করি না? বল্‌তে পার, কেন আমরা পরানুগ্রহনিরপেক্ষ, পরপীড়নমুক্ত স্বাধীন জীবনের সুখস্বপ্ন দেখ্‌তে গিয়ে বারংবার ডরে, ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠি?—তার কারণ, যমের সঙ্গে লড়াই দিয়ে জয়ী হ'তে আমরা চাই নি। মন্ত্র জপ্‌ছি আমরা—"জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি,"—তারই ফলে দেহযোগ্য আহারীয় সংগ্রহ ক'রে রোগ,

দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যমের অনুচরদের সঙ্গে লড়াই চালাবার চেষ্টা করি নি, দারিদ্র্যকে ঠেকাতে চাই নি, শরীরকে পুষ্ট ক'ত্তে চাই নি। "কপালে যা আয়ু লিখা আছে ডনই কর, ধ্যানই কর, তা'ত আর খণ্ডাতে পার্ব্বে না,"—এই ব'লে আমরা চিরকাল নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে রয়েছি। তাই, আমাদের এ দুর্গতি। ডনের আখ্ড়াগুলিকে আমরা মনে করেছি, গুণ্ডা-তৈরী করার কল, তাই আমাদের এ দুর্গতি, তাই আমাদের ঘরে ঘরে এত অকালমৃত্যু। যমকে আমরা পূজা কচ্ছি ফুলদল দিয়ে, লাঠি দিয়ে পূজা কত্তে পারি নি। তাই, আমাদের কন্যারা বিবাহের রাত্রিটী পার না হ'তে কপালের সিঁদুর মুছে ফেলে, হাতের শাঁখা ভেঙ্গে ফেলে।

বৈধব্য-নিবারণে সধবা-নারী

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈধব্য-সম্ভাবনা নিবারণে সধবা মেয়েরও ঢের কাজ কর্ব্বার রয়েছে। এই শিক্ষাটুকু তাকে পেতে হবে যে, চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, সদাচার, ব্যায়ামশীলতা ও ভগবৎ-পরায়ণতা অল্পায়ুতার শত্রু, দীর্ঘায়ুতার বন্ধু। নিজে শুদ্ধাচারিণী হ'য়ে তাকে স্বামীর জীবনে শুদ্ধতার সঞ্চার কত্তে হবে। নিজের প্রেমপরায়ণ হৃদয় দিয়ে তাকে স্বামীর হৃদয় আবৃত কত্তে হবে এবং নিজের দেহমনের পবিত্রতা দিয়ে তাকে স্বামীর দেহমনে পবিত্রতা-সঞ্চারিত কত্তে হবে। বিবাহের পর থেকেই যে স্বামীর দেহমন ক্ষয়ের স্রোতে ভাস্তে আরম্ভ করে, সেই স্রোত তাকে সুকৌশলে বন্ধ কত্তে হবে। নিজে যোগাভ্যাসিনী হ'য়ে তাকে স্বামীকেও যোগাভ্যাসের পথে টেনে নিতে হবে। নিজে ভগবৎ-পরায়ণা হ'য়ে স্বামীকেও ভগবানের দিকে আকর্ষণ কত্তে হবে।

বৈধব্যের প্রতিষেধ-কল্পে মাতার কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভবিষ্যতে দেশের ভিতরে একটী মেয়েও যাতে অকাল-বৈধব্যের-যন্ত্রণা সহ্য কত্তে বাধ্য না হয়, তার জন্য উঠেপড়ে লাগ্‌তে হবে। প্রত্যেক জননীকে এই সঙ্কল্প নিয়ে নিজ পুত্র-গুলিকে পালন কত্তে হবে যেন, কখনো এদের কোনো বধূর সিঁথির সিঁদূর অসময়ে না মুছ্‌তে পারে। ছেলেদের ঠেলে পাঠাতে হবে ব্যায়ামশালায়, ডন-কুস্তি কত্তে গিয়ে দুটো একটা ছেলে হাত-পা ভাঙ্গুক, ক্ষতি নেই, তবু দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ুক, রোগ-প্রতিষেধিকা শক্তি বাড়ুক খাদ্যদ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ কর্‌বার ক্ষমতা আসুক। স্তন্যদানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের প্রাণে প্রবিষ্ট কত্তে হবে ব্রহ্মচর্য্যের প্রেরণা, ঘুমপাড়ানী গানের সাথে ছেলেদের শুনাতে হবে ভীষ্ম, লক্ষ্মণ, হনুমানের ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা, শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্যের ত্যাগের কথা, রাণা প্রতাপ, শিবাজী আর গুরু-গোবিন্দের শৌর্য্যের কাহিনী। এর ফলে দুটো একটা ছেলে যদি পাগল হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে,—পড়ুক, কিন্তু তবু ত' জাতির চিত্তবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমিত হোক্!

অখণ্ডেরা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত?

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি অপর একটী জিজ্ঞাসুর সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন।—লোকে বলে, যাঁরা শিবভক্ত, তাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা কালীভক্ত, তাঁরা কর্ম্মী, যারা কৃষ্ণভক্ত, তাঁরা প্রেমিক। আমরা এর মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে পড়ি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তোমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর গণ্ডীতে আবদ্ধ নও,

পরন্তু সকল শ্রেণীতেই আছ। তোমরা একাধারেই সব। পূর্ণতালাভের পথে যখন তোমার যেমনটী হবার প্রয়োজন পড়্‌বে, তখন তুমি তাই। তোমাদের জীবনে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের বিরোধ নেই। তোমাদের জীবন পূর্ণ সামঞ্জস্যের জীবন। তোমাতে এবং তোমার উপাস্যে যখন ভেদ নেই, তখন তুমি জ্ঞানী। তোমাতে ও তোমার উপাস্যের মধ্যে যখন দ্বিত্ববোধ আছে এবং যখন তুমি তাঁকে পিতা, মাতা, সখা বা স্বামী ইত্যাদি ব'লে পূজা কত্তে সুখ পাও, তখন তুমি প্রেমী। তুমি যখন তোমার জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্মানুষ্ঠানকেই তোমার উপাস্যেরই পূজার্চ্চনা ব'লে জান, অথবা প্রতি কর্ম্মের মধ্যে তোমার পরম-প্রেমময় প্রাণারামকেই দেখ, তখন তুমি কর্ম্মী। এজন্য অখণ্ডের কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, তর্ক-বিতর্ক নেই। এক মাত্র নাম-সাধনের বলেই সে যথাসময়ে যথারূপ হচ্ছে। জীবন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের দাবী অনুযায়ী সাধনের ফলেই তার সর্ব্ব ভাবের প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে। কখনো সে জ্ঞানী হচ্ছে, কখনো কর্ম্মী হচ্ছে কখনো বা প্রেমী হচ্ছে। কিন্তু ভাবের পরিবর্ত্তন তাকে সাধনভ্রষ্ট কচ্ছে না। জ্ঞানী অবস্থায় নামযোগে সে জ্ঞানের অনুশীলন করে, প্রেমী অবস্থায় নামযোগে সে প্রেমের অনুশীলন করে, কর্ম্মী অবস্থায় নামযোগে সে কর্ম্ম-সাধনা করে। মতের তার পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, কিন্তু পথের পরিবর্ত্তন হয় না।

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

প্রশ্ন।—অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা শাক্ত না বৈষ্ণব। এ প্রশ্নের উত্তর কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অখণ্ডেরা একাধারে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ; একাধারে সৌর, গাণপত্য ও ব্রাহ্ম ; একাধারে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ;

একাধারে বৌদ্ধ, বৈদান্তিক ও ফ্রি-থিঙ্কার ; একাধারে সাকারোপাসক, নিরাকারোপাসক ও থিওজফিষ্ট। অখণ্ডেরা একটা অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়।

অখণ্ডের সাধন ও দর্শন-শাস্ত্র

প্রশ্ন।—ইহা কি কেহ সম্ভব ব'লে মনে কর্ব্বে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সবাই হয় ত' কত্তে পার্ব্বে না, কিন্তু যেটা সম্ভব হ'য়ে গেছে, সেটা কখনো অসম্ভব হ'তে পারে না। তোমার সাধন আগে, দর্শন-শাস্ত্র পরে ; নামের সেবা আগে, রূপের বিকাশ পরে। নির্দ্দিষ্ট একটা দর্শন-শাস্ত্রকে সত্য ব'লে মেনে নিয়ে নামের সেবা কত্তে তোমাকে হয় না, নির্দ্দিষ্ট একটা রূপকে আগে মেনে নিয়ে তারপরে তোমাকে সাধন কত্তে বস্‌তে হয় না। হ'তে পারে, সব দর্শন-শাস্ত্রই মিথ্যা বা সব দর্শন-শাস্ত্রই সত্য। হ'তে পারে, কালীকৃষ্ণাদি সব রূপই ভগবানের রূপ, অথবা এর একটাও ভগবানের প্রকৃত রূপ নয়। কিন্তু এই বিতর্ক-বিতণ্ডায় তোমার কিছু যায় আসে না। যীশু অভ্রান্ত কি মহম্মদ অভ্রান্ত, তোমাকে সে তর্কের ধার ধার্‌তে হয় না। তুমি শুধু জানো, নামের সেবা কত্তে কত্তে স্বভাবতঃই তোমার ভিতরে সকল সত্যের প্রকাশ ঘট্‌বে,—যখন তুমি যতটুকু সত্যকে যেভাবে ধারণ কর্ব্বার যোগ্য হবে, তখন ততটুকু সত্য সেভাবে তোমার ভিতরে প্রস্ফুটিত হবে। অখণ্ডের কাছে অখণ্ড-নামই হচ্ছে মূল ধর্ম্মগ্রন্থ, বেদ-কোরাণ-বাইবেল তার টীকা এবং ভাষ্য। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মমত এবং দর্শন-শাস্ত্রগুলিকেও সে নামেরই বিভিন্ন-মুখিনী ব্যাখ্যা ব'লে গ্রহণ করে। জগতের কোনও শাস্ত্রই তার দৃষ্টিতে মিথ্যা নয়, ধর্ম্মের কোনও ব্যাখ্যাই তার কাছে বাজে নয়। অখণ্ড যখন সাধন-জগতে মাত্র শিশু, তখন সে শিশুর যোগ্য ভাষ্যগুলিকেই অভ্রান্ত

সত্য ব'লে গ্রহণ করে। অথচ যখন সাধন-জগতে বৃদ্ধ, তখন সে বৃদ্ধের যোগ্য ভাষ্যগুলিকেই অভ্রান্ত সত্য ব'লে স্বীকার করে। কোনো ধর্ম্ম-গ্রন্থকেই সে মিথ্যা বা ভ্রান্ত ব'লে মনে করে না, শুধু আপেক্ষিক সত্য ব'লেই এগুলিকে জানে। সুতরাং সে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত না হ'য়েও সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্তই থাকে।

কোন্ রূপ ধ্যেয় ?

প্রশ্ন।—কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি রূপ-ধ্যানে মন যায়, তবে কোন্ রূপ ধ্যান কর্ব্ব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে রূপে মন বেশী ধায়, সেই রূপ। একই নাম জপ ক'রে তুমি কৃষ্ণ ধ্যান কত্তে পার, আমি কালী ধ্যান কত্তে পারি, আর একজন শিব ধ্যান কত্তে পারে। এতে কোনো বাধা নেই। শুধু নামটাই অপরিবর্ত্তনীয়।

কৃষ্ণভক্তের কালীমন্ত্র জপ ও কালীভক্তের কৃষ্ণমন্ত্র জপ

প্রশ্ন।—একজন কৃষ্ণভক্তের কাছে গিয়েছিলুম। তিনি বল্লেন,—কৃষ্ণবীজ জপ ক'রে কালীর রূপ ধ্যান ক'রা অবৈধ, কারণ, কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি ক'রে অন্য সব দেবতা ত' কৃষ্ণের দাসানুদাস। প্রভুর, নাম স্মরণ ক'রে তার পরিচারকদের মূর্ত্তিধ্যান প্রভুর পক্ষে অপমানজনক।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আবার কালীভক্ত আর একজন হয়ত ব'লে বস্‌বেন, কালীই কৃষ্ণের আরাধ্য, আর সেই জন্যই জটিলা-কুটিলার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কৃষ্ণকে কালীর রূপ ধারণ কত্তে হয়েছিল। কি বল ?

প্রশ্ন।—ঠিক্ এই কথাই একজন কালীভক্ত সাধকও বলেছেন। নানা জায়গায় নানা রকম কথা শুনে আমাদের ধাঁধা লেগে যায়।

সকলেরই লক্ষ্য এক পরমেশ্বর

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোমার ইষ্ট ছোট, আমার ইষ্ট বড়, এই সব কথার সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক আগ্রহ থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁকে একদল লোক কৃষ্ণ ব'লে ভজনা করেছেন, তাঁকেই অন্য দল লোক কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, গণেশ, সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিকেয়) ইত্যাদি ব'লে পূজা করেছেন। সকলেরই লক্ষ্য এক পরমেশ্বর। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষেরা ভগবানকে লাভ করার পথে যে অনুভূতিগুলি পেয়েছেন, তাকেই অবলম্বন ক'রে পরমেশ্বরের রূপাদি বর্ণনা করেছেন। এক এক জনের বর্ণনা এক এক রকম হওয়াতে এক এক জন দেবতার এক এক প্রকারের রূপ স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে। যিনি যেভাবে যা' বর্ণনা করেছেন, তার সবই পরমেশ্বরকে নিয়ে। ঐ একটী মাত্র স্থান ছাড়া তাঁর ঈশ্বরনিষ্ঠা অন্যত্র ছিল না,—অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ছাড়া ঈশ্বরদর্শনও হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে,—"আমার ধ্যেয় রূপটী শ্রেষ্ঠ হ'লেও তোমার ধ্যেয় রূপটীকে আমি অস্বীকার কর্ব্ব কেন",—এই জাতীয় উদার মনোভাবের ফলে সকলেই সকল দেবতাকে মান্য দিতে লাগ্‌লেন। অবশ্য এই উদারতার সৃষ্টি বৈদিক ঋষির দ্বারা প্রণব-গায়ত্রীর ব্যাপক অধিকার প্রসারের ফলেই সম্ভব হ'ল। কিন্তু গোল বাঁধল আর এক জায়গায়। দেবতা মাত্রেই যদি মান্য হন, তা' হ'লে কোন্ দেবতার কৃতিত্ব কি? সাধারণ গৃহস্থদের সংসারের সহিত তুলনা ক'রে এক দেবতার সঙ্গে অন্য দেবতার স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক, কোথাও বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক, কোথাও পিতা-পুত্র সম্পর্ক ইত্যাদি স্থাপন ক'রে একটা Pantheon-এর (দেবগোষ্ঠীর) মধ্যে সকলকে জায়গা ক'রে দেওয়া হ'ল। আসল লক্ষ্য আস্তে আস্তে দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যেতে লাগ্‌ল আর দেবতার পূজা, দেবপুত্রের

পূজা, দেবকন্যার পূজা এই সব সাড়ম্বরে চল্‌তে লাগ্‌ল। অনেক মহৎ ব্যক্তি নিজ নিজ তপস্যা ও সাধনের বলে দেবতুল্য হ'লেন আর ক্রমে তারাও এই দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেলেন। কত জাতির কত দেবতা যে এসে এই Pantheon এর (দেবগোষ্ঠীর) ভিতরে ঢুকে গেলেন, তার সীমা, সংখ্যা বা কোনও দলিল-হদিস পর্য্যন্ত রইল না। পুরাণকারেরা এক এক জন দেবতাকে বড় ক'রে দেখাবার জন্য অন্যান্য দেবতাদের পূজা স্বীকার সর্ব্বস্থলে করুন আর না করুন, অস্তিত্ব স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। এই হ'ল বর্ত্তমান হিন্দুর ধর্ম্ম-জগতের নিষ্ঠার অবস্থা। সুতরাং কত জন কত কথাই বল্‌বেন তোমরা নীরবে শুনে যেও। প্রতিবাদ ক'রে শক্তিক্ষয় করো না। তোমরা সব সময়ে জান্‌বে,—প্রণবমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ,—সুতরাং প্রণবমন্ত্র জপ ক'রে সর্ব্ব-দেবতার ধ্যান চলে,—সাকার সাধনা চলে, নিরাকার সাধনাও চলে। প্রণব বিশ্বময়ের বিশ্বনাম, প্রণবের সঙ্গে ধ্যান চল্‌তে পারে বিশ্বের প্রতিটী প্রতীকের। প্রণব-মন্ত্রের সাধক বিশ্বের কোনও প্রতীকের সঙ্গে কলহ করে না।

সমবেত উপাসনার বিগ্রহ একমাত্র প্রণব

প্রশ্ন।—তবে যে আপনি নির্দ্দেশ দেন যে, সমবেত উপাসনার জন্য যেখানে অখণ্ড-বিগ্রহ (প্রণব-মন্ত্র) বসান হবে, সেখানে অন্য কোনও প্রতীক বসান যেন না হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রণব মিলনের মন্ত্র। আর, সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণকে একত্র মিলাবার জন্যই সমবেত অখণ্ড-উপাসনার পুনরাবির্ভাব। সুতরাং এই স্থানে কেনই বা তোমরা নানা বিগ্রহের সমাবেশ ক'রে বৃথা জটিলতার সৃষ্টি কর্‌বে?

কলিকাতা
২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৪

হিন্দু ও মুসলমান

অদ্য বৈকালে বিদ্যাসাগর কলেজের দুইটী ছাত্রের সহিত হেদুয়াতে বসিয়া অনেক বিষয় আলোচিত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের সামাজিক সাম্য অধিক, আবার মুসলমানদের চাইতে হিন্দুদের পরমত-সহিষ্ণুতা এবং আধ্যাত্মিক উচ্চ চিন্তা অধিক। এক সম্প্রদায় যদি অপর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যতটা সম্ভব ভাল জিনিষটুকু নেন, তবে উভয় সম্প্রদায়ই লাভবান্ হবেন।

প্রশ্ন।—আপনি কি বলেন, হিন্দুরা সব মুসলমান হোক্, আর মুসলমানরা সব হিন্দু হোক্?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, তা বলি না। হিন্দু না হ'লে যার মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব, এমন ব্যক্তি অবাধে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তে পারেন। মুসলমান না হ'লে যার মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব, এমন ব্যক্তি অবাধে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ কত্তে পারেন। এঁদের এই স্বাধীনতাকে আমি স্বীকার করি। কিন্তু ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের আবশ্যকতা যাঁরা উপলব্ধি না কচ্ছেন, তাঁরা নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ না ক'রেও নিজেদের উন্নতি সাধন কত্তে পারেন, অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের জীবনে যে ভাল জিনিষটুকু রয়েছে, সেইটুকু নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত কত্তে পারেন। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে হিন্দুরা চিন্তার স্বাধীনতাকে যে সম্মান দিয়েছেন, মুসলমানরা মুসলমান থেকেও তার অনেকটা অনুকরণ কত্তে পারেন। সামাজিক সাম্য সম্বন্ধে মুসলমানেরা যে সকল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, হিন্দুরা হিন্দু থেকেও তার অনেকটা নিজেদের মধ্যে নিতে পারেন।

হিন্দু-মোশ্লেম বিদ্বেষের সুফল

প্রশ্ন।—পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমানে যে ভয়ানক বিদ্বেষ চলেছে!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এই বিদ্বেষেরও একটা ভাল ফল আছে। এ জগতে নিছক মন্দ কিছুই নেই। বিদ্বেষের ফলে একে অন্যের শক্তির সন্ধান নেবেন। হিন্দুরা খুঁজ্‌তে আরম্ভ কর্ব্বেন যে, একেবারে অশিক্ষিত এবং নির্ধন হ'য়েও কোন্ কারণে মুসলমানরা এমন একতাসম্পন্ন; মুসলমানেরা খুঁজ্‌তে আরম্ভ কর্ব্বেন যে, সাত শত বছর মুসলমানের অধীন থেকেও হিন্দুরা যে সবাই মুসলমান হ'য়ে যান নি, এর মূল কোন্ আধ্যাত্মিকতা? তখন নিজেদের শক্তি বাড়াবার জন্যে মুসলমানরা নিজেদের ভিতরে বাইরের জ্ঞান, বাইরের চিন্তা, ধর্ম্মমত-বিচারের স্বাধীনতা, এসব আপনি আমদানী কর্ব্বেন। আর, হিন্দুদেরও অনেক সামাজিক সংস্কার এভাবেই দ্রুত হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বোধ থেকে মানুষ বা জাতি যত সহজে আত্মোন্নতি সাধিত কত্তে পারে, এমন আর কিছুতে পারে না। অবশ্য, বিদ্বেষ জিনিষটা বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু বর্ত্তমানের এই পারস্পরিক বিদ্বেষ উভয় সমাজকে সবল করার জন্যেই ভগবানের কৌশল। সম্প্রতি কতক-দিন যাবৎ যে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি আন্দোলন খুব জোর্‌সে চল্‌ছে, তার সবটুকু জোরই সুবিচারের বুদ্ধি থেকে আসে নি, কতকটা এসেছে আত্মরক্ষার বুদ্ধি থেকে।

বিধবা-বিবাহ প্রচলনের মুল উৎস

প্রশ্ন।—বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কি বিধবা-বিবাহ এই আত্মরক্ষার বুদ্ধি থেকেই চালিয়েছিলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, দয়ালু হৃদয়ই ছিল তাঁর সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরণাদাতা। বিধবার দুঃখ দেখেই তিনি বেদনায় অধীর হ'য়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে

বিধবা-বিবাহ চালাতে চেষ্টা ক'রেছেন, তার মূলে আছে সুবিচার করার চেষ্টা বা স্বাধীনতাবাদ। বর্ত্তমানের বিধবা-বিবাহ-চেষ্টা প্রধানতঃ আত্ম-রক্ষা,—প্রথমতঃ বিধবাদের ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক অধঃপতনের দিক্ দিয়ে, দ্বিতীয়তঃ সমাজের লোকসংখ্যার ক্রমশঃ-ক্ষীয়মাণতার দিক্ দিয়ে।

স্বাদেশিকতার ধর্ম্ম

তৎপর নানা কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বর্ত্তমান-বিরোধ হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়কেই ভবিষ্যতে স্বাদেশিকতার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য কর্ব্বে। হিন্দু হিন্দু থেকেই দেশের সেবা কর্ব্বেন, মুসলমান মুসলমান থেকেই দেশের সেবা কর্ব্বেন। বর্ত্তমান তাঞ্জিম ও তব্‌লীগ এবং শুদ্ধি ও সংগঠন প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যতই ক্ষতিজনক বিবেচিত হোক্ না, ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে, এসব সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে ভারতবর্ষ মোটের উপর ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। সম্প্রতি অনেক ক্ষতি হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তব্‌লীগ ও শুদ্ধি সর্ব্বশেষে দেশাত্মবোধের পায়েই আত্মসমর্পণ কর্ব্বে।

শুদ্ধি ও তব্‌লীগের ভবিষ্যৎ

প্রশ্ন।—আপনি তা'হলে বল্‌ছেন যে. তব্‌লীগ ও শুদ্ধি-আন্দোলন উঠে যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' বল্‌ছি না। বরঞ্চ হয়ত তব্‌লীগ ও শুদ্ধি-আন্দোলন আরো জোরে চল্‌বে। কিন্তু এতে সমগ্র দেশের স্বার্থকে বিপন্ন করা হবে না। তখন তব্‌লীগও চল্‌বে, শুদ্ধিও চল্‌বে, কিন্তু দেশের কথা কেউ ভুলবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে লড়াই কত্তে যাবে, তাঁদের সেই চলন্ত পল্টনের মধ্যেই হয়ত একজন খ্রীষ্টান মুসলমান হ'য়ে

যাবেন, একজন মুসলমান হিন্দু হ'য়ে যাবেন, একজন হিন্দু গ্রীষ্টান হ'য়ে যাবেন, কিন্তু তাতে পণ্টনের মধ্যে আত্মদ্রোহ সৃষ্ট হবে না। একজন ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি হিন্দু বা গ্রীষ্টান হ'য়েছেন বলেই যে সব মুসলমান সৈন্য ক্ষেপে উঠে সব হিন্দু বা গ্রীষ্টান সঙ্গীদের উপরে গুলি বা বেয়নেট চালাতে আরম্ভ কর্ব্বেন,—এমনটী হবে না।

ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জিনিষ

প্রশ্ন।—এইরূপ অসম্ভব কল্পনাও কি আপনি করেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—করি, কিন্তু এটাকে শুধু কল্পনা ব'লেই মনে করি না, বাস্তবে এটা ফল্‌বে ব'লেও বিশ্বাস করি। ধর্ম্ম যে মানুষের ব্যক্তিগত জিনিষ, এই কথাটা একদিন প্রত্যেককেই বুঝ্‌তে হবে,—চাই তিনি মুসলমান হোন্, হিন্দুই হোন্, কি গ্রীষ্টানই হোন্। ধর্ম্ম যার যার অন্তরঙ্গ বস্তু, ধর্ম্মসাধন মুখ্যতঃ কত্তে হয় নিভৃতে, একাকী, নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের একেশ্বর বিবেচনা ক'রে,—ধর্ম্ম নিয়ে দল হয় না, দল গড়তে গেলে ধর্ম্মের মাঝে শত প্রকারের মিথ্যা, ক্লেদ, আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল এসে ঢোকে,—এই সত্য একদিন সকলকে স্বীকার কত্তে হবে। যথার্থ ধর্ম্মগুরু কখনো দলবিশেষের গুরু নন, পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের চিত্ততাপ প্রশমনের ক্ষমতা দিয়েই তিনি ব্যক্তিবিশেষের গুরু, একই গুরুর চেলারা নিজেদের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সাধন পরিহার ক'রে গুরুর মহিমা প্রচার কত্তে বেরিয়ে যে শতকরা নিরানব্বইটা করে অসত্যেরই প্রচার, শতকরা নিরানব্বইটা দেয় অধর্ম্মের প্রশ্রয়, একথা একদিন সবাইকে বুঝ্‌তে হবে। সেদিন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে দল গড়্‌তে মানুষ বিরত হবে। তখনো মানুষ গুরু মান্‌বে কিন্তু সে গুরু তার ব্যক্তিগত গুরু, নিজ গুরুকে বিশ্বগুরু ব'লে প্রচার কর্ত্তে

সে চেষ্টা কর্ব্বে না, এর জন্যে ছল-চাতুরী বা জোর-জবরদস্তির আশ্রয়ও সে গ্রহণ কর্ব্বে না। ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রত্যেককে নিজ স্বাধীন মতে চল্‌তে দিয়ে সে দল গড়্‌বে, তার সকল চেষ্টাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপরে। দল গড়ার বুদ্ধি তার লোপ পাবে না, কারণ, দলবদ্ধ হওয়া মানব-মাত্রেরই একটা চিরন্তনী প্রকৃতি। দল সে গড়্‌বে, সঙ্ঘ সে গড়্‌বে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অবতারের পূজার প্রসারের জন্য নয়, নির্দ্দিষ্ট প্রেরিতপুরুষের প্রতি আনুগত্য বাড়াবার জন্য নয়, পরন্তু দেশের শত্রু নিপাত করার জন্য, দেশের হিতসাধন করার জন্যে। অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনে মানুষ একক থাক্‌বে, ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টির জন্য যদি দল গড়েও, তবে তা' কর্‌বে শুধু নিজ সাধন-প্রচেষ্টার অনুকূল-ভাবে, মনকে শুধু অন্তর্মুখ করার জন্য, পরন্তু সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে সে সঙ্ঘের উপরে নির্ভরশীল হবে। তখন দেখ্‌বে, তুরস্ক বা আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ কত্তে এলে ভারতের মুসলমানরা তুর্কী বা আফগান মুসলমানদিগকেও অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রতিরোধ কর্ব্বে, স্বধর্ম্মী ব'লে রেহাই দেবে না; আর, চীন বা জাপান কখনো ভারত আক্রমণ কত্তে এলে ভারতীয় হিন্দুরা চীন বা জাপানীদিগকে প্রচণ্ড আক্রোশে আক্রমণ কর্ব্বে, বৌদ্ধ ব'লে, ধর্ম্ম-বন্ধু ব'লে খাতির কর্ব্বে না।

জাতীয় জীবনে দৈব ও পুরুষকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—যদি বল, এরূপ কখনো সম্ভব হবে না, তা'হলে জেনো, এরূপ সম্ভব কত্তেই হবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভারতের বর্ত্তমান সন্তানগণের পুরুষকারেরই আয়ত্ত। ব্যক্তিগত জীবনে দৈবকে মানো, ক্ষতি নাই। একটা সমগ্র জাতির জীবনের উপরে দৈবের অধিকার নাই, পুরুষকারই এখানে বিধাতা।

কলিকাতা
৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৪

রাজনীতি ও ব্রহ্মচর্য্য

অদ্য মফঃস্বল হইতে জনৈক যুবকের পত্র পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে যে সুবিস্তারিত পত্র লিখিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"রাজনীতিরও আবশ্যকতা আছে কিন্তু রাজনীতিতে যাঁহারা অত্যুৎসাহী হইয়া পড়েন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা দেখিতে পান না। দেখিতে না পাওয়ার কারণ, দৃষ্টিদৈন্য বা নিরপেক্ষতার অভাব।

"জাপান তুরস্ক, রাশিয়া ব্রহ্মচর্য্য না করিয়াও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু মনুষ্যজীবনের পূর্ণতা আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ স্বাধীনতা দ্বারাই হয়। পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভের পরেও আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার দৈন্য বশতঃ যে ঘোর বিপাকে পড়িয়াছে, তাহাও প্রণিধান করিতে হইবে। দূর হইতে উহাদের দুঃখগুলি আমরা টের পাই না। আমেরিকার এক একটা সহরে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ করিয়া স্ত্রীলোক প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে,এবং ইহার বহুগুণ পুরুষকে কুপথে আকৃষ্ট করে! ইংল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ, কিন্তু বিগত জার্ম্মাণ-যুদ্ধে armistice (সাময়িক যুদ্ধবিরতি) স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এই সংবাদ লণ্ডনে প্রচারিত হওয়া মাত্র দলে দলে ইংরেজ নরনারী প্রকাশ্য রাজপথের উপরে পতিত হইয়া পরিচিত-অপরিচিত-নির্ব্বিশেষে সম্মিলিত হইয়া অবাধে যে কুৎসিত স্ফূর্ত্তি করিয়াছিল, তাহা একটা মানুষের বা জাতির পক্ষে কি ভয়ানক, কি দারুণ! এই নৈতিক অবনতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাধা না হইতে পারে কিন্তু ইহার ফলে ঐ সকল জাতি যে মনুষ্যত্বের পরম সম্পদে

বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? মনুষ্যত্বের অভাবের দুঃখ কি পরাধীনতার দুঃখ অপেক্ষা কম?

"যাঁহারা নিজেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য নাও বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করা নিরর্থক। যে জাতির নৈতিক জীবন যত বিপন্ন, সে জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল্য তত কম। রোম স্বাধীন ছিল কিন্তু নৈতিক দুর্ব্বলতা তাহাকে যখন অন্তঃসারহীন করিয়াছিল, তখন সে বর্ব্বর জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই, তাহাকে পরাজিত ও উৎখাত হইতে হইয়াছিল। ইহা ইতিহাসেরই কথা। হয়ত অদূরবর্ত্তী-কালে আমাদিগকে এমন কথা শুনিতে হইতে পারে যে, যে ফরাসী জাতি ইন্দ্রিয়-সুখের প্ররোচনায় যৌন সাহিত্যের ছড়াছড়ি এবং জন্ম-নিরোধের কসরৎ করিতেছে, তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সামান্য যুদ্ধক্ষেত্রেই খতম হইয়া গিয়াছে।

"রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে আমি নিন্দা করিতেছি না, উহার আমি বিরোধীও নহি। কারণ, উহার আবশ্যকতা প্রকৃতই আছে। কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই একটা জাতির সকল দুঃখ নাশ করিতে সমর্থ নয় এবং কর্ম্মি-সমাজে যোগ্যতা-ভেদে কর্ম্মবিভাগও থাকিবে। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল দিকে জাতিকে অগ্রসর করিতে হইবে এবং যদি প্রকৃত কর্ম্মী হন, তবে, যিনি যেদিকে পারিবেন, অগ্রগতিকে সহায়তাই করিবেন। আমাদের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন সেই অগ্রগমনেরই একাংশ। একদেশদর্শীরা এই ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনের প্রকৃত মূল্যকে এবং উপযোগিতাকে স্বীকার না করিলেই কি আমরা থামিয়া যাইব? আমরা কোনও নূতন ধর্ম্মমত, নূতন দেবতা, নূতন ঈশ্বর, নূতন অবতার, নূতন

গুরু বা নূতন নেতাকে প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হই নাই। মানুষেরা সহজ মন স্বাভাবিকভাবে যে ধর্ম্মমত, যে দেবতা বা যে কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, হউক। আমরা সেই স্বাধীন পন্থা-নির্ণয়ের কোনও বাধা হইব না। পরন্তু, যে যেই পথে চলুক, চলিবার শক্তি যেন তার আরও বাড়ে, একনিষ্ঠা যেন সে আমৃত্যু বজায় রাখিতে পারে, তার জন্য তাহার কোমরে আমরা সাধ্যমত বলবৃদ্ধি করিয়া দিলাম।

"বিরাট সৌধ উঠিবে,—আমরা তাহার ভিত্তিটা পাকা করিয়া গাঁথিয়া দিলাম। এই ভিত্তির উপরে গোথিক শিল্প, ভারতীয় শিল্প, বা চৈনিক শিল্পের মর্য্যাদানুযায়ী বিরাট হর্ম্ম্য গড়িয়া উঠিবে, এই ভিত্তির উপরে ভোগীর প্রমোদ-বিহার, ত্যাগীর মঠ, রাজনীতিকের মন্ত্রণাকক্ষ, অনাথ-আতুরের সেবা-সদন বা পশুর পিঞ্জরাপোল নির্ম্মিত হইবে, সেই অনধিকার-চিন্তা আমরা করি না। ভিত্তি গড়িবার ভার যাহারা পাইয়াছে, তাহারা একাগ্রচিত্তে ভিত্তিটাকেই শক্ত করিয়া গড়িবে। চূড়া রচিবার যোগ্য যাঁহারা হইবেন, তাঁহারা তাহাই রচুন না! ইহাতে বিরোধের কথা কি আছে?

ব্রহ্মচর্য্যে রাজনীতিদের অশ্রদ্ধা কেন?

"আমার মনে হয়, যে সকল রাজনীতি-আন্দোলনকারী ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, মনে জ্ঞানে তাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূলবাদী নহেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা ও বিপুল ক্ষমতাকে অন্তরে অন্তরে স্বীকার করেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে যে সকল উগ্র সমালোচনা উদ্‌গিরণ করেন, সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থলেই তাহা ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের প্রতি নহে, পরন্ত যাঁহারা

ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই ব্যক্তিগত ত্রুটির প্রতি। অনেকের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার শুধু ভিক্ষান্নজীবীর সংখ্যা-বর্দ্ধনে এবং অভিনব ঈশ্বরাবতার-সমূহের প্রকটনে পর্য্যবসিত হইতেছে! অনেকের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার যুবকমনকে স্বদেশ-সেবার মহনীয় আদর্শের প্রতি হীনশ্রদ্ধ ও জাতীয় আত্ম-সম্মানবোধের প্রতি উদাসীন করিতেছে। অনেকের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার ত্যাগের নামে দৈবনির্ভর, আলস্য এবং ধর্ম্মের নামে কতকগুলি গোঁড়ামিরই সৃষ্টি করিতেছে!

"ব্রহ্মচর্য্যের নহে, সামঞ্জস্যবোধহীন প্রচারকদের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের এই যে সব কুফল, তাহা হইতে মুক্ত রাখিতে না পারিলে ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের দ্বারা জাতীয় হিত-সাধন কেমনে হইবে? সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনই বা কি ভাবে তাহার পূর্ণ সার্থকতাকে আহরণ করিবে?"

গুরুশক্তি ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার

"আরও একটী কথা আমার বারংবারই মনে জাগে যে, ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকদের আজ যাহা প্রয়োজন, তাহা গুরুখ্যাতি নহে, পরন্তু প্রয়োজন হইতেছে গুরু-শক্তির। গুরুখ্যাতিই ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের মধ্যে যত জঞ্জাল সৃষ্টি করে। পরন্তু গুরু-শক্তি কাজ করে সকলের অদৃশ্যে, সকলের অজ্ঞাতসারে, নিরতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে।"

শয়ন ও নাম-জপ

বৈকাল বেলা শ্রীশ্রীবাবামণি হেদুয়াতে বেড়াইতে গেলেন। কয়েকটী ভক্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া তৃণের উপর বসিলেন। নানা আলোচনা হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন অভ্যাস কর্ব্বে. যেন রাত্রিতে নিদ্রা-বস্থাতেও মনে মনে ভগবানের নামজপ চল্‌তে থাকে। শোবার সময় বিছানায় গিয়েই কাৎ হ'য়ে পড়্‌বে না। আসন ক'রে সরল মেরুদণ্ডে শয্যার উপর ব'সে প্রথমতঃ কয়েকবার যোনি-মুদ্রা কর্ব্বে এবং মনটাকে এনে ভ্রূ-মধ্যে স্থাপিত কর্ব্বে। তারপরে নামজপ কত্তে থাক্‌বে। নাম-জপ কত্তে কত্তে যখন আপনি গভীর নিদ্রা এসে যাবে, তার আগে পর্য্যন্ত আর শয্যার সঙ্গে পৃষ্ঠ-সংযোগ কর্ব্বে না।

প্রেম ও ব্রহ্মচর্য্য

প্রশ্ন।—এতে লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—লাভ ব্রহ্মচর্য্য। বিভীষিকার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয় না, হয় প্রেমের মধ্য দিয়ে। প্রেম্‌সে ভগবানের নাম কর, আপনি তোমার ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। ঘুমাবার সময়ে মনকে সকল ভয় থেকে, সকল আশঙ্কা থেকে, সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখ্‌তে হবে। তাই ভগবানের নাম করা।

দেশের সেবা ও ব্রহ্মচর্য্য

প্রশ্ন।—দেশের সেবা দ্বারা কি ব্রহ্মচর্য্য লাভ করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন যাবে না? প্রেম্‌সে দেশের সেবা কর্ল্লে সকল অব্রহ্মচর্য্য আপনি দূর হয়, আপনি চিত্তশুদ্ধি আসে। প্রেম অসাধ্য সাধন করে, প্রেমই মনুষ্যত্ব দান করে। যে ভাবে দেশের সেবা কর্ল্লে তোমার প্রেম বাড়্‌বে, জেনো; তাই তোমার ব্রহ্মচর্য্যের সহায়। প্রেম মানে কি? আসক্তি নয়, প্রেম মানে স্বার্থবুদ্ধিহীন অহেতুক অনুরাগ। কেন দেশের সেবা কত্তে ভাল লাগে, সেই কারণটীকে যখন খুঁজে পাবে না, তখনই জান্‌বে

প্রেম হ'য়েছে। প্রথম প্রথম তোমার দেশসেবার প্রবৃত্তি হয়ত কারণকে আশ্রয় ক'রে জাগ্রত হবে। কিন্তু দেশসেবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্বার্থপরতার অনুশীলন কত্তে চেষ্টা কর্লে ক্রমে দেশের প্রতি অকারণ অনুরাগ জন্মাবে। তখনই জান্‌বে, তোমার দেশসেবার ব্রতগ্রহণ সার্থক হ'তে চল্‌ল, তোমার ব্রহ্মচর্য্যও সুপ্রতিষ্ঠার পথে এল।—দিনরাত দেশের মঙ্গল, দশের মঙ্গল নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখ, আর রাত্রিতে শোবার সময় এলে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সঁপে দাও।

শয়ন ও দেশহিত-চিন্তা

প্রশ্ন।—শোবার সময় দেশের হিত-চিন্তা কর্লে দোষ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মনের দিক্ দিয়ে দোষ নেই কিন্তু দেহের দিক্ দিয়ে আপত্তি আছে। নিদ্রা বিশ্রামের জন্য। এই বিশ্রাম না হ'লে মানুষ প্রকৃত পরিশ্রমের কাজগুলি উপযুক্তভাবে কত্তে পারে না। ভগবানের নাম কত্তে কত্তে যে নিদ্রা হয়, সে নিদ্রা দেহকে গভীর বিশ্রাম দেয়, পূর্ণ শান্তি দেয়। কিন্তু দেশের সেবার চিন্তা কত্তে কত্তে নিদ্রা এলে সে নিদ্রা অধিকাংশ সময়ই নানা চিত্ত-চমৎকারী স্বপ্নে পূর্ণ হবে এবং তাতে পূর্ণ বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে। তাই, ভগবানের নাম কত্তে কত্তে ঘুমানোই উৎকৃষ্ট পন্থা।

কর্ম্মযোগ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা অনেক সময় মনে কর যে, দেশের সেবার সঙ্গে ভগবানের নামের বিরোধ আছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তা' নয়। কাজ কর্‌বে হাতে, আর নাম কর্‌বে মনে। তাতে কাজগুলি অশুদ্ধতাহীন হবে, নাম-সেবাও আলস্যহীন হবে। মঠ সৃষ্টি ক'রে দিবারাত্রি আলস্যের সেবা করাই ভগবানের নামের উদ্দেশ্য

নয়। তোমার প্রত্যেকটী কর্ম্মের মেরুদণ্ডকে শক্ত ক'রে দেবার জন্যই ভগবানের নাম। কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে মানুষের মত মানুষের লক্ষ্য। ধর্ম্ম-সাধনার নাম ক'রে চির-আলস্যে জীবন-যাপন করা কখনো যথার্থ মানুষের লক্ষ্য হ'তে পারে না। কর্ম্ম-সংগ্রামের কঠোর কোলাহলের মধ্যেও মনকে স্থির রাখার নামই যোগ-সাধন, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষা ক'রে খাওয়া আর নাক টেপাটেপি করার নাম যোগ-সাধন হয়। আলস্য কখনও যোগাভ্যাসের অঙ্গ হ'তে পারে না, নিরলস কর্ম্মই যোগাঙ্গ।

ভ্রূমধ্য ও শিরঃপীড়া

অপর একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন,—ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশনের ফলে কি কখনো কখনো মাথা ব্যথা হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সুস্থ ব্যক্তির হয় না। চোখে কোনো দোষ থাকলে বা মস্তিষ্ক উত্তপ্ত থাকলে কারো কারো এরূপ হতে পারে। কিন্তু এজন্য চিন্তা করা উচিত নয় বা ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশনের চেষ্টাও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন-কালে জোর ক'রে চোখকে ললাটের দিকে ঠেলে দেওয়া না হয়। চক্ষুকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিয়েই চোখ বুজে মনকে ভ্রূমধ্যসেবী করার চেষ্টা করবে। চক্ষের শিরা-উপশিরাগুলির উপরে যাতে কোনও চোট্ বা ক্লেশকর টান না পড়ে, সেই দিকে খেয়াল রেখে মনের সহজ আনন্দ নিয়ে ভ্রূমধ্যে মনকে বসাবে। এইভাবে কাজ কর্ল্লে ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশনের দ্বারা তোমার শিরঃপীড়াদি হবার ভয় কমে যাবে। অনেক সময়ে পেট গরম থাকার দরুণও ভ্রূমধ্যে মনঃ-সন্নিবেশ কত্তে ক্লেশ হয়। সুতরাং কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার দিকেও লক্ষ্য

দিবে, আহারীয়কে সহজপাচ্য লঘু কর্ব্বে, চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে, লোভ-বৰ্জ্জিত সরল সহজ খাদ্যে তুষ্ট থাক্‌বে। তারপরেও যদি শিরঃপীড়ার ভাব না কমে, তাহ'লে প্রাতঃকালে ভ্রূমধ্যে, মধ্যাহ্নে হৃদয়ে, সায়ংকালে গুহ্য-মূলে এবং শয়নকালে নাভিমূলে মন স্থির ক'রে নামের সেবা কর্ব্বে। এভাবে কয়েকদিন করার পরে দেখ্‌তে পাবে যে, সকল সময়েই যদি ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন কর, তা হ'লেও শিরঃপীড়া হচ্ছে না।

শরীরের বিভিন্ন কেন্দ্রে মনঃসন্নিবেশনের তাৎপর্য্য

যুবক।—শরীরের বিভিন্ন কেন্দ্রে মনঃসন্নিবেশনের বিশেষ তাৎপর্য্য কি কিছু আছে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়ই আছে। মন সর্ব্বদাই স্বভাবত নিম্নগামী থাকে। তাই গুহ্যমূলে মনঃসন্নিবেশন কত্তে ক্লেশ কম হয়, সেখানে মন সহজে স্থির হ'য়ে যায়। নাভিমূলে মনঃসন্নিবেশন কর্ল্লে নিদ্রা গভীর ও সুখপ্রদ হয়, তাই এতে দেহ-মনের বিশ্রাম হয়। হৃদয় প্রেমানুভূতির স্থান, তাই বক্ষে মনঃসন্নিবেশন দ্বারা ইষ্টের প্রতি ভক্তির ও আবেগের ভাব বৃদ্ধি পায়। ভ্রূমধ্যে শ্রীগুরুর দিব্য সিংহাসন, তাই এখানে মনঃ-সন্নিবেশন দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়, জ্ঞানের আলো, উপলব্ধির নানা বিচিত্র অবস্থা ফুটে ওঠে। মস্তিষ্ক থেকে ধ'রে অনন্ত ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত সহস্রার বিরাজিত, সুতরাং সেখানে মনঃসন্নিবেশন দ্বারা নিরাকার নিরঞ্জন নিষ্কল ব্রহ্মের সহিত অভেদ-বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশনের শ্রেষ্ঠতা

যুবক।—এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কোন্‌টী ?

শ্রীশ্রীবাবামণি ।—সময়-বিশেষে সাধকের পক্ষে এক একটী কেন্দ্র শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সর্ব্ব সময়ের বিচারে ভ্রূমধ্যই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।

শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপ ও অস্বস্তি

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম-জপ কত্তে বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তা ত' বাবা বোধ হবেই। এটা যে অতি সহজ কাজ! সহজ কাজের চাইতে কঠিন কাজ জগতে আর কি আছে? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিত্যসঙ্গী রূপে পেয়েছ। কিন্তু এতকাল ধরে শ্বাস টানা আর প্রশ্বাস ছাড়াকে কষ্টকর ব'লে মনে হয়নি। যাই ব'লে দিলুম, শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য দাও, আগম-নির্গমে তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণ কর, অম্‌নি কাজটা শক্ত হ'য়ে গেল। কি বল?

প্রশ্নকর্ত্তা যেন লজ্জা বোধ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতে তোমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই বাছা! না জেনে কাজ কর্লে কাজে শ্রমবোধ হয় না, জেনে কর্লেই শ্রমবোধ আসে। শরীরের ক্লান্তি মনের ক্লান্তি অনুযায়ী হয়। মনকে তাজা ক'রে নাও। বল, ইচ্ছা ক'রে শ্বাস-প্রশ্বাসকে দীর্ঘ বা ধীরগামী কর্ব্ব না। আপনা আপনি সে যে ভাবে চলার চলুক, আমি তার গতিবেগ বাড়াব না বা কমাব না; শ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি সম্পূর্ণরূপে নিজ স্বভাবে চল্‌তে দিব, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ক্লেশে বিনা পরিশ্রমে ভগবানের মঙ্গলময় নাম জ'পে যাব। এ ভাবে সঙ্কল্প কত্তে কত্তে দেখ্‌বে, যে কাজটাকে কঠিন বলে মনে কচ্ছ, বাস্তবিক প্রস্তাবে সেটা নিতান্ত সহজ কাজই হ'য়ে আছে।

যুগপৎ ভ্রূমধ্যে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কি করিয়া মন রাখা সম্ভব?

প্রশ্ন।—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম-জপ আর ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন এই দুটী কাজ এক সঙ্গে করার কৌশল কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি—প্রথমে মনটা দেবে শ্বাসে প্রশ্বাসে। সঙ্গে সঙ্গে নাম-জপ সুরু কর্ব্বে। যখন দেখ্‌লে শ্বাসের সঙ্গে নামকে মিলিয়ে দেওয়াটা সহজ হয়ে আস্‌ছে, তখন মনকে ভ্রূমধ্যে নিয়ে আস্‌বে। দেখো, প্রতি শ্বাসে আর প্রতি প্রশ্বাসে নাম ক'রে যেতে তখন আর কোনও আলাদা রকমের অভিনিবেশের প্রয়োজনই হবে না। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম কর্ব্বে বলে তোমার মনকে তোমার নাকে, আলজিবের গোড়ায়, কণ্ঠনালীতে বা ফুসফুসে রাখার কোনও প্রয়োজনই নেই। অম্‌নি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বা ছাড়তে যেমন ফুসফুসের কথা মনেই আসে না, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করবার কালেও তেমনি ফুসফুস আদি শ্বাস-সম্পর্কিত যন্ত্রে মন থাকার কোনও প্রয়োজনই নেই।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩৪

স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব

অদ্য ভ্রমণকালে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক ভক্তকে বলিলেন,—দেখ্‌, আমি যখন দেখি যে, আমার ব্যক্তিত্ব তোদের স্বাধীন চিন্তা ও সদসৎ-বিচারের শক্তিকে অভিভূত ক'রেছে, তখন নিজেকে ব্যর্থ ব'লে বুঝতে পারি। আমি যদি বেখাপ্পা কথা বলি, তাহ'লে যারা মেনে নেয় না, বরং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়—"you are not the man who taught us, you are Satan in the guise of Christ (তুমি সে নও,

যিনি আমাদের গুরু ছিলেন, খ্রীষ্টের ছদ্মবেশে সজ্জিত শয়তানই তুমি)" তাদের সৎসাহস দেখ্‌লেই প্রাণটা সার্থকতার বোধে পূর্ণ হ'য়ে যায়। আমার ব্যক্তিত্ব যদি তোদের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে, তবে ত' আমি সমাজের একটা পরম শত্রু !

স্বদেশপ্রীতি, স্বধর্ম্মপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতি

অপর এক ভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - স্বধর্ম্ম প্রীতিও ধর্ম্ম, স্বদেশপ্রীতিও ধর্ম্ম, বৈশ্বমৈত্রীও ধর্ম্ম। এই তিনটা ধর্ম্মে বিরোধ আছে ব'লে যারা মনে করে, তারা প্রকৃত ধর্ম্মকে জানে না। স্বদেশকে ভালবাসি ব'লেই যে স্বধর্ম্মানুরাগ কমাতে হবে, তা নয়। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি ব'লেই যে স্বদেশভক্তি কমাতে হবে, তাও নয়। পূর্ণ মানুষের জীবনে এই তিনটীরই সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে।

প্রশ্ন।—প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্র যদি আমাদের দেশ আক্রমণ করে, তা হ'লে কি "সকল মানব পরস্পর ভ্রাতা" এই কথা ব'লে তাদের রেহাই দিব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।— কেন দেবে ? ওরা ভাই, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এক ভাই যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, পরস্বাপহারী হয়, দুর্বৃত্ত হয়, তবে অপর ভাই কি তার চরিত্র-সংশোধনের অধিকার পরিত্যাগ কর্ব্বে ? তোমার যে ভাই পর-নির্য্যাতন কচ্ছে, তাকে তুমি শাসন কর্ব্বে কঠিন হস্তে। কিন্তু সে যখন সংশোধিত হ'য়ে যাবে বা বিপন্ন হবে, তখন তার সেবা কর্ব্বে প্রাণভরা প্রেম নিয়ে। সেদিন কুমিল্লাতে যে দাঙ্গা হ'য়ে গেল, খবরের কাগজে তার বিবরণ পড়েছ ত ? যে সব গুণ্ডা অভয়-আশ্রমের হাস-পাতাল ভেঙ্গে দেবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র কচ্ছিল, তারাই যখন আহত হ'ল,

তখন ঐ অভয়-আশ্রমের কর্ম্মীরাই আহতদের এনে নিজেদের হাসপাতালে রাখলেন, ঔষধ দিলেন, পথ্য দিলেন, রাত জেগে শুশ্রূষা কর্লেন, আবার রোগী আরোগ্য হ'লে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। একেই বলে প্রেম।

কলিকাতা

২রা আশ্বিন, ১৩৩৪

নাম-জপে বিধি-নিষেধ

নাম-জপ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লার জনৈক ভক্তের নিকটে যে পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে অনুলিখিত হইল। যথা,—

"নাম-জপ সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বভাবে চলিতে পারে। ঠাকুর-ঘরে বসিয়াও জপ করা যায়, পায়খানায় বসিয়াও জপ করা যায়। ভগবানের নাম অপবিত্র স্থানকেও পবিত্র করে। নাম মাটিতে বসিয়া, চৌকিতে বসিয়া, রেলে, ষ্টীমারে, বাজারে বসিয়া, দাঁড়াইয়া, হাঁটিতে হাঁটিতে, শায়িত অবস্থায় নেওয়া যাইতে পারে। নাম করের দ্বারা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, বাহ্য ও আভ্যন্তর কুম্ভককালে, পথ চলিবার সময়ে পায়ের তালের সাথে সাথে বা হৃৎ-স্পন্দনের সঙ্গে জপ করা যাইতে পারে। গুহ্যমূলে লিঙ্গমূলে, নাভিমূলে, হৃৎপিণ্ডে, কণ্ঠমূলে, ভ্রূ-মধ্যে, মস্তিষ্কে, অনন্ত ঊর্দ্ধে, অনন্ত অধোদেশে যেখানে ইচ্ছা মন রাখিয়া নাম-জপ করা যাইতে পারে। কিন্তু অপবিত্র স্থানে বসিয়া জপ করা অপেক্ষা পবিত্র স্থানে বসিয়া জপ করা ভাল। কোলাহলপূর্ণ স্থানে বসিয়া জপ করা অপেক্ষা নির্জ্জন স্থানে জপ করা উৎকৃষ্টতর। মালা বা করে জপ করা অপেক্ষা শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করা অধিকতর সুগম। অন্যত্র মন স্থির করিয়া জপ

করা অপেক্ষা ভ্রূমধ্যে মন স্থির করিয়া জপ করা অধিকতর ফলপ্রদ। শায়িত অবস্থায় অপেক্ষা পথ চলিতে চলিতে জপ করা ভাল, চলন্ত অবস্থায় অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় জপ করা ভাল, দণ্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষা উপবিষ্ট অবস্থায় জপ করা ভাল। যখন উত্তম ভাবে জপ করিবার সুযোগ পাইবে, তখন উত্তম ভাবেই করিবে ; যখন তাহা পাইবে না, তখন যেমন ভাবে পার তেমন ভাবেই করিবে। কিন্তু উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগে কখনও শিথিলপ্রযত্ন হইবে না।

নামের ফল

"নামের ফল অন্ধবিশ্বাস নহে। নামের ফল জ্বলন্ত বিশ্বাস। নামের ফল প্রত্যক্ষ দর্শন। নামের ফল অভ্রান্ত সত্য। নামের ফল পূর্ণ জ্ঞান। জ্ঞানবর্জ্জিত অপ্রত্যক্ষ আনুমানিক বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া মনে করিও না। উহা অবিশ্বাসেরই নামান্তর। নাম তোমাকে এই অবিশ্বাসের দুশ্ছেদ্য জাল-প্রসার হইতে উদ্ধার করিবে।

শিষ্যই গুরুর প্রতিমূর্ত্তি

"আমার ফটোর কথা লিখিয়াছ। কিন্তু আমার পৃথক্ ফটো দিয়া প্রয়োজন কি ? তোমরাই ত' আমার ফটো। তোমাদিগকে দেখিলেই আমাকে দেখা হইবে। তোমাদের প্রদীপ্ত জীবনই আমার জীবন, তোমাদের তেজস্বিতাই আমার তেজোবীর্য্য।"

নামজপের উদ্দেশ্য

পত্রের অনুলেখক প্রশ্ন করিলেন,—নামজপের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপ সর্ব্ব উদ্দেশ্যে হ'তে পারে। তবে অসৎ উদ্দেশ্যে নামজপ করা উচিত নয়।

পরীক্ষায় পাশ করার জন্য নামজপ

প্রশ্ন।—ধরুন, পরীক্ষায় পাশ করা, কামদমন করা ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরীক্ষায় পাশ করার জন্য নামজপ না ক'রে মনঃসংযোগের শক্তিবৃদ্ধির জন্য নামজপ অধিকতর শ্লাঘ্য। নামজপের ফলে কারো পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাহায্য হয় না,—সাহস বাড়ে, দক্ষতা বাড়ে, একাগ্রতা বাড়ে, মনের বহির্ম্মুখতা দূর হয়, এইসব হচ্ছে নামজপের প্রত্যক্ষ ফল। অতএব একজন যদি পড়তে বসার আগে ভক্তি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নিয়ে কিছু সময় নামজপ করে, তাহ'লে পড়ার সময় তার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, ফলে পড়া অতি সহজে আয়ত্ত হবে।

কামদমনের উদ্দেশ্যে নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কামদমনের উদ্দেশ্যে নামজপ অবশ্যই চল্‌তে পারে এবং নামজপ খুব প্রগাঢ় চিত্তে কত্তে পারলে মনের দুরন্ত চঞ্চলতা আপনিই শান্ত হয়ে যায়। যার নামজপের অভিনিবেশ যত গভীর, তার কাম-ক্রোধাদি রিপু তত দমিত হ'য়ে যায়। জোর ক'রে কাম-দমনের চেষ্টার চাইতে নামজপের মধ্য দিয়ে কামদমনের সামর্থ্য সঞ্চয় অধিকতর স্থায়ী কাজ। যে কাম যুক্তি মানে না, বাধাকে গ্রাহ্য করে না, লোকলাজকে তুচ্ছ করে, এমন দুর্ব্বার দুর্ম্মদ দুঃশীল কামও নামজপের ধারাবাহিক অনুশীলনে আস্তে আস্তে সহজ-নিবার্য্য ও শান্ত হয়ে আসে।

মানুষ বশীভুত করিবার জন্য নামজপ

প্রশ্ন।—কাউকে বশীভূত করার জন্য যদি নামজপ করা যায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একাগ্র মনে নামজপ কর্ল্লে পশু, পক্ষী, মানুষ, দেবতা পরমেশ্বর, সবাই বশীভূত হ'তে বাধ্য। কিন্তু মানুষকে বশীভুত করার

উদ্দেশ্য নিয়ে নামজপ কত্তে বসার মতন বোকামি নেই। নামজপ কচ্ছ ভগবানের আর বারংবার তোমার ধ্যানাবেশ আসছে তাকে নিয়ে. যাকে চাচ্ছ বশীভূত কত্তে। ফলে সেই মানুষটীকে বশ না ক'রে তুমিই উল্টো তার বশ হয়ে যেতে পার। এই বিপদটা এই ক্ষেত্রে পদে পদে। তাই এরূপ অধ্যবসায় থেকে প্রত্যেকের বিরত থাকা উচিত।

পরের অনিষ্টসাধনের জন্য নামজপ

প্রশ্ন। – অনেকে ত' পরের অনিষ্টসাধনের জন্যও নামজপ করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরের অনিষ্ট সাধিতও হয় কিন্তু যাকে যেই অনিষ্ট করা হয়েছে, তার বহুগুণ অনিষ্ট নিজের উপরে এসে পড়ে। তাই, নিজের ভবিষ্যতে যার দৃষ্টি আছে, তার এমন কর্ম্মে হাত দেওয়া উচিত নয়।

মৃতের আত্মিক শান্তির জন্য নামজপ

প্রশ্ন।—মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য ত' নামজপ চলতে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়ই পারে এবং এই উদ্দেশ্যে নামজপ প্রশস্ত ব'লে সাধক-সমাজে পরিগৃহীতও হয়েছে। অপরের মঙ্গলের জন্য নামজপ সর্ব্বসময়েই প্রশস্ত। তবে জপকালে মৃত ব্যক্তির অবিরাম চিন্তা না ক'রে জপারম্ভ কালে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে নেবে,—"হে ভগবান, অমুকের আত্মার পারলৌকিক শান্তির কামনায় তোমার পবিত্র নাম জপ কত্তে বস্‌লুম, তুমি দয়া ক'রে তোমার নামে আমার গভীর অভিনিবেশ দাও এবং প্রতিটি বার নাম জপ করার অশেষ সুফল এই পরলোকপ্রস্থিত আত্মাকে দান কর।" এইভাবে জপ সুরু কর্ব্বে।

অপরের রোগশান্তির জন্য নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এভাবে অপরের রোগ-শান্তির প্রার্থনা নিয়েও নামজপ কত্তে পার। তাতে তার এবং তোমার এই উভয়েরই কুশল হবে। কিন্তু নিজের রোগ-শান্তির উদ্দেশ্য নিয়ে জপ করার কোনও প্রয়োজন নেই।

নিজের রোগশান্তির জন্য নামজপ

প্রশ্নকর্ত্তা।—কেন বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নামজপ নিষ্কাম অন্তরে করাই ভাল। তাতে নামের শক্তি জীবনের উপরে সহজে প্রকাশ পায়। নিজের রোগের আরোগ্য-কামনায় নামজপ কত্তে বস্‌লে মন অধিকাংশ সময়ে নামে না ব'সে স্থির হয়ে বসতে চাইবে তোমার দেহের উপরে, তোমার রোগের উপরে। তার চাইতে নিষ্কাম অন্তরে নামজপ ক'রে রোগ-সম্পর্কে কর্ত্তব্য করার ভার ভগবানের হাতে দিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত থাকাই ভাল। ভগবানের উপরে নিজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বল্‌বে,—

"তুমি যদি রাখ্‌তে নার,
ডুব্‌ব,—তাহে
নাই ভাবনা!"

(সতীশচন্দ্র)

সস্ত্রীক আত্মোৎকর্ষ

বৈকাল বেলা শ্রীশ্রীবাবামণি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট নিবাসী জনৈক ভক্তকে লইয়া ইডেন গার্ডেনে বসিলেন। নানা কথার পরে, বলিলেন,—"তোমরা হচ্ছ গৃহী। তোমাদের আগে প্রতিষ্ঠা ক'রে নিতে হবে নিজ গৃহের

কল্যাণ। নিজের স্ত্রীকে আগে ধর্ম্মের প্রকৃত সহকারিণী ক'রে তুলতে হবে। তাঁকে সত্য, প্রেম, পবিত্রতার সাধিকা কত্তে হবে। তাঁর ভিতরেও সংযম, সদাচার ও সদ্‌বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে। যে স্বামীর স্ত্রী অধার্ম্মিকা, তার পক্ষে ধর্ম্মলাভ কঠিন। যে স্ত্রীর স্বামী অধার্ম্মিক, তার পক্ষেও ধর্ম্ম-লাভ দুঃসাধ্য। তাই, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব-প্রযত্নে প্রত্যেক দম্পতির জীবনে সমভাবে ধর্ম্মানুরাগ সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে। তবেই গৃহীর জীবনে সুখ হ'তে পারে। পশুর মতন জীবন-যাপন ক'রে যাওয়াটাই যদি চরম হ'ত, তবে মানুষ পশুদিগকেই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বল্‌ত। কিন্তু পশুকে ত' কেউ শ্রেষ্ঠ মনে করে না! তাই, পাশবিক ভাবগুলি দমন ক'রে চল্‌বে। যেমন ভাবেই হোক্, মানুষ যে হ'তেই হবে, এইটী কখনো ভুলো না। নিজেও দিবারাত্রি জপ কর, "মানুষ হব, মানুষ হব", স্ত্রীকেও দিবারাত্রি জপ করাও, "মানুষ হব, মানুষ হব, মানুষ হব।"

স্ত্রীশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধনা

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা (ভক্তের স্ত্রী) লেখাপড়া জানেন ত'?"

ভক্ত।—সামান্য জানেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।— সামান্যতে চল্‌বে না বাপ্‌ধন, ভাল ক'রে শেখাবার জন্য যত্ন নেবে। দেশের মেয়েগুলি সুশিক্ষিতা নয় ব'লে কোনো মহা-পুরুষই তাঁদের উচ্চ চিন্তাগুলি এদের কাছে পরিবেশন কত্তে পাচ্ছেন না। এমন একদিন আস্‌ছে, যেদিন মেয়েরা অদ্ভুত সব কাজ কর্ব্বে, মায়ের জাত যথার্থই মায়ের জাত হবে, জগন্ময়ী মহাশক্তির আবির্ভাব নিজেদের মধ্যে অনুভব ক'রে মায়েরা সব ত্রিলোক-বিস্ময় উৎপাদন কর্ব্বে। কিন্তু মহাভাব ধারণের যোগ্য হবার জন্য তাঁদের আগে হ'য়ে নিতে হবে সুশিক্ষিতা।

অশিক্ষিত মন বারংবার কুসংস্কারের প্রভাবে নত হ'য়ে পড়ে, আত্ম-অবিশ্বাসে ক্লিষ্ট হয়, বার বার সংশয়-সন্দেহে দোদুল্যমান হয়। এই জন্যই আজ শিক্ষা দিতে হবে সর্ব্বপ্রযত্নে। আগে কথকতা, পুরাণ-ভাগবত পাঠ, রামলীলা, যাত্রা ও কবিগানের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মের তত্ত্ব অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক এবং কুলনারীদের নিকটে পৌঁছুত। সে সব এখন উঠে গেছে এবং শাস্ত্রকে বিকৃত, শাস্ত্রার্থকে নানা গ্রাম্য উদ্দেশ্যের অনুগত ক'রে বলার রীতি এসেছে। এখন নিজে শাস্ত্র ও সদ্‌গ্রন্থ না পড়লে ধর্ম্মভাবের পরিপুষ্টির উপায় নেই। এই জন্যই প্রত্যেক পিতার উচিত নিজের কন্যাকে উপযুক্ত-ভাবে লেখাপড়া শেখান, প্রত্যেক স্বামীর উচিত নিজের স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা কর্ব্বার জন্যে প্রাণপণে যত্ন দেওয়া।

স্ত্রীলোকের কাম

ভক্ত বলিলেন,—কিন্তু আর এক দিকে যে মস্ত বিপদ হচ্ছে! স্ত্রীলোক যখন কামাবিষ্টা হয়, তখন তার আর হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি ব'ললেন,—এই কথাটাই পূর্ণ সত্য নয়। স্ত্রীলোকেরা কাম দমন কর্ত্তে পারে পুরুষের চাইতে অনেক বেশী। স্ত্রীলোকেরা যত সহজে noble sentiment এর (মহৎ ভাবের) বশবর্ত্তী হয়, পুরুষরা তত সহজে হয় না। একটা ভাল সংস্কার একবার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পার্লে স্ত্রীলোকেরা তার মর্য্যাদা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষা কর্ত্তে চেষ্টা পায়, পুরুষরা তা' পায় না। কামের ধর্ম্মই হিতাহিত-জ্ঞান লোপ করা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যারই কাঁধে কাম চেপে বসে, তারই হিতাহিত-জ্ঞান সে লোপ ক'রে দিতে চায়। কিন্তু সুশিক্ষিত, সুপরিমার্জ্জিত, বিচারপরায়ণ সাধক মন কামের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে, অশিক্ষিত অপরিমার্জ্জিত, বিচারাভ্যাসহীন অসাধক মন তা' পারে না। স্ত্রীলোক-

দিগকে শিক্ষায় বঞ্চিত রেখে তোমরা তা' দিগকে লড়াইয়ের পটুত্ব থেকেও বঞ্চিত করেছ। এজন্য দায়ী বাছাধন তোমরাই।

স্বাভাবিক কাম ও কৃত্রিম কাম

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকালকার স্ত্রী স্বামীর বলবিধায়িনী নয় পরন্তু তার বক্ষোরক্ত-শোষিণী রাক্ষসী-বিশেষ। স্বামীর সংযমে সে সহায়তা করে না, স্বামীর সংযমকে সে চূর্ণ করে। এর সবটা কারণই তার কামার্ত্ততা নয়, এর প্রধান কারণ তার কাম-সংস্কার। একদিকে তার মা, জ্যেঠী, খুড়ী, দিদি ও সখী, আর একদিকে তার স্বামী স্বয়ং বিবাহের পরমুহূর্ত্ত থেকেই তার মনে কামসংস্কার প্রবিষ্ট কর্ব্বার জন্য অনুক্ষণ চেষ্টা করেছে। পিত্রালয় থেকে শতবার তাকে শত প্রকারে শিখান হ'য়েছে সেই সব ফন্দী-কৌশল যাতে স্বামীর মন ভোগাতুর হয়। আর স্বামী ম'শায় নিজে দিয়েছেন তাকে এমন শিক্ষা, যাতে অকালেই, ইন্দ্রিয়পরিপুষ্টির আগেই, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদির সম্যক্ সুখটুকু উপলব্ধি কর্ব্বার ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব্বেই সে তার ইন্দ্রিয়-নিচয়ের কণ্ডূয়ন অনুভব করে। এই যে কণ্ডূয়ন এটা কখনো স্বাভাবিক জিনিষ নয়, পিত্রালয়ের গুপ্ত কুপরামর্শ আর স্বামীর কদাচার, এই দুইটী মিলে এই অস্বাভাবিক কামকে জাগ্রত করেছে। এটা কামার্ত্ততা নয়!

সকল ধর্ম্ম কি এক

অতঃপর অপরাপর বহু বিষয় আলোচিত হইবার পরে সকল ধর্ম্মের মূল একত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—সকল ধর্ম্ম কি এক?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, সকল ধর্ম্ম এক নয়, কিন্তু সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য এক। তুমি আর আমি দুজনেই এস্‌প্লানেডে যাচ্ছি। তুমি যাচ্ছ ডাইনের

রাস্তা ধ'রে, আমি যাচ্ছি বাঁয়ের আর একটা রাস্তা ধ'রে। দুই জনেই পেঁছব গিয়ে ঐ একই জায়গায়। কিন্তু রাস্তা দুটো এক নয়। পৃথিবীর ধর্ম্ম-মতগুলিও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য-স্থান এক। এক জায়গায় যাবার দুটো পথ থাক্‌লে একটা যেমন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, আর একটা নোংরা থাকতে পারে, একটা যেমন সুপ্রশস্ত আর একটা সঙ্কীর্ণ থাকতে পারে, একটা যেমন নিরাপদ, আর একটা বিপদসঙ্কুল হ'তে পারে, একটা যেমন আলোক-মালায় সুসজ্জিত ও সঙ্গীত-মুখরিত হ'তে পারে, আর একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভীষিকাপূর্ণ হ'তে পারে, বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলিও সেইরূপ। আবার, এমন ধর্ম্মমতও অনেক আছে, যাদের পরস্পরের সাদৃশ্য খুব বেশী কিন্তু তবু তারা বিভিন্ন। যেমন তোমার হ্যারিসন রোড আর বহুবাজার ষ্ট্রীট। দুটোই পেঁছাচ্ছে গিয়ে শিয়ালদায়, দুটোর উপরেই আলোর ব্যবস্থা এক রকম, দুটোতেই ট্রাম চলে, বাস চলে, কিন্তু তবু দুটো বিভিন্ন। দুজায়গার লোকের পক্ষে শিয়ালদা পেঁছুতে হ'লে এই দুটোর মধ্যে একটারই দরকার হবে। বড়বাজারের লোক হ্যারিসন রোড দিয়েই যাবে, লালদীঘির লোক বহুবাজার ষ্ট্রীট দিয়েই যাবে। যে যেমন অধিকারী, যে যেমন সুযোগ-সঙ্গতি পাবে, সে তেমন পথেই যাবে।

কোন্ ধর্ম্ম নিরাপদ ?

ভক্ত। কোন্ ধর্ম্ম নিরাপদ বেশী ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।— যে ধর্ম্মে সংযমের যত সম্মান, ত্যাগের যত মর্য্যাদা, পরার্থের যত সমাদর, আর স্ত্রীজাতিতে মাতৃবুদ্ধির যত পরিপোষণ, সেই ধর্ম্ম তত নিরাপদ। যে ধর্ম্মপথে সংযমের প্রতি দৃষ্টি যত কম, সে ধর্ম্ম তত বিঘ্ন-সঙ্কুল। যে ধর্ম্মে ভোগ-লিপ্সার যত প্রশ্রয়, সে ধর্ম্ম তত বিপজ্জনক। যে ধর্ম্মে স্ত্রীজাতির প্রতি যত ভোগবুদ্ধি, সে ধর্ম্ম তত নিকৃষ্ট।

মাতৃভাব বনাম ভগাবদ্‌বুদ্ধি

আলোচনা ক্রমে স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, দেখ, মাতৃভাবের কথা ত' আমরা সর্ব্বদাই বলি, কিন্তু মাতৃভাব বস্তুটা যে কি, তাও জানা আবশ্যক। স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব যেন তোতাপাখীর বুলিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি ক'রে দেখ্‌তে হবে, মাতৃভাবের স্বরূপ কি, স্বভাব কি, বিকাশ কোন্ পথে? গর্ভধারিণী মাকে মা ব'লে ত' সবাই ডাকে, চোরও ডাকে, ডাকাতও ডাকে, লম্পটও ডাকে, শঠও ডাকে। কিন্তু মা-ডাকা আর মা ব'লে অনুভব করা কি একই কথা? মা ব'লে ডাক্‌লেই কি মা ব'লে অনুভূতি এল? মা কে? জগজ্জননীই মা। নিজ মাকে জগজ্জননী ব'লে অনুভূতি কত্তে না পার্লে মা ডাকেও কিছু হয় না, মা ঠিক্ ঠিক্ মা হন্ না। মাকে জান্‌তে হবে আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী জননী, পরমানন্দময়ী জননী, ব্রহ্মময়ী জননী। মাকে জান্‌তে হবে, ভগবানেরই মূর্ত্ত বিকাশ, ভগবানেরই করুণা-ধারার বিগ্রহ, ভগবানেরই স্নেহজ্যোতির দীপ্তি। তবেই না মাকে মা ব'লে ডাকা সার্থক হবে, আর পর-নারীর প্রতি মাতৃ-বুদ্ধি স্থায়ী হবে।

মিথ্যা মাতৃভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন—নিজের মাকে লাথি মেরে যারা পরের মাকে মা ডাক্‌তে যায়, পরের স্ত্রীকে মা ভাব্‌তে চায়, পরের বোন্‌কে মাতৃদৃষ্টিতে দেখ্‌তে চায়, জান্‌বি, তারা সব ভণ্ড জুচ্চোর! জান্‌বি, তারা সব শয়তানের অনুচর! ভগবানে মাতৃবুদ্ধি না এলে যেমন নিজের মায়ের প্রতি ষোল আনা মাতৃবোধ, খাঁটি খাঁটি মাতৃবোধ আসে না, ঠিক্ তেম্‌নি নিজের মায়ের প্রতি ষোল আনা মাতৃবোধ না এলে পর-নারীতে কখনো মাতৃবোধ জাগ্‌তে পারে না।

দেশের প্রতি মাতৃবোধ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশের প্রতি মাতৃবোধও সহজে আসে না, আসে ভগবানের প্রতি মাতৃবোধের গভীরতা অনুযায়ী, গর্ভধারিণী জননীর প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধির অকপটতার অনুপাতে। "বন্দে মাতরম্‌" ব'ল্লেই দেশের প্রতি মাতৃবোধ এসে যায় না। ভগবান্‌কে যে যত গভীরভাবে মা ব'লে জেনেছে, নিজের মাকে যে যত গভীরভাবে ভগবান ব'লে বুঝেছে, মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্‌" তার প্রাণে দেশমাতৃকার প্রতি ভালবাসা তত গভীরভাবে জাগাবে। শুধু মন্ত্র জপলেই ত' হয় না, মন্ত্রের চৈতন্য-সম্পাদন হওয়া চাই।

মন্ত্রের চৈতন্য

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন্ত্রার্থ স্মরণই মন্ত্র-চৈতন্য-সম্পাদন। মাতৃবুদ্ধি দ্বারা সমগ্র দেশটাকে আবৃত ক'রে ফেল্‌তে হবে, তবে হবে "বন্দে মাতরম্‌" মন্ত্রের চৈতন্য-সম্পাদন। নিজেকে ভগবানের সঙ্গে অভেদ ব'লে অনুভব করার চেষ্টা একান্ত হ'লে তবে হবে "সোঽহং" মন্ত্রের চৈতন্য-সম্পাদন। দেহ-মনের প্রত্যেকটি তরঙ্গে, প্রাণক্রিয়ার প্রত্যেকটী স্তম্ভনে ও অভিঘাতে ভগবানের উপস্থিতি স্মরণের চেষ্টা অকপট হ'লে তবে ওঙ্কার-মন্ত্রের চৈতন্য-সম্পাদন।

মন্ত্র-চৈতন্যের উপায়

প্রশ্ন।—সম্প্রতি আমাদের দেশে (গ্রামে) একজন সাধক এসে-ছিলেন। তিনি লোকদের মন্ত্র-চৈতন্য সম্পাদন ক'রে দেবার জন্য রুদ্ধ গৃহের মধ্যে নিয়ে নবদ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে আঘাত কত্তে লাগ্‌লেন। এক এক জন ক'রে লোক ঘর থেকে বের হ'য়ে আসে আর হাসতে হাসতে বলে,—"আমার মন্ত্রচৈতন্য হ'য়ে গেল ভাই।" এভাবে

কিছুদিন করার পরে তিনি আবার লোকজনদের ডেকে এক এক জনের নামে হোম, জপ, পুরশ্চরণ আদি সব নানা প্রকারের কার্য্য কত্তে লাগ্‌লেন। তখন আবার অনেক লোক বল্‌তে লাগ্‌ল যে, তাদেরও মন্ত্রচৈতন্য হয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—মন্ত্রের চৈতন্য এলে সাধক আর মন্ত্র ছেড়ে অন্য দিকে মনই দিতে পারে না, নিজে মন্ত্রের ভিতরে একেবারে ডুবে যায়। তখন আর তার বল্‌বার রুচি থাকে না, "আমার এই হ'ল আর ঐ হ'ল"। নিম্ন অঙ্গের গুহ্যপ্রত্যঙ্গসমূহে দুই একটী মুদ্রার সাহায্যে * মনের নিম্নগামিতা দূর হ'য়ে মন্ত্রের উপরে দুর্নিবার আগ্রহ ও সামর্থ্য সৃষ্টি ক'রে দেয়, একথা সত্য। কিন্তু মন্ত্র চৈতন্যকে জান্‌তে হবে মন্ত্রার্থের নিত্যস্মরণ, সুস্থির স্মরণ, অবিচল স্মরণ ব'লে। ভক্তি ও আগ্রহ নিয়ে মন্ত্র জপ কত্তে কত্তে এই চৈতন্য আপনা-আপনি এসে যায়। তার জন্য সাত কলসী পাদ্যার্ঘ্যের গঙ্গাজল আর পাঁচ বোতল অভিষেকের কারণ-বারি প্রয়োজন হয় না।

কলিকাতা
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৪

দেশভক্তি বনাম ভগবদ্ভক্তি

একটী কলেজের ছাত্রকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ইডেন গার্ডেনে তৃণের উপরে বসিলেন। বলিলেন,—স্বদেশ-প্রেমের মূল কোথায় জানিস্? উদরের ক্ষুধায়। একলা তোর উদরটার ক্ষুধায় নয়, সমগ্র দেশের সকল লোকের উদরের ক্ষুধায়। এই চিন্তাটাই লোককে পাগল করে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে সমর্থ করে। আর, ভগবৎপ্রেমের

* সন্দীপনী, অশ্বিনী, যোনি, সঙ্কোচনী, কুলাঙ্কনী প্রভৃতি। "সংযম-সাধনা" দ্রষ্টব্য।

মূল কোথায় জানিস্? হৃদয়ের ক্ষুধায়। এই দুটো ক্ষুধাকে একসঙ্গে অনুভব করার ক্ষমতা মানুষের আছে, একই সময়ে তুই দেশভক্তও হ'তে পারিস্, ভগবদ্ভক্তও হ'তে পারিস্। যাদের অনুভূতির ক্ষমতা কম, তারাই দেশ-সাধনা ও ভগবৎ সাধনায় বিরোধ কল্পনা করে।

গার্হস্থ্য পবিত্রতা

গার্হস্থ্য পবিত্রতার কথা উঠিতেই প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—গার্হস্থ্য পবিত্রতা বল্‌তে আপনি কি সন্তান-জনন বর্জ্জন বুঝাচ্ছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' কেন বুঝাব? গৃহীর ঘরে সন্তানই যদি না জন্মায়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক কি মাটী ফুঁড়ে বেরুবেন? গার্হস্থ্য পবিত্রতা বল্‌তে আমি বুঝি সংযত জীবন এবং নিষ্কাম নিস্পৃহ-ভাবে জগৎ-কল্যাণ-বুদ্ধি নিয়ে সন্তান-জনন।

প্রশ্নকর্ত্তা।—সব গৃহী কি এরূপ হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হবে না, কিন্তু প্রতি গ্রামে দুটী একটী ক'রে আদর্শ গৃহী থাক্‌লেই তাঁদের দৃষ্টান্তের প্রভাবে সমগ্র বাতাসটা পবিত্র হ'য়ে যাবে এবং যারা পূর্ণ সংযম লাভ কত্তে পারেনি, তারা নিজেদের ত্রুটীর জন্য মনে মনে লজ্জিত হবে, আর, তারই ফলে নিজেদেরই অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সংযমের পথে অগ্রসর হবে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন

ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যকে সকল কল্যাণের ভিত্তি ব'লে মনে কত্তে হবে। যে যেদিকেই বড় হ'তে চাক্, গোড়ায় চাই ব্রহ্মচর্য্য।

প্রশ্নকর্ত্তা।—য়ুরোপ আমেরিকা ত' ব্রহ্মচর্য্য করে না!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—করে না কে বল্লে? গত বিশ বছরে ছাত্রজীবনে বীর্য্য-ধারণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শুধু ইংল্যাণ্ডেই যে কয়খানা গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হ'য়েছে, সবগুলি একখণ্ড ক'রে একত্র কর্লে একটা বিরাট লাইব্রেরী হ'য়ে যাবে। কোন্ দেশের কতটুকু খবর আমরা রাখি? ওদের দেশের শত শত মহাপ্রাণ নরনারী জাতির নৈতিক দুর্গতি দূর করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে আছেন। একজন লেখক তাঁর বইতে কি লিখেছেন জানো? তিনি বল্‌ছেন,—ইংল্যাণ্ডের ছাত্র-সমাজে দুর্নীতির যে ভয়ঙ্কর রাজত্ব চল্‌ছে, তাতে বুদ্ধিমান্ লোকদের উচিত চীন আর আফ্রিকাতে মিশনরী না পাঠিয়ে আগে নিজের ঘর সাম্‌লানো। আর একজন লিখেছেন,—ভারতের ব্রাহ্মণদের কাছে আমাদের এখনো ঢের শেখ্‌বার আছে, জাতিকে যদি উদ্ধার কত্তে হয়, তবে ভারতীয় সদাচার ইংল্যাণ্ডের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। আমেরিকাতে নীতি-প্রচারক কর্ম্মীরা দস্তুরমত ব্রহ্মচর্য্যের propaganda (আন্দোলন) চালাতে আরম্ভ ক'রেছেন এবং এই propagandaকে বলশালী করার জন্য মাঝে মাঝে এক একটা বিরাট সম্মিলনী ক'রে তাতে নানা দেশের সংযম-প্রচারক কর্ম্মীদের সমবেত চেষ্টায় নূতন নূতন কল্যাণ-পন্থা প্রবর্ত্তনে যত্ন পাচ্ছেন। য়ুরোপে কোন্ দেশের নেতারা ব'সে ব'সে তাঁদের দেশের ভবিষ্যৎ কুশলের জন্য কি কি কচ্ছেন আর না কচ্ছেন, তার কতটুকু খবর তোমরা রাখ? ভবিষ্যতে হয়ত একদিন দেখ্‌বে যে, একটা জাতি নিজেদের সমস্ত অপচয় ব্যভিচার কদাচার বন্ধ ক'রে দিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে শক্তি সংহত করার ফলে আগ্নেয়গিরির তেজ নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছে। শক্তি সংযমেরই ফল, ব্রহ্মচর্য্যেই ফল, যৌন-বিশৃঙ্খলা থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে চলারই ফল।

ব্রহ্মচর্য্য ও ঈশ্বরোপাসনা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের জন্য ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন হয়ত ওঁরা স্বীকার করেন নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন করবেন না? আমি যে সব গ্রন্থ পড়েছি, তার দুই একখানা ব্যতীত আর সকল গ্রন্থেই ভগবদুপাসনা সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে বলা হ'য়েছে। সত্যদর্শী সব দেশে ব'সেই সত্যকে দর্শন করেন। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যে দেশে ব'সেই যিনি চিন্তা করুন না কেন, তিনিই স্পষ্ট বুঝেছেন ভগবদুপাসনার কি অসীম শক্তি। তবে, পাশ্চাত্যেরা ইহজগতের সুখশান্তির দিকেই দীর্ঘকাল মাথা দিয়েছেন, যোগের সূক্ষ্মপথ ওঁরা পান নি। তাই ভারতবর্ষের ব্রহ্মচারীদের হচ্ছে better chance (উৎকৃষ্টতর সুযোগ)। ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে ভারতবর্ষ একদিন যা' কর্‌বে, জগতের অন্য কোনো দেশ কোনো কালেই তা' করে নি।

ভারতের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাতীত উজ্জ্বল

প্রশ্নকর্ত্তা।—ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে মনে সে আশা জাগে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আশা জাগে না ব'লেই ত' সে আশাকে জোর ক'রে জাগাতে হবে। জগতে লক্ষ লক্ষ বার এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেছে, যা' মানুষ আশা কত্তে পারে নি। ভারতের ক্ষেত্রেও তার পুনরাবর্ত্তন হবে। History repeats itself, (ইতিহাস নিজের পুনরাবর্ত্তন করে)। কিন্তু সে পুনরাবর্ত্তন এমন ভাবে হবে, যা' অন্য কোনও ইতিহাসের অনুকরণ নয়। কারণ, History does not repeat itself—(ইতিহাস নিজের পুনরাবর্ত্তন করে না) এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য।

আদিম জাতিসমূহের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বহুকাল পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়াছি যে, সভ্যতা নামক সরলতা-বিধ্বংসী কালকূট যাহাদের ভিতরে ক্রিয়া সুরু করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা অসভ্য-নামে পরিচিত অরণ্যজাতিসমূহ তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সেবাপাত্র। তরুণ জীবনে আবর জাতির কথা শুনিয়াছিলাম। তাহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছিল। গৃহ ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু আসাম সীমান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত না যাইয়াই কেন জানি ফিরিয়া আসি। অভিধানের সাহায্যে তখন তিব্বতী ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কেননা, মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, আবর প্রভৃতি জাতির ভাষা তিব্বতী ভাষার অনুরূপ হইবে। কিন্তু এখন লক্ষ্যে পড়িতেছে যে, আমাদের গৃহকোণে কত কত জাতি অনাদি অতীত হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত গাছের মাথায় মাচা বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ব্যাঘ্র-হস্তীকে প্রতিবেশী বলিয়া জানিতেছে, শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত রহিয়া আদিম সারল্যে অনাড়ম্বর ও অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদের ভিতরে যে দ্রুত প্রবেশের প্রয়োজন, ইহা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিও। ইহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া ইহাদের শ্রমলব্ধ অন্ন নিজেরা কাড়িয়া আনিবার জন্য নয়, নিজেদের চিত্ত দিয়া ইহাদের বিত্ত বর্দ্ধনের জন্য, নিজেদের বিত্ত দিয়া ইহাদের চিত্তের প্রসার বাড়াইবার জন্য ইহাদের ভিতরে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে।

প্রত্যাহার-যোগ ও আত্মরুচি-পরিচয়

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

"ধ্যান, ধারণা, নামজপ, ঈশ্বরের গুণবর্ণন ও গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি কোনও কার্য্যই যখন তোমার রুচির সহিত খাপ খায় না, তখন তোমার পক্ষে নিত্য অভ্যস্য হইল প্রত্যাহার-যোগ। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরল মেরুদণ্ডে স্থিরাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনকে একেবারে ভাবনাহীন করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। যেদিক হইতে যেই চিন্তাটাই মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে চাহুক না কেন, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। ভাল-মন্দের বিচার নাই, সুশ্রী-বিশ্রীর হিসাব নাই, মার্জ্জিত-অমার্জ্জিতের পার্থক্য নাই, চর্ব্বিত বা অপূর্ব্বের বিবেচনা নাই, হিতকর বা ক্ষতিকর ভাবিবার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু তাহাকে তাড়াইয়া দিবার। যে যত বেগে আসুক, যে যত সুকৌশলেই মনোমধ্যে প্রবেশ করুক, কাহারও পক্ষে কোনও ব্যতিক্রম নাই, প্রত্যেককে এখান হইতে সুদূরে সরিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ নিত্য অনুশীলনের ফলে কিছু দিন পরে দেখিবে, তোমার আত্মরুচির প্রকৃত পরিচয় তুমি খুঁজিয়া পাইতেছ। সুতরাং ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত নানা বিষয়ে বিতর্ক ও বিতণ্ডায় বৃথা কালহরণ না করিয়া নিজের রুচিকে নিজে চিনিবার জন্য অবিলম্বে প্রত্যাহার-যোগ সাধনায় ব্রতী হও। হাজার কথার চেয়ে দু'দিনের কাজে ফল বেশী পাইবে।"

নিজের স্বার্থ ও সকলের স্বার্থ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংসার এবং হীন স্বার্থ নিয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের সংসারও দেখিতে না দেখিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইবে, স্বার্থও দুর্ব্বৃত্ত-পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া মরিবে। আজ তোমরা সকলকে স্বার্থ এবং সংসার এই দুই জঞ্জালের চিন্তা হইতে মুক্ত হইবার জন্য গভীর

আরাবে আবেদন জানাও। পৃথিবীর সকলের স্বার্থের মধ্য দিয়া নিজের স্বার্থকে আদায় করিতে, জগতের সকলের সংসারের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টির ভিতর দিয়া নিজের ক্ষুদ্র সংসারের পুষ্টি আহরণ করিতে আজ তোমরা প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ কর। ব্যষ্টির তৃপ্তি এবং ব্যক্তির কুশলই আজ যেন কাহারও লক্ষ্য না হয়। সমষ্টির তৃপ্তি এবং সমগ্রের কুশলের মধ্য দিয়া যেন ব্যষ্টি আজ পরিপূর্ণরূপে তৃপ্তিমান্ এবং অফুরন্ত কুশলের অধিকারী হইতে পারে।"

গ্রন্থপাঠ কখন ক্ষতিকর?

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হাজার হাজার কেতাব পড়িয়া প্রকৃত ফল দাঁড়াইল কি? শুধু কতকগুলি মতবাদ বা theory-র চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। খাতার পাতায় কত জাহাজ চালাইলে, সমুদ্র-মন্থন করিয়া শ্রান্ত হইলে ক্লান্ত হইলে, কিন্তু না উঠিল লক্ষ্মী, না উঠিল কৌস্তুভ, না উঠিল ঐরাবত, না উঠিল অমৃত। এখন কিছু কাজ করিতে হইবে। এখন চাই অনুশীলন। পুঁথিগত বিদ্যা জনসমাজে তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া আদৃত করিয়াছে কিন্তু তোমার উপলব্ধির ভাণ্ডারে ত' একটী কাণা-কড়িও জমা দেয় নাই! এখন তোমার প্রয়োজন, নিজের বাহুকে শ্রমনিরত করিয়া নিজের অর্জ্জিত কিছু উপলব্ধির সমৃদ্ধি সঞ্চয়। তাই এখন সর্ব্বপ্রযত্নে গ্রন্থ-পাঠের আতিশয্য বর্জ্জন করিতে হইবে। সাধনে প্রমত্ত হও এবং যে গ্রন্থ পড়িলে সাধনে রুচি বাড়ে, উৎসাহ বাড়ে, আগ্রহ বাড়ে, মাত্র সেই গ্রন্থই পড়।"

গায়ত্রী-মহিমা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গায়ত্রী-মন্ত্রকে জানিবে, সর্ব্বজীব উদ্ধারের মন্ত্র। যে যত পাপ করুক,

সৎপথ হইতে যে যত দূরে সরুক, একমাত্র গায়ত্রী-মন্ত্র তিনবার উচ্চারণের দ্বারা তাহার সকল পাপ ও দুষ্কৃতি দূর হইয়া যাইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিও। কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া প্রাচীন আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়াছে,—প্রকাশ্য ভাবে তিনবার গায়ত্রী-জপ করিলেই সে শুদ্ধ হইল, পুরাতন মার্গে অধিষ্ঠিত হইল,—তোমাদের এই বিশ্বাস থাকা উচিত। কোনও ব্যক্তি বলপ্রয়োগে বা প্রলোভনে পড়িয়া নিষিদ্ধ বস্তু আহার করিয়াছে, নিষিদ্ধ স্ত্রী-পুরুষাদির সংশ্রব করিয়াছে, এমন কি কোনও নারী বলাৎকারের ফলহেতু অপজাত সন্তানের জননী পর্য্যন্ত হইতে চলিয়াছে,—তাহার শুদ্ধিমন্ত্র তোমার ব্রহ্ম-গায়ত্রী। সকল অশুদ্ধকে শুদ্ধ করিবার, সকল অহিন্দুকে হিন্দু করিবার ইহা অমোঘ পাবন-মন্ত্র। শ্রদ্ধা সহকারে গায়ত্রী উচ্চারণের পরে কাহারও ভিতরে পাতিত্য আর বিন্দুমাত্রও রহিয়াছে, এই কথা মনে রাখা তোমাদের উচিত নহে। তাহাতে গায়ত্রী-মন্ত্রের অসম্মান করা হয়। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ,—যাহাকে গান করিলে ত্রাণ হয়, তাহাই গায়ত্রী। সুতরাং ইহার পরিত্রাণ-ক্ষমতাকে অস্বীকার করার মত মূর্খতা আর কিছু নাই।”

গায়ত্রী-মন্ত্র গোপনীয় নহে

“ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্র গোপন করিয়া রাখিবার জিনিষ নহে। জগতের সকল শ্রেণীর নরনারীকে আধ্যাত্মিক উদ্ধারের পথে টানিয়া আনিবার জন্য ইহার ধ্বনি এবং তত্ত্ব সকলের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। প্রাচীন আর্য্য-ঋষি গায়ত্রী-মন্ত্রকে কুলুপ মারিয়া সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহারা দলে দলে অনার্য্যকে আর্য্যগোষ্ঠীর ভিতরে আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং ‘শূদ্রো বা চরিতব্রতঃ’ সদাচারী শূদ্রকে ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার প্রদান করিয়াছেন। মহান্ আর্য্যজাতি এইভাবেই মহত্তর হইয়াছিলেন।

বর্জ্জনের পর বর্জ্জন করিয়া আজ তোমরা দুর্ব্বলতার, স্বার্থপরতার ও সঙ্কীর্ণতার চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছ। ব্রহ্মগায়ত্রীর শক্তিতে পুনরায় তোমরা অনার্য্যকে আর্য্য কর, ব্রহ্মগায়ত্রীর মহিমায় তোমরা সমাজ-বহির্ভূত নরনারীকে সমাজের অঙ্গীভূত কর, ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রতাপে, পাবন-প্রভাবে, সমদর্শী প্রোজ্জ্বল প্রভায় তোমরা সকলকে সমতা এবং মমতা দিয়া আপন কর।"

কলিকাতা
৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪

আহার

বাদুড়বাগানের মাঠে বিদ্যাসাগর কলেজের জনৈক ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—আহারের কি কি নিয়ম পালন কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম নিয়ম, চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া। দ্বিতীয় নিয়ম, প্রতি গ্রাস অন্নের সঙ্গে একটা ক'রে কল্যাণ-সঙ্কল্প করা— নিজেরই হোক্, কি জগতেরই হোক্। তৃতীয় নিয়ম, পাঁচ-সাত গ্রাস ভাত খাওয়ার পরে পরে স্বল্প পরিমাণে এক এক চুমুক জল পান করা।

প্রশ্ন।—কি কি খাদ্য খাব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সহজে যা' হজম হয়, যে খাদ্যে চিত্ত প্রসন্ন হয়, যা' ভগবানে নিবেদিত হ'য়েছে, যা' পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত।

প্রশ্ন।—নিবেদন কত্তে প্রতিদিন মনে থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অভ্যাস কর, তা'হ'লেই মনে থাকবে। অনিবেদিত অন্নপানীয়কে অগ্রাহ্য ব'লে মনে করবে। দু'দিন, চার দিন চেষ্টা করলেই দেখবে সব ঠিক হ'য়ে গেছে।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায়

প্রশ্ন।—ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—চিত্তের প্রসন্নতাই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রধান উপায়। এই বুঝি গেলাম, এই বুঝি ম'লাম, এই বুঝি কামোত্তেজনা এল, এই বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল, এই সব ভাবনা যারা ব'সে ব'সে ভাবে, তাদের কখনও ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয় না। একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে হয়। যা' হবার হোক্, আমি তাতে ভ্রূক্ষেপও কর্ব্ব না এবং শতবার শত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যাব, পবিত্র থাকতে প্রাণপণে চেষ্টা কর্ব্ব, এইরূপ মানসিক দৃঢ়তাই ব্রহ্মচর্য্যের সহায়। বিভীষিকাগ্রস্তেরা কখনও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা কত্তে পারে না।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

প্রশ্ন।—সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীজাতির সম্পর্ক বর্জ্জন ক'রে চলা কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সম্ভব নয়। এই জন্যেই স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব কত্তে হবে। মাতৃভাব দ্বেষহীন ভাব। মাকে কেউ বাঘিনী মনে করে না, নরকের দ্বারও ভাবে না, মায়ের সম্পর্কে কারো মনে কোনো ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি বা অসন্তোষ জন্মে না। এই জন্যই মাতৃভাব ব্রহ্মচর্য্যের বন্ধু। প্রেমই ব্রহ্মচর্য্যকে স্থায়ী করে, দ্বেষ বা ঘৃণা নয়। তোমরা যে ব্রহ্মচারী হবে, জেনে রেখো তা' শুধু প্রেমেরই শক্তিতে হবে, ঘৃণা-বিদ্বেষের শক্তিতে নয়। স্ত্রীজাতিকে নিন্দা ক'রে, গাল দিয়ে, বিষাক্ত ভুজঙ্গীর মত ভয় ক'রে, বিষ্ঠা-পূঁযাদির আধার ব'লে ঘৃণা ক'রে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় না,—সপ্রেম সন্তান-ভাবের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মচর্য্য পরিপুষ্টি আহরণ করে। স্ত্রীলোককে ঘৃণা করার মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রচ্ছন্ন ভয় রয়েছে। এই ভয়ই ব্রহ্মচর্য্যকে নিয়ত টলটলায়মান করে।

অদূর ভবিষ্যতে যে যুগ আসছে, সেই যুগে প্রতি পদে পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির সাহচর্য্যে চল্‌তে হবে, ঘরে বাইরে, দেশ-বিদেশে, শান্তিতে সংগ্রামে সর্ব্বত্র স্ত্রী-পুরুষকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যের আহ্বানে মিলে মিশে চল্‌তে হবে, একযোগে কাজ কত্তে হবে। বিভীষিকার ভাব সে সময়ে উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে।

স্ত্রীজাতিতে উদাসীন ভাব

প্রশ্ন।—অনুরাগের ভাবও কি ক্ষতিকর হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হবে।—তাই মাতৃভাবের প্রয়োজন। স্ত্রীপুরুষের সহজ অনুরাগ যদি মাতৃভাব দিয়ে পুষ্ট না হয়, তা' হ'লে বিষম অনর্থ সৃজন কত্তে পারে। তবে, আরো একটী প্রকৃষ্ট উপায় রয়েছে, তা' হচ্ছে উদাসীন ভাবের আশ্রয় করা। স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক ব'লে যখন মনে আসবে না, বুঝতে হবে, তখনই উদাসীন ভাব এসেছে।

কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৪

জাতি দ্বিবিধ—স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি

অদ্য জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতি ত' মাত্র দুটো, একটী হচ্ছে স্ত্রীজাতি, অপরটা হচ্ছে পুরুষজাতি। এই দুটোর ভেদ মান্‌তেই হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর জাতিভেদ কোথায় রে? উকিল একটা জাত, মাষ্টার একটা জাত, গাড়োয়ান একটা জাত, কোচোয়ান একটা জাত, এ কিরে সব বিতিকিচ্ছি কাণ্ড? এক বাপের পাঁচ ছেলে পাঁচটা চাকুরী করে ব'লে কি পাঁচটা জাত হয়ে যাবে?

পেটেণ্ট অবতারের প্রয়োজন হয় না

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরও কতিপয় ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ আসিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী আর ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু এই দুইজনের প্রভাব আমার জীবনের উপর পড়েছে যেভাবে, এমন আর কোনো মহাপুরুষের পড়েনি। প্রথম কৈশোরে যখন সব-কিছুতে অবিশ্বাস এল, তখনো অগ্নিসম লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে মান্‌তাম। তারপরে যখন স্কুলে-কলেজে পড়ি, তখন প্রভু জগদ্বন্ধুর অমানুষ প্রভাব লোক-মুখে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে আমার উপর পড়ল। এঁদের দুজনের একজনকেও আমি চোখে দেখিনি। বিশেষতঃ জগদ্বন্ধু থাকতেন মৌনী হ'য়ে, বারো বৎসরকাল কারো সঙ্গে একটী-মাত্র কথাও বলেন নি, ছয় বৎসরকাল অতি অল্প দু-একটী কথা বল্‌তেন। যারা বলে, জগতের উদ্ধারের জন্য পেটেণ্ট অবতারেরা আবির্ভূত হন, তাঁদের কথা আমার কাছে নিতান্ত খেলো ব'লে মনে হয়। বিভিন্ন অধিকারীর ভিতরে কল্যাণের সাড়া জাগাবার জন্যে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন। কেউ কেউ স্থানের গুণে বা ভক্তের গুণে প্রচারিত হন, কেউ কেউ হন না। কিন্তু প্রচারটার বাহুল্য দিয়েই যারা মহাপুরুষদের মহত্ত্ব বিচার কত্তে চায়, তারা অবিচারই করে।

যত মানুষ, তত অবতার

জনৈক বর্ষীয়ান্ ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে একটা কথা শুনেছি যে, ঢাকাতে কোনও একজন মহান্ ধর্ম্মপ্রচারক হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কত্তে এলে পরে প্রভু জগদ্বন্ধুর একজন ভক্ত জগদ্বন্ধুর একখানা ফটো নিয়ে সেই ধর্ম্মপ্রচারকের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস কর্ল্লেন,—

বলুন ত', ইনি ভগবানের অবতার কি না? আর, ধর্ম্মপ্রচারক সেই মহান্ পুরুষ এক ধমক দিয়ে ভক্ত ছোকরাকে শুনিয়ে দিলেন যে, অবতার কখনো ঘাটে মাঠে গজায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন,—লোকের ভুলের আলোচনা ক'রে কি লাভ হবে বাবা? নিজের চরকায় তেল দিতেই দিন ফুরিয়ে যায়! যে যাকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবাসে, সে তাকে পরমেশ্বর, অবতার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিধাতা, জগদ্‌গুরু ইত্যাদি বলে ভাবতে, বলতে, প্রচার কত্তে সুখ পায়। এতে জগতের কিছু আসে যায় না। সুতরাং এর প্রতিবাদ ত নিরর্থক! আবার, একজন সত্যিকারের মহাপুরুষকে যিনি অবতার ব'লে ভাবতে কুণ্ঠিত, এমনও অসম্ভব নয় যে, তিনিই হয়ত নিজের গুরুকে ভগবানের অবতার ব'লে প্রচার কচ্ছেন এবং পুজার্চ্চনার প্রসারের জন্য যথেষ্ট উদ্যমও অবলম্বন কচ্ছেন। এমতাবস্থায় ব্যাপারটা আরো কৌতুকজনক হয়ে পড়ে। তোমরা তোমাদের গুরুকে ঈশ্বরের অবতার ব'লে প্রচার কত্তে গিয়ে শক্তিক্ষয় করো না,—তোমাদের জন্য তোমাদের গুরুদেবের এই উপদেশটুকু মনে রেখো। ব্যস, এখানেই তোমাদের কর্ত্তব্যের শেষ। অবতার যে তোমরা প্রত্যেকে, এই প্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার মত কুশল কিছুতেই নেই। সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য, অসাধুত্বের বিনাশের জন্য, ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের জন্যই তোমরা প্রতি জনে যুগে যুগে আবির্ভূত হচ্ছ। নিজেদের আবির্ভাবকে অর্থহীন ব্যাপার বলে মনে করো না। যত জীব, তত শিব; যত মানুষ, তত অবতার।

মন্ত্রকে অক্ষরজ্ঞান ও গুরুতে নরজ্ঞান

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—মন্ত্রকে অক্ষর এবং মন্ত্রদাতাকে

-নরজ্ঞান কর্‌লে নরক হয়, এই যে একটা কথা হাটে-মাঠে-ঘাটে সব জায়গায় শুন্‌তে পাওয়া যায়, এর বাস্তব তাৎপর্য্য কি কিছু আছে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছেও বলা যায়, নেইও বলা চলে। মন্ত্রকে সামান্য একটা অক্ষর মাত্র জ্ঞান কর্‌লে মন্ত্রের উপরে নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা কমে যায়। ফলে, মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধি দুরপরাহত হয়। মন্ত্রদাতাকে সামান্য মানুষ মাত্র জ্ঞান কর্‌লে তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রকে সামান্য বলে মনে হওয়া বিচিত্র কি ? এজন্যই এসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিচার ক'রে দেখ্‌তে গেলে অক্ষরও ত' সামান্য বস্তু নয় ! প্রত্যেকটা অক্ষর একটা ধ্বনির প্রতীক। অক্ষরের চেহারাটা হয়ত মানুষেই তৈরী করেছে, কিন্তু যেই ধ্বনির সে বাহক, সেই ধ্বনিটা মানব-সৃষ্ট নয়। সেই ধ্বনি অনাদির আদি এবং আদির অনাদি। সুতরাং মন্ত্রকে অক্ষর জেনেও মন্ত্রের সাধন কর্‌লে ফল হবে না কেন ? গুরুকে মানুষ-জ্ঞান ত' মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ না ভাব্‌লে কোন্ সাহসে শিষ্য তার কাছ ঘেঁষবে ? অন্য মানুষকে পশু থেকে যা' দিয়ে পৃথক্ বলে জানা যায়, তোমার গুরুতে সেই সব জিনিষগুলো ত' রয়েছে ! তাঁকে মানুষ বলে মনে করাই ত' স্বাভাবিক। সাধন পথে চলতে হলে স্বাভাবিক বোধ-শক্তি আর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে পোঁট্‌লা বেঁধে আমগাছের ডগায় ঝুলিয়ে রাখ্‌তে হবে, এমন কোনো নিয়ম থাকতে পারে না, তার প্রয়োজনও কিছু নেই। গুরুকে মানুষ বলে ভাব্‌লে ক্ষতি হয় কখন ? যখন এই মানুষটার ভিতর অন্য পাঁচটা দুর্ব্বলচেতা কলঙ্কিত নীচাশয় মানুষের অবগুণগুলি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে গুরুদেবেরই সাবধান থাকা দরকার যেন শিষ্যের বিশ্বাস নষ্ট না হয়, ভাবভঙ্গ না ঘটে। সাধক মাত্রেরই পরদোষে উদাসীন-বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। নইলে সাধনের ক্ষেত্রে আগাছাগুলোই বেশী জোরদার হয়ে জন্মায়। যে গুরু, যে শাস্ত্র,

যে তন্ত্র যে-কথাই বলে থাকুন না কেন, তোমরা যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তাঁর কথার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে চেষ্টা করো। নইলে বহু গুরুর, বহু শাস্ত্রের, বহু তন্ত্রের পরস্পর-বিরোধী বাক্য তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দেবে। বৈষ্ণব গুরুরা বল্‌ছেন গুরুতে নর-জ্ঞান কর্‌লে নরক হয়। কুলার্ণব তন্ত্র বল্‌ছেন, "মুক্তির্ন জায়তে দেবি মানুষে গুরুভাবনাৎ", অর্থাৎ মানুষকে গুরু ভাব্‌লে মুক্তি কিছুতেই হবে না। দুটো কথাই ত' পরস্পর-বিরোধী! এমন বলার প্রয়োজন নেই যে দুটো কথার একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অন্যটাই একমাত্র সত্য। সাধকের অগ্রগমনের দুটী পৃথক্ গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে এরূপ দুটী বিরুদ্ধ উক্তি প্রচলিত হয়েছে। এ দুটী উক্তির মাঝখানে একটা সামঞ্জস্যের সুযোগও রয়েছে। স্বল্পগ্রাহী ব্যক্তিরা সেই সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। তুমি সম্যগ্‌গ্রাহী হও। তখন দেখ্‌বে দুটো কথাই সত্য।

হরি কে?

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—হরির কি কোন মূর্ত্তি আছে? হরির মাতাপিতার নাম কি কোন শাস্ত্রে আছে? কশ্যপের পুত্র বিষ্ণু, বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, শুদ্ধোধনের পুত্র বুদ্ধ, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র গৌরাঙ্গ। কিন্তু হরি কাহার পুত্র? আর কৃষ্ণ-বিষ্ণু প্রভৃতিকে হরিই বা কেন বলা হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরি শব্দের মানে, যিনি সব কিছু আহরণ ক'রে নিজের ভিতরে রাখেন। যাঁর ভিতরেই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু, যাঁর বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই, কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, মহেশ্বর সব কিছু যাঁর ভিতরে রয়েছে, তিনিই হরি। তিনিই সকলের পিতা, তাঁর কেউ পিতা নেই। তিনিই সকলের ধাতা, তাঁর কেউ ধাতা নেই। এই জন্যই হরিকে নিয়ে

পুরাণকারেরাও কোন জন্ম-কাহিনী বা কোনও লীলা-কাহিনী ফাঁদেন নি। তিনি কেবল যে সকলকে আহরণ করে নিজের ভিতর ধরে রেখেছেন, তাই নয়, সকলের ভিতরেও তিনিই অণুর অণু হয়ে বিরাজ কচ্ছেন। সকলকে আহরণ ক'রে রেখেছেন বলে তিনি যেমন হরি, সবার ভিতরে তিনিই আছেন বলে সবাই তেমন হরি। এইজন্য কৃষ্ণও হরি, বিষ্ণুও হরি, তুমিও হরি, আমিও হরি। হরি স্থূলেরও স্থূল, সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম। তিনি জড়েরও চৈতন্য, চৈতন্যেরও প্রাণ। তাই সর্ব্ববস্তুকেই হরি বলে চিন্তা তুমি কর্‌তে পার। তাতে কোন ভুল হয় না। দেব-মানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-সরীসৃপ, স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুকেই হরি বলে তুমি পূজা কর্‌তে পার। সকলেরই পিতা হরি। অতএব সকলেই হরি। ব্রহ্মাণ্ডও হরি, ব্রহ্মাও হরি, বিষ্ণুও হরি, মহেশ্বরও হরি।

হরি কোথায় নাই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই দৃষ্টিতে যদি বিচার কর আর সেই বিচারে যদি অন্তরের সরলতা থাকে, তা'হলে তোমার উপলব্ধি কর্‌তে কোনো কষ্ট হবে না যে, কৃষ্ণ, যীশু, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ এবং অপরাপর মহাত্মগণ সকলেই কেন হরি বলে পূজা পেয়েছেন। হরিকে যে এক জায়গায় দেখেছে, তার পক্ষে তাঁকে সব জায়গায় দেখা সম্ভব। হরিকে যে এক জায়গায় পেয়েছে, তার পক্ষে তাঁকে সব জায়গায় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি যেখানে হরিকে দেখেছি, তোমাকেও সেখানেই হরিকে দেখ্‌তে হবে, এই যে জিদ্, তা' শুধু ভক্তিরই লক্ষণ নয়, অন্ধত্বেরও লক্ষণ। আমি যেখানে হরিকে দেখিনি, হরি সেখানে নেই, ও ত' অসম্যগ্‌দর্শীর কথা। হরির লিঙ্গ নেই, জাতি নেই, বংশ নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু সর্ব্বলিঙ্গে, সর্ব্বজাতিতে, সর্ব্ববংশে, জনন-মরণাদি জীবের সর্ব্ব অবস্থায় একমাত্র তিনিই বিরাজমান।

গায়ত্রী জপে কি সিদ্ধিলাভ সম্ভব?

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। সিদ্ধিলাভ মানে ঈশ্বর-দর্শন, পূর্ণ সত্যের দর্শন। ব্রহ্মগায়ত্রী বারংবার জপ্‌তে জপ্‌তে গায়ত্রীর অপর মন্ত্রাংশগুলি আস্তে আস্তে আপনি চলে যায়। থাকে মাত্র প্রণব। সুতরাং যারা অন্তরে সাহস এবং বিশ্বাস পেয়েছে, তারা গায়ত্রীকে অন্তরের ভাবোদ্বোধক ভূমিকারূপে রেখে প্রণব-মহামন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দেবে। বৈদিক গায়ত্রী বহু অক্ষরে গঠিত, অতি দীর্ঘ, তাই একাগ্র মনঃসন্নিবেশন কালে প্রণব ব্যতীত অপর অক্ষরগুলি সাধন-পর্ব্বতারোহী সাধকের পৃষ্ঠদেশে গুরুভার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় বোঝা কমিয়ে একমাত্র প্রণবেই মনঃসন্নিবেশ করা উচিত।

গায়ত্রী-দীক্ষা ও তান্ত্রিক দীক্ষা

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী শ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মগায়ত্রী-দীক্ষার পর আবার তান্ত্রিক দীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। তবু যে তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন হয়েছে, তার বিশেষ কারণ আছে। বৈদিক ঋষিরা ভারতবর্ষে আসার বহু পূর্ব্বেই তান্ত্রিক ঋষিরা সাধন-জগতের দিব্য আস্বাদন সমূহ পেয়েছিলেন। তাঁরা হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ঐং প্রভৃতি মন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে প্রণব-সাধনে পৌছেছিলেন। ব্রহ্মগায়ত্রী সাধনার মধ্য দিয়ে বৈদিক ঋষি যা' পেলেন, তান্ত্রিক মন্ত্রের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক ঋষিরাও যে তাই পেলেন, এই সত্য বৈদিক ঋষিদের উপলব্ধিগত হয়েছিল। তাই তাঁরা তান্ত্রিক সাধকের বীজমন্ত্রগুলির প্রতি বিদ্বিষ্ট হন নি। সকল মতকে স্বীকার করার যে অসামান্য যোগ্যতা ও সামর্থ্য তাঁদের ছিল, তারই ফলে প্রায় বিনা কলহে বা অতি অল্প কলহে বেদ ও তন্ত্র এই দুটী মার্গের

মধ্যে চমৎকার এক আপোষ-রফা হয়ে গেল। তন্ত্রের সাধনা এদেশের অতি প্রাচীন সাধন, এমন কি প্রাগ্-বৈদিক সাধন। তাই তন্ত্রকে উচ্ছেদ করার বুদ্ধিও কারো হ'ল না। এই ভাবেই বৈদিক দীক্ষার পরেও আবার একটা তান্ত্রিক দীক্ষা অনেক স্থানে চল্‌তেও লাগ্‌ল। যেমন বাহুতে অনন্ত পরার পরে আবার জোর ক'রে একটা আর্ম্মলেট বেঁধে দেওয়া। আবার আরও, পরবর্ত্তী কালে স্ত্রীশূদ্রদের বেদাধিকার সঙ্কীর্ণতর কত্তে কত্তে তাদের যখন একেবারে কোণঠেঁসা ক'রে দেওয়া হ'ল, তখন ত' এদের পক্ষে একমাত্র আর্ম্মলেট বা তান্ত্রিক দীক্ষাই সার হয়ে গেল। ক্ষীর-চিনি দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়ার পরে আর কারো দই-চিড়া দিয়ে উদরপূর্ত্তি প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দ্বিজদের মধ্যে বৃথা একটা লোকপ্রথা দাঁড়িয়ে গেল কুমার অবস্থায় একবার ব্রহ্মগায়ত্রীতে বৈদিক দীক্ষা নেবার পরে সংসারী অবস্থায় আবার তান্ত্রিক আর একটা দীক্ষা নেওয়ার। কিন্তু একবার নেয়ে দুবার কাপড়-ছাড়ার মতই এই ব্যবস্থা নিতান্ত নিরর্থক।

কলিকাতা
৮ই আশ্বিন, ১৩৩৪

ভারতীয় নারীর আদর্শ গার্গী ও মৈত্রেয়ী

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বিন্ধ্যাকূট-নিবাসিনী জনৈকা মহিলার নিকটে যে পত্র লিখিলেন, তাহার আংশিক অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"স্নেহের মা, বিবাহ শুধু সংসারী করিবার জন্য নয়। বিবাহ সাধন-ভজন করিবার জন্য। বিবাহিত জীবন শুধু ছেলেখেলা নয়, শুধুই কোনও ক্রমে দিন কাটাইয়া যাওয়া নয়।

"যাহারা ধর্ম্মসাধনা করিতে চাহে, এমন নারীরও বিবাহ হয়। যাহারা বিবাহিতা হয়, এমন নারীও ধর্ম্মসাধনা করে। তুমিও বিশ্বাস করিও যে, ধর্ম্মসাধনা করিবার জন্যই তুমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, শুধু লোকাচারের শাসনে নয়। মনকে তুমি বারংবার জিজ্ঞাসা কর, তুমি ভোগ-সুখের লোভে বিবাহ করিয়াছিলে, না, ধর্ম্মসাধনের জন্য বিবাহ করিয়াছিলে?

"প্রাচীন যুগের গার্গী আর মৈত্রেয়ী ভারতীয় নারী-সমাজের চির-যুগের আদর্শ। তাঁহাদের পবিত্র চরিত-কথা স্মরণ করিও।

"গার্গী এক ঋষির কন্যা। নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া গার্গী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে গার্গীর মত সুপণ্ডিতা আর কেহ ছিলেন না। গার্গী শুধু স্ত্রীলোকের মধ্যে বিদুষী ছিলেন, তাহা নহে; পুরুষ জ্ঞানীদের মধ্যেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না।

"একদিন জনকরাজার সভায় ব্রহ্মবিচার হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য নামক এক যুবক ঋষি সমাগত সহস্র সহস্র প্রবীণ ও মহাজ্ঞানী ঋষিদিগকেও পরাস্ত করিয়া দিতেছেন। যাবতীয় ঋষিগণ একজন যুবকের নিকটে এইভাবে পরাজিত হইয়া রোষে, ক্ষোভে ও আক্রোশে জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। এই সময়ে তেজস্বিনী গার্গী ব্রহ্মবিচারার্থে দণ্ডায়মানা হইলেন।

"যাজ্ঞবল্ক্য প্রকৃতই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্য গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও ধীরভাবে প্রত্যেকটী সমস্যার সমাধান করিয়া যাইতে লাগিলেন। সমাগত জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিরা এবং যোগিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনক এই দুই জনের আশ্চর্য্য জ্ঞান ও

বাগ্‌বিভূতি দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন। পুরুষের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞানের সুবিমল বিকাশ পৃথিবী বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু নারীও যে নিকৃষ্টা নহেন, তাহাও প্রমাণিত হইল।

"বিবাহিতা হইয়াও নিজেকে অবিবাহিতা কুমারীর ন্যায় জ্ঞান করা যাইতে পারে। সংসারে বাস করিয়াও পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত তোমরা যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর জীবনে দেখিতেছ। মৈত্রেয়ীর জীবন লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তিনি ভোগ-সুখের লোভেই বিবাহ করিয়াছিলেন, না, লোকাচারের দায়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, না, ধর্ম্মসাধনার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

"মৈত্রেয়ী ছিলেন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী। তখনকার দিনে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পার হইলেই গৃহীরা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যা করিতেন। ইহাকে বলিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করা। মহর্ষি যখন বানপ্রস্থে রওনা হইবেন, তখন নিজের যাবতীয় ভূসম্পত্তি, অর্থ ও গোধন মৈত্রেয়ীকে দান করিতে চাহিলেন। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রভো, এসব দিয়া কি অমরত্ব লাভ করা যাইবে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'না, মৈত্রেয়ী, এইসব দিয়া কেহ অমরত্ব পায় না, শুধু ইহজগতেরই সুখ হয়।' তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যাহা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? আমি এ সকল তুচ্ছ জিনিষ চাহি না।'

"তোমরা কি এইরূপ হইতে পার না মা? অমর হইবার আকাঙ্ক্ষা তোমরাও কি অন্তরে পোষণ করিতে পার না? পরমসুখের জন্য ক্ষুদ্র সুখকে তোমরাও কি উপেক্ষা করিতে পার না? তোমরাই বা কেন

বিষয়-সুখকে বড় করিয়া দেখিবে ? মৈত্রেয়ী ত' প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত পূরা দমে সংসার করিয়াও অমরত্বের স্পৃহা হারান নাই,—তোমরাই বা কেন অমরত্বের কথা ভুলিয়া থাকিবে ?"

স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য

পত্র লেখার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক বিবাহিত ভক্তের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন, পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এতকাল কত কথাই বলেছি, কত ভাবনাই ভেবেছি, কিন্তু এখন থেকে স্ত্রীলোকদের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধেও বল্‌তে হবে, ভাব্‌তে হবে। এবার ম'রে আবার এসে যাদের গর্ভে জন্মাব, তাদের ভিতরে ত্যাগ, সংযম ও পবিত্রতার ভাব খুব প্রগাঢ়-রূপে না প্রতিষ্ঠিত হ'লে, আমাদের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। যেমন বীর্য্যবান্ পিতা চাই, তেমন বীর্য্যবতী মাতাও চাই। যেমন প্রবুদ্ধ-বুদ্ধি জনক চাই, তেমন প্রবুদ্ধশক্তি জননীও চাই। যেমন দীপ্ততেজা বাপ চাই, তেমন দীপ্তশৌর্য্যা মাও চাই। এর জন্যেই পুরুষ-জাতির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার সাথে সাথে যুগপৎ স্ত্রীজাতির মধ্যেও ব্রহ্মচর্য্যের প্রসার ঘটাতে যত্ন নিতে হবে।

পাতিব্রত্য ও ব্রহ্মচর্য্য

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এতকাল স্ত্রীজাতির মধ্যে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে, তাহা দ্বারাই কি স্ত্রী-জাতির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তবে প্রতিষ্ঠার ভিত্তিটুকু দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয়েছে। পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নারীর জীবন থেকে বহুপরায়ণতা রোধ ক'রেছে কিন্তু দাম্পত্য-জীবনকে যথেচ্ছাচার-মুক্ত কত্তে পারেনি। এই যথেচ্ছাচারকে বিদূরিত কত্তে হ'লে পুরুষদের যেমন প্রথম জীবন

থেকেই সংযমের সাধনায় নাম্‌তে হবে, স্ত্রীলোকদেরও তেমনি হবে। শিক্ষা ও সংস্কারের গুণে কোনও স্ত্রীলোক একমাত্র-পতি-নির্ভরা হ'তে পারেন, কিন্তু সাধনের বল ব্যতীত তিনি নিজের সংসর্গকে স্বামীর সংযমবর্দ্ধনে প্রয়োগ কত্তে পারেন না বা নিজের সংযমের ভাব দিয়ে স্বামীর অসংযমকে জয় কত্তে পারেন না। এইজন্যই বাল্যকাল থেকেই তাঁকে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযমের শিক্ষাও দিতে হবে। আজ এ-শিক্ষা দিবার মত উপযুক্ত আয়োজন নেই কিন্তু প্রয়োজন যখন সত্যই হয়েছে, তখন আয়োজন হতেই হবে।

দাম্পত্য সংযম ও রোগোৎপত্তি

ভক্ত বলিলেন,—কেউ কেউ ব'লে থাকেন, বিবাহিত-জীবনে সংযত থাক্‌লে রোগোৎপত্তি হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বৈজ্ঞানিকদের এবিষয়ে দুই মত আছে কিন্তু যোগীরা এ-বিষয়ে একমত। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, - "বিয়ে ক'রে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে থাকাতে রোগ হয়", আর একদল বলেন,—"ওসব মিছে কথা, রোগ হয় না, বরং স্বাস্থ্য দৃঢ়তর হয়।" কিন্তু যোগীরা বলেন, একবাক্যে বলেন, সমস্বরে বলেন,—"নূতন রোগ ত' সৃষ্ট হয়ই না, বরঞ্চ পুরাতন রোগ সেরে যায়।" যোগীদের সাহস বড় ভয়ঙ্কর,—তাঁরা বলেন,—বিবাহিতের সংযম রোগের উৎপাদক ত' নয়ই, বরঞ্চ প্রতীকারক, প্রতি-ষেধক, প্রতিরোধক। শুধু দেহের রোগ নয়, ভবরোগের আরোগ্যে পর্য্যন্ত এতে সহায়তা হয়।" বল্‌তে পার, যোগীর এ সাহসের কারণ কি? বল্‌তে পার, বৈজ্ঞানিকরা যখন দুই দলে বিভক্ত হলেন, তখনো যোগীরা কেন একমত থাকেন? তার কারণ হচ্ছে, ইন্দ্রিয়সংযম বল্‌তেই যোগীরা সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-সাধন বোঝেন। যোগী জানেন, সঙ্কল্পের বলে দেহের

সংযম হ'তে পারে কিন্তু ভগবৎ-সাধন ছাড়া মনের সংযম হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা দৈহিক সংযমকেই সংযম ব'লে মনে করেন, তাই একদল দেখেন, সংযমের পরেও রোগ হচ্ছে, আর একদল দেখেন, সংযমের পর স্বাস্থ্য উৎকৃষ্টতর হচ্ছে। কিন্তু যোগী বলেন,—"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্, ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে"—বাইরে ইন্দ্রিয়বিমুখ হ'য়ে মনে মনে যে ইন্দ্রিয়ের সেবা করে, সে মিথ্যাচারী, কপটী। বাইরের সংযমকে যোগীরা সংযম ব'লেই মানেন না, যদি সঙ্গে সঙ্গে না থাকে ভিতরের সংযম। তাই তাঁরা সংযমপন্থী গৃহীমাত্রেরই সংযমবুদ্ধির সাথে ভগবৎ-সাধনাকে অপরিহার্য্যরূপে যুক্ত ক'রে দেন। কারণ, মনকে কদাচারে আসক্ত রেখে যে দৈহিক সংযম, তাতে দেহ রুগ্ন হয়, আর মনকে কদাচারের উর্দ্ধে রেখে যে দৈহিক সংযম, তাতে দেহ নীরোগ হয়, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল বর্দ্ধিত হয়। অথচ, ভগবৎসাধনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়বিধ ফলই হচ্ছে মনকে ইন্দ্রিয়লিপ্সার উর্দ্ধে তোল্‌বার ক্ষমতা।

বালিকার ব্রহ্মচর্য্য

তৎপর পুনরায় শ্রীশ্রীবাবামণি স্ত্রীলোকদের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজ একেবারে গোড়া থেকে ধর্‌তে হবে। বিবাহিতা যুবতীকে গিয়ে ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা শুনাতে চেষ্টা না ক'রে, বালিকা বয়সে কুমারী অবস্থায় তাকে তৈরী কত্তে হবে। যে কৃত্রিম ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভন অনেক বালিকাকে বিবাহের পূর্ব্বেই পবিত্রতা থেকে ভ্রষ্ট করে, সেই সুখের অনুরূপ কিন্তু শতগুণ আনন্দপ্রদ সুখ যে এই দেহের মধ্যেই সাধনের কৌশলে পাওয়া যায়, তার সন্ধান, তার আস্বাদ, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাকে আগে দিয়ে নিতে হবে,—

তাকে যোগাভ্যাস করাতে হবে। এইটুকু হবে স্ত্রীজাতির ব্রহ্মচর্য্যের মূল। সৎসাহসের অভাবে অনেক বালিকা ভদ্রবেশধারী প্রচ্ছন্ন লম্পটের নানা পাশবিক ব্যবহার, নানা নৈতিক অপমান মাথা হেঁট ক'রে সয়ে যায়। যাতে এইটি সে আর না সয়, আত্মরক্ষার চেষ্টার চাইতে লজ্জার মূল্য সে বেশী না দেয়, প্রলোভন দেখিয়ে বা চাতুরীতে ভুলিয়ে যারা বালিকাকে কুপথে নিতে চায়, তাদের নাকে মুখে লাথি মারতে না ভয় পায়, বিপদের সময়ে যাতে সে নিজেকে নিতান্ত দুর্ব্বলা মনে ক'রে চুপ মেরে না থাকে,—এমন শিক্ষা তাকে দিতে হবে। তাকে লাঠি-চালানো শিখাতে হবে, মুষ্টিযুদ্ধ শেখাতে হবে। এইটুকু হবে স্ত্রীজাতির ব্রহ্মচর্য্যের কাণ্ড। আর একটী কাজ এই কত্তে হবে, যেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার প্রাণ মন জুড়ে বাড়্তে পারে। হোক্ সে নগণ্যা বালিকা, কিন্তু একদিন যে তাকে মরণসঙ্কুল ভয়াবহ পথে রণচণ্ডিকার মত অসুরমর্দ্দিনীরূপে বিচরণ কত্তে হতে পারে, একদিন যে তাকে দুই হাতে দুই মহাস্ত্র – ইন্দ্রের বজ্র আর কৃষ্ণের চক্র—ধারণ কত্তে হ'তে পারে, এই রকমের সুদৃঢ় সংস্কার তার মনের মধ্যে খোদাই ক'রে দিতে হবে। তাকে শুনাতে হবে,—"কালী তুই, দুর্গা তুই, লক্ষ্মী তুই, সরস্বতী তুই, সৃষ্টি তুই, ধ্বংস তুই, জ্ঞান তুই, ঋদ্ধি তুই, প্রেম তুই, সৌন্দর্য্য তুই, সর্ব্বজীবের প্রাণ তুই, সর্ব্বজীবের মা তুই।"

কিশোরীর ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—তারপরে ধর্তে হবে বালিকার কৈশোরকে। কৈশোর নবানুরাগের উন্মেষকাল, এ সময় তাকে চিন্তার অস্বচ্ছতা থেকে, অনাবিলতা থেকে, পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা কত্তে হবে। পুরুষ ও নারীর গ্রাম্য-সম্পর্ককে সে জানুক, কিন্তু যার-তার মুখ থেকে নয়, সে জানুক বিজ্ঞানের দিক থেকে, আর তারই জন্য সমর্পিতপ্রাণা ত্যাগ-

সিদ্ধা আচার্য্যার মুখ থেকে। শুধু বিজ্ঞানের দিক্ থেকেই নয়, শ্রীভগবানের সৃষ্টিপ্রকরণের অপূর্ব্ব মহিমার দিক্ থেকেও। জগন্ময় ভগবদ্বুদ্ধির মধ্য দিয়ে নবীনা কিশোরীর প্রত্যেকটী চিন্তা ও চেষ্টা পরিণত হয়ে বিকাশ পেতে থাকুক। ভয় কর্ব্বার দরকার নেই, কিশোরীর নির্ভয় মন যৌনতত্ত্বে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করুক, কিন্তু কারো অস্পষ্ট কাণা-ঘুষায় সে কাণ দেবে না, সে স্পষ্টভাবে সব তথ্য আহরণ করুক হয় তার সুশিক্ষিতা মায়ের কাছ থেকে, নয় তার সর্ব্বত্যাগিনী আচার্য্যার কাছ থেকে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ প্রত্যেকের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, তাঁর অনন্ত শক্তিকে সীমায় আবদ্ধ ক'রে, অসীম বিভূতিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে বিরাজ কচ্ছেন, প্রকৃত সাধনের বলে সে তা' প্রত্যক্ষ করুক। একটা অনুমানের ব্যাপারে বা একটা কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হ'তে না দিয়ে, প্রথম বিকশিত যৌবনের সমগ্র শক্তি দিয়ে সে নির্ভুলরূপে অনুভব করুক, পবিত্রতার পূর্ণজ্যোতি পরমাত্মাই স্পন্দিত হন প্রত্যেকের বক্ষের স্পন্দনে, পরমাত্মাই ধ্বনিত হন প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধাধোগামী নিঃস্বননে। বুঝ্‌তে সে সমর্থা হোক্, জীবসৃষ্টির জন্য যে অনির্ব্বচনীয় প্রেরণার বীজ ভগবান জীব-মাত্রেরই মধ্যে জন্মের সাথেই নিহিত ক'রে রেখেছেন, সেই প্রেরণা ইন্দ্রিয়ের অন্ধ-পরিতর্পণের মধ্য দিয়ে নিজ সার্থকতাকে কখনো পায় না পরন্তু যদি সার্থকতা পায়, তবে তা' সে পায় শুধু ব্রহ্মবিজ্ঞানসহকৃত পরিতর্পণের মধ্য দিয়ে। দৃষ্টি তার এত সূক্ষ্ম হোক্ যেন, প্রচ্ছন্ন কাম সাধুতার ভণিতা ক'রে, তার বিচার-নৈপুণ্যকে. তার ছদ্মবেশ চিন্‌বার পটুত্বকে কখনো প্রতারিত কত্তে না পারে। অন্তরে তার এত বড় তীব্র ব্রহ্মভাব জাগ্রত হোক্ যেন, আত্মসমর্পণের যে প্রবণতা নারীজাতির মধ্যে স্বতঃপ্রকাশ, তা' যেন তাকে চঞ্চলা, বিকলা, অধীরা বা ব্যাকুলা না কত্তে

পারে, তা' যেন তার পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাকে টলাতে না পারে, তার কুমারী জীবনের অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের দিব্যগন্ধি সৌরভকে তা' যেন না মহিমাভ্রষ্ট কত্তে পারে।

যুবতীর ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—তারপরে এস তার যৌবনের দ্বারে। লোকশিক্ষক, আচার্য্য বা গুরু এ দুয়ার খুল্‌বেন না, করাঘাতও কর্ব্বেন না, উঁকি মেরেও দেখ্‌বেন না। এখানে দেবেন তিনি শুধু আশীর্ব্বাণী, দ্বারের ললাটে ভগবানের নামের একটী জয়টীকা মাত্র তিনি যাবেন পরিয়ে। কিন্তু ভিতর থেকে যুবতীর সমধর্ম্মী স্বামী তাকে দেবে সমসাধনার উৎসাহ, সমযজ্ঞের অনুরাগ। যুবতী ব্রহ্মচারিণীর সমগ্র দৃষ্টি, সমগ্র লক্ষ্য, সমগ্র একাগ্রতা পুঞ্জীভূত হোক্ গিয়ে সেই অনাগত বীর্য্যবান্ সন্তানের মাঝে, যাকে প্রসব কর্ব্বার আগে গর্ভকে জগৎকল্যাণ-সঙ্কল্প দিয়ে বিশোধিত কত্তে হয় দীর্ঘকালের সহিষ্ণুতা-সহকারে। এই সধবা ব্রহ্মচারিণীর সমগ্র মন-প্রাণ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হোক্ সেই স্বভাব-সংযমী আনন্দমূর্ত্তি সন্তানের মাঝে, গর্ভাধান বা গর্ভধারণের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসুখলিপ্সা থাক্‌লে যার আবির্ভাব অসম্ভব হয়। তার চিত্তের সমস্ত ব্যাকুলতা উথ্‌লে উঠুক শুধু তারি জন্য, দাম্পত্য-ব্যবহারের মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্রহ্মভাবের বিচ্যুতি ঘট্‌লে যে সন্তান গর্ভবিন্দুতে প্রবেশ কত্তে কুণ্ঠিত হয়।

সর্ব্বতোমুখ ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আন্দোলন ক'রে বেড়াচ্ছি ব্রহ্মচর্য্যের, লোকে ভাব্‌ছে পাগ্‌লামি কচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কচ্ছি কিসের আন্দোলন বল্ দেখি? জাতির এবং জগতের সর্ব্বতোমুখ অভ্যুদয়ই কি এ আন্দোলনের ফল নয়? যা বল্‌ছি, তা কি শুধু চিরকুমার সন্ন্যাসীর

ব্রহ্মচর্য্যের কথা, না শুধু পুরুষদেরই ব্রহ্মচর্য্যের কথা? সর্ব্বতোমুখিনী উন্নতির জন্যে কি আজ সর্ব্বতোমুখ ব্রহ্মচর্য্যেরই কথা বল্‌ছি না? "ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূলমন্ত্র"—ব'লে যে বৎসরের পর বৎসর চেঁচিয়েই যাচ্ছি, সে কি শুধু একদল গেরুয়াধারী পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষোপজীবী সৃষ্টি করারই জন্যে?

ভবিষ্যতের ভারত ও নবীন যুবক

অতঃপর রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ছাত্রাবাস হইতে একটী যুবক আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে লইয়া হেঁতুয়াতে গিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—লোকে আমায় অনেক সময় পাগল বলে। প্রকৃতই আমি একটা উন্মাদ-রোগী। আমি ভবিষ্যৎকে ভয়ানক বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ কি সহজ জিনিষটী হবে? ভবিষ্যতের ভারত এত বড় হবে, যার তুলনা জগতের কোন দেশে কোন কালে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতীত ভারত আর কতখানি বড় ছিল? রোম, গ্রীস কত উঁচুতে উঠেছিল? অনাগত ভারত সবাইকে হার মানিয়ে ছাড়্‌বে, সবাইকে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়ে তবে রেহাই দেবে। এখন ভারতবর্ষ জলের দেশ, তখন হবে বজ্র, বিদ্যুৎ ও আগুনের দেশ। জ্ঞানের আগুন তখন অজ্ঞানকে দগ্ধ কর্ব্বে, প্রেমের আগুন তখন বিদ্বেষকে ধ্বংস কর্ব্বে, বিদ্যার আগুন অবিদ্যাকে, বুদ্ধির আগুন নির্ব্বুদ্ধিতাকে, কর্ম্মের আগুন আলস্যকে, সত্যের আগুন মিথ্যাকে আর যোগের আগুন বিয়োগকে পুড়িয়ে ছাই কর্ব্বে। ভবিষ্যতের ভারত কত বড় হবে জান? আমরা কল্পনা দিয়ে তার নাগাল পাই না। তোমাদের মত যুবকদের দেখ্‌লে আমার কি মনে হয় জান? একটা হিমালয়ের চাইতেও অনেক

বড় মনে হয়। তোমাদের তুলনায় একশ'টা আল্পস্-আন্দিজ্ তুচ্ছ মনে হয়,—যেন একটা ধূলির রেণু, বাতাসের ভর সয় না, আর পায়ের তলায় পড়ে থাকে। তুমি হাস্ছো ? কিন্তু তুমি যে মানুষ, তোমার দুই পাশে যৌবন যে তার ডানা ছড়িয়েছে, তুমি যে ভবিষ্যতের স্রষ্টা, তোমরাই যে ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতা। আমার মাথার ভিতরে পোকা ঢুকেছে,—সে আর বের হ'তে চায় না। সেই পোকা হচ্ছে—ভবিষ্যতের গৌরব-স্বপ্নের। ভবিষ্যৎই আমার সর্ব্বস্ব, তাই তোমরাই আমার ঈশ্বর।

অতীত ভুলিব কি না ?

যুবক।—ভবিষ্যৎকেই যদি এত বড় ক'রে দেখ্ছেন, তবে বলেছে কেন—"Trust no Future"—ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিও না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—Longfellowর 'Psalm of Life' ত' ? যারা অলস কল্পনা ক'রে দিন কাটায়, দিনের বেলায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখে, Longfellow'র কথা তাদেরই উদ্দেশ্যে লিখিত। বর্ত্তমানের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তের যাঁরা সদ্ব্যবহার কচ্ছেন, তুমি কি বল তাঁরাও ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস কর্ব্বেন না ? বর্ত্তমানে যাঁর আলস্য নেই, ভবিষ্যতের সুবিশাল স্বপ্ন দেখ্বার তিনিই ত' অধিকারী ! অতীতের কথাও বলি। 'Let the dead Past bury its dead'—এই কথাটাকেও নিজের জীবনের কর্ম্মের আলোকে বুঝ্তে হবে। কর্ম্মই যার সাধনা, সে dead past (মৃত অতীত)-কেই সমাধি দেয়, living past (জীবন্ত অতীত)-কে ভুলে যায় না। যে অতীত তার অমরত্ব নিয়ে বিরাজ কচ্ছে, তাকে ভুলে যাওয়া কি সৌভাগ্য ? ভুলে যাও ত' দেখি, তুমি মহর্ষি কশ্যপের সন্তান ! ভুলে যাও ত' দেখি, ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠের অতুলনীয় সাধনার তুমি উত্তরাধিকারী ! ভুলে যাও ত' দেখি, দধীচির আত্মোৎসর্গ, অর্জ্জুনের

উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যান, শুকদেবের অটুট ব্রহ্মচর্য্য তোমারই পূর্ব্বপুরুষদের পবিত্র জীবনের প্রমাণ! দেখ্‌বে, তুমি ইট-কাঠ-পাথরের মত প্রাণহীন, নির্জ্জীব। এই যে পূর্ব্ববঙ্গে সহস্র সহস্র মুসলমান নৈতিক আদর্শে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, মনুষ্যত্বে, বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানে মুষ্টিমেয় হিন্দুদের পশ্চাতে পড়ে আছে, তার কারণ কি জানো? এরা হিন্দুরই বংশধর, কিন্তু ভুলে গেছে, শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রের এরাও উত্তরাধিকারী। ধর্ম্মে এরা মুসলমান থাকুক, ক্ষতি কি? কিন্তু এরা যে ভুলে গেছে, এদের দেহে ভরদ্বাজের রক্ত, ভৃগুর রক্ত, জৈমিনির রক্ত, কপিল-কণাদ-পতঞ্জলির রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে! হিন্দুর ধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছে, তাতে দোষ কি হয়েছে? কিন্তু গোত্র ভুলেই এরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করেছে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের উপর এদের ন্যায্য দাবী কর্‌বার সৎসাহসটুকু নেই; হতভাগ্যেরা ভাব্‌তে পারে না যে, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর জীবন-গৌরব এদেরই মায়ের জীবন-গৌরব, গার্গী-মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীর অপূর্ব্ব মহিমা এদেরই মায়ের মহিমা, গান্ধারী-বেহুলার অতুলন পাতিব্রত্য এদেরই মায়ের পাতিব্রত্য। তাই এদের এই অধঃপতন। কেমন বাছা, এই সব অমর অতীতকে ভুলে থাকৃতে চাও কি? যে অতীতের স্মৃতি তোমাকে চরিত্রের বল দেয়, নৈতিক সাহস দেয়, মনুষ্যত্বের উপাদান যোগায়, তা' ভুলে থাকৃতে চাও কি? তা' ভোলবার চেষ্টা করা এক মহা ভ্রান্তি, তা' ভুলে যাওয়া এক মহা দুর্ভাগ্য।

মন্ত্র ও শ্রদ্ধা

আরও কতকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর যুবক চলিয়া গেল। শ্রীযুক্ত সু— এবং শ্রীযুক্ত প্র—র সাথে শ্রীশ্রীবাবামণির আলাপ-আলোচনা হইতে লাগিল।

সু।—গঙ্গার ঘাটে আজ সবাই তর্পণ কচ্ছে, আমিও কর্ল্লাম। কিন্তু পুরুত যে মন্ত্র পড়ালেন, তার উচ্চারণই বুঝ্‌তে পার্ল্লাম না, অর্থবোধ ত' দূরের কথা।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন।

প্র—অর্থবোধহীন মন্ত্রে কোনো কাজই হয় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কোনো কাজই হয় না, তা নয়। কিছু কাজ হয়। শ্রদ্ধা থাক্‌লেই কাজ হয়। তবে, অর্থবোধহীন শ্রদ্ধা দীর্ঘজীবিনী হয় না ব'লে কোনো মূল্যবান বা স্থায়ী কাজে আসে না। অর্থবোধযুক্ত শ্রদ্ধাতেই পূরোপূরি কাজ হয়।

পিতৃ-তর্পণের লাভ

সু।—এই তর্পণের জল কি পিতৃ-পুরুষেরা পান?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পান আর না পান, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তোমরা যে তর্পণ কচ্ছ, এতে তোমাদেরই লাভ।

সু।—লাভ কিসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তোমরা ত' শুধু পিতৃ-পুরুষদেরই তৃপ্তির কামনায় জলতর্পণ কচ্ছ না! তৃপ্তির কামনা কচ্ছ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্র তৃণগাছটার পর্য্যন্ত। এতে কারো তৃপ্তি হোক্ আর না হোক্, তুমি যে সকলের তৃপ্তির কামনাটা অন্তরে অন্তরে পোষণ কচ্ছ, এটাই তোমার পরম লাভ। অন্ধ ভিক্ষুক ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে, তুমি হয়ত তাকে একখানা সিকি-পয়সাও দিতে পার্‌লে না, কিন্তু তার দুঃখে দুঃখ অনুভব কর্ল্লে। এটাই তোমার পরম পুণ্য। পরের দুঃখ দূর কত্তে পার্‌লে আর না পার্‌লে, পরের দুঃখে তুমি যে কাঁদ্‌লে, এই করুণাময়ী

অবস্থাটাই তোমার অক্ষয় স্বর্গ। হিন্দুর তর্পণ-ব্যবস্থা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির কামনাকে জাগ্রত করে, পুষ্ট করে, প্রসারিত করে। এই তর্পণ ত' শুধু পিতৃপক্ষের তিন পুরুষ আর মাতৃপক্ষের তিন পুরুষের জন্যই নয়, যাদের কেউ ছিল না, বান্ধব ছিল না, জল-পিণ্ড-দাতা ছিল না, তাদেরও সবার জন্য। যারা অগ্নিদগ্ধা, অদগ্ধা, যারা পুত্র-পৌত্রাদিবিহীন, তাদেরও সবার জন্য এ তর্পণ। হিন্দুর তর্পণে কোনো জীব বাদ পড়ে না, কোনো জাতি বাদ পড়ে না, কোনো ধর্ম্মাবলম্বী বাদ পড়ে না, ভূচর, খেচর, জলচর, সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্যই এই তর্পণ। আদি ঋষিরা যাঁরা সংসারাশ্রমে রত না হ'য়ে ভবিষ্য মানবের কল্যাণে তপোব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আদি প্রজাপতিরা, যাঁরা সমুদয় মানবজাতির আদিপুরুষ, যাঁরা খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী সবারই পিতৃপুরুষ,—তাঁদের থেকে আরম্ভ ক'রে সর্ব্বজীবের কল্যাণকামনা এই তর্পণের মন্ত্রের ভিতর রয়েছে। এই মন্ত্রে যদি সর্ব্বজীবের তৃপ্তি নাও হয়, তবু কেন, "ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্" ব'লে আমি উন্নতি লাভ কচ্ছি, আমিই কল্যাণবন্ত হচ্ছি।

কলিকাতা

৯ই আশ্বিন, ১৩৩৪

সাধুত্ব ও যশোলিপ্সা

ত্রিপুরার কোনও পল্লী-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মীরূপে সমাগত জনৈক ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য নিম্নরূপ একখানা পত্র লিখিলেন :—

"লোকে আমাকে সাধু বলুক,—এই ভাব প্রথম সাধকের পক্ষে তেমন দোষের নহে। কারণ লোকের শ্রদ্ধা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবর্ত্তক সাধককে সাধুজীবন যাপন করিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। এই যশোলোভ

বর্ত্তমানে মনে আছে বলিয়া বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইও না। সাধু হইবার পথে ইহা সহায়, কিন্তু সাধুত্ব লাভের পরে ইহা বিঘ্ন। যখন প্রকৃত সাধুত্বের উন্মেষ ঘটিবে, তখন যশোলোভ দমন করিবার শক্তিও তোমার জন্মিবে। ইহার জন্য ভয় পাইও না।

"তপস্যার জন্য প্রস্তুত হও। ভারতের উন্নতি একদল সর্ব্বত্যাগী তপস্বীরই মুষ্টিগত জানিও। তপস্বী যাহা ইচ্ছার ইঙ্গিতে করিবেন, চাতুর্য্যপরায়ণ কপটী ব্যক্তি শত যুগের কঠিন পরিশ্রমেও তাহা করিতে পারিবে না। অকপট জীবহিতৈষণার অগ্নি-শিখা অন্তরে জ্বালিয়া পথ চলা আরম্ভ কর।"

ভবিষ্যৎ ভারতের মহামানব

বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সার্কিউলার রোডে রামমোহন রায় পাঠাগার ভবনে গেলেন। অদ্য সেখানে উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের বক্তৃতার পরে সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি যখন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইলেন, সমগ্র জনমণ্ডলী তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার অনলস্রাবিণী বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি মাত্র সতের মিনিটকাল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় মধ্যেই "ইনি কে" জানিবার জন্য সকলের মধ্যে এক অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্ট হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"যাঁরা ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করেন, লোকে বলে তাঁরা পাগল। কেননা, তাঁরা নিক্তির কাঁটায় ওজন ক'রে নিজ ব্যক্তিত্বকে

বোঝেন না, জমা-খরচের খাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তাঁরা কাজ করেন না। স্বার্থের চাইতে পরার্থের দিকে রুচি তাঁদের বেশী, আত্ম-সুখের চাইতে পরসুখের দিকে নজর তাঁদের বেশী, নিজের ক্ষুধার চাইতে পরের ক্ষুধার প্রতি লক্ষ্য তাঁদের বেশী, নিজের দুঃখের চাইতে পরের দুঃখে দরদ তাঁদের বেশী, প্রেয়ের চাইতে শ্রেয়ের দিকে আগ্রহ তাঁদের বেশী। লোকে এঁদের পাগল বলে, রাস্তার ছেলেরা এঁদের পানে ঢিল ছোড়ে, বুদ্ধিমানেরা এঁদের গাল দেয়, বিদ্বানেরা এঁদের মূর্খ ভাবে, ধনীরা এঁদের উপেক্ষা করে, নির্য্যাতিত করে, ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে লাঞ্ছিত করে। কিন্তু সর্ব্বলোক-নিন্দিত এই সব আত্মভোলা মানুষেরাই যুগে যুগে জাতিকে গ'ড়ে তুলেন। হিসাব-নিকাশের ধার এঁরা ধারেন না, তাই আত্মোৎকর্ষের চাইতে আত্মোৎসর্গের মূল্য এঁদের কাছে বেশী, গ্রহণের চাইতে দানের মর্য্যাদা এঁদের কাছে অধিক। এমন একদল সর্ব্বত্যাগীই ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে গ'ড়্বেন। ভবিষ্যতের ভারতকে এঁরা এত বড় ক'রে গ'ড়ে তুল্বেন, যেমনটী আর কখনো হয়নি, যে উন্নতিকে জগতের কোনো দেশ কখনো লাভ করেনি, যে গৌরব ত্রিদিবেরও অপ্রাপ্য। অতীতকে আমি অশ্রদ্ধা করি না, বর্ত্তমানকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সংগ্রামবিমুখ ক্লীব কাপুরুষের মিথ্যা বৈরাগ্যাশ্রয়কেও আমি পূজা করি না, অক্ষমের নিষ্ফল গৈরিকাচ্ছাদনকেও আমি অর্চ্চনা করি না। আমি বিশ্বাস করি ভারতের ভবিষ্যৎকে, আমি পূজা করি ভারতের ভবিষ্যৎকে। ইহকালকে আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করি, চলমান জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডকেও নিখিল সত্যের বিকাশ ব'লে বিশ্বাস করি, আরো বিশ্বাস করি, এই সমবেত জনতার মধ্য হ'তে, এই সমাগত বালক ও যুবকদের মধ্য হ'তে এমন অমানুষ শক্তিশালী মহাপুরুষবৃন্দের উদ্ভব

হবে, যাঁরা কোটি ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকিকে, কোটি কালিদাস-ভবভূতিকে, কোটি শঙ্করাচার্য্য, কোটি বুদ্ধ, কোটি চৈতন্য, কোটি নানককে, কোটি ভাস্করাচার্য্য-বরাহমিহির-আর্য্যভট্টকে, কোটি অশোক-সমুদ্রগুপ্ত-হর্ষবর্দ্ধনকে নিষ্প্রভ ক'রে দিয়ে ভারত-জননীকে এক অপূর্ব্ব সন্তান-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী কর্ব্বেন। হে যুবক ভারত! আজ তুমি তোমার ভবিষ্যতের এই গৌরবমণ্ডিত আলেখ্য দর্শন ক'রে স্থিতপ্রজ্ঞ হও এবং তোমার সবল পেশল বজ্রবাহু সমুন্নত ও জাগ্রত কর। জাগাও তোমার অন্তর্নিহিত সুপ্ত চেতনাকে, আর লাগাও তোমার সমগ্র শক্তিকে মিথ্যার বিরুদ্ধে অবাধ্য বিদ্রোহের প্রলয়ানল প্রজ্বলিত কর্ত্তে।"

অনাগত জাতি ও জননী-সমাজ

সভাভঙ্গের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি চলিয়া আসিলেন। একটী জাতীয় উন্নতিকামী ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"অনাগত জাতি ভীষ্মের মত হবে জিতেন্দ্রিয়, ভীমের মতন হবে বীর্য্যবান্, বলশালী, একলব্যের মত হবে একনিষ্ঠ, আর শঙ্করের মত হবে জ্ঞানী। কিন্তু যাঁদের জঠরে এঁরা জন্মগ্রহণ কর্ব্বেন, তাঁদের ভিতরে আজ এ সকল সন্তানের জননী হওয়ার যোগ্যতার সমাবেশ কর্ত্তে হবে। এই যোগ্যতা আস্‌বে জননী-সমাজের মধ্যে আবাল্য শরীর-চর্চ্চা, যৌগিক-সাধনা ও প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনে। ভারতের ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনগুলি এতদিন শুধু বীজের উৎকর্ষ-সাধনেই দৃষ্টি দিচ্ছিল, এখন থেকে দৃষ্টি দিতে হবে ক্ষেত্রেরও উৎকর্ষ-সাধনে। ভালো বীজ হ'লেই ভালো গাছ হয় না, ভালো ক্ষেত্রে তার বপন হওয়া চাই। নিকৃষ্ট বীজ নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে উপ্ত হওয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট বীজ নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে উপ্ত হ'লে ফল কিছু ভালো হয়; কিন্তু শ্রেষ্ঠ ফল হবে, উৎকৃষ্ট বীজ ও উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রের সম্মিলনে।

বীজের চাইতে ক্ষেত্রের শক্তি কম ব'লে মনে কত্তে পারি না, কেননা, নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজও ত' ষোল আনা ফল দেয় না। আবার, তাই ব'লে যে বীজের শক্তিকে অস্বীকার কচ্ছি, তাও নয়, কেন না, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রেও নিকৃষ্ট বীজ ষোল আনা ফসল দিতে পারে না। তাই আজ সম্মেলন ঘটাতে হবে, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রের সাথে উৎকৃষ্ট বীজের। তাহ'লেই ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ জগতের সকল দেশের শীর্ষস্থানে গিয়ে দাঁড়াতে সমর্থ হবে। বালক ও যুবকদের ভিতরে আমরা পুরুষকর্ম্মীরা যেমন সংযম, সদাচার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কচ্ছি, ঠিক তেমনি বালিকা, কিশোরী ও যুবতীদের ভিতরে এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চিরতপোধারিণী কর্ম্মী-মাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে আমৃত্যু খাট্‌তে হবে। বীজের সংস্কার পুরুষ-কর্ম্মীরা কর্ব্বেন, কর্ম্মী-মায়েরা কর্ব্বেন ক্ষেত্রের সংস্কার। জননীর জাতির মনের জমিতে, দেহের জমিতে যত আগাছা জ'ন্মে রয়েছে, কর্ম্মী-মায়েরাই তাঁদের সাধনদীপ্ত জীবনের উৎসর্গ দিয়ে সেগুলিকে উৎপাটিত কর্‌বেন। সৎসঙ্কল্পের সার গোবর, পচাপাতা প্রভৃতি দিয়ে তাঁরা জমিকে উর্ব্বর কর্ব্বেন, ব্রহ্মবিদ্যার হাল চালিয়ে শক্ত মাটি সরস কর্ব্বেন, মল্লবিদ্যার হাতুড়ি চালিয়ে পাথর-কাঁকর চূর্ণ কর্ব্বেন। এইভাবে আজ অনাগত জাতির জননী-সমাজকে কর্ম্মী-মায়েরা, তপস্বিনী মায়েরা প্রস্তুত কর্ব্বেন।

কলিকাতা
১০ই আশ্বিন, ১৩৩৪

ধর্ম্ম ও জাতি

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার ধর্ম্ম যে নেবে, সে তোমার জাতি পাবে,—এই হওয়া উচিত তোমার

আচরণ। জগৎ জুড়ে তুমি তোমার ধর্ম্ম প্রচার কর, নিষ্ঠাবান্ প্রার্থীকে তোমার ধর্ম্ম দান কর এবং তোমার ধর্ম্ম যে গ্রহণ কর্ল্ল, তাকে তোমার স্বজাতি ব'লে স্বীকার ক'রে মহাসমাদরে বুকে তুলে নাও। সে যদি শিক্ষায় হীন হ'য়ে থাকে, তবে যত্ন করে শিক্ষা দিয়ে তোমার সমান ক'রে নাও, কিন্তু তাকে পর বলে, ছোট ব'লে, ভিন্ন জাতি বলে মনে ক'রো না। সে যদি ধনে এবং পার্থিব সমৃদ্ধিতে তোমার চেয়ে হীন হয়ে থাকে, তবে তাকে নিজের ঘরের মূলধন দিয়ে বড় হবার সাহায্য কর, সদ্‌বুদ্ধি দিয়ে তাকে পরিশ্রমের বলে, অধ্যবসায়ে শক্তিতে নিজের সৌভাগ্য নিজে অর্জ্জন কত্তে উৎসাহ দাও, প্রতি পদক্ষেপে তার সঙ্গে থেকে থেকে তার দেহে, মনে, প্রাণে বল যোগাও, যতদিন সে সর্ব্বতোভাবে বড় না হ'তে পাচ্ছে, ততদিন তার পিছে পিছে লেগে থেকে তাকে দুর্ব্বার উদ্দীপনায় পরিচালিত কর, কিন্তু আজ সে ছোট আছে ব'লে তাকে ঘৃণাও ক'রো না, অবজ্ঞাও ক'রো না।

ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহৎকে দেখ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—ক্ষুদ্রকে যে অবহেলা করে, তার দুঃখ পদে পদে। পৃথিবীতে তোমার অবজ্ঞার পাত্র যে কেউ নেই, এই কথাটী সত্য ক'রে জানো। ছোট'র ভিতরে বড়'র বীজ খুঁজে বে'র কর। নিম্নতম অবস্থার এবং নীচতম চরিত্রের লোকের ভিতরেও উচ্চতম অবস্থা ও চরিত্র যে বিকশিত হ'তে পারে, এই বিশ্বাসকে জাগ্রত কর, জ্বলন্ত কর। ক্ষুদ্রের ভিতরেও বৃহৎকে দেখ।

জীব মাত্রকেই ব্রাহ্মণ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মুচি, মেথর, ডোম ব'লে কোনো জাতি থাকবে না, এই নামে মানুষ থাকৃতে পারে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার,

কবিরাজ, আমলা, হাকিম, মুহুরী বা নায়েব ব'লে কোনো জাতি আছে? যে ওকালতী করে, তাকেই উকিল বলে, উকিলের ছেলেকে কেউ উকিল বলে না। যে নায়েবী করে, তাকেই নায়েব বলে, নায়েবের ছেলেকে কেউ নায়েব বলে না। মুচির ছেলে যদি জুতো সেলাই না করে, জুতো বিক্রী না করে, তবে সে মুচি নয়। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ঐ কাজটী করে, তবে সে মুচি। মুচি জুতো সেলাই করে ব'লেই তাকে ঘৃণ্য মনে কত্তে পার না। আজকাল অনেক চক্রবর্ত্তীর ছেলেও ওকাজ করে। পেটের দায়ে দু'দিন পরে হাজার হাজার মুখুয্যে, বাড়ুজ্যে, চাটুজ্যের ছেলেরা ওকাজ কর্ব্বে। তাই ব'লে সে ঘৃণ্য নয়। সে ঘৃণ্য হবে, সে অপরিচ্ছন্ন হ'লে। দৈহিক পবিত্রতা মানসিক পবিত্রতার সহায়ক, সম্পাদক ও অনুপূরক! এই কারণেই একজন মুচি, মেথর বা ডোমকে তুমি ঘৃণা কত্তে পার না, যদি সে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলে। মুখুয্যের ছেলে হাসপাতালে মড়া ঘাঁটে, সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে নিজ রুগ্ন পিতার মল পরিষ্কার করে, এতে তাদের জাত যায় না, কিন্তু যতক্ষণ তারা পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও স্নাত না হচ্ছে, ততক্ষণ স্পর্শের অযোগ্য। বাপের মড়া পোড়ালে ছেলের জাত যায় না, তা হ'লে নিরাশ্রয় ব্যক্তির মড়া পোড়ালে ডোমের কেন জাত যাবে? মানুষ মাত্রেই শূদ্র জাতি, কিন্তু গায়ত্রী-মন্ত্র লাভ কল্লে সে ব্রাহ্মণ হয়। জীব মাত্রকেই তোমরা ব্রাহ্মণ ক'রে লও। বৃথা হাজার হাজার জাতির ভেদাভেদের কোলাহলে পড়ে নিজের আসল ধর্ম্ম ভুলে থেক না।

কলিকাতা
১১ই আশ্বিন, ১৩৩৪

নামজপ ও খেচরীমুদ্রা

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাসে ও

প্রশ্বাসে নামজপের সময়ে ওষ্ঠ বা জিহ্বাকে আন্দোলিত কর্ব্বে না, বরং সম্ভব হ'লে জিহ্বাকে উল্‌টে নিয়ে জিহ্বার অগ্রভাগকে তালুমূলে অর্থাৎ আলজিভের সাথে সংযুক্ত রাখ্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে। চেষ্টা কর্ব্বে কথাটার মানে এই যে, জবরদস্তি কর্ব্বে না, আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে অভ্যাস ক'রে ক'রে জিহ্বাকে আলজিহ্বার সাথে সংলগ্ন কর্ব্বে। এসব কাজে হঠকারিতা ভাল নয়, দু'দিন দশদিন র'য়ে স'য়ে আস্তে আস্তেই আয়ত্ত কত্তে হয়। এই মুদ্রাটীকে খেচরীমুদ্রা বলে। খেচরীমুদ্রা অভ্যাসে মন উর্দ্ধগামী হয়। খেচরীমুদ্রার দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসে দেহের প্রতি অহং-মমাদি বোধ ক্রমশঃ ক'মে আসে, ফলে নামে অভিনিবেশ ঘনতর এবং নিষ্ঠা প্রগাঢ়তর হয়; নাম-সাধকের পক্ষে এটা একটা মস্ত কথা।

মৌনব্রত ও খেচরীমুদ্রা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খেচরীমুদ্রাকে তালুমুদ্রাও বলে। জিহ্বার অগ্রভাগকে তালুমূলে যুক্ত ক'রে রাখ্‌তে হয় ব'লেই এর অপর নাম তালুমুদ্রা। এই মুদ্রা অভ্যাসে মন নিম্নগামিতা ত্যাগ ক'রে অনন্ত উর্দ্ধে বিচরণের ক্ষমতা অর্জ্জন করে ব'লে এর নাম খেচরীমুদ্রা। খেচরীমুদ্রা অভ্যাসকারীর পক্ষে মৌনব্রত পালন বড় সহজ। জিহ্বা আলজিহ্বার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ব'লে কথা বলতে অরুচি এসে যায়, নীরব থাকৃতেই যেন ভাল লাগে। অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত মৌনব্রতী সাধু-মহাত্মাকেও দেখা গিয়েছে যে, হঠাৎ ক'রে কথা ব'লে ফেলেছেন। খেচরীমুদ্রা অভ্যস্ত থাকৃলে এবং মৌনাবস্থায় এই খেচরীমুদ্রাতে রত থাকৃলে সেরূপ ব্রতভঙ্গের সম্ভাবনা অনেক ক'মে যায়।

মৌন ও ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌনব্রত

নেবার সময়ে নিজেকে যত অধিক পরিমাণে ঈশ্বরানুগত কর্ব্বে, ব্রতভঙ্গের সম্ভাবনা তত হ্রাস পাবে। ঈশ্বরে যে যত নির্ভর করে, ঈশ্বর তার ব্রতভঙ্গের সম্ভাবনা তত দূর ক'রে দেন। নিজের অহমিকাতে প্রবুদ্ধ না হ'য়ে ঈশ্বর-চরণাশ্রিত হবার চেষ্টাই মৌনব্রতীর করা উচিত। মৌন পালন ক'রে কতজনকে দেখা যায় এক একটা দম্ভের অবতারে বা দর্পের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে। তা হওয়া মৌনব্রতের এক নিদারুণ নিষ্ফলতা। মৌনের লক্ষ্য হবে ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণ।

মৌনব্রত ও লোকমান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন;—লোকমান লাভ যেখানে মৌনের উদ্দেশ্য, সেখানে মৌনব্রতী ক্রমশঃ নিজ উচ্চ অবস্থা থেকে পরিভ্রষ্ট হ'য়ে নিতান্ত সাধারণ লোকের মত কাম-ক্রোধের দাস হ'য়ে পড়ে। মৌনী বাবা ব'লে নাম-যশ হ'লেই কিছু হ'ল না। শুধু শুধু মৌনী থাকার কোনো মানেও হয় না। বোবারা কথা কইতে পারে না, এতে এদের কৃতিত্ব নেই। জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কিছুই হ'ল না, অথচ তুমি মৌনী রইলে,—এ মৌনেও তেম্‌নি কোনো কৃতিত্ব নেই। লাভও নেই বরং ক্ষতি আছে। বোবারা কথা বলে না, কিন্তু কপটতাও করে না! লোকমানলিপ্সু মৌনব্রতীরা প্রচুর কপটতাও করে।

মৌনব্রত হঠাৎ ভঙ্গ হইলে কি কর্ত্তব্য?

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মৌনব্রত পালন করিতে করিতে যদি কখনও মৌনভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হঠাৎ এরূপ হ'য়ে গেলে দ্বাদশবার হরি-ওঁ বা গায়ত্রী মন্ত্র জপ ক'রে পুনরায় মৌনী হওয়া কর্ত্তব্য। কারো যদি সঙ্কল্প থাকে যে, ছয় মাস বা এক বৎসর মৌনী থাক্‌বেন, আর তাঁর যদি এ রকম হঠাৎ ব্রতভঙ্গ হ'য়ে যায়, তাহ'লে প্রতিবার ব্রতভঙ্গের জন্য এক পক্ষকাল বেশী সময় মৌনী থেকে তবে ব্রত উদ্‌যাপন কর্ব্বেন।

মৌনব্রত উদ্‌যাপনের নিয়ম

প্রশ্ন।—সঙ্কল্পিত মাস, ষণ্মাস বা বৎসর অতিক্রান্ত হ'লে মৌনব্রত কি ভাবে উদ্‌যাপন করা উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা বা সমবেত উপাসনার দ্বারা মৌনব্রত উদ্‌যাপিত হ'তে পারে। এই কাজ যার পক্ষে সম্ভব না হবে, সে জগতের মঙ্গল উচ্চারণ কত্তে কত্তে মৌনভঙ্গ কর্ব্বে।

কলিকাতা
১২ই আশ্বিন, ১৩৩৪

বাহিরের লোককে স্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত করা

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মত এবং পথের প্রতি যার সত্যিকারের বিশ্বাস, মমত্ব এবং নিষ্ঠা আছে, বাইরের লোককে ডেকে এনে তার পক্ষে নিজ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করাবার প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পন্থাহীন ব্যক্তিকে এনে পথ দেখিয়ে দেওয়া দোষেরও নয়। যে ব্যক্তি বিপথে চলেছে, তাকে সৎপথে আকৃষ্ট করা নিন্দনীয়ও নয়। বরং একদল লোক যে জগতে অপরকে নিজমতানুবর্ত্তী ও নিজপথাবলম্বী করার চেষ্টা করেছেন,

তাতে জগতের অনেক পাপী-তাপীর নিষ্কৃতিও হয়েছে, অনেক জগাই-মাধাই উদ্ধারও পেয়েছে। সুতরাং, যাঁরা লক্ষ্যহীন পথচারীকে টেনে আনেন, যাঁরা বিপথগামী ভ্রান্তকে সুপথ দেখান, তাঁরা জগতের মধ্যে নমস্য। মানব সভ্যতা তাঁদের কাছে ঋণী।

সম্প্রদায়ে দুর্ব্বৃত্ত-প্রবেশের ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু দুর্ব্বৃত্তস্বভাব, দাম্ভিক, ধন-গর্বিত, বল-দর্পিত, জ্ঞান স্পর্দ্ধিত, উদ্ধত ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের ভিতরে টেনে এনে সম্প্রদায়ের কোনও কুশল হয় না, সম্প্রদায় বরং এতে ধ্বংস পায়। কুচক্রী, ষড়যন্ত্রপরায়ণ, আত্ম-প্রাধান্য-লিপ্সু, কর্তৃত্বলোভী এবং অনাচারী ব্যক্তিদিগকে সম্প্রদায়ের বাইরে থাক্‌তে দেওয়া ভাল। যে অসৎ লোক তোমার সম্প্রদায়ের বাইরে আছে, সে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সম্প্রদায়ের অতি অল্পই অনিষ্ট সাধন কত্তে পারে। কিন্তু ঘরের ইন্দুর বেড়ার বাঁধ কাটে। একবার যদি এরূপ অসৎ লোককে তোমার নিজ সম্প্রদায়ের ভিতরে ঢুক্‌তে দাও, দেখ্‌বে, বাইরে থেকে হাজার অসৎ লোকে যে অনিষ্ট কত্তে পারে নি, ভিতরে এসে এই একটা অসৎ লোক তার শত সহস্র গুণ অনিষ্ট কচ্ছে। একটা দুর্ব্বৃত্ত তোমার সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে অন্য দশজন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিয়ে তা'দিগকে পাপ-পথে প্ররোচিত কর্ব্বে, সরল-স্বভাব অল্পবুদ্ধি নিরীহ লোকগুলিকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে এক একটা অপকার্য্যের অনুষ্ঠানে নির্ব্বাক যন্ত্ররূপে ব্যবহার কর্ব্বে, চিরকালের হিতৈষী এবং বান্ধবদিগকে শত্রুতে এবং কার্য্য-হন্তারকে পরিণত কর্ব্বে, নিত্য-দিনের সুযশঃ-প্রচারকারীদিগকে অপপ্রচারকারীতে রূপান্তরিত কর্ব্বে। সম্প্রদায়ে লব্ধ-প্রবেশ দুর্ব্বৃত্তের এত শক্তি। সুতরাং সম্প্রদায়-পরিপুষ্টির

বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে তুনিয়ার যত কুটিল বিষধর সর্প আর হিংস্র রক্তপিপাসু বাঘকে এনে সম্প্রদায়-মধ্যে ঠাঁই দিও না। তাদের প্রকৃত স্থান গহন অরণ্য, যেখানে মানুষ যায় না; নতুবা তাদের স্থান আলিপুরের পশুশালা, যেখানে তাদের খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখা হয়। তাদের স্থান কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে নয়।

কেমন লোককে সম্প্রদায়ে আনিবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁরা বিনয়ী, বিনম্র, নিজেদের বিদ্যা, অর্থ বা প্রতিষ্ঠার জন্য অগর্ব্বিত, এমন লোককে সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ব্বে। যাঁরা প্রিয়কারী, প্রিয়বাদী, প্রিয়চিকীর্ষু, এমন ব্যক্তিকে কোল দিয়ে আন্‌বে। যাঁরা মিথ্যায় অরুচিসম্পন্ন, সত্যবাক্যে উৎসাহবান্, ক্ষমাশীল, ক্ষেমদর্শী, প্রেমিক এবং অনুগত, যাঁরা নিজেদের নৈতিক ও আত্মিক ভবিষ্যৎকে সুন্দর ক'রে গড়ার জন্য ব্যগ্র, এমন লোকদের এনে সম্প্রদায় পরিপুষ্টি কর্ব্বে। কলহে বিরত, ঈর্ষ্যায় অনভ্যস্ত, নীচতাবর্জ্জিত লোকই সম্প্রদায়ের সম্পদ।

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩৪

জাতিভেদের ভণ্ডামি

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক ব্রহ্মচারীসহ পুপুন্‌কী পৌছিলেন। ধবনী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—জাতিভেদ রক্ষার জন্য এত সোরগোল ত' করা হচ্ছে, কিন্তু জাতিভেদ প্রকৃতই কি রক্ষিত হচ্ছে? একটা গ্রামের সবগুলি ব্রাহ্মণের জীবনের ভালোমন্দ সব দিক্ অনাবৃত করে ফেলুন দেখি!

দেখ্‌বেন, কি আহারে, কি পানে, কি যৌনসংসর্গে সকল দিক্ দিয়েই প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোন না কোন প্রকারে শূদ্রই হ'য়ে রয়েছে। এদেরও কি ব্রাহ্মণ ব'লে মানতে হবে? এদেরও কি পায়ের ধূলো মাথায় তুলে পিতৃপুরুষ কৃতার্থ হ'ল ব'লে অপর জাতিদের ভাব্‌তে হবে? শুধু গলায় পৈতা আর মাথায় টিকী আছে ব'লেই কি তাদের অনাচার, তাদের ব্যভিচার, তাহাদের কদাচারগুলিকে এক তূড়িতে উড়িয়ে দিতে হবে? কথায় বলে, শূদ্র যদি দ্বাদশ বর্ষকাল ব্রাহ্মণের সেবা করে, তা হ'লে সে ব্রাহ্মণ হয়। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সদ্‌ব্রাহ্মণের সংসর্গে সুদীর্ঘকাল থাকৃতে থাকৃতে শূদ্রের ভিতরে ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় চিত্তসংস্কার এসে যায়। এতে শূদ্রের জাত্যন্তর-পরিণাম ঘটে, শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়। আবার ব্রাহ্মণ যদি বহুবর্ষ ধ'রে শূদ্রের সংসর্গ বা সেবা করে, তা হ'লে সে শূদ্রই হ'য়ে যায়। সংসর্গের ফল হাতে হাতে। আজকাল সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-সন্তান শূদ্রের চাকুরী করে, শূদ্রের অনুগ্রহের উপরে জীবন ও জীবিকা চালায়, শূদ্রের রুচি অনুসরণ করে। তাদেরই বা ব্রাহ্মণ ব'লে কি ক'রে গণনা করা যাবে? সংসর্গ যখন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিয়ে এবং ঘনিষ্ঠতা যখন যৌনপরিতৃপ্তির মুখপানে তাকিয়ে, তখন তা স্পর্শমাত্রই জাত্যুৎকর্ষ নাশ ক'রে উচ্চ জাতিকে নীচ জাতিতে পরিণত করে দেয়। তবু এসব স্থলে গলায় যজ্ঞোপবীত রয়েছে ব'লেই কাউকে ব্রাহ্মণ ব'লে মান্‌তে হবে?

জাতের বজ্জাতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এ মিথ্যা জাতিভেদ আমি মানি না। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা যার গায়ের মাংস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে খাচ্ছে, তাকে আমি ব্রাহ্মণ ব'লে মানি না। সকলে এদেরই ব্রাহ্মণ

ব'লে মানছে, আর দুনিয়ার যত মিথ্যার, যত শয়তানীর, আর যত বজ্জাতির প্রশ্রয় দিচ্ছে।

সন্তানের জাতি-নির্ণয়

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুণ, কর্ম্ম এবং জন্ম দেখে নর-নারীর জাতিনির্ণয় হয়। গুণ-কর্ম্ম যাঁর ব্রাহ্মণোচিত, তাঁর জন্ম যেখানেই হোক্, তিনি ব্রাহ্মণ। গুণ-কর্ম্ম যাঁর অব্রাহ্মণোচিত, তার জন্ম যদি বাড়ুয্যের ঔরসে আর মুখুজ্যের মেয়ের গর্ভেও হয়, তবু সে অব্রাহ্মণ। জন্ম দিয়েও জাতিনির্ণয় হয়, কিন্তু দ্বিবেদীর ঔরসে আর ত্রিবেদীর গর্ভে জন্মালেই বলা চলিবে না যে, সন্তান ব্রাহ্মণ-জন্মা। বাপ মা তার যেই হোক্ না কেন, জন্মদানকালে তাদের মনে যদি ব্রাহ্মণোচিত সংযম থাকে, তবেই সন্তান ব্রাহ্মণ। হরুয়া মুচি যদি জন্ম দেয়, আর মতিয়া ডোম্‌নী যদি সে ঔরসকে ধারণ করে, তাহ'লেও সন্তান জন্ম-দ্বারা ব্রাহ্মণই হবে, যদি জন্মদানকালে হরুয়া মুচির মন থাকে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে, আর মতিয়া ডোম্‌নীর মন থাকে ভোগাতুরতার ঊর্দ্ধদেশে। জগৎ-কল্যাণের বুদ্ধি নিয়ে, মনকে ইন্দ্রিয়-লালসার সংস্পর্শ থেকে সম্যগ্‌রূপে মুক্ত রেখে যদি ফিরিঙ্গী ডিক্রুজ আর যবন-কন্যা ফিরোজা বিবি সন্তান-জনন করে, তবে তাকেও ব'ল্‌তে হবে, ব্রাহ্মণজন্মা। ব্রাহ্মণজন্মা বলি তাকে, যার জন্ম ব্রহ্মভাব থেকে।

বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—দৈহিক ভাবে বর্ণসঙ্কর কথাটার সত্যিকার মানে বেশী কিছু নেই! যেখানে স্ত্রী-পুরুষের সন্তানোৎপাদন-কালীন মনোভাবের কৌলীন্যের তারতম্য রয়েছে, বর্ণের জন্ম সেখানে। মিশ্রের ছেলের সঙ্গে ওঝার মেয়ের বিয়ে হ'ল, মিশ্রনন্দন বীর্য্যাধান

কর্লে́ন শূদ্রবুদ্ধি নিয়ে, ওঝা-কন্যা ঔরস ধারণ কর্লে́ন ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধি নিয়ে, সবাই বলেছে ব্রাহ্মণ জন্মেছে। বীর্য্যের ব্রাহ্মণত্ব বা শূদ্রত্ব নির্ণীত হবে বীর্য্যাধানকালীন চিন্তাপ্রবাহের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা দিয়ে। শুদ্ধ চিন্তায় যার জন্ম হবে, সেই হবে ব্রাহ্মণজন্মা।

ব্রাহ্মণজন্মা ও ব্রাহ্মণকর্ম্মা

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ব্রাহ্মণজন্মা হ'লেও তাকেই ষোল আনা ব্রাহ্মণ মানব না। পিতামাতার বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্য দিয়া তাকে ব্রাহ্মণজন্মা ত হ'তেই হবে, পরন্তু জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়ে তাকে ব্রাহ্মণকর্ম্মাও হ'তে হবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজন্মা, ব্রাহ্মণকর্ম্মা হওয়া তার পক্ষে সহজ-সাধ্য হয়, কিন্তু যদি সে ব্রাহ্মণকর্ম্মা হ'তে না পারে, তবে তাকে "পিতৃমাতৃপুণ্যে চার আনা ব্রাহ্মণ" ব'লে স্বীকার কর্ব্ব মাত্র। পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণজন্মা নাও হয়, তথাপি পুরুষকার-প্রভাবে যদি ব্রাহ্মণকর্ম্মা হ'তে পারে, তবে তাকে মান্‌ব বারো আনা ব্রাহ্মণ ব'লে অবাধে, এমন কি স্থলবিশেষে ষোল আনা ব্রাহ্মণ ব'লে মানতেও দ্বিধা কর্ব্ব না। তবে, একথা আমি এক শ' বার বলছি, যতদিন দেশ-মধ্যে ব্রাহ্মণজন্মাদের আবির্ভাব বেশী ক'রে না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্রাহ্মণকর্ম্মা খুব অল্পই মিল্‌বে। কেননা যার জন্ম শুদ্ধ, তার কর্ম্ম শুদ্ধ হয় অল্প আয়াসে।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণজন্মা আর কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণজন্মা নয়; তা' আমরা বুঝব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ দৃষ্টিতে তা' জান্‌বার উপায় নেই, শুধু যোগদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই তা' বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বিচার কর্ব্বে কর্ম্ম দিয়ে, তারা সম্মান কর্ব্বে কর্ম্ম-ব্রাহ্মণকেই।

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৪

পুপুন্‌কী আশ্রমের সূত্রপাত

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত পুপুন্‌কীর কাহারও সহিত পূর্ব্ব-পরিচয় নাই। ভগবৎ-প্রেরিত হইয়াই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় কতিপয় মাস যাবৎ শ্রীশ্রীবাবামণিকে একবারটী পুপুন্‌কী আসিবার জন্য বার বার নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে পত্র লিখিতেছেন। হরিহর বাবুর উদ্দেশ্য, শ্রীশ্রীবাবামণির দ্বারা পুপুন্‌কীতে কোনও একটি প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করা। শ্রীশ্রীবাবামণির গ্রন্থাদি পাঠের পর হইতেই হরিহরবাবুর এবং তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র মহাশয়ের শ্রদ্ধা শ্রীশ্রীবাবামণির উপরে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লোকমুখে তদীয় অভিক্ষা-ব্রতের কথা শুনিয়া ইঁহারা আরও চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"ভিক্ষা চাহিবেন না, ইহাই যাঁহার পণ, নিশ্চয়ই তিনি সাধারণ মানুষ নহেন,—এমন পুরুষ-সিংহকে দিয়াই এখানে প্রতিষ্ঠান গড়াইতে হইবে।" উদারচেতা হরিবাবু ভাবিলেন—"আমরা যদি এখানে এক শত বিঘা বনভূমি আশ্রমার্থে নিষ্কর দান করি, তাহা হইলে ইনি উহা গ্রহণ করিবেন কি? ইনি জানিতেন যে, ইতঃপূর্ব্বে দানের প্রস্তাব শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে আরও আসিয়াছে, কিন্তু কাহারও দান-গ্রহণে কখনও তিনি করপ্রসারণ করেন নাই, সুতরাং মিশ্র-পরিবারের এ দান তিনি গ্রহণ করিবেন কি না, সংশয়সঙ্কুল। হরিবাবু বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিলেন,—"কেন, উনি ত' আর এই ভূমি আমাদের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া নিতেছেন না, আমরা নিজেদের গরজে ভক্তিসহকারে দিতেছি, ইহাতে ত' তাঁহার অভিক্ষা-ব্রত ক্ষুণ্ণ হয় না।" কতিপয়

দিবস পরে পরে পত্রের পর পত্র দ্বারা হরিহর মিশ্র মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণিকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"আমি স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনার্থ রাঁচি যাইতেছি, তৎকালে পুপুন্‌কী হইয়া যাইব। চারি বৎসর পূর্ব্বে (কার্ত্তিক, ১৩২৯) একবার আপনাদের গ্রামে যাইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল * কিন্তু পূরণ হয় নাই। যাহা হউক আপনাদিগকে দর্শন করিবার সুযোগ আমি ছাড়িব না।" শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আসিয়া পৌছিয়াছেন শুনিয়াই চতুর্দ্দিক হইতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়েরা মিশ্র-গৃহে সমবেত হইতে লাগিলেন এবং এইখানে এক শত বিঘা অরণ্য-ভূমি দান গ্রহণ করিয়া দাতাকে কৃতার্থ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দানগ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি কোনও আগ্রহই প্রকাশ করিলেন না।

অদ্য প্রাতঃকালে জলযোগাদি সম্পাদিত হইলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণিকে লইয়া সকলে পুপুন্‌কীর জঙ্গলে রওনা হইলেন। পক্ককেশ ও পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র মহাশয় যেন সিংহ-বিক্রমে অরণ্য পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হরিবাবুর মাতুল-শ্বশুর শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঠক ও বন্ধু শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মাহাথা মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের কৃষিকার্য্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন্ কোন্ স্থান চাষ-বাসের পক্ষে বেশী উপযোগী হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। তপস্যার স্থান হিসাবে বনটীর দৃশ্য লোভনীয় হইলেও কৃষিকার্য্যের দিক দিয়া ইহা লোভনীয় নহে। মত্ত-হস্তীর বিক্রমে বন-পর্য্যটন করিতে করিতে যাঁহারা এখানে আশ্রম স্থাপনের সম্পর্কে নানা উৎসাহব্যঞ্জক পরিকল্পনার কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাদের

* সেই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি জানুনিয়াটাঁড় ষ্টেশানে নামিয়া নৌকাযোগে পার হইয়া (দামোদর ব্রীজ তখন হয় নাই) পুপুন্‌কীতে মিশ্র মহাশয়ের বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া সহসা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ফিরিয়া যান।

একজনেরও এই সমস্যার মীমাংসার দিকে মন যেন নাই যে, এই অক্রুরন্ত শালগাছের মোটা মোটা গুঁড়ি কি করিয়া অপসারিত হইবে, মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত বড় বড় লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-কঙ্কর কি করিয়া দূরীভূত হইবে, প্রতিষ্ঠান গড়িবার ও চালাইবার প্রয়োজনীয় স্বল্পতম অর্থও কোথা হইতে আসিবে। আর্থিক দিক দিয়া অলাভজনক এবং শ্রমের দিক দিয়া কল্পনাতীত কঠোর, এই ভূমি দান করিলে কেমন গ্রহীতা ইহাকে কাজে আনিতে পারিবেন, উৎসাহের আধিক্যে এই একটী প্রয়োজনীয় বিষয়েই কেহ একটী কথাও বলিলেন না। কেহই একবার চিন্তা করিলেন না, এমন কি একটা প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত তুলিলেন না যে, আশ্রম গড়িতে, আশ্রম চালাইতে অন্নও লাগে, অর্থও লাগে, প্রারম্ভকালে দুই চারি গুচ্ছ ধান্য-মঞ্জরীরও প্রয়োজন হয়। বৃদ্ধ অযোধ্যানাথ পাঠক মহাশয় ত' যেই জমি-খণ্ড দেখেন, তাহা দেখিয়াই বলিয়াই ওঠেন,—চমৎকার ধান-জমি হইবে, অতুলন ফলবাগান হইবে। হরিবাবু কল্পিত এক ধনকুবেরকে মনে মনে পৃষ্ঠপোষক করিয়া আনন্দাতিশয্যে কেবলই বলিতে লাগিলেন,—এখানে দালান উঠিবে, ওখানে ইন্দারা-খনন হইবে, সেখানে ট্রাক্টার চলিবে,—ইত্যাদি। অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রও নানাভাবে প্রাণের আনন্দ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শুধু একটী ব্যক্তিই হাঁ বা না কোনও কথাই বলিলেন না,—তিনি শ্রীশ্রীবাবামণি।

বন পরিদর্শন করিতে করিতে বেলা হইল। তখন সকলে মিলিয়া একটী মহুয়া গাছের ছায়ায় বসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকলে চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে উপবেশন করিলেন।

ধবনীর পাঠক মহাশয় আবেগাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"পুপুন্কীর ও আমাদের বহু পুণ্যফলে আপনার এখানে শুভাগমন হ'য়েছে, আপনি এখন বলুন যে, এখানে আশ্রম হবে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি কোনও উত্তর করিলেন না।

হরিবাবু ব্যাকুলস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আজ পাঁচ বৎসর ধরে আমরা আপনার আশাপথ তাকিয়ে রয়েছি। আজ যদি এসেছেন, আপনাকে এই ভূমি নিতেই হবে, এখানে আশ্রম গড়্‌তেই হবে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি এখনও কোন উত্তর করিলেন না।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবু, গোষ্ঠবিহারী হালদার, দমন শর্ম্মা, হরদয়াল শর্ম্মা এবং উপস্থিত অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণকে হরিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের মত কি ?

সকলেই সমস্বরে আগ্রহ জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র মহাশয় সর্ব্বশেষে বলিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু অশ্রু তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল, তিনি দু' একটী কথা কহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। তারপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন,—এখানে আশ্রম হবে।

সকলের মধ্যে যেন আনন্দের প্লাবন বহিয়া গেল। দীননাথ মিশ্র মহাশর ও পাঠক মহাশয়ের গণ্ড বাহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে "হরি ওঁ, হরি ওঁ" ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণির পাদমূলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

অদ্য বৈকালে গান্ধাজোড় হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণিকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। যোগেন্দ্রবাবু দীননাথ মিশ্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও হরিহর বাবুর জ্যেঠাত ভাই। যোগেনবাবুর

বুদ্ধিমত্তা-সূচক মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি বুঝিলেন যে, লোকটী সাধারণ কেহ হইবেন না। বাস্তবিক, যোগেন্দ্র বাবু সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ।

যোগেনবাবু আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবামণিকে পরীক্ষা করিতে, ইহা শ্রীশ্রীবাবামণি সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। কিন্তু রাত্রি একটা পর্য্যন্ত আলোচনার পরে স্বতঃই যোগেনবাবু ভক্তি-বিনম্রভাবে জানাইলেন, —স্বামীজী, এ অঞ্চলে যত সন্ন্যাসী আজ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সকলকে আমি কটাক্ষে পরাজিত করিয়াছি। একবার যে আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছে, সে দ্বিতীয়বার আর এ দেশে ফিরিয়া আসিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু দেখিতেছি আপনিই প্রথম সন্ন্যাসী, যাঁহাকে তর্ক দ্বারা পরাজিত করা যায় না।

যোগেনবাবু আসিয়াছিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে কিন্তু তিনি আলাপে মুগ্ধ হইয়া করিলেন মৈত্রীস্থাপন। একান্তে বলিলেন, - স্বামীজী, কঠিন বন্ধুর ভূমি গ্রহণে সম্মতি জানাইয়াছেন। এদেশের মাটি ও বায়ু স্বভাবতই রুক্ষ। তার উপরে আশ্রমের জন্য অভিলষিত বনাংশটুকু অধিকাংশই প্রস্তর-কঙ্করে পূর্ণ। এই মাটিতে আয় করা আর সেই আয়ে আশ্রম চালান অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমার মাথায় ত একেবারেই ঢুকিতেছে না যে, এমন একটা কঠিন বন্ধুর ভূমিতে আশ্রম করিবার জন্য আপনাকে এত চাপ কেন দেওয়া হইল। সঙ্গে অন্তত দুই চারি বিঘা তৈরী ধান্যজমি না দিলেই বা আপনি কি করিয়া আশ্রম গড়িবেন? আমরা পাঁচ দশ পুরুষ ধরিয়া মাটির সহিত মিতালী করিতে চেষ্টা করিয়াছি, পোষ মানাইতে পারি নাই। একটা গাছ রুপিলে ফল দিবার ঠিক আগে সে মরিয়া যায়। আর আপনি এই ভূমিই নির্ব্বাচন করিলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কাজেই আমার অধিকার, সাফল্য-বৈফল্যের চিন্তা ক'রে কি কর্ব্ব ?

যোগেনবাবু বলিলেন,—কাকা (দীননাথ মিশ্র) এইখানে আশ্রম করার প্রস্তাব ক'রে আপনাকে সম্মতও করাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন এই প্রস্তাবের রূপান্তর করিতে গেলে আত্মীয়গণমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে। নতুবা আমি গান্ধাজোড় মৌজাতে আপনার চরণে অতি সহজে আবাদ-যোগ্য তিন শত বিঘা ভূমি অর্পণ করিতাম।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চুপ, চুপ। এখন ঐরূপ প্রস্তাব হ'লে আর আমি তাতে স্বীকৃত হ'লে লোকে আপনাকেও গাল দেবে, আমাকেও ভুল বুঝবে।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

দুঃখ ও দুঃখী

বন ভ্রমণ করিতে করিতে সকলে একটি রামকাগজ (সীতাপত্র) গাছের নিকটে আসিতেই উহার পাতায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন লেখা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যে-কোনও একখানা সরু কাঠি দিয়া সীতাপত্রের উপরে কিছু লিখিলেই তাহা দেখিতে না দেখিতে কালীর অক্ষরের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি দুইটী পত্রে দুইটী ছোট ছোট কবিতা লিখিলেন। যথা,—

১

দুঃখীরে লইতে বুকে ঘুরি দেশে দেশে ;
সার্থক জনম সর্ব্বজীবে ভালবেসে।

২

দুঃখীরে পাইয়া বুকে আনন্দ অপার
স্কন্ধেতে বহিতে পারি ব্রহ্মাণ্ডের ভার।

বনের নানা অঞ্চল ঘুরিতে ঘুরিতে একটী স্থানে উপনীত হইতেই একজন বলিলেন,—এই স্থানে ভূতের রাজা কুন্দরা বাস করে, প্রতি বৎসর গ্রামবাসীরা অনেকে এখানে তাঁর পূজা করবার জন্য আসে। এই দেখুন না মাটির উপরে সিন্দুরের দাগ!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যত জীব, তত ভূত। আবার, যত ভূত, তত ভূতভাবন শিব! শিবের পূজা ভুলে গেলেই ভূত-প্রেতের পূজার আবশ্যকতা পড়ে। শিব মানে সুন্দর, শিব মানে সত্য, শিব মানে মঙ্গল।

যেখানে ভয়, সেখানেই অভয়ের প্রয়োজন

বনের ভিতরে আর একটী অঞ্চলে আসিলে একজন বলিলেন,—এইখানটায় এই দিনের বেলাও একাকী কেউ কখনো আসে নি। ভূতের ভয়, সাপের ভয়, নেকড়ে বাঘের ভয়।

বন-ভ্রমণ-কারীরা ক্রমশঃ দুই তিনটা আলাদা দলে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ পছন্দমত এক এক দিকে ছুটিলেন। একখানা বিরাট প্রস্তরের পার্শ্বে একটী বন্য বিল্ববৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে,—শ্রীশ্রীবাবামণি ও যোগেনবাবু ক্লান্ত হইয়া সেই পাথরখানার উপরে পা ছড়াইয়া বসিলেন।

যোগেনবাবু বলিলেন,—স্বামীজী, আপনাকে দেখা অবধি আপনার উপরে এমন একটা মমত্ব-বোধ এসে গেছে যে, ভাবতে মনে বড় উদ্বেগ হচ্ছে যে, এখানেই আপনি আশ্রম-প্রতিষ্ঠা কর্ব্বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এর আগে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এসেছি, যেখানে উনানে খিচুড়ী বসিয়ে কলসী জলশূন্য দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পরে বাল্‌তি নিয়ে জল আনতে গেলে রয়েল-বেঙ্গল টাইগারের পেটে ঢুকে যাবার সম্ভাবনা ছিল শতকরা নব্বই দিন,—কিন্তু সেখানেও ত ভয় পাই নি। অবশ্য অন্য কারণে সেই আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে।

যোগেনবাবু।—সেটা কোথায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উড়িষ্যার সুখিন্দার জঙ্গলে। যদিও সে আশ্রম-চেষ্টা সফল হয় নি, তবু দিনের বেলা পথ চলতে চলতে অনাবৃত পৃষ্ঠ-দেশে ঠাণ্ডা লাগল কেন দেখবার জন্য চোখ তাকিয়ে কতবার দেখ্‌তে হয়েছে, একটা ময়ূর একটা বিষধর সাপকে গিলে যাচ্ছে। সেখানেও ভয় পাইনি।

যোগেনবাবু।—কিন্তু সেখানে আপনাকে দেখে কেউ আপনার মায়ায় পড়ে নি। আমি কিন্তু পড়েছি। এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে যে কোনও বিপদ ঘটতে পারে। ভূতকে হয়ত আপনি ভয় পাবেন না, কিন্তু সাপ, বাঘ; মানুষ, কোনওটাই এদেশে খুব অবহেলার মত নয়। সত্যিই কি আপনি এখানে আশ্রম কর্ব্বেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কথা যে দিয়ে ফেলেছি! আশ্রম এখানে হবেই।

এমন সময় উভয়ের সম্মুখ দিয়া একটী কালসর্প অাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তীরবেগে চলিয়া গেল।

যোগেনবাবু সশঙ্কিত ভাবে বলিলেন,—ঐ দেখুন! চাক্ষুষ প্রমাণ দেখুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি খলখল হাসিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া বলিলেন,—যেখানে ভয়, সেখানেই ত অভয়ের প্রয়োজন।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

জয় মৃত্যু, জয় দুঃখ

অদ্য পুনরায় শ্রীশ্রীবাবামণি বনভ্রমণে বাহির হইয়া রামকাগজ গাছের নিকটে আসিলেন। সকলেই এক-একটী বাক্য লিখিলেন।

শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র লিখিলেন,—"হরি নাম সত্য।"

হরিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুশেখর লিখিলেন,—"জয় শ্রীস্বামীজীর জয়।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয় লিখিলেন,—"জয় অভিক্ষুর জয়।"

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

জয় মৃত্যু, জয় দুঃখ, জয় অপমান,
জয় সত্যে অবিচল শঙ্কাহীন প্রাণ।

গান্ধাজোড়
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

আজ শ্যামাপূজা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবামণি আজ গান্ধা আসিয়াছেন। যোগেনবাবু, শশীবাবু, অবিনাশবাবু, যতীনবাবু এবং সতীশবাবু এই পঞ্চভ্রাতার আদর-আপ্যায়নের অবধি নাই; সন্ন্যাসীদের উপরে যার দৃষ্টি চিরকাল খরতর, সেই যোগেনবাবু শ্রীশ্রীবাবামণির এমন গোঁড়া অনুরাগী হইয়াছেন যে, বাড়ীর সকলে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অর্চ্চনা উপলক্ষে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ সমবেতভাবে শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানাভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

মায়ের ছেলে

এত সমাদরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সকলকে বিনয়পূর্ব্বক নিরস্ত হইতে বলিলেন।

তাহাতে ধবনীনিবাসী শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঠক শ্রীশ্রীবাবামণিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আজ মা (অর্থাৎ মা-কালী) আসাতে যা না আনন্দ, মায়ের ছেলে আসাতে তার চতুর্গুণ আনন্দময় বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মায়ের ছেলে সবাই, আমি যেমন, আপনিও তেমন।

শশীবাবু বলিলেন,—তবু ইতর-বিশেষ রয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইতর-বিশেষ থাকৃত যদি 'মা' বলতে নয়নে অশ্রু ঝর্‌ত, প্রাণে প্রেমের বন্যা বইত। পার্থক্য হ'ত, যদি "মা — মা" বল্‌তে বল্‌তে অনায়াসে অসত্যের বিরুদ্ধে রণযাত্রা আরম্ভ কত্তে পাত্তাম, জগতের সকল অমঙ্গলকে নিমেষের মধ্যে ছারখার ক'রে দিতে পাত্তাম। মায়ের ছেলে সবাই, কিন্তু নিজেকে মায়ের ছেলে ব'লে গৌরব করার অধিকার একমাত্র তার, মায়ের কাজে যার মৃত্যু-ভয় নাই, দণ্ড-ভয় নাই, অপমান-ভয় নাই।

যোগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন,—নিজের definitionএ (সংজ্ঞাতে) নিজে আটক পড়লেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

মায়ের কাজ

যতীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—মায়ের কাজ বলতে কোন্ কাজকে বুঝব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,- মায়ের সন্তানের মঙ্গলার্থে যে কাজ, সেই কাজই মায়ের কাজ।

বলিদান

কিয়ৎকাল পরে বলিদানের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,- বলি মানে আত্মবলি। জননীর পূজার বলি হচ্ছে তাঁর শুভ্রতম চরিত্রে দীপ্ত, নিষ্কলঙ্ক মনুষ্যত্বে বিভূষিত, পবিত্রতার চির-আধার প্রিয়তম সন্তানের আত্মাহুতি। জননী বলি চান, চান তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানের আত্মবলি, তাঁর জ্ঞানগরিষ্ঠ, ত্যাগবরিষ্ঠ, উৎকৃষ্টতম সন্তানের আত্মোৎসর্গ। দেবীর পূজায় এই বলি ছাড়া অন্য কোন বলির কথা আমি ভাবতেই পারি না। পশুবলি আমার কাছে নিতান্তই যেন একটা আত্ম-বঞ্চনা ব'লে মনে হয়।

ভূতের ভয়

শশীবাবু হাসিয়া বলিলেন,—পুপুন্‌কীতে ত আশ্রম কত্তে যাচ্ছেন স্বামীজী। কিন্তু সেখানে যে প্রত্যেকটা গাছের ডালে একটী ক'রে ভূত বাস করে। তাদের নিয়ে কি করবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাদের ভূতভাবন মহেশ্বর হব! শিব হ'তে পারলে আর ভূতকে ভয় কিসের?

অবিনাশবাবু বলিলেন,—আপনি জঙ্গলের মধ্যে একটা একটা ক'রে গাছ কাটবেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের ভূতটাকে গ্রামবাসী কোনও না কোনও লোকের বাড়ী সঙ্গে সঙ্গে চালান দিয়ে দিতে হবে। তা যদি না পারেন, তা হ'লে সেই ভূত নিশ্চয় আপনার ঘাড় মট্‌কাবে। আর যদি শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, ভূতে আপনার ঘাড় মটকাতে কিছুতেই

পার্ল্লনা, তখন গ্রামবাসীরা গিয়ে আপনার ঘাড় মটকে দিয়ে এসে ভূতের ইজ্জৎ বাঁচাবে। এসেছেন কিন্তু স্বামীজী তেমন দেশে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে লাগিলেন।

গান্ধাজোড়
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

জল ও সাঁতার

অদ্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঠকের তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। তর্ক ব্রহ্মচর্য্য লইয়া।

যোগেনবাবু বলিলেন,—সাঁতার শিখিয়া পরে জলে নামিব, ইহা কখনও একটা কথাই হইতে পারে না। সংসারে চলিতে গেলে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিব, এই যদি হয় কথা, তাহা হইলে জিতেন্দ্রিয় আর হইতে হইবে না।

পাঠক মহাশয় বলিলেন,—প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া জীবন-গঠন, চরিত্রসাধন বা জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ অসম্ভব। আগুন আর ঘৃত এক স্থানে থাকিলেই বিপদ, আগুন ঘৃতকে গলাইবে, ঘৃত আগুনকে প্রবর্দ্ধিত করিবে। অতএব স্ত্রীবর্জ্জন দ্বারা আগে চরিত্র-গঠন করিয়া লইয়া তার পরে মিশা উচিত।

তর্ক বহুদূর অগ্রসর হইলে—শ্রীশ্রীবাবামণি মীমাংসা করিলেন। শ্রীশ্রী-বাবামণি বলিলেন,—একেবারে অগঠিত-চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে সাঁতার শিখিয়া জলে নামা উচিত, অর্থাৎ জলে নামিবার আগে হইতেই দুর্ব্বল ব্যক্তির উচিত বুক ডন, মুগুর ভাঁজা, স্যাণ্ডোর ডাম্বেল প্রভৃতির দ্বারা বাহুতে বল সংগ্রহ করা। যে ইহা আগে করে না, সে সাঁতার শিখিতে

নামিবামাত্রই ডুবিয়া মরে। আবার, যার বাহুতে শরীর-ভার বহনের উপযোগী বল আসিয়াছে, তাকে সাঁতার শিখিতে হইলে জলে নামিতে হয়। কিন্তু সাঁতার শিক্ষায় গুরু লাগে। ইন্দ্রিয়জয় শুধু আক্কেলের বলে হয় না, গুরুর কাছে তার কৌশল জানিতে হয়। যার চরিত্র কতকটা গঠিত হইয়াছে, সে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও বাকীটুকু গঠিত করিয়া লইতে পারে, যদি আর এক জন সবল, সক্ষম, সন্তরণ-দক্ষ ব্যক্তির হাতের উপরে বুকের ভর রাখিয়া পা দাপ্‌লায়। প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচারীরা ছিলেন প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাঁতার-শিক্ষার্থী। ব্রহ্মচারীকে গুরু স্ত্রীলোক-সংস্পর্শের, এমন কি দর্শনের সম্ভাবনা হইতেও দূরে রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু তরুণ গৃহীর জন্য সস্ত্রীক সাধনের নিগূঢ় কৌশল-সমূহও শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ছিল।

২১ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

রাঁচি

ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে সম্পর্ক

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু একজন পণ্ডিত, সাধক এবং ব্রহ্মচারী ব্যক্তি। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্ম এবং রাজনীতির পরস্পর সম্বন্ধটা কি ব'লে আপনি মনে করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এবিষয়ে প্রকৃত কথাটা কি, তা' কি আপনি বোঝেন না?

ক্ষিতীশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বুঝি, কিন্তু আপনার মতটা জান্‌তে চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংস্কারমুক্ত ধর্ম্মান্দোলন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ, সত্যনিষ্ঠ, মরণ-নির্ভীক ও দৃঢ়সঙ্কল্প করে। অতএব ধর্ম্মের মহিমা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বল দান করে, পরিপোষণ করে, ব্যাপক করে।

ক্ষিতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—দু একটা প্রমাণ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ত' সেদিন বাংলার যুবকেরা এক হাতে বোমা আর এক হাতে গীতা নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়াল। এটা কি ধর্ম্মের শক্তিতে নয়? অশিক্ষিত আরবেরা হজরত মহম্মদের ধর্ম্ম পেয়ে অসিহস্তে স্পেন থেকে সুরু ক'রে আসামের প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য স্থাপন কল্ল'। মার্টিন লুথার জার্ম্মেণীতে ধর্ম্মের নবচেতনা দিলেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তারই ফলে নূতন য়ুরোপ গঠিত হ'ল, রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের চূড়ায় তারা উঠে পড়্‌ল। পিউরিটানরা ইংল্যাণ্ডে নবধর্ম্মচেতনা দিতে চেষ্টা কল্লে'ন, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবলির এমন আবর্ত্তন হ'ল যে, নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল, অ্যামেরিকায় সভ্যতা-পত্তন হ'ল, স্বাধীনতার যুদ্ধ হ'ল। সমর্থ রামদাস স্বামী ধর্ম্মের আন্দোলন চালালেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে নূতন মহারাষ্ট্রীয় জাতির পত্তন হ'ল, শিবাজী স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র গঠন ক'রে অপক্ষপাত প্রজাশাসনের সুদুর্ল্লভ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কল্লে'ন। গুরু নানক শিখ্যসমাজে দিলেন একনিষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেম ও একেশ্বরবাদের বাণী, আর গুরু গোবিন্দ এসে সেই ইস্পাতে তীক্ষ্ণধার তরবারি নির্ম্মাণ ক'রে মুঘল-মুণ্ড ধূলিলুণ্ঠিত কত্তে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের নবচেতনা দিতে এদেশে চেষ্টা কল্লে'ন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার নূতন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হতে লাগ্‌ল। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্য-সমাজও ধর্ম্মই দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে কম রাজনৈতিক কর্ম্মী তৈরী হয় নি। ধর্ম্ম যাঁরা দেন, তারা জাতির ভিতরে নূতন তেজ, নূতন শৌর্য্য সৃষ্টি করার

উপাদানসমূহ পুঞ্জীভূত করে রেখে যান। কেন না, ত্যাগ এবং সত্য ধর্ম্মেরই দান এবং ত্যাগের পৌরুষে আর সত্যের বীর্য্যেই শক্তিশালী জাতির সৃষ্টি হয়।

সংস্কারমুক্ত ধর্ম্মান্দোলন

ব্রহ্মচারী ক্ষিতীশবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সংস্কারমুক্ত ধর্ম্মান্দোলন বল্‌তে আপনি কি বুঝাতে চান ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্প্রতি যেই সকল সংস্কার আগাছার মত ধর্ম্মাচরণের অঙ্গকে আঁকৃড়ে ধ'রে আছে এবং প্রকৃত ধর্ম্মচেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, সেই সকল সংস্কার থেকে মুক্ত রেখে যে ধর্ম্মান্দোলন, তার কথা বল্‌ছি। হাজার হাজার বিগ্রহের উপাসনা যারা করে আর নিজের আরাধ্য বিগ্রহ অপরের আরাধ্য বিগ্রহের চাইতে যে শ্রেষ্ঠ, একথা প্রমাণ করার জন্য যারা অস্ত্রধারণ করে,—এমন এক জাতির সকল সংস্কারকে ভেঙ্গে হজরত মহম্মদ সম্পূর্ণ নূতন এক জাতিতে পরিণত করেছিলেন। পোপের সিংহাসনের পায়ার সাথে নিজেদের বিবেকের মুণ্ড লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে রেখে যে খ্রীষ্টানরা পরস্মৈপদে ধর্ম্মের সেবা কচ্ছিল, মার্টিন লুথার তাদের মধ্যে আত্মসম্বিৎ, আত্মসম্মান ও আত্মচেষ্টার প্রয়োজন জাগিয়ে দিলেন। শস্যের কদর ছেড়ে দিয়ে যারা সব তুষের আদরে প্রমত্ত ছিল, গুরু নানক তাদের ভিতরে প্রকৃত সত্যকে সমাদর করার সৎসাহস জাগিয়ে দিলেন। প্রচলিত অন্ধ সংস্কারকে ভেঙ্গে ফেলার এই যে নিদারুণ সাহস, প্রচলিত বদ্ধ সংস্কারের লৌহশৃঙ্খলকে চূর্ণ করার এই যে অজেয় শক্তি, তাই পরবর্ত্তীকালে রাজনৈতিক শক্তির পুষ্টি সাধন করেছে।

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
২৪ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

মহাপুরুষের প্রকাশ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি মহাপুরুষের প্রকাশ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—কুটীর আলোকিত হয় দীপশিখায়, রজনী আলোকিত হয় চন্দ্রকিরণে, প্রান্তর আলোকিত হয় সূর্য্যরশ্মিতে কিন্তু মহাত্মারা আলোকিত হন নিজ নিজ জীবনোৎসর্গের দ্বারা। যাঁর উৎসর্গ যত তীব্র, তাঁর দীপ্তিও তত প্রখর।

আদর্শ জীবন

গাইবান্ধা (রংপুর) নিবাসী জনৈক যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে জীবনের মাঝে বিশ্বমানব তাহার দাবীর পূরণ পাইয়াছে, তাহাই আদর্শ জীবন। যে জীবনের কাছে ক্ষুধার্ত্ত পাইয়াছে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্ত পাইয়াছে জল, অজ্ঞান পাইয়াছে দিব্যচক্ষু, নির্ব্বোধ পাইয়াছে সদ্‌বুদ্ধি, তাহাই আদর্শ জীবন। যে জীবন নিজেকে লইয়াই শেষ হয় না, অপর সকল জীবনকে বুকের মাঝে পাইয়া যাহার তৃপ্তি, তাহাই আদর্শ জীবন।"

সন্ন্যাসে অকপটতা

খুলনা-নিবাসী জনৈক যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন:—

"মৃতকে বাঁচাইবার ব্রত যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে অসাধক থাকিলে চলিবে না। এক পয়সার গেরিমাটি কিনিয়া সন্ন্যাসী

সহজেই সাজা যায়, কিন্তু মৃতসঞ্জীবন তপঃসাপেক্ষ। মৃত ভারতকে যাঁহারা বাঁচাইবেন, মনে রাখিও, তাঁহারা ফন্দীবাজ চালিয়াৎ নহেন, তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষেরই ইহা কর্ম্ম। তপস্যার উপর জোর দাও, সংযম, সদাচার ও চরিত্রের উপর লক্ষ্য দাও, মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে জগৎ-সেবাকে প্রতিষ্ঠিত কর। 'Commercial Gerua' will not do (বাণিজ্যার্থে গেরুয়াতে চলিবে না)। ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিবার জন্য গৃহীত গৈরিকে চলিবে না। বিনা শ্রমে, বিনা যোগ্যতায়, বিনা ত্যাগ স্বীকারে শুধু সহজ-বিশ্বাসীর মন-ভোলান গৈরিক বসনে চলিবে না। অন্তর-জোড়া পশুত্বকে এক টুক্‌রা রং-করা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে না।"

বর্ত্তমানের যুবক

অপর একটী কর্ম্মী যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন :—

"তোমরা অন্ধকারের জীব নহ, তোমরা আলোকের শিশু। দীপ্ত জ্ঞান তোমাদের বিধিদত্ত অধিকার। সর্ব্বত্যাগের সামর্থ্য তোমাদের বিধিদত্ত বিশেষত্ব। ভোগসুখের প্রতি উদাসীন ভাব তোমাদের সহজ-সংস্কার। পূর্ব্বযুগের বহু বহু সিদ্ধ মহাপুরুষেরা মানবের হিতকল্পে এই যুগে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। তোমরা নিজেদিগকে তাহাই মনে করিও। জনক, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ গৃহী এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের ন্যায় আদর্শ সন্ন্যাসীরা তোমাদের মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইবেন।"

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
২৭ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন ও কর্ম্ম

শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র এবং হরিহর মিশ্র মহাশয়দ্বয় প্রাতঃকালে

শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত আলাপ করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন হচ্ছে অনালস্যের আন্দোলন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধানতম শত্রু কে? আলস্য ও অবসাদ নয় কি? অলসের পালই কি মনে মনে যত কুবুদ্ধি, কুচিন্তা আর কুকথার চর্চ্চা করে না? অলসেরাই কি যত গুণ্ডাগিরির আড্ডাধারী হয় না? দিনের বেলা যারা দিব্যি প'ড়ে ঘুমায়, রাত্রি জেগে যারা তাস-পাশার শ্রাদ্ধ করে, তারাই কি পরনারীর সতীত্ব-হরণে, কুমারীর কৌমার্য্য-লঙ্ঘনে, বিধবার পবিত্রতা-নাশে সব-চাইতে আগে উৎসাহবান্ হয় না? হাতে যাদের কাজ নেই, অধিকাংশ সময়ে তারাই কি সমাজ-শরীরে কামুকতার কাল-কূট বিস্তারিত করে না? তারাই কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাথা খায় না? তারাই কি গৃহে গৃহে গুপ্ত পাপের প্রবেশদুয়ার খুলে দেয় না? তারাই কি অধিকাংশ সময় যাকে ভাই ব'লে ডাকে, তার প্রতি সর্পের মত, যাকে বোন্ ব'লে সম্বোধন করে, তার প্রতি বৃশ্চিকের মত ব্যবহার করে না? তারাই কি স্বর্গের পারিজাতগুলিকে দিয়ে শিবপূজার নাম ক'রে ডাকিনী-যোগিনীর অর্চ্চনা করে না? এই জন্যই লাম্পট্যকে দেশ থেকে দূর কত্তে হ'লে, চাই আজ ঘরে ঘরে কর্ম্মশীলতার প্রতিষ্ঠা। তাই আজ ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনকে দাঁড় করাতে হবে বিশ্বগ্রাসিনী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষার উপর, অভ্রভেদিনী উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর, সংসার-বিরক্ত উদাসীনের নেতি-মূলক দার্শনিক চিন্তার উপরে নয়।

কর্ম্মী ও কর্ম্মযোগী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য জিজ্ঞাসা কত্তে পারেন, য়ুরোপ, আমেরিকা ত' কর্ম্মীর দেশ, সুতরাং তাঁদের কর্ম্মরীতিই কি আমাদের

অনুকরণীয় হবে না ? আমার উত্তর হচ্ছে,— না, তা হবে না। আমাদের হ'তে হবে কর্ম্মযোগী। কর্ম্মী কাজ করে কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করে না ; কর্ম্মযোগী কাজ করে এবং তার মধ্যে ভগবানকে দর্শন করে। কর্ম্মী ভোগ করে কিন্তু তার মধ্যে ভগবানের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সে পায় না, কর্ম্মযোগী ভোগ করে এবং তার মধ্যে দর্শন করে ভগবানকে, আস্বাদন করে ভগবানকে, স্পর্শ করে ভগবানকে, লাভ করে ভগবানকে। কর্ম্মী কর্ম্ম করে এবং নিজেকেই কর্ম্মের কর্ত্তা জেনে বিজয়ে হয় উল্লসিত, আর পরাজয়ে হয় অবসাদগ্রস্ত, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করে এবং নিজেকে কর্ত্তা না জেনে ভগবানকে জানে কর্ত্তা, ভগবানকে জানে কর্ম্ম, ভগবানকে জানে কর্ম্মফল, ভগবানকে জানে লাভ ও ক্ষতি, ভগবানকে জানে জয় ও পরাজয়, অভ্যুদয়ে সে উল্লসিত হয় না, অধঃপতনে সে নিরাশ, নিরুদ্যম, মৃত্যু-তিমিরাচ্ছন্ন হয় না।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও কর্ম্মযোগী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমগুলিকে হ'তে হবে কর্ম্মযোগাশ্রম। কোন্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কঠোরতম ব্রতসমূহ উদ্‌যাপিত কর্ব্বেন, তা' নির্দ্ধারিত ক'রে দেওয়া ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের কাজ নয়। কারণ যার যার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দিয়ে, আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন রুচি দিয়ে ব্রহ্মচারীরা তা' যথাসময়ে নিজেরাই ঠিক ক'রে নেবে,—ওর জন্যে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের প্রকৃত কাজ হ'ল, প্রতি কর্ম্মের মধ্যে ভগবানের যোগটুকুকে উপলব্ধি করার কৌশলটীকে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া। আশ্রম ছেড়ে কে বেঙ্গল–

সেক্রেটারিয়েটে * কলম পিষ্‌বে, আর কে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনে হাউইট্‌জার কামানে গোলা চালাবে, তার নির্দ্ধারণ করুক যার যার স্বাধীন রুচি। কিন্তু, যে গিয়ে কলম পিষ্‌বে, সে যেন কলমের ভিতরে, কাগজের ভিতরে, দোয়াতের ভিতরে, কলম পেষবার ক্ষমতার ভিতরে, সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখ্‌তে পায়। যে গিয়ে কামান চালাবে, বর্শা চালাবে, সে যেন কামানের ভিতরে গোলার ভিতরে, তলোয়ারের ভিতরে, ছিন্নশির সৈনিকের রুধিরস্রোতের ভিতরে, রণ-কোলাহলের ভিতরে, মৃত্যুর বিশৃঙ্খল উন্মাদনার ভিতরে—সর্ব্বত্র ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পায়। ভগবান্ তার প্রতি অঙ্গের প্রতি গতি ও বিরতিতে নিজেকে সুস্পষ্ট করুন, এইটাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য।

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম কাহাদিগকে সৃষ্টি করিবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—দেশ চাচ্ছে ত' মানুষ। দেশ এমন সব মানুষ চাচ্ছে, যারা তাদের সমস্ত শক্তিকে যে কোনও একটী কাজের জন্য জাগিয়ে তুল্‌তে পারে, কাজে হাত দিলে যার শক্তির একটী কণাও ঘুমিয়ে থাকৃতে পারে না, এককণা সামর্থ্যও যার কখনো কুণ্ঠায় মুখ ফিরায় না। এমন উদ্যত বজ্রের মত তেজস্বী কর্ম্মীকে দেশ চায়। কিন্তু তার সামর্থ্য যদি দু'দিন শ্রম ক'রেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে? জীবের শক্তি ত' সীমাবদ্ধ। তাই চাই তেমন বজ্র, যার বিদ্যুৎ একটুখানি চ'খ-ধাঁধানি দিয়েই মিলিয়ে যায় না, পরন্তু, বজ্রের সাথে বাস করে চির-অবিনশ্বর হ'য়ে।

---

* এই সময়ে ইংরেজের রাজত্ব ছিল। সরকারী দপ্তরখানায় যাঁহারা কাজ করিতেন, তাঁহাদের বুদ্ধি ও প্রতিভা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দমনের কার্য্যেই প্রযুক্ত হইত।

এই জন্য বালক ব্রহ্মচারীর চাই শক্তিস্বরূপ ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগের ব্যবস্থা আর দীর্ঘকালব্যাপী প্রাত্যহিক ত্যাগ স্বীকারের পদ্ধতিবদ্ধ অনুশীলন যাতে সম্ভব হয়, তার অনুকূল অবস্থা। যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম এইটুকু কত্তে পার্ব্বে, আশ্রম ব'লে পরিচয় দেবার অধিকার মাত্র তারই আছে।

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪

সহজতম যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি অনুচর ব্রহ্মচারীর নিকটে যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যুকালেও জীব যে-যোগ থেকে ভ্রষ্ট হয় না, মরণের শীতল স্পর্শও যে-যোগপ্রণালীকে স্তব্ধ কত্তে পারে না, তাই সহজতম যোগ। যোগের এই সহজতম প্রণালীকে তপস্বি-সমাজ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধ'রে খুঁজেছেন। নিম্নাধিকারীরা লাফালাফি আর মালাঝোলা নিয়েই বিব্রত রইলেন, ভাগ্যবান্ তাপস সহজ যোগ পেয়ে গেলেন। মনকে যখন চেষ্টা ক'রে অভিনিবিষ্ট কত্তে হয় না, তখন জান্‌বে যে সহজ যোগ হচ্ছে। কৃত্রিমতার সঙ্গে যখন সংস্পর্শমাত্র রাখ্‌তে হয় না, তখন জানবে যে সহজ যোগ হচ্ছে।

সহজ যোগের সহজতম পথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহজ যোগের সহজতম পথ হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত ব্যবস্থার উপরে নিজে গায়ে পড়ে কোনও জবরদস্তি না করা। শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি দিয়েছেন, হৃৎস্পন্দন তিনি দিয়েছেন, এরা সব নিজ নিজ নিয়মে আপনা আপনি চলেছে, তার উপরে জোর খাটিয়ে নিজে কিছু না করা। স্বভাবতঃ যা হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কেবল ধ্যানের, মনের,

নামের যোগ রেখে যাওয়া। চেষ্টা ক'রে কুম্ভক নয়, প্রাণায়াম নয়, হৃৎস্পন্দন-স্তম্ভন নয়,—কেবল তাঁর ইচ্ছানুসারে বিহিত স্রোতের সঙ্গে জোয়ার-ভাঁটার অন্তরের যোগ রক্ষা ক'রে যাওয়া। অনেক সময়ে উপদেষ্টারা অমনোযোগ সহকারে শিষ্যদের উপদেশ দেন, এমন কি যেন তেন প্রকারেণ একজনকে শিষ্যত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে ফেলার ব্যগ্রতায় উপদেশ ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া হ'ল কি না, তার বিষয় পর্য্যন্ত ভেবে দেখেন না। তারপরে যখন একনিষ্ঠ শিষ্যেরা নির্দ্দেশ পালন কর্ব্বার সহজ বিশ্বাসে শ্বাসের উপরে জোর দিয়ে কাজ কত্তে কত্তে দারুণ রোগে পড়ে, তখন বেমালুম কবুল জবাব দিয়ে বসেন,—"আমি ত' বাবা ঠিকই বলেছিলুম, তুমিই মনোযোগ দিয়ে সব বুঝে নাও নি।" মনে রেখো, বলপ্রয়োগ নয়, জোর-জবরদস্তি নয়, স্বভাবের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর রেখে ঈশ্বর-দত্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে পরমেশ্বরকে স্মরণই হচ্ছে সহজ যোগের সহজতম পথ।

নির্ভর-যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নির্ভরের মত সুখ নাই। কি ভাবে তোমার শ্বাস চলছে আর থাম্‌ছে, তা নিয়ে নিজের কোনও পুরুষকার প্রয়োগ না ক'রে এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপরে নির্ভর ক'রে থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস কেবলই যে চল্‌ছে, তা নয়; আবার থাম্‌ছেও। ক্ষণকাল ক'রে থাম্‌ছে, তবু থাম্‌ছে। এই থামাটা ঈশ্বরেরই বিধানে হচ্ছে। এজন্য কাউকে কোনো চেষ্টাই কত্তে হচ্ছে না। সেই স্তব্ধ অবস্থাটার নামই হচ্ছে কুম্ভক। এখন যেমন অল্প অল্প সময় ধ'রে এই থামা-থামিটা হচ্ছে, তাঁর উপরে নির্ভর ক'রে থেকে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ ও ইষ্টচিন্তা কত্তে কত্তে পরে এই কুম্ভকটাই দীর্ঘতর সময়

ব্যেপে হবে। এ একেবারে ধ্রুব সত্য। নির্ভরের যে কত বল, কত শক্তি, তা একান্ত ভাবে নির্ভর ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর। শ্বাসের আর প্রশ্বাসের সঙ্গে নামকে আর ধ্যানকে যুক্ত ক'রে রাখার অধ্যবসায়টুকু মাত্র তোমার নিজের প্রয়োজন। বাকী সবটুকুরই জন্য চাই সম্পূর্ণ নির্ভর। এজন্যই এর আর এক নাম নির্ভর-যোগ।

স্বাধীনতার সম্মান করি

এই সময়ে কাতরাস-গড় হইতে জনৈক আগন্তুক আসিলেন। তিনি আসিয়া জনৈক সন্ন্যাসী মহোদয় সম্পর্কে নানা মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী মহাশয় জনৈক খ্যাতনামা ব্রহ্মচারীর শিষ্যরূপে এই দেশে আসিয়া জন-সমাজে বিশেষ ব্যাপক পরিচয় অর্জ্জন করেন এবং যখন নিজের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং পরিচিত-মণ্ডলের সহায়তায় বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মচারী-গুরুদেবকে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ও তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে নানারূপ অনুকূল প্রতিকূল মন্তব্যের পরে ভদ্রলোক এই বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবামণির অভিমত জানিতে চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আপনার বর্ণিত বিষয়ের যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ যখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন মন্তব্য দেওয়াও নিরর্থক। তা ছাড়া পরচর্চ্চায় গিয়ে লাভ কি? জগতের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মতে নিজ নিজ পথে চলবার স্বাধীনতা আছে। কেউ যদি নিজেকে নির্দ্দিষ্ট গুরুর শিষ্য ব'লে পরিচয় দিতে আনন্দ পান, তা হ'লে যেমন আমার বলবার কিছু নেই, তিনি যদি নিজেকে কোনও নির্দ্দিষ্ট গুরুর প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে চলা লাভজনক জ্ঞান করেন, তা হ'লেই

বা আমার অথবা আপনার মতামত দেবার কি থাক্‌তে পারে? জগতে আমি মানুষের স্বাধীনতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করি।

মিথ্যা গুরু

কিন্তু তথাপি উপস্থিত ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা ঐ একটী সূত্র ধরিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যক্তি-বিশেষের আচরণের দোষ-গুণ বিচারের দিক্ বাদ দিয়ে আমি সাধারণ ভাবেই নিজের মতামত প্রকাশ কত্তে পারি। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধটা এমন একটা সম্বন্ধই নয় যা জোর ক'রে কৌশল ক'রে, ছলনা-কপটতার সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। একজন লোকের আর একজন লোককে দেখে বেশ ভাল লাগ্‌ল, আর সেই সাময়িক মানসিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অপর ব্যক্তি তার কাণে একটা মন্ত্র ফুঁকে দিয়ে বল্লেন,—"এই আমি গুরু হ'লাম", গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ এভাবে সৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। এভাবে এই সম্বন্ধ সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে ফুসলে নিয়ে বা বলাৎকার ক'রে নারীকে নিজের পত্নী করে নেওয়ার সঙ্গে বেশ একটা ব্যবহারিক সাদৃশ্য আছে। ফুসলান বা বলাৎকৃতা স্ত্রী যেমন স্বল্পকাল পরেই তথাকথিত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা এমন কি নিষ্ঠাও হারায়, এই ভাবে শিষ্য কর্‌তে গেলে এই সব গুরুদেবদের শিষ্যরা অনেক সময়ে গুরুর প্রতি তেম্‌নি অতি অল্প-কাল মধ্যেই শ্রদ্ধা-ভক্তি হারায়। রেজেষ্টারী-অফিসে দলিল রেজেষ্টারী কত্তে গিয়ে অনেক সময়ে দলিলে নিজের পরিচয়টা কি ভাবে দিব স্থির কত্তে না পেরে অনেক শিষ্য হয় ত ঐ ব্যক্তির নামটীকেই গুরুরূপে লিখিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে তার অন্তরের সায় থাকে না, ফলে রেজেষ্টারী করা বিবাহ যেমন অনেক সময়ে মিথ্যা হ'য়ে যায়, তেমনই রেজেষ্টারি দলিলের

নাম-পরিচয়ও মিথ্যা হ'য়ে যায়। গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে বৎসরের পর বৎসর ধরে দেখে শুনে নিজেকে তার উত্তরণের যোগ্য ব'লে ধারণা হ'লে তবে তার গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করা। কোনও প্রকারে একটা মন্ত্র দান ক'রে ফেলে একটা লোককে চিরজীবনের মত আটক ক'রে রাখার মত কুবুদ্ধি আর জগতে কিছু নেই। নবযৌবনবতী কুলীন-কন্যা যেমন মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার দুই দিন পরেই বিধবা হয় এবং জোর ক'রে বেঁধে তাকে সহমরণে পাঠালেও সে সুযোগ পেলেই পলায়ন করে, এই সব স্থলেও তেমনি দুই চারি দিন গুরুশিষ্যের প্রেমাভিনয় চলবার পরে হঠাৎ গ্রন্থি-বন্ধন ছিঁড়ে যায়, শিষ্য গুরুকে পরিহার ক'রে নিজ পথে চলে যায়। শিষ্য তার প্রথম মোহে এই গুরুর প্রতি যতই বিনম্র বিনীত ভাব প্রদর্শন করুক না কেন, জোর ক'রে এসব ক্ষেত্রে শিষ্যকে চিরকাল শিষ্য ব'লে বেঁধে রাখা জগতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। শিষ্য তার চরিত্রের স্বভাবগত বিনয়-বশতঃ হয়ত বাহ্য ব্যবহারে ভবিষ্যতেও কোনও দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করে না কিম্বা নিজের স্বভাবগত কোনও দুর্ব্বলতা বা ভ্রান্তি বশতঃ এই গুরুর কাছে দুই একবার মাথা খুঁড়্‌তেও যায়, তবু জানতে হবে, এ সম্বন্ধ সত্য নয়। মিথ্যা এখানে গুরুদেবের গুরুত্বের অভিনয়, মিথ্যা এখানে শিষ্যের আনুগত্যের অভিনয়।

শিষ্যের অকৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কোনও শিষ্য যদি গুরুদেবের শিষ্য-রূপে নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ নিয়ে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রে থাকে আর তারপরে ব'লে বসে যে উনি তার গুরু নন, তা হ'লে

তাকে অকৃতজ্ঞ ব'লে জান্‌তে হবে। যাকে ধ'রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে, তাকেই সে অস্বীকার কর্ব্বে? অকৃতজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ নয়।

লঘুত্ব-প্রাপ্ত গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যেখানে তথাকথিত শিষ্যের স্বোপার্জ্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত ক'রে তথাকথিত গুরু জনসমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার চেষ্টা করেন, সেখানে তিনি যে ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন সুচতুর গুরু, তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু তিনি এই শিষ্যের হৃত্তাপহারী গুরু হবার অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত থাকেন। শিষ্যের নাম-যশকে, শিষ্যের দীপ্ত কীর্ত্তিকে, শিষ্যের দিগ্দেশ-ব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তিকে যিনি নিজের গুরুগিরির পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রয়োগ করেন, তিনি গুরু নামের যোগ্যই নন। এ:ক্ষেত্রে তিনি লঘু হয়ে যান। যে শিষ্য নিজ অনুভূতির রাস্তা ধ'রে সত্যের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে এবং তারই ফলে ভিতরে বাহিরে অগণিত নরনারীর শ্রদ্ধা ও আত্ম-প্রসাদের জনক হচ্ছে, সুকৌশলে তাকে নিজের শিষ্যদের মুখে মুখে জনসমাজে স্বকীয় শিষ্য ব'লে পরিচিত করিয়ে করিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা লঘুত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ। গুরুত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিচয় এতে মোটেই নেই। এ সব ক্ষেত্রে শিষ্যকে নিজের সাময়িক-অভ্যস্ত দুর্ব্বলতা এবং মোহ পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমেশ্বরকেই গুরু জেনে তাঁরই চরণে পূর্ণ আনুগত্য রেখে অগ্রসর হ'তে হয় এবং কে কোথা থেকে পিছন-টান দিয়ে পথ-বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা কচ্ছে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ-হীন হতে হয়।

মৃত্যুকালে ভগবৎ-স্মরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভগবৎ-স্মরণকে একেবারে স্বভাবে পরিণত করা চাই, তবে ত' মৃত্যুকালেও ভগবানের নাম মনে আস্‌বে। তবে ত' পরমা গতি লাভ করা যাবে! সমগ্র জীবন যে যে-চিন্তা করে, তাই তার স্বভাবে পরিণত হয়। প্রতিদিন যে রাগ হ'লেই উপেক্ষাভরে অন্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, মরণকালেও সে মুখ বাঁকিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেই চেষ্টা করে। সমগ্র জীবন যে চর্চ্চা করেছে কামের আর লালসার, মৃত্যুকালে তার চিত্ত কাম আর লালসা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অনুক্ষণ যে আস্বাদন করেছে শুধু বিষয়-রস, মৃত্যুকালে নামের রসে তার মন মজ্‌তে চায় না। প্রতিদিন যে ক'রে এসেছে চক্রবৃদ্ধির হিসাব আর গুণে এসেছে সুদের কড়ি, মৃত্যুকালে তার কর আর ভগবানের নাম জপ্‌তে চায়ও না, পারেও না। অন্তে যদি সদ্গতি লাভ কত্তে হয়, তবে তাঁর নামকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অন্তরে জপতে হবে, তাঁর নামকে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণ ক'রে রাখ্‌তে হবে। এমন অভ্যাস কত্তে হবে যেন শেষ নিঃশ্বাসেও নামেরই হুঙ্কার গর্জ্জে ওঠে।

নারীর সতীত্ব

স্ত্রীজাতির প্রসঙ্গ উঠিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীর সতীত্বকে আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার গোড়ার ভিত্তি বলেই মনে কচ্ছি। কিন্তু সতীত্ব বল্‌তে বুঝে যাচ্ছি কাকে? সতীত্ব বলে কাকে? কি ভাবে জীবন পরিচালনা কর্ল্লে নারীকে সতী নারী বলা যায়? একটীমাত্র স্বামীর ভজনা করাই কি সতীত্বের চরম নিদর্শন? অন্য পুরুষে যার মন যায় না, সেই নারী যদি তার স্বামী নিয়ে দিনরাত শুধু তামসিক চর্চ্চায়ই

কাল কাটায়, তা'হলে কি তাকে সতী বলা চল্‌বে ? না, তা চল্‌বে না। নারীকে সৎস্বরূপ পরব্রহ্মের কাছে কত্তে হবে সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ, নিজেকে আগে জান্‌তে হবে শ্রীভগবানের একান্ত সেবিকা, তারপরে সেই ভগবানকে দর্শন কত্তে হবে স্বামীর ভিতরে, স্বামীর ভালবাসার ভিতরে। দাম্পত্য-জীবনটাকে প্রত্যক্ষ ভগবদ্দর্শনের জীবনে পরিণত কত্তে হবে, তবে গিয়ে হবে যথার্থ সতীত্বের সাধনা।

সতীত্ব-সাধনার অন্তরায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু সতীত্বের সাধনা স্বামীর সাহচর্য্যসাপেক্ষ। এ সাধনার ইন্ধন যদি স্বামীও না জোগান, তাহ'লে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না। স্বামী যদি পশুর মত জীবনযাপন কত্তে চান, তাহ'লে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে সৎস্বরূপের প্রতিনিধি ব'লে ধারণা করা সম্ভব হয় না। স্বামী যদি না হন সৎস্বরূপের সেবক, তাহ'লে স্ত্রী তাঁর হাসিতে ভগবানের হাসি, তাঁর কথায় ভগবানের কথা শুন্‌তে চাইলেও যে শুন্‌তে পান না! স্বামীর অশুদ্ধতা স্ত্রীর সতীত্ব-সাধনার এক অতি প্রবল অন্তরায়।

সাধিকা নারীর শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, এ অন্তরায় সত্ত্বেও নিজের জীবনের কুম্ভ ব্রহ্মামৃতের ধারা দিয়ে পূর্ণ ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা মায়ের জাতির আছে। ওরা হচ্ছে মহাশক্তির অংশ ; ওরা না কত্তে পারে, এমন অসাধ্য কিছু নেই। সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেতে নিজেকে একেবারে লীন করে দিয়েও ওরা পশুস্বভাব স্বামীর সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে ঘর

কত্তে পারে। সমাজ-ধর্ম্মের মুখ চেয়ে ওরা স্বামীর সঙ্গে দেহের সম্পর্ক রাখে কিন্তু আত্মধর্ম্মের প্রেরণায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখে ব্রহ্মসাগরের অতলতলে।

নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও ভারতের অধোগতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীজাতির এই অসামান্য শক্তিকে অবজ্ঞা ক'রেই ভারতবর্ষ অবনতির গভীর অন্ধকূপে ডুবেছে। দীর্ঘকাল থেকে স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্মের সঙ্গিনীরূপে ভাবা বন্ধ হয়েছে। তার দিকে পুরুষেরা তাকিয়ে আসৃছে শুধু ভোগের দৃষ্টিতে, কামের চোখে, লালসার প্ররোচনায়। সমগ্র পুরুষ-জাতিকে আবার নূতন ক'রে তাকাতে শিখ্তে হবে, নারীর মুখে, নারীর চ'খে নূতন মহিমা খুঁজ্তে হবে।

ভগবানই স্বামী

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীরা নিকৃষ্ট আর পুরুষেরা উৎকৃষ্ট, এই যে এক অন্ধ সংস্কার আমাদের মনের মাঝে ঢুকে বাসা ক'রে ব'সে আছে, এটাকে দূর কত্তে হবে সর্ব্বাগ্রে। দেহ-দৃষ্টিতে বিচার কর, একই রস, রক্ত, ক্লেদ, পূঁযাদি দ্বারা কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই শরীর নির্ম্মিত। উভয়েরই দেহ রোগ-শোকের অধীন, ক্ষয়-বৃদ্ধির অধীন, জন্ম-মৃত্যুর অধীন। তবে আর ছোট বড় কে? আত্মদৃষ্টিতে বিচার কর, উভয়ের মধ্যেই বিরাজ কচ্ছেন এক জগদীশ্বর, এক পরমাত্মা, একই সর্ব্বান্তর্য্যামী। ইন্দ্রিয়-চিহ্নের পার্থক্য শরীরের আছে কিন্তু আত্মার ত' আর স্ত্রী-পুরুষ নাই! আত্মা ত' উভয়েরই এক নির্ব্বিকার, নিষ্কলুষ, নিরঞ্জন পরব্রহ্ম। তুমি যে ভোগের দৃষ্টিতে তাকাও, কার দিকে তাকাও?

কাকে ভোগ কর? কে কার ভোগ্য? পতি ব'লে অহঙ্কার কর, কিন্তু কে কার পতি? ইচ্ছামত তুমি তোমার স্ত্রীর দেহটাকে গড়্‌তে ভাঙ্গতে পার? তবে আবার পতি কিসের? ইচ্ছামত তুমি তার রূপ-লাবণ্য বাড়াতে কমাতে পার? তবে আবার স্বামী কেমন? ভাব্‌ছ, স্ত্রী তোমার ক্ষেত্র, তুমি ক্ষেত্রপতি। কিন্তু এ ভাবটাই যে ভুল। জগতে পতি শুধু একজনই আছেন, যিনি সকলেরই পতি, স্ত্রীরও পতি, স্বামীরও পতি, বীজেরও পতি, ক্ষেত্রেরও পতি, ফসলেরও পতি।

স্বামী বড় না স্ত্রী বড়?

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং লড়াই করা বৃথা যে, বীজ বড় না ক্ষেত্র বড়। বীজে যে অঙ্কুর গজায়, তার কারণ ত' শুধু এই যে, এতে ক্ষেত্রপতি শ্রীভগবানের শক্তি নিহিত আছে। ক্ষেত্র যে বীজকে মৃদু উষ্ণতা দিয়ে ফুটিয়ে তোলে, অঙ্কুরের রস জোগায়, তারও ত' কারণ এই যে, এতে ভগবানের শক্তি ছড়ান রয়েছে। ভগবান্ যদি স'রে দাঁড়ান, ভূমি বন্ধ্যা হবে। বীজ ও ক্ষেত্রের সঙ্গে সূর্য্যের যে সম্বন্ধ, স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গে ভগবানের সে সম্বন্ধ। ভগবান স্বামীরও পতি, স্ত্রীরও পতি, স্বামীরও গুরু, স্ত্রীরও গুরু, স্বামীরও শেষ লক্ষ্য, স্ত্রীরও শেষ লক্ষ্য। স্বামী ও স্ত্রী সম-সাধক-সাধিকা। একজন আর একজনকে বিয়ে করেছে ব'লেই কেউ বড় কেউ ছোট নয়, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যার যত শিথিল হ'য়েছে, সে তত ছোট, আর ভগবানের সঙ্গে যার সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হ'য়েছে, সে তত বড়। নারী ও পুরুষের বড়-ছোটর বিচার হবে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের হিসাব দিয়ে, কে কাকে গায়ের জোরে অধীনা করেছে বা কে কাকে রূপের মোহে ক্রীতদাস করেছে, তা দিয়ে নয়।

দেশের সেবায় কর্ম্মী-সংগ্রহ

রাত্রিতে আহারের পর শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আসার পর হইতেই স্থানীয় ভদ্রমহোদয়েরা সর্ব্বদা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং নানা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা দ্বারা সৎ-প্রসঙ্গে সময়াতিপাত করিতেছেন। এই সকল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসুর মধ্যে হরিবাবু একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। হরিবাবুর সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—স্বদেশের সেবামূলক মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য অসংখ্য কর্ম্মীর আবশ্যকতা, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়ে কোন দেশ-হিতৈষীর সাথে আমার মতভেদ নেই কিন্তু মত-ভেদ হচ্ছে, কর্ম্মী-সংগ্রহের পন্থা নিয়ে। আমি মনে করি না যে, হুজুগাকৃষ্ট কর্ম্মীরা দীর্ঘকাল কোনও মহৎ কর্ত্তব্য নিয়ে মরণ-সঙ্কল্প ক'রে লেগে থাকৃতে পারে। আমি মনে করি না যে, কারো মনে কৃত্রিমভাবে সাময়িক একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পার্‌লে, তারই প্রভাব তাকে খাঁটি কর্ম্মী ক'রে গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হবে। আমি মনে করি না যে, আমাদের স্বদেশ-সেবার বুদ্ধির ভিতরে যদি কোথাও চালাকী থাকে, তবে তা' বাইরের কলরব দিয়ে ঢেকে রাখা চলবে এবং ফলে কর্ম্মীদের কাছ থেকে ষোল আনা সততাশুদ্ধ কর্ম্ম পাওয়া যাবে। পরন্তু আমি মনে করি, প্রকৃত কর্ম্মী যদি সংগ্রহ কত্তে হয়, তবে হুজুগের বাইরে দাঁড়িয়ে তা' কত্তে হবে। আমি মনে করি, খাঁটি কর্ম্মীকে যদি আকৃষ্ট কত্তে হয়, তবে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর বা বক্তৃতার বহর দিয়ে না ক'রে, একনিষ্ঠ প্রাণের নীরব আহ্বানের বলেই তা' কত্তে হবে, পুঞ্জীভূত ইচ্ছাশক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহের মুখ খুলে দিয়েই তা' কত্তে হবে। আমি মনে করি, নিজেদের

স্বদেশ-সেবার চেষ্টার ভিতর থেকে সর্ব্বপ্রকার কপটতা, অসত্য, গলদ ও ত্রুটী দূর কর্ব্বার ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে যে স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি আপনা-আপনি প্রবুদ্ধ হবে, তারই প্রভাবে কর্ম্মীরা সব নিজেদের প্রাণের টানে ছুটে আস্‌বেন। দিন দিন আমার এই ধারণাই দৃঢ়তর হচ্ছে। প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যতই বেশী পরিচয় লাভ কচ্ছি, ততই বিশ্বাস আমার গভীরতর হচ্ছে যে, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা যত গভীর হবে, যত নিবিড় হবে, যত সত্য হবে, যোগ্য সহকর্ম্মীরা তত দ্রুত চারদিক থেকে ছুটে আস্‌তে থাক্‌বেন। যোগ্য কর্ম্মী যদি বাংলায় না থাকেন, তবে তিনি আস্‌বেন বোম্বে, মাদ্রাজ, বার্ম্মা থেকে, ভারতে না থাকেন, তবে আস্‌বেন চীন, জাপান, পারস্য থেকে, এশিয়ায় না থাকেন, তবে আসবেন ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, আমেরিকা থেকে, পৃথিবীতে না থাকেন, তাহ'লে আস্‌বেন, সূর্য্য থেকে, চন্দ্র থেকে, মঙ্গল থেকে, শুক্র থেকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য চিন্তার মৃত্যু নাই।

কর্ম্মীর অভাব হয় না

তৎপরে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কত লোকই দেশের কাজে নাম্‌ছে আর কত লোকই পালাচ্ছে, কিন্তু তার জন্যে কি কাজ বন্ধ থাক্‌ছে? কখনই নয়। একদল যাবে আর একদল অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটে আস্‌বে দেশের কাজ হাতে তুলে নেবার জন্যে। কোনো দিনই সৎকাজ লোকের অভাবে আটকে থাক্‌ছে না, একজন যায় ত' আর একজন আসে। যোগ্য ব্যক্তি যাবে ত' যোগ্যতর ব্যক্তি এসে তার ত্যক্ত আসন অধিকার কর্‌বে। আর, এ ভারত-ভূমি ত' বন্ধ্যা নন যে, একজন যোগ্য পুরুষ অন্তর্হিত হ'লে আর একজন কেউ জন্মাবেন না। বল্‌তে কি, আজ্‌কের ভারতবর্ষকে দেখে ভবিষ্যতের

ভারতবর্ষকে আমরা কল্পনাও কত্তে পারি না। বর্ত্তমান কর্ম্মীরা যখন লীলা গুটাবেন, তখন তাদের শতগুণ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নূতন মহাত্মারা আবির্ভূত হবেন।

বাঙ্গলার নিকটে ভারতের দাবী

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাঙ্গলার নিকটে ভারতের দাবী হচ্ছে, বৃহত্তর বাঙ্গলা। বাঙ্গালীকে আজ সমগ্র ভারতময় ছড়িয়ে পড়্‌তে হবে, তার ভাবময় প্রাণ নিয়ে আর প্রাণময় ভাব নিয়ে। উকিল, মোক্তার, আর সরকারী চাকুরে রূপে নয়, এমন কি ব্যবসায়ী বা শিল্পী-রূপেও নয়, পরন্তু আজ বাঙ্গালীকে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌তে হবে, তার সেবাপরায়ণ কোমল হৃদয় নিয়ে, তার প্রেমসিক্ত জ্ঞানের পসরা নিয়ে। প্রাণের শক্তি নিয়ে বাঙ্গলাকে ভারত জয় কত্তে হবে, আর প্রাণের মধ্য দিয়ে তাকে সমগ্র ভারতের পদতলে নিষ্কাম আত্মসমর্পণ কত্তে হবে।

বাঙ্গালীত্বের পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা খুব জরুরী কথা কিন্তু ভুলে যেও না। তুমি যে বাঙ্গালী, এই পরিচয়টা তোমার কিসে হ'ল? বাঙ্গলা দেশে জন্মেছ বা বাংলা ভাষায় কথা বল, এইটুকুই কি তোমাকে বাঙ্গালী ব'লে পরিচিত করার পক্ষে যথেষ্ট? বাংলা দেশে জন্মালে বাঙ্গালী হয়, এটা তোমার সাধারণ পরিচয়। কিন্তু যেই বাংলা অনাদি কাল থেকে বহু সাধনার সমন্বয়কে এক ক'রে দেখে আসবার চেষ্টা করেছে, যেই বাংলা বাংলার জন্য স্বাধীনতা চায় নি, চেয়েছে নিখিল ভারতের জন্য, যেই বাঙ্গালী কবি, বাগ্মী ও দার্শনিকের লেখনীতে, কণ্ঠে, চিন্তায় জেগে

উঠেছে নিখিল বিশ্বের পরম দুঃখের পরিসমাপ্তির সঙ্কল্প-ঘোষণা, তুমি সেই বাঙ্গালী,—এইটাই তোমার আসল রূপ। সেবাসিদ্ধ করযুগ নিয়ে তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়। সর্ব্বত্র গিয়ে জগদ্বাসীকে বল,—এসেছে তোমার আত্মীয়, এসেছে তোমার আপন জন, এসেছে আজ তোমাকে সেবা দিতে, প্রেম দিতে, সরল সহজ অকপট আবেগে প্রতি মানবে পূর্ণতা, তৃপ্তি, আনন্দ ও সার্থকতার মূল সম্পদ বিতরণ কর্ত্তে, এসেছে না পেয়ে না চেয়ে কেবল দিতে আর দিতে, সকলের কুশলের মধ্য দিয়ে আত্মাহুতি দিয়ে সমগ্রের সৌষ্ঠবকে জাগ্রত ক'রে তুলতে। এই যদি পার, তা'হলে বাঙ্গালী ভারতের একটা প্রান্ত মাত্রেরই অধিবাসী নয়, সে তখন বিশ্বমানব।

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
২৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৪

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও চিন্তার স্বাধীনতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা-নিবাসী জনৈক যুবকের পত্রের উত্তরে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লিখিলেন। সেই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে সন্নিবদ্ধ হইল। যথা,—

"রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ সম্বন্ধে তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অধিকারের বৈধতা আছে যদি কোনও পথ ভাল বোঝ, তবে তাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পার, নির্ভয়ে সে পথে চলিতে পার, নিজেকে সে পথের পায়ে নির্ম্মম ভাবে বলি দিতে পার। আমি নিজের পক্ষে রাজনৈতিক পন্থাকে প্রয়োজনীয় বোধ করি নাই। এই জন্যই যে তোমাদিগকে রাজনীতি পরিহার

করিয়া চলিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। আমার শক্তি, সামর্থ্য, রুচি, প্রকৃতি, আশা ও আদর্শ রাজনৈতিক কর্ম্মকোলাহলকে ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহার কারণ এই নহে যে, রাজনীতি খারাপ জিনিষ। পরন্তু, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, অধিকারী-ভেদে কর্ম্ম-বিভাগ স্বধর্ম্মের অনুকূল। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে রাজনীতি আবশ্যক,—শুধু আবশ্যক নহে, এমন কি ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে ইহা তত জরুরী নহে। কাহারও পক্ষে অন্য কোনও কর্ত্তব্যের ডাক হয়ত গভীরতর হইতে পারে। কাহারও পক্ষে দেশের অপর কোনও প্রণালীর সেবা হয়ত বৃহত্তর, মহত্তর ও কঠিনতর বলিয়া মনোযোগ দাবী করিতে পারে। * * * কেহ হয়ত দূরবীণ কষিয়া একশত বা তিনশত বৎসর পরের ভারতবর্ষের পানে দৃষ্টি দিতে পারেন।

"মৌলিক ও লাক্ষণিক, এই উভয়বিধ চিকিৎসাই জগৎ-সমাজে সম্মানিত স্থান পাইয়াছে। যাঁহারা রোগের মৌলিক চিকিৎসা না করিয়া লাক্ষণিক চিকিৎসা করেন, তাঁহারা অনুবীক্ষণ ধরিয়া উপস্থিত উপসর্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া সদ্যঃ ঔষধ প্রয়োগের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। ইহা আমি তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় মনে করি না। বরঞ্চ আমি এইরূপই মনে করি যে, সমগ্র শক্তিকে রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মপন্থায় প্রযুক্ত করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্বধর্ম্ম বা স্বভাব-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' স্বভাব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা করা ভয়ানক ব্যাপার, উহাতে না হয় দেশের সেবা, না হয় নিজের কল্যাণ। নিজ নিজ রুচিমত উপসর্গ বা মূলের চিকিৎসা করিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতির দিক্

হইতে যখন দেশের দুঃখকে বিচার ও বিশ্লেষণ করি, তখন অনুভব করি, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের আসল রোগ নহে, পরন্তু মূল রোগের একটা অবশ্যম্ভাবী ও সঙ্কটময় উপসর্গ মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে তেমন কাহারও উপর চাপাইয়া দিবার আমার রুচি হয় না, স্বাভাবিকভাবে নিজেই যে এ-সিদ্ধান্তকে অন্ততঃপক্ষে অস্পষ্টভাবে হইলেও নিজের অন্তরের মাঝে খুঁজিয়া পায় নাই। ইন্‌জেক্‌শানের চিকিৎসাও জন-সমাজে উচ্চ সমাদর পাইবে সত্য, কিন্তু বাহির হইতে ভিতরে আনিয়া প্রেরণা প্রবিষ্ট করিবার অপেক্ষা ভিতর হইতেই প্রেরণাকে স্বভাবতঃ প্রস্ফুটিত দেখিতে আমি বেশী ভালবাসি। এজন্যই নিজ সিদ্ধান্ত দ্বারা অপরের জীবনকে প্রভাবিত, পরিচালিত বা আবিষ্ট দেখিতে আমি আদৌ আগ্রহশীল নহি। আমি চাহি,—যিনি যেমন-ধারার কর্ম্মের যোগ্য, তিনি তেমন পন্থা বাছিয়া লউন। যাহার হৃদয়-বীণায় যেমন চিন্তাধারা আসিয়া ঝঙ্কার দিয়াছে, যাহার চিত্ত-মলয়ে যেমন প্রবাহ আসিয়া হিল্লোল তুলিয়াছে, সে তেমন কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করুক। আমি শুক্ত দিয়া ভাত খাইতে ভালবাসি বলিয়া তোমার মৃগমাংস-সেবনে বাধা দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। আমি খিচুড়ী পছন্দ করি বলিয়া তোমাকে পলান্ন খাইতে না দেওয়ার কোনও সার্থকতা আমি বুঝি না। ধুনীর ভস্মেই আমার অঙ্গ পরিষ্কার হয় বলিয়া তোমাকে সাবান মাখিতে নিষেধ করাটা কোনও বাহাদুরী বলিয়া আমি অনুভব করি না। আমি সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার আর স্থিতির দেবতা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছি বলিয়াই যে তোমার ধ্বংসময়ী কালিকার আর শ্মশানেশ্বর শিবের পূজার বাদ্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য লাঠি-সোটা লইয়া বাহির হইব, তাহাও নহে। কোনও মত বা পথকেই নিরাকৃত, নিরস্ত বা নিন্দা করিবার

জন্য আমি নহি। সবাই নিজ নিজ প্রাণের জিনিষটীকে স্বাধীন অনু-সন্ধানের দ্বারা লাভ করুক, স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় তাহার অনুশীলন করুক, স্বাধীন অভিজ্ঞতা দ্বারা গ্রহণ-বর্জ্জন-বুদ্ধিকে পরিচালিত করুক, ইহাই তোমাদের নিকট আমার একমাত্র বাণী। আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম দিতে আসিয়াছি, তাহা স্বাধীনতারই ধর্ম্ম। মতামতের লৌহ-শৃঙ্খলে তোমাদের হস্তপদ বন্ধন করিবার জন্যই কি আমি তোমাদের সেবাধিকার পাইয়াছি? গুরুগিরির প্রচণ্ড চাপে তোমাদের বিকাশোন্মুখ মনুষ্যত্বকে পিষিয়া ফেলিবার জন্যই কি আমি ডোর-কৌপীন পরিয়াছি? তোমরা তোমাদের স্বাধীন চিন্তার মাথায় পদাঘাত করিয়া ধর্ম্মের নামে আর একদল নূতন ক্রীতদাস সৃষ্ট হও, এই জন্যই কি আমার গৈরিকের পতাকা উত্তোলন? তোমরা তোমাদের প্রকৃতিগত সামর্থ্যকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়া জীবনব্যাপী ভণ্ড-কপটীর দুঃখময় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হও, এই জন্যই কি তোমাদের সহিত আমার সংস্পর্শ? তোমরা তোমাদের স্বাধীন চিন্তার উপরে নির্ভর করিতে শিখ,—ইহাই তোমাদের নিকটে আমার সকল উপদেশের সারমর্ম্ম। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও যাহা শতগুণ বড়, আর কোটিগুণ দুর্লভ, সেই চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হুজুগাকৃষ্ট তথাকথিত রাজনৈতিক দল-সংগঠকদের অত্যুক্তি-লাঞ্ছিত কল্পনারঞ্জিত যুক্তির ছলনায় ভুলিবার তোমার অধিকার নাই। রাজনীতি-ভীত কারাতঙ্কগ্রস্ত কাপুরুষকুলের হিসাব-নিকাশ-তপ্ত কর্ম্মকুণ্ঠ অলস যুক্তিজালের মিথ্যা পিছন-টানে বিচলিত হইবারও তোমার অধিকার নাই। তোমাকে আজ নিজের প্রাণের পুরে প্রবেশ করিয়া নিজের প্রিয়তম প্রার্থনার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে এবং একমাত্র তাহারই অনুরোধ রক্ষা

করিয়া জগতের অপর সকলের অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতি-মিনতি, আকুলতা, ব্যগ্রতা প্রভৃতি সব কিছুতে বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে। আমি রাজনীতি' বা অরাজনীতি হইতে মনুষ্যত্বকে বেশী শ্রদ্ধা করি, আমি অতীত এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতে বেশী বিশ্বাস করি।"

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের লক্ষ্য

রাত্রিতে শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয়ের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রী-বাবামণি বলিলেন,—বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে আপোষ ক'রে যাঁরা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম চালাতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা বিফলতাই লাভ কচ্ছেন। কারণ, বর্ত্তমানের ভারতবাসীর জীবন ত' ক্রীতদাসের জীবন ; বর্ত্তমানের সঙ্গে আপোষ করার মানে দাসত্বের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করা। যাঁরা অতীতের মোহে অন্ধ হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম চালাতে চাচ্ছেন, তারাও ঠকেই যাচ্ছেন। কারণ, পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন স্বভাবেরই ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু প্রাচীন সত্যের আত্মা নবীন যুগ-ধর্ম্মের দেহটাকে কিছুতেই অস্বীকার ক'রে চল্‌তে পারেন না। আশ্রম চালাতে হ'লে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে ভবিষ্যতের পানে। তথাগত বুদ্ধকেও পূজা কর্ব্ব, কিন্তু সমগ্র সাধন-শক্তিকে কেন্দ্রীকৃত কর্ব্ব অনাগত বুদ্ধের পানে।

ছাত্রজীবন ও যোগাভ্যাস

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগাভ্যাস ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য হয় না। ছাত্র-জীবনটাকে যোগাভ্যাসের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। যোগাভ্যাস মানে জটাধারণ, গঞ্জিকা-সেবন, ভস্মবিলেপন নয়। যোগাভ্যাস মানে ভগবানের সঙ্গে নিজের একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন

ক'রে তারই অনুশীলন করা, ভগবানের সাথে নিজের এমন একটী অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করা যেন তাঁকে নিমেষের তরেও ভুলে থাকা অসম্ভব হয়। এর জন্য যদি গণিত, ভূগোল বা ইতিহাসের পড়া দু'বছর পিছিয়ে যায়, তাও দোষের হবে না।

পুপুন্‌কী (মিশ্রভবন)
৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪

দীক্ষা ও ফ্যাসান

অদ্য চিকশিয়া-নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষা-প্রার্থী হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, দীক্ষা লওয়াটা আজকাল একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাধন-ভজন করা নেই, শুধু গেয়ে বেড়ান,—"আমি অমুকের শিষ্য।" এরই জন্যে আজকাল দীক্ষার সম্মান কমে গেছে, মূল্য হ্রাস পেয়েছে। ভগবানের জন্য প্রাণ আকুল হ'ল না, তাঁর জন্য চিত্ত অধীর হ'ল না, তবু একটা লোক-দেখান দীক্ষা নিতেই হবে, আর লোক-দেখান সাধুগিরি ফলিয়ে বেড়াতে হবে, এতেই দেশের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অযোগ্যের দীক্ষা

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষার ফলেও অনেকের প্রাণে ভগবানের জন্য আকুলতা জন্মে, একথা সত্য। কিন্তু দীক্ষার জন্যও আত্মগঠন প্রয়োজন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ব্যতীত কেউ দীক্ষা লাভের যোগ্য হয় না। একজন সাধু দেখ্‌লে, আর অম্‌নি বল্লে দীক্ষা দাও, এর মত বোকামী আর নেই। আগে আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ, দীক্ষার জন্য

প্রকৃত আগ্রহ এসেছে কি না, দীক্ষার পরে ক্রিয়া কর্‌বে কি না, না, দু'দিন পরেই হাত-পা গুটিয়ে বস্‌বে ? তারপরে পরীক্ষা কর, যাঁর কাছে দীক্ষা চাচ্ছ, তাঁর মধ্যে দীক্ষাদানের যোগ্যতা আছে কি না, তিনি তোমার প্রাণের পিপাসা মিটাতে পার্ব্বেন কিনা ?

গুরু-পরীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—গুরু-পরীক্ষা না ক'রে দীক্ষা কেন নেবে ? পরীক্ষা কর, তিনি ত্যাগী কিনা, জ্ঞানী কিনা, ভগবৎ-প্রেমিক কিনা। পরীক্ষা কর, তিনি ভয়ের সময়ে অভয় দিতে পারেন কি না, দুর্ব্বলতার সময়ে হৃদয়ে বলসঞ্চার কত্তে পারেন কি না। পরীক্ষা কর, তাঁর ভিতরে প্রকৃতই ব্রহ্মবীর্য্য আছে কি না, তাঁর বাক্য অনুভূতির ফল কি না, তাঁর অনুভূতি তীব্র সাধনার ফল কি না ? পরীক্ষা কর, তিনি যে তোমাকে ধর্ম্মজগতে সাহায্য কত্তে চান, তার কারণ লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার লোভ কি না, না তিনি নিষ্কাম প্রেমেরই প্রেরণায় তোমাকে বুকে তুলে নিচ্ছেন।

গুরুর পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—গুরুর পরিচয় তোমাকে নিতে হবে। গুরুর পরিচয় কোথায় পাবে ? পাবে তোমার ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষমতার ভিতর। গুরুর সঙ্গ তোমাকে নারীজাতির প্রতি মাতৃবুদ্ধি আরোপ কত্তে সামর্থ্য দেবে, নারীর প্রতি ভোগবুদ্ধি বর্জ্জন ক'রে পূজা-বুদ্ধি আরোপ কর্ব্বার শক্তি দেবে। তাঁর সঙ্গ তোমাকে নিয়ত মনে করিয়ে দেবে যে, জগতের সকল সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তোমার মা,

গর্ভধারিণী তোমার মা, জন্মভূমি তোমার মা, মাতৃভাষা তোমার মা, অন্নদাত্রী তোমার মা, অভয়দাত্রী তোমার মা, পালয়িত্রী তোমার মা, নিঃসম্পর্কীয়াও তোমার মা। গুরুর সঙ্গ তোমাকে শেখাবে, বালিকা তোমার মা, কিশোরী তোমার মা, যুবতী তোমার মা, প্রৌঢ়া তোমার মা, বৃদ্ধা তোমার মা, নারীর মৃত দেহটাও তোমার মা, নারীর ছবিটা পর্যন্ত তোমার মা। গুরুর পরিচয় কোথায়? তাঁর পরিচয় হচ্ছে বিশ্বজনীন মাতৃবোধকে জাগ্রত করার শক্তিতে। প্রত্যেক নারীকে যখন মনে করবে এক একটা সিদ্ধ পীঠস্থান, এক একটা অন্নপূর্ণার মন্দির, এক একটা ব্রহ্মবিদ্যার বেদী, এক একটা সরস্বতীর বীণা, এক একটা শ্মশানকালীর খড়্গ, তখন জানবে গুরুর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

শিষ্যের চেষ্টা ও গুরুশক্তির প্রকটন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু শিষ্যকে বল দেন, বীর্য্য দেন, সাহস দেন, শৌর্য্য দেন কিন্তু সাধন কত্তে হয় শিষ্যকে। যে শিষ্য সাধন করে না, গুরুর শক্তি সে মাত্র অদৃশ্য ভাবেই পায়, শিষ্যের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অদৃশ্য শক্তি ক্রমশঃ প্রকট হ'তে প্রকটতর হয়ে ওঠে। গুরু নিয়ে যত কথাই বল, শিষ্যের কিন্তু সাধন করা চাই। সাধন কর্ব্ব না, গুরু কর্ব্ব; গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াতে অভিনিবেশ দিব না, গুরুর যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিয়ে তর্ক তুলব; গুরুদেব কোন্ আদর্শে পরিচালিত হয়ে কোন্ মন্ত্র কেন দিলেন, তা' বুঝবার চেষ্টা কর্ব্ব না, গুরু পরীক্ষা কর্ব্ব;—এসব কিন্তু মারাত্মক কথা। গুরুর কাছে যদি প্রত্যাশা কিছু রাখ, তা'হলে নিজের সমগ্র শক্তিকে সাধনে নিয়োজিত করার জন্য চেষ্টা চাই উদগ্র, একাগ্র, অকপট।

মৃত্যু ও কর্ম্মী

বৈকালে ত্রিপুরান্তর্গত নবীনগর পবিত্রতা-প্রসারিণী-সমিতির হাতে-লেখা পত্রিকার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণি নিম্নলিখিত কবিতাটী প্রেরণ করিলেন।

মৃত্যু কহে,—"দুঃখ আমি",
কর্ম্মী কহে হাসি',—
"তাই ত' তোমারে বন্ধো
অত ভালবাসি।"

মৃত্যু-জয়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে একটী একটী করিয়া কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

মৃত্যুরে নাহিক ভয়,
সেই করে মৃত্যুজয়।

বিশ্বাসী ও মৃত্যু

অপর একজনকে লিখিলেন,—

মরণ নহেক নিদ্রা,—এ যে জাগরণ
তার তরে, সদা যার ঈশ্বর-স্মরণ।
মৃত্যু শুধু মৃত্যু নহে, অমৃতের দ্বার
উন্মুক্ত করিয়া দেয় বিশ্বাসী জনার।

ঈশ্বরে সঁপিয়া মন সর্ব্বকাজ করে,
দুরন্ত কৃতান্ত তার বন্ধু-রূপ ধরে।
সবাই ডরায় যারে ভাবি' দুঃখময়,
বিশ্বাসী সাদরে তারে বক্ষে বেড়ি' লয়।

পুপুন্‌কী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

পুপুন্‌কী আশ্রমের কর্ম্মপদ্ধতি

প্রতিদিনই মিশ্রভবন হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি, সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র, শ্রীযুক্ত লক্ষীনারায়ণ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী হালদার প্রভৃতি আসিয়া আশ্রমের ভূমিতে সর্ব্বদাই মাটি-কাটা, বৃক্ষচ্ছেদন প্রভৃতি কার্য্য নিজেদের হস্তে করিতেছেন। অদ্য প্রায় সমগ্র দ্বিপ্রহরই কার্য্য চলিতেছে। বৈকাল বেলা দ্বারিকা গ্রাম হইতে কতিপয় ভদ্রলোক আশ্রম দেখিতে আসিলেন। একজন শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখানকার আশ্রমের কার্য্যপদ্ধতি কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি তদুত্তরে বলিলেন,—এইস্থানটাকে একটা কেন্দ্র ক'রে একদল সমাজ-সেবক কর্ম্মীকে সেবকত্বের শিক্ষাদানই হবে কাজ। এখানে এমন একদল ত্যাগী কর্ম্মী গঠিত হবেন, যাঁরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়্‌বেন শুধু জ্ঞান ও সৎসঙ্কল্প বিস্তারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এরা এখানে এসে সাধন-ভজন ক'রে আধ্যাত্মিকতার অভাব পূরণ ক'রে নেবেন, জ্ঞান চর্চ্চা ক'রে বিদ্যা-প্রচারের যোগ্যতা সঞ্চয় কর্ব্বেন, তারপরে অস্থি-দানের সঙ্কল্প ক'রে দুটী-তিনটী কর্ম্মী একত্র মিলে এক-একটী গ্রামে নূতন এক-একটা শাখা-কেন্দ্র স্থাপন কর্ব্বেন। সেখানে তারা প্রাতঃকালে স্কুল ক'রে গ্রামের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেন, দ্বিপ্রহরে নিজ নিজ

ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী জ্ঞানানুশীলন কর্ব্বেন, বৈকালে শাস্ত্র-গ্রন্থ, জীবনী-গ্রন্থ, জাতীয় উন্নতিমূলক গ্রন্থ, সংবাদপত্র প্রভৃতি পাঠ ক'রে সমবেত গ্রামবাসীদিগকে শুনাবেন এবং রাত্রিতে "ছেলের-বাপ"-দিগকে নৈশ-বিদ্যালয় ক'রে লেখা-পড়া শেখাবেন। এ ছাড়া পল্লীর উন্নতির জন্য অপরাপর কাজও তাঁরা করবেন, নিজেদের সামর্থ্য এবং উপযুক্ততা বুঝে স্থল-বিশেষে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারেও সহায়তা দিতে চেষ্টা কর্ব্বেন। অবশ্য, তাঁরা যেমন সমাজের সেবা কর্ব্বেন, তেমন আবার নিজেদের সাধন-ভজনেও খুব দৃঢ় নিষ্ঠা রাখ্‌বেন। সপ্তাহে একদিন ক'রে তারা গ্রামবাসীদের নিয়ে সমবেত উপাসনা, নাম-কীর্ত্তন এবং এই ভাবে ভগবানের নামের ভিতর দিয়ে, শিক্ষার প্রচারের ভিতর দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শকে প্রত্যেকের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বেন। অবশ্য, স্থানীয় অবস্থানুসারে এ সবের পরিবর্ত্তনও হবে।

অসাম্প্রদায়িক বিগ্রহ

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—হিন্দুর সৎকাজ চির-কাল ভগবানকে আশ্রয় ক'রে বড় হয়েছে, আর ভগবানকে হিন্দু অধিকাংশ সময়েই মন্দির ও বিগ্রহকে আশ্রয় করেই পূজা করেছে। এক-একটী দেব-মন্দির ঘিরে হিন্দু-সভ্যতার এক-একটা অঙ্গ নির্ম্মিত হয়েছে। সুতরাং এ আশ্রমেরও একটী মন্দির থাক্‌বে, একটী বিগ্রহ থাক্‌বেন। কিন্তু কোন্ বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত হবেন? ধর্ম্ম সম্বন্ধে কত প্রকারের বিভিন্ন রুচি নিয়ে কত জনই ত' এখানে আস্‌বেন, তাঁদের সকলের পরিতৃপ্তি ত' কোনো একটী নির্দ্দিষ্ট বিগ্রহ দিয়ে হ'তে চাইবে না।

সরস্বতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্‌লে সুন্দর হয়। বেদবিধায়িনী হংসবাহিনী জননী শিক্ষায়তনে বেশ মানান। কিন্তু অমনি অপর এক ভক্তের মনে হবে, আমার শ্যামসুন্দর দোষ কি কর্লেন? তাঁর ঐ বদনচন্দ্রমা কি অন্ধকার বিনাশ করে না, তাঁর ঐ চরণযুগলে কি শতদল ফোটে না, তাঁর বেণুধ্বনি কি বীণাধ্বনির চাইতে কম প্রাণমন-মাতোয়ারা? অমনি অপর একজনের মনে হবে, আমার শ্রীরামচন্দ্রজী কিসে তুচ্ছ হ'লেন, তিনিও কি নয়ন-মনোহর নন, তিনিও কি পদ্মপলাশ-লোচন নন, তিনিও কি ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু নন? অমনি অপর এক ভক্তের মনে হবে, ঐ যে আমার করালবদনা করালনয়না ভীষণানাং ভীষণা মা যুগপৎ স্মিত হাস্যে জগৎ আলো ক'রে রেখেছেন, একাধারে যাঁর মূর্ত্তিতে ধ্বংসের উল্লাস আবার অভয়ের প্রশান্তি, যাঁকে উলঙ্গ দেখেও কাম আসে না, যাঁর অট্টহাসি শুনেও মনে ভয় আসে না, যাঁর মসীকৃষ্ণ কালো রংয়ের মধ্যেও আলো ফুটে উঠ্‌ছে, সেই আমার আদ্যাশক্তি জগজ্জননী কি কারো চাইতে ছোট? কারো বা মনে হবে, যে মা আমার দশভুজে দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে জীবকুলের রিপুকে, দুঃখকে, অমঙ্গলকে, উৎপীড়নকে মহিষাসুরের ন্যায় ছিন্নশির কচ্ছেন, দুই পাশে যাঁর গণেশরূপী ধৈর্য্য আর কার্ত্তিকেয়রূপী সংযম, দুই পাশে যাঁর সরস্বতীরূপিণী পরাবিদ্যা আর লক্ষ্মীরূপিণী সফলতা, সেই মা কি আমার উপেক্ষার জিনিষ হলেন? এই ভাবে শতজনের মনে শত ব্যথা লাগ্‌বে। তাই এ আশ্রমে বিগ্রহ থাক্‌বেন শুধু ওঙ্কার। কারণ, ওঙ্কার কোনও সাম্প্রদায়িক নাম নয়, এ যে, বিশ্বনাথের বিশ্বনাম। শুধু তাই নয়, প্রণব-বিগ্রহ ভারতের আদি অধ্যাত্ম-সাধনার অনাদি প্রতীক। ওঙ্কার-মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্ব্বমন্ত্রের সার, সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতি, সমন্বয় ও সমাহার।

নারীর উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুরের জনৈক স্বদেশপ্রাণ উকিলের নিকট একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"যে দিন হইতে ব্রহ্মচর্য্যের ভূত আমার স্কন্ধে চাপিল, সেই দিন হইতে আমি পুরুষ জাতির সকল উত্থান-পতনের সমস্যাকে স্ত্রীজাতির সকল উত্থান-পতনের সমস্যার সহিত অভেদ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। একপক্ষ-বিহঙ্গম কতক্ষণ উড়িবে, ইহাই ছিল মনের কাছে আমার এক গুরুতর প্রশ্ন। প্রার্থনীয় হইতেছে, দেশের কল্যাণ। দেশ বলিতে দেশের শুধু পুরুষগুলিকে বুঝিয়া ক্ষান্ত হইবার উপায় নাই, দেশের উন্নতি নারীর উন্নতিরও অপেক্ষা রাখে। এই জন্যই আমাকে পুরুষ জাতির পতন-অভ্যুদয়ের সমস্যাকে নারীজাতির পতন-অভ্যুদয়ের সমস্যার সহিত অভিন্ন বলিয়া দেখিতে হইয়াছে। আর, যদিও বা শুধু পুরুষের উন্নতিতেই দেশের বাঞ্ছিত লাভ হইবে বলিয়া মনে করি, তাহা হইলেও এই পুরুষদের উন্নতির জন্যই আবার নারীর উন্নতিকে আবশ্যকীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কারণ নারী যে পুরুষের উন্নতির বিঘ্ন, নারী যে পুরুষের মৃগ-তৃষ্ণিকা, নারী যে পুরুষের মরু-মরীচিকা, ইহা নারীরই উত্থানের অভাব হেতু। নারী যদি আজ যথার্থ নারীত্বের ঐশ্বর্য্যে মহিমময়ী হইতেন পুরুষ কি তাহা হইলে এত সহজে নিজ অপদার্থত্ব প্রতিপন্ন করিয়া অধঃপাতে যাইবার সুযোগ পাইত? মাতৃস্তন্যে যদি বড় হইবার উপাদান না থাকে, ভগিনীর স্নেহে যদি মহত্ত্বের প্রেরণা না থাকে, পত্নীর প্রেমে যদি চরমচরিতার্থতার যোগ না থাকে, কন্যার ভক্তিতে যদি উপরে ঠেলিয়া তুলিবার শক্তি না থাকে, তবে তাপদগ্ধ মৃতপ্রায় বর্ত্তমান পুরুষ-

জাতির প্রকৃত উন্নতি কখনই হইতে পারিবে না। অনুন্নতা মাতা চির-কাল তাহার পুত্রকে বলিবেন,—'কাজ নাই বাছা মহৎ কাজে, প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আয়।' অনুন্নতা ভগিনী চিরকাল তাহার ভ্রাতাকে বলিবে,—'কাজ নাই ভাই দেশের সেবায়, আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম।' অনুন্নতা স্ত্রী চিরকাল তাহার স্বামীকে বলিবে,—যাইও না প্রভো, ঐ পথে, তুমি না থাকিলে আমি যে হইব অনাথা।' অনুন্নতা কন্যা চিরকাল তাহার পিতাকে বলিবে,—'না পিতা, বৃদ্ধ বয়সে কেন দুঃখ-বরণ করিতে যাইবে, তার চেয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসিয়া নিরাপদে পরের জুতার ঠক্কর খাও।'

"ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় ত' দেশের মধ্যে কতকগুলিই হইয়াছে, কিন্তু কই একটা বিদ্যালয়ও ত' নিজ অস্তিত্বের কোনও মহান্ পরিচয় তাহার শিক্ষা-ধন বিদ্যার্থীদের জীবনের মধ্য দিয়া দিতে পারিল না? ইহার প্রধানতম কারণ হইতেছে এই যে, এই সকল বিদ্যার্থীরা মাতার মত মাতা পায় নাই, ভগিনীর মত ভগিনী পায় নাই, পত্নীর মত পত্নী পায় নাই, কন্যার মত কন্যা পায় নাই। যদি পাইত, তাহা হইলে শিক্ষা যতই অসম্পূর্ণ হোক্, গুরুগৃহের চারিত্রিক সুপ্রভাব তাহাদের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হইত, ইহা নিঃসন্দেহ।"

পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

আসিলেই যাইতে হয়

অদ্য পুপুন্‌কী আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। শেষ হইয়াছে বলিলে ঠিক হইবে না, বরং কয়েকখানা পলাশ-খুঁটির উপরে কিছু খড়

চাপাইয়া চারিদিকে গাছের ডালের বেড়া দিয়া কোনও প্রকারে একটা ঝুপ্‌ড়ি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই গৃহে আজ শ্রীশ্রীবাবামণি প্রবেশ করিতেছেন।

প্রবেশ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঘর বাঁধার মানেই হচ্ছে, সংসার বাঁধা। কিন্তু যাকে বেঁধেছ, একদিন তাকে ছাড়্‌তেই হবে। এটা শাশ্বত সনাতন রীতি। সুতরাং ঘরে ঢুক্‌ছ, ঢোক, বেরুবার কথা যেন ভুলো না। এলেই যেতে হয়, সুরু কর্‌লেই আবার শেষও কত্তে হয়। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও থাকে। ধরার মানেই ছাড়্‌বার জন্য সুনিশ্চিত হওয়া।

গঠনের ও ভাঙ্গিবার শক্তি

অন্য এক সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সেই এক কৌপীন্‌কা ওয়াস্তে গল্পটা জান ত'? কৌপীন যখন ইঁদুরে কাটে, তখন বিড়াল পোষ। বিড়ালের যখন দুধ দরকার, তখন গাভী পোষ। গাভীর যখন খড় দরকার, তখন জমি কেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ক'রে এক দারুণ সংসারী পয়দা হ'য়ে গেল। এ গল্পটা শুধু গল্পই নয়। বহু ধীমান্ পুরুষের জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা নিয়ে এই গল্পটার জন্ম। অতএব আশ্রমই গড়, আর কুটীরই বাঁধ, সাধু সাবধান! অনাসক্ত হ'য়ে, নিষ্কাম হ'য়ে, নির্ব্বিকার উদাসীন মন নিয়ে কাজ কত্তে হবে। তবে আশ্রম হ'ল। যাকে গড়েছ, তাকে নিজ হাতে নির্ম্মম হ'য়ে ভাঙ্গবার শক্তি থাকা চাই। তবে আর আশ্রম-গড়া জঞ্জাল সৃষ্টি কত্তে পার্ব্বে না।

বনচারী তপস্বীদের লোকালয়ে আসার কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেই যুগে মহাপুরুষেরা অরণ্যে, পর্ব্বতে, গুহা-গহ্বরে বাস ক'রে নীরবে তপস্যা ক'রে পরমপুরুষার্থ লাভ কত্তেন, সেই যুগ ত' আর আজ নেই। আজকের তপস্যা লোকালয়ে। জন-সংখ্যাবৃদ্ধির উৎপাতে আর উদরের ক্ষুধাবৃদ্ধির তাড়নায় সহরের মানুষ জঙ্গল কেটে আবাদ ক'রে ফেল্‌ছে, পর্ব্বত কেটে সমতল জনপদে পরিণত কচ্ছে। আজ নীরব বন-পর্ব্বতই বা কোথায় পাবে? কাল যেখানে তপস্বীর বিজন তপঃক্ষেত্র ছিল, সভ্যতা-রাক্ষসীর মানসপুত্রেরা সদলবলে গিয়ে আজ সেখানে হয় খনি খুঁড়ছে, নয় স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন কচ্ছে। বনচারী নিভৃত-নিবাসী তপস্বীরা যায় কোথায়? সুতরাং এই কারণেও তাঁদের আজ ইচ্ছা ক'রেই লোকালয়ে ফিরে আস্‌তে হচ্ছে। কিন্তু লোকালয়ে ফিরে আস্‌বার আর একটী জরুরী কারণ এই ঘটেছে যে, বহুদিনের বহু প্রকারের সঙ্কটজনক সভ্যতার সংঘর্ষণে শেষ পর্য্যন্ত অসহায় ভারত-সভ্যতা যাতে না প্লাবনের জলে তলিয়ে যায়, তার জন্য প্রাচীন আদর্শের পতাকাবাহীদিগকে জনস্থলীতেই এসে সেই পতাকা প্রোথিত কত্তে হবে। এই জন্যেই দিকে দিকে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারত-সভ্যতাকে বাঁচাবার তাগিদ জনপদবাসীদের মনেও জেগেছে, তাই তাঁরা আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মীদের সাদরে আহ্বানও জানাচ্ছেন। এটা দেশাত্মার দাবী। এ জন্যই সর্ব্বত্যাগীদের বিড়ালও পুষ্‌তে হবে, গাভীও পাল্‌তে হবে, জমিও কিনতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বাহিরে নিষ্কিঞ্চনও থাকৃতে হবে। আমার সব আছে কিন্তু কিছুই আমার নেই, সব কিছুই আমার কিন্তু কোনো কিছুই আমার

নয়, এই রকমের মনোভাব প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে হবে। অর্থাৎ মনকে কত্তে হবে জন-প্রাণীহীন নিভৃত বন, আর কর্ম্মক্ষেত্রটী হবে দুঃস্থবহুল, দুঃখিবহুল, ব্যথিতের ক্রন্দনে আকুল, সহযোগী কর্ম্মিগণের কলরবে মুখরিত বিশ্ব-সংসার।

পুপুন্‌কী আশ্রম ও অবতার-বাদ

অপর এক সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে তোমরা কেউ আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রো না, এইটী আমার অভিপ্রায়।

শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার প্রতিমূর্ত্তির পূজা আর আমার আদর্শের পূজা এক কথা নয়। আমার কর্ম্মে, বাক্যে ও চিন্তায় আমি আমার আদর্শ তোমাদের কাছে প্রচার করেছি। আমার পার্থিব প্রতিমূর্ত্তিই আমার স্বরূপ নয়। তবু এই পার্থিব প্রতিমূর্ত্তি যে আমার কর্ম্মের, বাক্যের বা চিন্তার স্মারক হ'তে পারে, একথা অবশ্য আমি মানি। আর প্রিয়জন প্রিয়জনের প্রতিচিত্র চ'খের কাছে রাখতে ভালবাসে, একথাও আমি মানি। কিন্তু আশ্রমের মন্দিরে থাক্‌বেন আশ্রমের উপাস্য বিগ্রহ। তিনি হবেন ওঙ্কার-বিগ্রহ। মন্দিরের মধ্যে তিনিই হবেন সকল পূজার একমাত্র প্রাপক। তিনি হবেন অদ্বিতীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বি-বর্জ্জিত। এই কথাটী ভুলে গিয়ে যদি তোমরা তার সাথে আবার আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সুরু ক'রে দাও, তা'হলে দেখো ভবিষ্যতে তা' থেকে কি বিষম অনর্থের সূচনা হয়। আমাকে অবতার ব'লে প্রচার ক'রে তোমাদের কোনো লাভ নাই। তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে অবতারত্ব ফুটে উঠুক, এটাই আমার লক্ষ্য। সেই কথাটী তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো। নতুবা আমাকে অবতার কত্তে গিয়ে শেষে আমাকে হত্যা ক'রেই ফেলা হবে।

সীমার ভিতরে অসীম দর্শনই অবতার-বাদের মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দুদের শাস্ত্রীয় সাহিত্যে কয়েকজন অবতারের তালিকা আছে। কিছুদিন পরে লক্ষ্য করা গেল যে, আরও দু'একজনকে অবতার ব'লে পূজা কত্তে আমরা ভালবাসি, কিন্তু শাস্ত্রে অবতারের তালিকায় তাঁদের নাম নেই। তখন ব্যাখ্যাকারদের দারুণ পরিশ্রম কাউকে অবতার ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে দিল, কাউকে বা অবতার প্রমাণিত করার জন্য নিখিল শাস্ত্র খুঁজে দুটা একটা অস্পষ্ট শব্দকে বের করে নিয়ে ভাষ্যের ঝামা ঘ'ষে ঘ'ষে তাকে স্পষ্ট করা হ'ল। কিন্তু এখানেই বা আমরা থামি কি ক'রে? এদেশে গুরু মাত্রেই অন্তরঙ্গ শিষ্যের কাছে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তা ব'লে পরিগণিত। অথবা প্রত্যেক সাধকই তুরীয় অবস্থায় গিয়ে নিজেকে পরমাত্মার সাথে অভেদ ব'লে অনুভব করেন। ফলে কোনও গুরু শিষ্যকে সাধনে একনিষ্ঠ এবং সচেতন রাখার জন্য কোনও সময়ে বলেছেন,—অহং ব্রহ্মাস্মি, অম্নি সেই বাক্যটীর প্রামাণ্যে আর একজন অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং পূজা পেতে লাগ্‌লেন। সীমার ভিতরে অসীমকে দেখার অভ্যাস যে জাতির, সে জাতি যে নিত্য নূতন অবতারের সৃষ্টি, স্থাপন ও অর্চ্চনা কর্ব্বে, তাতে ত' আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই বাবা!

বহু প্রতিমূর্ত্তি পূজার বিভ্রাট

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মনে কর, একটী মঠে বা আশ্রমে একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে অবতার ব'লে পূজা করা হয়। কিন্তু যিনি এই অবতারকে জগতের নিকটে পরিচিত ক'রে দিলেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা

প্রচারক মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তিটীর কি গতি হবে? তাকেও কি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের প্রতিচিত্রের পদতলে বসিয়ে নিতে প্রাণ চাইবে না? প্রাণ যখন চাইবে, তখন বসাতেও হবে। অবতার-পুরুষের আদর্শ-প্রচার আরও দু' একজন অসামান্য যোগী অন্যভাবে করেছেন। সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও দু' একখানা ক'রে মূর্ত্তি এসে পাদপীঠের শোভা বাড়াতে আরম্ভ কর্ব্বে। মূর্ত্তির সংখ্যা যত বাড়ান হ'তে থাক্‌বে, ততই অধিক বাড়্‌বার দিকে ঝোঁক চেপে যাবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদের অনুবর্ত্তীদের ভিতরে যে সব অদ্ভুতকর্ম্মা আশ্চর্য্যতপাঃ মহতের আবির্ভাব হতে থাকবে, ঐ মন্দিরের ভিতরে পূজা-পীঠে তাদের প্রত্যেকের মূর্ত্তির জন্য এক একটা ক'রে স্থান দাবী করার জন্য কত কত কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স হ'তে থাকবে, তার ইয়ত্তা করা যাবে না। এত বড় হট্টগোল আর কোলাহলের ভিতরে আমি তোমাদের যেতে দিতে পারি না। প্রাণে যার যা' আছে, থাকুক কিন্তু মন্দিরের ভিতরে একমাত্র উপাস্য হবেন প্রণব!

বহুবিগ্রহ-পূজা নিষ্ঠাহানিজনক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন্দিরের ভিতরে অন্যান্য দেব-বিগ্রহও স্থাপন কত্তে পার্ব্বে না। দ্রৌপদীর যে পঞ্চপতি ছিলেন, আদর্শ হিসাবে সেটা কি হজম কত্তে কেউ পেরেছে? হজম কত্তে পার্‌লে আরো বহু মেয়ের পঞ্চপতি হ'ত। তোমরা একটা মন্দিরে দশটা দেবতার মূর্ত্তিস্থাপন কি ক'রে কর বল দেখি? যে সহরে যাবে, যে গ্রামে যাবে, ব্যক্তিগত ঠাকুরঘরই হোক্ বা সর্ব্বসাধারণের পূজা-মন্দিরই হোক্, দলে দলে দেব-দেবীর প্রতিচিত্র বসান হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে গেলে দস্তুরমত যাদুঘর বা শিল্প-প্রদর্শনী ব'লে ভ্রম হয়। এতে যে একনিষ্ঠার ক্ষতি

হচ্ছে, একথা কেউ বোঝে না, কেউ ভাবে না। যাকেই তুমি অর্চ্চনা কর, অদ্বিতীয় জেনে কর। সাধনের প্রধান সহায় হচ্ছে একনিষ্ঠা। একনিষ্ঠা সাধন পথের যষ্টি। হাতের লাঠি ছেড়ে দিয়ে পথ চল্‌লে গতিবেগ কমে যায়। কে কি ভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কচ্ছে, তা নিয়ে কারো সাথে আমার কোনো কলহ নেই, কিন্তু যে যে-ভাবেই যা' কর, একনিষ্ঠ হ'য়ে কর। বাইরের পথিক দলে দলে এসে ঘরে ঢুক্‌বে, এমন ভাবে দুয়ার খোলা রেখে সতী নারীর পতিসেবা হয় না।

ওঙ্কার-অর্চ্চনা কি সকলের পক্ষে বাধ্যকর ?

প্রশ্ন হইল, ওঙ্কার-অর্চ্চনায় বা ওঙ্কার-জপে কি সকলকেই বাধ্য করা হইবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখান থেকে বা এখানকার অনুবর্ত্তীদের কাছ থেকে যে সাধন নিয়েছে, ইচ্ছায় হোক্, আর অনিচ্ছায় হোক্, তার অর্চ্চনার সামগ্রী একমাত্র ওঙ্কার। এতে কোনো প্রকারেই অন্যথা হ'তে পারে না। কিন্তু যারা অন্যত্র সাধন-দীক্ষায় দীক্ষিত, কেন আমরা তাদের জোর ক'রে বল্‌ব,—তোমরা সবাই ওঙ্কার-সাধনা কর !

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

ওঙ্কার

অদ্য সন্ধ্যার পরে পুরুলিয়ার হেল্‌থ্‌ অফিসার আশ্রমে আসিলেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবানকে কোন্‌ নাম ধ'রে ডাকা ফলপ্রদ ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে কোন নাম ধ'রেই ডাকুন না কেন, প্রাণে ভক্তি থাক্‌লেই হ'ল।

হেঃ অঃ।—ওঙ্কার বা মদনমোহন ব'লে ডাক্‌লে একই ফল হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হবে। কেন না, ওম্ শব্দটীর মধ্যে যে অনাহত নাদ রয়েছে, মদনমোহনেও তাই আছে। 'ওম' 'ওম' জপ কত্তে কত্তে ক্রমে তার আহত নাদটুকু লোপ পেয়ে শুধু অনাহত নাদই থাকে। ঠিক তেমনি 'মদনমোহন' 'মদনমোহন' জপ কত্তে কত্তে ক্রমে মদনমোহনের আহত নাদটুকু লোপ পেয়ে অনাহত common factorটুকু বর্ত্তমান থাকে।

হেঃ অঃ।—ওঙ্কার কি অনাহত নাদের nearest approximation নয়? এবং সেই জন্যেই কি ওঙ্কার সকল নামের শ্রেষ্ঠ নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু জগতের সকল নামই ব্রহ্ম এবং সকল নামেরই common factor হচ্ছে অনাহত নাদ, যাকে মুখে বল্‌তে গিয়ে আহত নাদে বলা হচ্ছে ওম্। ওঙ্কারের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকত্ব নেই, ওঙ্কার সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক নাম। কিন্তু যে অন্য নাম জপ করে, সেও ওঙ্কার-জপেরই পূর্ণ ফল পায়, যদি প্রাণে থাকে পূর্ণ ভক্তি। হরি ব'লেই ডাকুক, আর দুর্গা ব'লেই ডাকুক, হ্রীং বলেই ডাকুক আর ক্লীং ব'লেই ডাকুক, গড্ ব'লেই ডাকুক, আর খোদা ব'লেই ডাকুক, যদি শেষ পর্য্যন্ত লেগে থাকে, যদি মাঝ গাঙ্গে গিয়ে হাল ছেড়ে না দেয়, তা'হলে সবারই শেষ অনুভূতি হচ্ছে সেই অনাহত নাদ বা প্রণব!

প্রশ্ন।—এ উপলব্ধি কি প্রত্যেকেরই হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হওয়া উচিত, হওয়া সঙ্গত, হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে হয় না, বুঝতে হবে, সেখানে সাম্প্রদায়িক অন্ধতা জ্ঞানদৃষ্টিকে ঢেকে রেখেছে।

প্রণব কি সন্ন্যাসীদেরই মন্ত্র ?

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—একজন সন্ন্যাসী বললেন, ওঙ্কার নাকি সন্ন্যাসীদেরই মন্ত্র, এই মন্ত্র গৃহীদের দিলে পাপ হয়, এই মন্ত্র গৃহীরা জপ কর্‌লে পাপ হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—চমৎকার কথা বৈ কি! এদেশে নিজের মত চালাতে হ'লে এখন ত' যুক্তি ও প্রমাণের চাইতে নরকের ভয়টাই অধিকতর কার্য্যকর হয়ে থাকে। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠালিপ্সু ব্যক্তিরা তাই দরকার মত নরকের ভয় দেখান। প্রণব-মন্ত্র একমাত্র সন্ন্যাসীদেরই মন্ত্র, এই কথার ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সন্ন্যাস-আশ্রম ভারতীয় সাধন জীবনের আদি কথা নয়। আদি কালের বৈদিক সাধকেরা প্রায় সকলেই গৃহস্থ ছিলেন এবং সন্ন্যাস নামে একটা আশ্রম-সংস্কার বেদ ও উপনিষদাদি রচিত হবার কয়েক সহস্র বৎসর পরে ভারতীয় সাধন-জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। সন্ন্যাস নামক একটী জিনিষের যে বয়স, ওঙ্কার নামক একটা মন্ত্রের লৌকিক বয়স তার অপেক্ষা লক্ষাধিক বৎসর বেশী। যেদিন আর্য্য-ঋষিরা ওঙ্কার-মন্ত্র দর্শন করলেন, একমাত্র ওঙ্কারের ভিতরেই বিশ্বের সকল আছে ব'লে উপলব্ধিতে পেলেন, সেইদিন সন্ন্যাস-সংস্কারই বা কোথায় ছিল, সন্ন্যাস-আশ্রমই বা কোথায় ছিল ? দুই চারি জন সংসারাশ্রমবর্জ্জী যে মহাপুরুষ বা ঋষিদের নাম অতি প্রাচীন-কালেও শুনতে পাওয়া যায়, তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবেই সন্ন্যাসী ছিলেন,

চতুরাশ্রম প্রবর্ত্তিত হয়েছে ব'লেই সন্ন্যাসী হন নাই। ওঙ্কার-মন্ত্রে ঈশ্বর-সাধনারত শত সহস্র বৈদিক ঋষি সন্ন্যাস-আশ্রমের সৃষ্টির আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন,—এই সরল সহজ ঐতিহাসিক সত্য জানেন না বা জানতে চান না ব'লেই কোনো কোনো সন্ন্যাসী ব'লে থাকেন যে, সন্ন্যাসী ছাড়া অন্যের পক্ষে প্রণব-জপ নিষিদ্ধ। এই সকল অযুক্তিযুক্ত কথায় তোমরা ভড়্‌কে যেও না। প্রণব কারও একচেটে সম্পত্তি নয়। প্রণব বিশ্ব-মানবের সর্ব্বজনীন বিশ্ব-ধন। এতে প্রত্যেকের অধিকার।

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

বর্ত্তমান গুরুবাদ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম নিবাসী জনৈক যুবকের নিকট একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করা হইল। যথা :—

"গুরু কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'গু' মানে 'অন্ধকার' 'রু' মানে 'অন্ধকার-নিবারক'। সুতরাং তিনি গুরু, যিনি অন্ধকার দূর করেন। তাহা হইলে যিনি অন্ধকার দূর করেন না, তিনি কি করিয়া গুরু হইবেন? যিনি অন্ধকার দূর করিতে পারেন না, তিনি কি করিয়া গুরুর গুরুতর পদবী দাবী করিবেন?—যাঁহারা বর্ত্তমান দেশ-প্রচলিত গুরুবাদ সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে আগে এই প্রশ্নের জবাব পাইয়া লইতে হইবে।

"অনেক শাস্ত্র যাঁর অধ্যয়ন করা আছে, কথায় কথায় যিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত শ্লোক উদ্গার করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রার্থের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাঁর নিজ জীবনের মধ্যে এক কণিকাও নাই, তিনিই কি গুরু?—বর্ত্তমান গুরুবাদকে এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হইবে।

"যে সকল গুরু বলেন,—গুরুত্যাগ মহাপাপ, তাঁহারা কসাই। যাঁহারা বলেন,—অযোগ্য গুরু ত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ কর, তাঁহারাও কসাই। শিষ্যকে পরমার্থের লোভ দেখাইয়া উভয়েই জানিয়া শুনিয়া শিষ্যের গলায় ছুরী চালাইয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ গুরু হইতেছেন বর্ত্তমান গুরুবাদের প্রধানতম স্তম্ভ। শিষ্যের জীবনে সত্যলাভের বিদ্যুন্ময়ী প্রেরণা জাগিয়া বজ্রের সৃষ্টি না করিলে এই স্তম্ভদ্বয়ের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান শিষ্যের অন্ধ অনুরক্তিই ইঁহাদের প্রতিষ্ঠাকে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতেছে।

"আমি কখনই মনে করি না, শিষ্যের পুরুষকারকে পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়া নিজের গুরুত্বকে স্পর্দ্ধিতশির হইতে দিবার অধিকার কোনও গুরুর আছে। বর্ত্তমান গুরুবাদ যেখানে যেখানে শিষ্যকে পুরুষ-কার-বিমুখ ও দৈবনির্ভর করিয়াছে, সাধনে পরাঙ্মুখ, কৃপার লোলুপ এবং অলস করিয়াছে; সেখানে সেখানেই সে তাহার স্বকীয় শেষ সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ভারতীয় গুরু, পাশ্চাত্য পাদ্রী এবং আইন

"কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সরকারী পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারিলে কেহ গুরু হইতে পারিবেন না,—এইরূপ আইন-প্রণয়নের চেষ্টাকে আমি একান্তই হাস্যকর মনে করি। কারণ, গুরু আর পুরোহিত এক বস্তু নহেন। দেশের রীতিই এই যে, যজন-যাজন করাইতে পারিলেই যে-কেহ পুরোহিত হইতে পারেন,—অবশ্য যদি তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মেন। কিন্তু এই জাতি-ভেদ-শাসিত দেশেও অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের গুরু হইতে

পারেন, হইয়াছেন এবং হইতেছেন, যদি কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়া যায়। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপণ্ডিত অথবা কোন্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ইহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন? কেন না, একমাত্র শিষ্যই গুরুর শক্তিকে অনুভব করেন, অপরে করিতে পারেন না।

"পাশ্চাত্যের পাদ্রীরা যে হিসাবে রাজার আইন মানিয়া থাকেন, ভারতের গুরু কখনও তাহা মানিবেন না। পাশ্চাত্য পাদ্রী কতকটা আমাদের দেশের পুরোহিতদেরই মতন যজমানের ধর্ম্মের বহিরঙ্গ আচার-ব্যবহারগুলি লইয়া গলদ্ঘর্ম্ম হন। পরন্তু ভারতের গুরু,—যথার্থ গুরু,—শিষ্যের প্রাণের সুপ্ত শক্তিকে নিজের জাগ্রত শক্তির অদৃশ্য স্পর্শ দিয়া নিদ্রোত্থিত করেন। এখানেই ভারতীয় গুরুর কৃতিত্ব এবং এখানেই তাঁহার অমরত্ব। মোট কথা, বর্ত্তমান গুরুবাদ, স্বার্থসিদ্ধিমূলক গুরুবাদ, বংশানুক্রমিক জাতিভেদ ও কৌলীন্যের মত বংশানুক্রমিক গুরুবাদ কখনও কোনও সত্যান্বেষীর সমর্থন পাইবে না। কিন্তু পরমার্থ-পথের জন্য যাহারা ব্যাকুল হইয়াছে, তাহারা তত্ত্বদর্শী গুরুর সাক্ষাৎকার চিরকালই কামনা করিবে। আইন করিয়া বা আন্দোলন চালাইয়া এই সত্যকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।"

গৈরিকের অধিকার

ত্রিপুরা অঞ্চলের জনৈক কর্ম্মীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি আর একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ এইরূপ ঃ—

"শুধু গৈরিক পরিলেই হইবে না। এই গৈরিক একদিন বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের অঙ্গ-শোভা করিয়াছে, এই গৈরিকের

মধ্য দিয়া একদিন কোটি কোটি সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাত্মার পরকল্যাণ-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, একথাও মনে রাখিতে হইবে। গেরুয়া পরিলেই চলিবে না, গেরুয়ার কৌলীন্য বজায় রাখিবার জন্য কায়মনো-বাক্যে সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। দিকে দিকে আজ গেরুয়ার প্রতি অনাস্থা, অবজ্ঞা, অবিচার বর্ধিত হইতেছে ; গৈরিকধারী দেখিলে লোকে মনে করে চোর, ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক বলিয়া। এই দুরবস্থার, এই শোচনীয় দুর্গতির অপনয়ন সাধন করিতে হইবে। লোক-চক্ষে নিজ প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য নয়, গেরুয়াকে তাহার পূর্ব্বাধিকৃত শ্রদ্ধার সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবারই জন্য যে তোমরা রঞ্জিত বস্ত্র পরিয়াছ, এই কথা নিয়ত মনে রাখিতে হইবে এবং নিত্যকার চিন্তায়, নিত্যকার বাক্যে, নিত্যকার কর্ম্মে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। মন যাহার ত্যাগোন্মুখ নহে, গেরুয়া পরায় তাহার অধিকার নাই। প্রাণ যাহার পরার্থে নহে, গেরুয়া পরায় তাহার অধিকার নাই। চিত্তসংযম, জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও আত্মজয় লাভের জন্য যে মৃত্যুবরণ করিতে কুণ্ঠিত, গেরুয়া পরায় তাহার অধিকার নাই। ব্যবসাদারীর জন্য গেরুয়া নহে, পরার্থে আত্মোৎসর্গের জন্যই গেরুয়া। বোকা ভুলাইবার জন্য গেরুয়া নহে, জীবনকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্যই গেরুয়া। ফাঁকিবাজি করিবার জন্য গেরুয়া নহে, অধঃপতিত ভারতবর্ষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার আত্মসম্বিৎ সম্প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই গেরুয়া। গৈরিক-পরিধান যাহাতে কখনও কপটতায় পরিণত হইতে না পারে, সেই খেয়াল রাখিতে হইবে। আজকাল অনেক সন্ন্যাসীরা ছাতা-জুতা পর্য্যন্ত গেরুয়া দিয়া রঙ্গাইয়া সাধুগিরির জৌলস বাড়াইতেছেন, তোমরা তাহা বুঝিয়া চলিও। ভবিষ্যতের ভারতকে পূজার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে

চাহিয়া আমি আজ যে অবিনশ্বর গৈরিকের পতাকাতলে দাঁড়াইতে চাহিতেছি, তোমরা শুধু তাহাকেই সম্মান করিও, অপর গেরুয়াকে কুক্কুর-বিষ্ঠা-প্রলেপিত জীর্ণ চর্ম্মপাদুকার ন্যায় ঘৃণাভরে পরিবর্জ্জন করিও।—গৈরিক ভারতবর্ষকে নবজন্ম দান করিবে, কিন্তু কাপট্যের মধ্য দিয়া নহে, দ্বিধাহীন আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া।"

চিন্তার শক্তি

বৈকালবেলা ধবনী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাঠক মহাশয় আশ্রমে আগমন করিলেন। সন্ধ্যার পরে নানা বিষয় আলোচনা আরম্ভ হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধুর আশ্রম এমন স্থানেই হওয়া উচিত, যেখানে পূর্ব্বে কখনও কোনও অকল্যাণ-অনুষ্ঠান হয় নি। এই বনের ভিতরে আশ্রম হওয়াতে এই জন্যই আমি বড় আহ্লাদিত হয়েছি। যেখানে বিলাসীর প্রমোদ-উদ্যান ছিল, সেখানে ত্যাগী গিয়ে আশ্রম কর্‌লে বিলাসীর পূর্ব্ব পাপ-চিন্তাসমূহ ত্যাগীকে প্রভাবিত কত্তে চেষ্টা করে। চিন্তার ক্ষমতা অসীম। যেখানে একজন ব'সে তীব্রভাবে পাপচিন্তা ক'রেছে, সেখানে অপর লোক এলেও তাকে ঐ চিন্তার দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হ'তে হয়।

পাঠক মহাশয়।—ত্যাগীর সচ্চিন্তা যদি অত্যধিক প্রবল হয়, তবে কি এ পাপ-চিন্তা দমিত হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হয়, কিন্তু যদি বিনা বাধায় সচ্চিন্তার অনুশীলনের সুযোগ মিলে, তবে বাধার সঙ্গে লড়াই কত্তে কোন্ বুদ্ধিমানে যায়?

বার-নারীর গৃহে ব'সেও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন চল্‌তে পারে এবং তাতে ভাবও জমাট বাঁধ্‌তে পারে,—যদি ভক্তদের থাকে হৃদয়ের টান। কিন্তু তবু লোকে হরিমন্দিরে ব'সেই কীর্ত্তন করে। কারণ, হরিমন্দিরে স্বভাবতঃ যে ভক্তিমূলক চিন্তাগুলির অনুশীলন বহুদিন ধ'রে হয়ে আস্‌ছে, সেগুলি সকলকে অজ্ঞাতসারে ভক্তিভাবে অনুপ্রাণিত করে। আর, বেশ্যার গৃহে নিয়ত যে পাপমূলক, কামমূলক চিন্তাগুলির অনুশীলন হয়ে আস্‌ছে, সেগুলি সকলকে কামভাবে পাপভাবে অনুপ্রাণিত করে। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন লোকে তীর্থ কত্তে যায় কেন? পাথরের দেবতা দেখ্‌তেই কি যায়? ঐখানে ব'সে কত কত শক্তিশালী মহাত্মা তীব্র-ভাবে সচ্চিন্তা ক'রে গেছেন। তাঁরা কবে দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তাগুলি অজর অমর হ'য়ে সেখানে ব'সে আছে। শ্রদ্ধাপূত চিত্ত নিয়ে, ভক্তিপ্লুত হৃদয় নিয়ে, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মন নিয়ে যারা সেখানে যায়, তারা সেই সব মহচ্চিন্তাগুলিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি-বলে দেখ্‌তে পায়, সেই সব মহচ্চিন্তার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হ'য়ে নবজীবন লাভ ক'রে গৃহে ফিরে আসে। লোকে সাধুসঙ্গ করে এরই জন্য। ধীর প্রশান্ত মন নিয়ে আপনি একটী যথার্থ সাধুর নিকট নিঃশব্দে কিছুকাল ব'সে থাকুন, দেখ্‌বেন, বিনা আলাপে, বিনা আলোচনাতে কত কত মহৎ চিন্তা, মহৎ আকাঙ্ক্ষা আপনার মনে উদ্দীপিত হচ্ছে। উন্নত সাধুরা এই ভাবে বিনা বাক্যব্যয়েই মানব-সমাজের মঙ্গল-সাধন করেন। আর, উন্নত ভক্তেরা বিনা তর্ক-সৃষ্টিতেই এই ভাবে নীরবে প্রকৃত উপদেশ সংগ্রহ করেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই সাধুদের কাছে গিয়ে তর্কের পর তর্ক সৃষ্টি ক'রে হট্টগোল বাঁধায় এবং নিজেরাও না পারে কোনও কল্যাণ আহরণ কত্তে, সাধুকেও করে বিরক্ত।

পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

মন্ত্র ও ভক্তি

অদ্য শ্রীযুক্ত পাঠক মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদি কেউ সম্যক্ প্রাণটা নিয়ে জপ কত্তে থাকে, তাহ'লে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপকারীদেরও শেষ ফল একই হবে। ভক্তিই সর্ব্ববিধায়িনী। মন্ত্র যখন ভক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই সে মোক্ষের জনক হয়, নতুবা যে বৃথা চীৎকার মাত্র।

সংসার বিপথ নহে

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি হাওড়া জেলা নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে লিখিলেন,—

"সংসার-পথও পথ বটে, ইহা বিপথ নহে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া ভ্রম না হয়। প্রতিপদে বিচারকে আশ্রয় করিয়া চলিবে এবং বিচারবুদ্ধি যাহাতে অসত্য-প্রভাবিত না হইতে পারে, তাহার জন্য অবিরাম নাম-সাধনা করিবে। একান্ত মনে যাঁহারা ভগবানের নামের সেবা করেন, শত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও, শত বিরুদ্ধ পরিবেষ্টনের প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি কখনও অসত্যের ক্রীত-দাস হয় না।"

বিবাহ করা কি না-করা

ত্রিপুরা জেলা নিবাসী জনৈক যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি ঠিক্ ঠিক্ ইহাই বলিতেছি না যে, তোমাকে চিরকালই অবিবাহিত থাকিতে হইবে। ইহাও আমি বলিতেছি না যে, নিশ্চিতই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। আমি শুধু ইহাই বলিতেছি যে, যত-দিন পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে বিবাহের কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নিজ স্বাধীন বিচারের দ্বারা একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না করিতে পারিতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের চেষ্টাই প্রধানতম কর্ত্তব্য। বিবাহ করিয়া অনেকে দুঃখের দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে, কেহ কেহ সুখীও হইয়াছে। বিবাহ না করিয়া অনেকে শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, কেহ কেহ গোলক-ধাঁধায়ও ঘুরিয়া মরিয়াছে। সুতরাং অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবাহের মত ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া অতি বিপজ্জনক হইবে। এই ব্যাপারে নিজের হৃদয়, প্রকৃতি ও সামর্থ্য বুঝিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। যতদিন নিজ হৃদয়, প্রকৃতি ও সামর্থ্যকে বুঝিতে না সমর্থ হও, ততদিন অবিবাহিত থাকিয়া সাধন কর, শক্তি সঞ্চয় কর, বীর্য্যধারণ কর, পৌরুষ অর্জ্জন কর।"

পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

জাতিভেদে সত্য ও মিথ্যা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বাঙ্গরা নিবাসী জনৈক যুবকের নিকটে যে পত্র লিখিলেন, নিম্নে তাহা অনুলিখিত হইল :—

"অকপটতা ও সত্যনিষ্ঠার অভাবে প্রকৃত ধর্ম্ম দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে এবং তত্ত্বদৃষ্টিবর্জ্জিত ব্যক্তিদের নিজেদের খেয়ালগুলিই ধর্ম্মনামে

সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইতেছে। আবার, যাহাকে সকলে কুসংস্কার ও মিথ্যা আবর্জ্জনা বলিয়া কলরব করিতেছে, তাহার মধ্যেও মনুষ্য-জীবনের এমন সকল গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহা ব্যতীত পূর্ণতার সাধনা অঙ্গহীন হইবে। অতীতের এবং বর্ত্তমানের ভারতবর্ষ অপেক্ষা ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সহস্রগুণে বড় হইবে। ভবিষ্যতের ভারত বড় হইবে, আমাদের খামখেয়ালি, আমাদের মর্জ্জি বা আমাদের জেদের জোরে নয়। সত্যের শক্তিতেই ভবিষ্যতের ভারত বড় হইবে। আজ তাই আমাদিগকে তপঃসাধনালব্ধ তীক্ষ্ণ-প্রজ্ঞার বলে আগে বুঝিয়া লইতে হইবে, প্রচলিত জাতিভেদে মিথ্যার রাজত্ব কতখানি আছে, সত্যের প্রতিষ্ঠাই বা কতখানি রহিয়াছে। আমাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যে-সব সমাজে জাতিভেদ নাই বা ছিল না, তাহাদের মধ্যেই বা সত্য কতখানি প্রস্ফুটন পাইয়াছে, কতখানি অবজ্ঞাত হইয়াছে। অতীতের অন্ধ অনুকরণ করিলেও আমাদের চলিবে না, বর্ত্তমানের দেশাচারের ভয়ে বিচলিত হইতেও আমরা পারি না। ভবিষ্যতের মঙ্গলের আমরা উপাসক, আমরা শুধু যাহা সত্য, তাহারই সমাদর করিব। সত্যকে তাহার মর্য্যাদা দিতে গিয়া যদি বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দিতে হয়, তবে তাহাতেও কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। সত্যকে তাহার প্রাপ্য সম্মান দান করিতে গিয়া যদি প্রচলিত জাতিভেদের বন্ধন আরও দৃঢ় করিবার আবশ্যকতা পড়ে, তবে তাহাও করিতে হইবে। জাতিভেদ থাকিবে কি যাইবে, ইহা খুব বড় সমস্যা নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইতেছে সত্যানুসন্ধান। তুমি-আমি, রাম-শ্যাম, যদু-মধু, রহিম-করিম সবাই যদি জীবনের প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হই, ব্যাকুল হই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তবেই জগতের দুঃখ ঘুচিল! জাতি-

ভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেই জগতের সকল দুঃখ ঘুচিবে না, জাতিভেদের লৌহ-প্রাচীর আরও উচ্চ করিয়া গাঁথিয়া তুলিলেও বিশ্বব্যাপী হাহাকার বিদূরিত হইবে না। মানুষ যখন জীবনের বিনিময়েও সত্যকে চাহিবে, সেই দিনই সে এই দুঃখময় জগতে প্রকৃত সুখের রসাস্বাদন করিবে।—তবে, সাধন ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে সত্যদৃষ্টি খোলে বলিয়া আমার জানা নাই।"

নবযুগের ভগীরথ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক-পত্রিকা "মুক্তি"তে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী লিখিলেন।

"ঋষি-শাপে ভস্মীভূত ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তানের প্রেতাত্মা একদিন যেমন উদ্ধার-কামনায় ব্যাকুল হইয়া পতিত-পাবনী গঙ্গার অবতরণের দীর্ঘপোষিত আশা ও আকাঙ্ক্ষায় বংশের দুলাল ভগীরথের মুখপানে কাতর-নয়নে চাহিয়া ছিলেন, ঠিক্ তেমনি বৈদেশিকী-সভ্যতা-পরিক্লিষ্টা চিরদুঃখাভিশপ্তা ভারত-জননী আজ তাঁহার সন্তানগণের মুখপানে মুক্তির কামনায় সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আঁখিযুগ বাহিয়া মায়ের আজ দর-বিগলিত-ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু কণ্ঠ তাঁর মূক। প্রেতাত্মা যেমন প্রাণান্ত চীৎকারে প্রাণের বেদনা শতবার করিয়া বান্ধব-সমীপে উপস্থাপিত করিলেও কেহ তাহা শুনিতে পায় না, তেমনি আজ জননীর হৃদয়ভরা অসহনীয় যন্ত্রণার বারতা মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া মনোমধ্যেই বিলয় পাইতেছে,—যে ভগীরথ-বর্গের অভ্যুত্থানের আশায় দুঃখিনী জননী এত ক্লেশের মধ্যেও প্রাণধারণ করিয়া আছেন, কই তাঁহাদের ত' প্রাণের নিলয়ে সহানুভূতির একটা ক্ষুদ্রতম স্পন্দনও সৃষ্ট হয়

না! যে-ভগীরথ-কুল জাহ্নবী-সলিলে দেশমাতৃকার চিরকলঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া তাঁহার তপ্ত বক্ষ শীতল করিবেন, যাঁহাদের রুদ্রমধুর অভয়-শঙ্খ-নিনাদে অগণিত যুগের পরাজয়-চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে, কই তাঁহাদের ত' আজও সন্ধান মিলিতেছে না! তবে কি জননী শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু কাঁদিয়াই মরিবেন? তবে কি জননী তাঁহার অযোগ্য, অক্ষম, ক্লীব—কাপুরুষ সন্তান-পালের প্রতি বৃথাই আশার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন? যাঁহাদের আবির্ভাব অকল্যাণকে ধ্বংস করিয়া কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করে, মিথ্যার প্রভুত্বকে নির্ব্বাসিত করিয়া শত বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তির মধ্য দিয়াও সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তীকে ধরাতলে প্রোথিত করে, যাঁহাদের কর্ম্মদীপ্ত অকুণ্ঠিত পৌরুষ ভীরুর ভয় ভাঙ্গিয়া দেয়, অলসের আলস্যকে বিদূরিত করে, আত্মপ্রত্যয়হীনের অনাস্থাকে বজ্রাঘাতে নিশ্চিহ্ন করে, তাঁহাদের আত্মপ্রকাশ কি তবে চিরকালই কবির কল্পনা থাকিয়া যাইবে? পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস কি কোনও-কালেই শেষ হইবে না?

"ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন। সুশিক্ষার ভাগীরথী তাহার সর্ব্বকলুষহরা পুণ্যধারায় অভিষিঞ্চিত না করিলে ত' ভারত-জননীর অকথনীয় দুঃখপুঞ্জের মূলোৎপাটন হইবে না! রাইন্ বা টেম্‌স নদীতে কুলাইবে না, টাইগ্রিস বা ইউফ্রেটিসে চলিবে না, ইয়াং-সি-কাই, আমাজান বা নাইল নদেও হইবে না, আজ চাই হিমাচলের সেই চির-আদরিণী কন্যাকে, যাহাকে পাইবার জন্য গিরিরাজকে যুগের পর যুগ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চর্য্যা করিতে হইয়াছিল, যাহাকে বুকে ধরিবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য হিমালয়কে নিজের নিভৃত-কন্দরে বেদ-উপনিষদের দ্রষ্টাদিগকে, পুরাণ-তন্ত্রের স্রষ্টাদিগকে সাদরে পূজা করিতে

হইয়াছিল। আজ চাই নানা-রস-রঙ্গিনী, তরল-তরঙ্গিনী সুশিক্ষার সেই গঙ্গাকে, যাহা হরিপাদপদ্ম হইতে নিজ অগাধজলময়ী মধুরতা অফুরন্ত স্রোতোধারে বিসর্পিত করে, আর, যাহা ত্যাগিরাজ শঙ্করের জটাজাল বেড়িয়া নিত্যনব ভঙ্গিমায় প্রেমের লীলা-মাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিতা হয়। আজ চাই সেই অপ্রতিহত-স্রোতা সুশিক্ষাকে, যাহার সমক্ষে অজ্ঞানতার মদমত্ত ঐরাবত নিমেষমধ্যে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যায়, পাশ্চাত্যের ইহমুখিনী-সভ্যতাদৃপ্ত ত্রিভুবন-তাপন স্পর্দ্ধিতশীর্ষ পর্ব্বতশৃঙ্গ আঁখির পলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধ্বসিয়া পড়ে। সেই গঙ্গা চাই, পুত্র যাঁহার চির-ব্রহ্মচারী দেবব্রত ভীষ্ম, স্বামী যাঁহার অসীম, অনন্ত, অখণ্ড মহাসমুদ্র, স্পর্শে যাঁহার নরক-নিবারণের অপূর্ব্ব সামর্থ্য, আর, দর্শনে যাঁহার অজ্ঞানান্ধ-নেত্রের দিব্যদৃষ্টির উন্মেষণ।

"কিন্তু কই আজ ভগীরথগণ! কই ভাই, সাড়া দাও, আত্মপ্রকাশ কর, তোমাদিগকে খুঁজিয়া লইবার সুযোগ দাও। ত্রেতার গঙ্গাকে একটী ভগীরথ ভক্তির বলে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে বহিয়া আনিয়াছিলেন, কলির গঙ্গা শত শত ভগীরথের ভক্তি-সাধনা ও আত্মোৎসর্গের অপেক্ষা করিতেছেন।"

প্রকৃতির পথে প্রকৃতি-জয়

অদ্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যা পাঠক এবং শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র একখানা গ্রন্থপাঠ ব্যপদেশে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত অনেক সদালোচনা করিলেন। কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃতি জয়ই প্রকৃত পুরুষার্থ, কিন্তু প্রকৃতির পথেই প্রকৃতিকে জয় কত্তে হয়। যার প্রকৃতি যাকে যেদিকে টানছে, সে সেদিকেই অগ্রসর হোক্,—শুধু মনে রাখ্‌তে হবে,

প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক আমি নই। মনে রাখ্‌তে হবে, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্‌।

যুগ-বিভাগের বিজ্ঞান

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কলিযুগ আর সত্যযুগ সব যুগই সমান, সকল যুগেই সিদ্ধতপা জন্মেছেন, সকল যুগেই পরদারগামী লম্পটও জন্মেছে! কিন্তু ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে যুগ-বিভাগ শুধু মনের ক্রমোন্নতির অবস্থা অনুসারে। নিম্নতম স্তরের মন, বৃথা পরানিষ্ট-সৃজনকারী মন কলিযুগে বাস কচ্ছে। আত্মসুখার্থে পরানিষ্টকারী মন দ্বাপরযুগে বাস কচ্ছে। আত্মসুখার্থে পরোপকারী মন ত্রেতাযুগে বাস কচ্ছে। পরহিতে সর্ব্বস্ব-উৎসর্গকারী মন সত্যযুগে বাস কচ্ছে।

নবজাতির স্রষ্টা

রাত্রিতে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীর সহিত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিকে গঠন করে একটা মুষ্টিমেয় দল। কোনও অসম্ভবকে আমলে না এনে, সকল আপনার জনের প্রবল বিরুদ্ধতা ঠেলে, সকলের নিন্দা-বিদ্রূপ অম্লানবদনে সহ্য ক'রে তারা সমাজটাকে একেবারে বরাহদংষ্ট্রায় ওলট-পালট ক'রে অভিনব মহাজাতি সৃষ্টি করে। আমার প্রতীক্ষা তাদেরই জন্য। এ প্রতীক্ষা, শবরীর প্রতীক্ষা।

গঠন করার মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—কিন্তু 'গঠন' শব্দটা ভাল ক'রে মনে রাখ্‌তে হবে। 'গঠন' মানে ভাঙ্গাচুরাকে মেরামত করা,

অকর্ম্মণ্যকে কর্ম্মণ্য করা, দুর্ব্বলকে সবল করা। 'গঠন' মানে উপাদানীভূত বস্তুগুলিকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত করা। যাঁরা দেশ, জাতি বা জগতের সংগঠক, তাঁরা মিস্ত্রীর মত। আমি তুমি যাকে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে কচ্ছি, তাকে তিনি প্রয়োজনীয় ক'রে তুললেন। আমি তুমি যাকে কদাকার ও অনাদরণীয় ব'লে মনে কচ্ছি, তিনি তাঁর হাতুড়ি-বাঁটালির স্পর্শে তার ভিতরে নয়নাকর্ষক রূপ ফুটিয়ে দিলেন, তাকে আদরণীয় ক'রে তুল্‌লেন। যে কাঠটা খানা-ডোবায় প'ড়ে ছিল, তিনি তা' দিয়ে দেব-বিগ্রহের সিংহাসন বা মন্দির-দুয়ারের কপাট তৈরী কর্ল্লেন। এই রকম মিস্ত্রিরাই একটা নবজাতির স্রষ্টার আসন গ্রহণ করেন।

পুপুন্‌কী আশ্রম

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপের সুফল

জনৈক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—নামজপ কত্তে হ'লে কি শ্বাসে-প্রশ্বাসেই করা উচিত? করে বা মালায় করা উচিত নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বিষয়ে গুরূপদেশ যেমন পেয়েছ, তেমনই ক'রো। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামজপের সব চেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এই যে, তোমার জপের সময়ে অন্য কেউ তা' দেখ্‌তে পাবে না বা টের পাবে না। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামজপের সব চেয়ে বড় লাভ হ'ল এই যে, এই অভ্যাসটা খাঁটি ভাবে হ'য়ে গেলে, এমন কি যদি হঠাৎও তুমি ম'রে যাও, তাহ'লেও, মৃত্যুকালে নাম স্মরণ হবেই হবে, মৃত্যুটা একান্ত নিষ্ফল হবে না। কিন্তু যার জপনীয় মন্ত্র দীর্ঘ, তার পক্ষে শ্বাসেপ্রশ্বাসে জপ করা কষ্টকর।

শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের নিয়ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করার কালে সব সময়ে সাবধান থাক্‌বে যেন প্রাণ-বায়ু আদৌ অস্বাভাবিক না হয়। স্বাভাবিক শ্বাস আর স্বাভাবিক প্রশ্বাসের সাথে সাথে নাম কর্ব্বে। শ্বাসের বা প্রশ্বাসের উপরে একটুও বল-প্রয়োগ কর্ব্বে না। আপনা-আপনি যেমন শ্বাস আসে আর যায়, তার সাথে সাথে নাম কত্তে থাক্‌বে। শ্বাসকে নিজে ইচ্ছা ক'রে হ্রস্বও কর্ব্বে না, দীর্ঘও কর্ব্বে না।

অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ও জপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদি কখনও কোনও আকস্মিক কারণবশতঃ তোমার শ্বাস অস্বাভাবিক ভাবে বইতে থাকে, তাহ'লে সেই সময়টুকু শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ বন্ধ ক'রে মালায় জপ কত্তে পার। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'য়ে এলেই পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ সুরু কর্ব্বে। অনেক পথ হেঁটে এলে, দৌড়ে এলে বা গেলে, অশ্বারোহণ কল্লে, বিপন্ন হলে, অত্যধিক ভয় পেলে, নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠ্‌লে অনেক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিক হয়। সেই সময়ে তার স্বাভাবিকত্ব ফিরে আসা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা ভাল। বায়ু-মণ্ডলের তাপ হঠাৎ অত্যন্ত নেমে গেলে বা অত্যন্ত চড়ে গেলে অনেকের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ অত্যন্ত ক্লেশকর হয়! সেইরূপ সময়ে শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ কত্তে কষ্ট হ'লে মালায় জপ করাই ভাল। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, আবহাওয়ার এই শৈত্যাধিক্য বা তাপাধিক্য দিনের পর দিন কেবল চল্‌ছেই, থাম্‌ছে না বা কম্‌ছে না, তখন শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে না থেকে প্রত্যহ অল্প অল্প ক'রে তার অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য।

আমৃত্যু নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম প্রথম শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ অভ্যাস কত্তে হ'লে নির্দ্দিষ্ট সময়ে করা ভাল। ক্রমশঃ অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে পরে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ নাম, এভাবে চল্‌বে। মৃত্যু পর্য্যন্ত যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস তোমাকে ছাড়ে না, তুমিও তেমন মৃত্যু পর্য্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপকে ছাড়্‌বে না। আমৃত্যু সাধনাই হবে তোমার লক্ষ্য।

সার্থক দীক্ষা নবজন্মদানেরই নামান্তর

অতঃপর দীক্ষার প্রসঙ্গ উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা হচ্ছে নবজন্ম-লাভ। দীক্ষার ফলে অতীতের সংস্কার মুছে যায়, নূতন জীবন-যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়। দীক্ষাদান আর জন্মদান এক কথা। যে যাকে দীক্ষা দেয়, সে তাকে নিজের জাতিও দেয়। দীক্ষা দিয়ে সকল পতিতকে মহাপুরুষেরা যুগে যুগে উপরে টেনে তুলেছেন। আর, যেখানে এইটাই হয়েছে দীক্ষার ফল, সেখানেই দীক্ষা হয়েছে সার্থক। সার্থক দীক্ষা নবজন্মদানেরই নামান্তর, নবজন্মলাভেরই রূপান্তর।

দীক্ষার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসব ক্ষেত্রে দীক্ষা দীক্ষিতের মুক্তিদাত্রী, স্বাধীনতা-দাত্রী, নিরঙ্কুশ ঊর্দ্ধগমনের শক্তি-বিধাত্রী। কিন্তু যেখানে দীক্ষা দিয়ে গুরু তাঁর শিষ্যকে স্বাধীনতার সামর্থ্য না যুগিয়ে কেবল বন্ধনের প্যাঁচ কষেন, সেখানে দীক্ষা ব্যর্থ। এ কথা যেমন মিথ্যা নয় যে, দীক্ষা দিয়ে দলে দলে স্বচ্ছন্দচারী উচ্ছৃঙ্খল লোককে সামাজিক-চরিত্রবিশিষ্ট সুসংযত জীবন যাপনকারী ব্যক্তিতে পরিণত করা সম্ভব

হয়েছে, একথাও তেমন মিথ্যা নয় যে, দলে দলে লোকের মনের স্বাধীনতা হরণ ক'রে আধ্যাত্মিক ক্রীতদাসে পরিণত ক'রে একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সেবার জন্য তা'দিগকে কেনা গোলামে রূপান্তরিত ক'রে রাখার চেষ্টাও এই দীক্ষার মাধ্যমেই দীর্ঘকাল ধ'রে করা হয়ে এসেছে। দীক্ষা এক অতি শক্তিমৎ অস্ত্র, যার সদ্ব্যবহার মানুষকে করেছে দেবতায় উন্নীত, যার অসদ্ব্যবহার মানুষকে করেছে ক্রীড়নকের দলে পরিণত।

রাজনীতিক নেতাদের সহিত দীক্ষাদাতা গুরুদের সাদৃশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাজনীতিক নেতারা যেমন ক'রে অনেক সময়ে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে প্রলুব্ধ ক'রে তাদের কাছ থেকে নিজের অনুকূলে ভোট আদায় ক'রে তারপরে রাজ্যশাসকের গদীতে ব'সে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য সকলের স্বার্থকে পদ-বিদলিত করে, দীক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তেমনি একদল লোক সহস্র সহস্র নরনারীর উপরে সম্মোহনাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তাদের স্বাধীন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সর্ব্বশক্তি লোপ ক'রে দিয়ে স্বর্গ-নরকাদির প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের বল-বিত্ত অপহরণ ক'রে ক'রে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখের অনুশীলন এবং নিজেদের নিতান্ত সান্ত ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতর্পণ ক'রে থাকে। এরা সকলেই সমাজের শত্রু। এই কথাটী সুস্পষ্ট-রূপে জেনে রেখে প্রত্যেককে হুজুগ-বর্জ্জিত মন নিয়ে ভোট-দানের কেন্দ্রে বা দীক্ষার গৃহে ঢুকতে হবে। কেন দীক্ষা নিচ্ছি, তা' না জেনে দীক্ষা নেওয়া উচিত নয়।

সৎ-সাহস চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার সৎসাহস চাই। ইহজীবনই বল আর পরজীবনই বল, জীবন নিয়ে কোনও অবস্থাতেই জুয়াখেলা চালানো উচিত নয়। "তোমাকে ভোট আমি দিব না",—ওই কথা বলার সাহস যেমন প্রত্যেক নাগরিকের থাকা উচিত, "তোমার কাছে দীক্ষা আমি নিব না"—এই কথা বলার সাহসও তেমন প্রত্যেক সাধন-পথ-গমনেচ্ছু ব্যক্তির থাকা উচিত। এ সৎসাহস যাদের না থাকে, তারা বস্তা-পোরা বেড়ালের মত কেবল আছাড় খায় আর আঘাতই পায়। অতি তরুণ কৈশোরে আমার পিতৃদেব আমাদেরা শিক্ষা দিয়েছিলেন এই ব'লে প্রত্যহ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করবার,—"হে ভগবান, আমাকে সৎসাহস দাও।"

সৎসাহস কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎকার্য্যে নির্ভীক থাকার নামই সৎসাহস। সৎসাহস যার আছে, সে ভদ্রতার বা তথাকথিত শিষ্টাচারের মোহে কখনো কোনও অকর্ত্তব্য কাজে হাত দেয় না। সৎসাহস যার আছে, সে বিচার না ক'রে কারো পথ গ্রহণও করে না, বর্জ্জনও করে না। সৎ-সাহস যার আছে, সে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকেও তুচ্ছ ব'লে জ্ঞান করে না। সেই ক্ষুদ্র শক্তিরই শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার কত্তে এবং সেই ক্ষুদ্র শক্তিকে সর্ব্ব-প্রযত্নে কাজে আন্‌তে সে চেষ্টা করে। সৎসাহসী ব্যক্তি বিপদ দেখে কর্ত্তব্য-ত্যাগ করে না, বাধাবিঘ্ন দেখে হতভম্ব হয় না। "চিলে কাণ নিয়ে গেছে", শুনলে সৎসাহসী ব্যক্তি কখনও লোকে নিন্দা কত্তে পারে ভেবে কাণে হাত দিয়ে দে'খে চিলের আচরণের সত্যতা প্রমাণে অগ্রসর

হ'তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করে না। সৎসাহস আর সত্যানুরাগ নিয়ত হাতধরাধরি ক'রে চলে।

দেহাভ্যন্তরস্থ আলম্বনের শ্রেষ্ঠতা

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহটাকেই আত্মা ব'লে জ্ঞান কচ্ছ ব'লে দেহের উদয়-বিলয়ের সঙ্গে নিজেকে উদিত বা বিলীন ব'লে ধারণা কচ্ছ। এরই ফলে দেহের বিকারে তোমার মনেরও বিকার সৃষ্ট হচ্ছে। এই বিকারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়-হিসাবেও দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে মনঃসন্নিবেশনের দ্বারা ঈশ্বর-সাধন একটা প্রয়োজনীয় কৌশল। নিজের ইষ্টকে বাইরে ধ্যান করার চাইতে দেহাভ্যন্তরস্থ কোনও না কোনও কেন্দ্রে ধ্যান করা অধিকতর শুভকর। কারণ, দেহাভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রে মন একটু মজ্জে গেলে দেহ-দ্বারা অধিকৃত স্থানটুকু ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত স্থানের আর কোনও স্থানই তখন নিজের জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও উপলব্ধিতে প্রবেশ করে না। এতে মন সহজে এবং অতি দ্রুত অতি গভীরভাবে একমুখী হয়। এই জন্যই দেহের বাইরে অবস্থিত আলম্বনসমূহ অপেক্ষা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনও কেন্দ্রে অবস্থিত আলম্বনসমূহকে যোগীরা ধ্যান-সাধনের পক্ষে অধিকতর অনুকূল জ্ঞান ক'রে থাকেন। দেহাভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রে ধ্যান যোগীদের এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার!

নিম্নাঙ্গে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন যাদের প্রায় সর্ব্বক্ষণই নিজের বা অপরের নিম্নাঙ্গেই পড়ে আছে, তাদের পক্ষে গুহ্যমূলে বা উপস্থমূলে মনঃসন্নিবেশন সহজতর। যার পক্ষে যা সহজতর, তার পক্ষে তা

মঙ্গলতরও বল্‌তে হবে। এ যেন, নদীতে জোয়ার-ভাটা যেমনই যখন থাকুক, তখন সেই স্রোতেই নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে কৌশলে কোণাকুণি পথে অপর তীরে পৌছার মত। বলও বেশী দিতে হ'ল না, অথচ নৌকাও অপর তীরে গিয়ে পৌছুল।

মূলাধারে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আলস্যে অবসাদে দেহ-মন ঝিমিয়ে রয়েছে, যাকে যৌগিক পরিভাষায় বলা হয়, –'কুলকুণ্ডলিনী ঘুমুচ্ছে',— এমন অবস্থায় গুহ্যমূলে কয়েকবার অশ্বিনী বা যোনিমুদ্রার অভ্যাস ক'রে নিয়ে ঘুমন্তকে দু'চার ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে তারপরে ইষ্টধ্যান সুরু করলে অতি সহজে মন ব'সে যায়। এই জন্যই মূলাধারে মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদনের নিয়ম সৃষ্ট হয়েছে।

স্বাধিষ্ঠানে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, –আলস্যেরও চূড়ান্ত নয়, অবসাদেরও চূড়ান্ত নয়, জাগৃতির কেমন একটা খেলা শরীরের মধ্যে চলেছে, কিন্তু সেই খেলা অতীন্দ্রিয়ের নয়, নিতান্তই জড় ইন্দ্রিয়ের, কামনা-বাসনার ঝিকিমিকি পথে সাপের মত বুকে হেঁটে লালসার পঙ্কিল গতি কেবলি চারিদিকে অন্ধ তাড়নায় নিজেকে ছড়াচ্ছে এবং কাদার উপরে আছাড় খেয়ে খেয়ে নিজেকে কেবলি অতৃপ্ত জেনে তৃপ্তির জন্য অস্থির অধীর হ'য়ে পড়েছে, –এই যখন অবস্থা, তখন উপস্থমূলে মনঃসন্নিবেশন এক সহজতর অধ্যবসায়। এই কারণেই স্বাধিষ্ঠানে মনঃসন্নিবেশনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

মণিপুরে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কামের দুর্নিবার তাড়না থেমে গেছে কিন্তু ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ব্যতীত অন্যতর পথে আত্মতৃপ্তির লোভ কমে নি, আপনা আপনিই মন দুরন্ত চঞ্চলতার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে কিন্তু ভোগ-সুখকে বর্জ্জন ক'রে চলার সামর্থ্য সে সঞ্চয় করে নি, এমন অবস্থায় নাভিমূলে মনঃসন্নিবেশন এক সহজতর কার্য্য। এই কারণেই মণিপুর-চক্রে মনঃসন্নিবেশনের রীতি যোগীদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

হৃদয়ে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্তর-ভরা প্রেম এসেছে, সেই প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের বিভিন্নতাকে মানে অথচ উভয়কে এক ক'রে বুকে ধরার জন্যই বিহ্বল ব্যাকুল, এমন অবস্থায় হৃদয়ে মনঃসন্নিবেশন-কার্য্য সহজতর। এই কারণেই হৃৎপদ্মে মনঃসংস্থানের নিয়ম এল।

বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রেম তার প্রেয়কে পেয়েছে, কিম্বা পেয়েছে-কি-না-পেয়েছে তার তোয়াক্কাই নাই, অথচ তাঁর সঙ্গে নিজের অভেদত্বকে অনুভবে নিয়ে এসেছে, ভেদ-জ্ঞান ম'রে যায় নি বরং অভেদবোধাগ্রহকে তীব্রতর করার জন্যই একটুখানি বেঁচে আছে, এই যে অবস্থা, এতে কণ্ঠমূলে মনঃসন্নিবেশন সহজতর কাজ। এই কারণেই বিশুদ্ধে মনঃসন্নিবেশনের রীতি প্রবর্ত্তিত হ'ল।

আজ্ঞাচক্রে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইষ্টের সঙ্গে আরাধকের অভিন্নত্ব ও ভিন্নত্ব যখন সকল প্রশ্নের বাইরে, ভিন্নত্ব যখন অভেদত্বের সাথে সংঘর্ষে আসে না, অভেদত্ব যখন ভিন্নত্বকে অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর জ্ঞান করে না, ভেদের ভিতরে অভেদ, অভেদের ভিতরে ভেদ যখন ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিত এবং শরীরের ক্রিয়া যখন শরীরকে আসক্ত করে না, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি বিক্ষেপ-সহভূ-গুলিই মাত্র যখন সমগ্র শরীরের বা অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব কচ্ছে, তখন ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন যোগীদের নিকটে প্রিয়তর হ'ল। এ সাধনে ঊর্দ্ধ-অধের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য !

সহস্রারে মনঃসন্নিবেশনের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস-প্রশ্বাসেরও যখন ক্ষমতা নাই বিক্ষেপ সৃষ্টি কর্ব্বার, শ্বাস যখন প্রশ্বাসে বিলীন হয়ে গেছে, প্রশ্বাস যখন শ্বাসের মধ্যে নিজেকে হারিয়েছে, কুম্ভকে আর রেচক-পূরকে যখন কলহ মিটে গেছে, রেচক-পূরক যখন অনুভূতির বাইরে, কুম্ভক যখন স্বভাব-সম্পদ রূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন হ'ল সময় সহস্রারে মনঃসন্নিবেশনের। এই অবস্থায় সাধক নিজেকে পরমপ্রভুর সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে এক ব'লে অনুভব করে এবং নিখিল বিশ্বকে প্রপঞ্চ জেনে সম্যক্ বিস্মৃত হয়ে যায়,—স্থিতি তার আনন্দে, ব্রহ্মানন্দে, উপলব্ধি তার স্বতঃপ্রকাশ জ্যোতিঃসমুদ্রে, সঞ্চরণ তার একান্ত ও নিত্য স্থিতিতে, স্থিতি তার অনন্ত অতীতের সঙ্গে অনন্ত বর্ত্তমান ও অনন্ত ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ সমন্বয়ে।

সহস্রারের উপলব্ধি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহস্রারে মনঃসন্নিবেশনের কালে ক্রিয়া থাকে না, কর্ত্তব্য থাকে না, অতীত থাকে না, ভবিষ্যৎ থাকে না, শরীর ও আত্মায় ব্যবধান থাকে না, দিনে ও রাত্রিতে তফাৎ থাকে না, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, জোয়ার এবং ভাটা, ক্ষয় এবং উদয় তখন আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হয়, চন্দ্র ও সূর্য্য একাধারে যুগপৎ উদিত হয়, মৃত্যু ও অমৃত একত্র সমাস্বাদিত হয়।

সহস্রার-সেবীর সাধন-কৌশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহস্রার-সেবীর সাধন-কৌশল অনন্ত ব্যোম হ'তে অভ্যুত্থিত অনন্ত ওঙ্কার, যাতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণু হ'তে অভ্যুত্থিত মহাধ্বনি গিয়ে মিলিত হয়ে লীন হয়েছে। এ বড় বিচিত্র সাধন।

ভ্রূমধ্য-সেবীর সাধন-কৌশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভ্রূমধ্য-সেবীর সাধন-কৌশল হচ্ছে, ভ্রূমধ্যেই মনঃসন্নিবেশন ক'রে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাদ-সাধন, শ্বাস-প্রশ্বাসকে নাদের অনুগত এবং নাদকে শ্বাস প্রশ্বাসের অনুগত ক'রে কাজ করা। মন যাতে ভ্রূমধ্যে নিয়ত থাকে, তার সহায়ক হিসাবেই সে ললাটে, দুই ভ্রূর মাঝখানে, একটী চন্দনের কোঁটা দিয়ে নিজেকে সহায়তা করে। মনের অনিবিষ্ট বা অগভীর অবস্থায় মন বারংবার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াগত কারণ ফুস্ফুসে এসে পড়্তে চায়, কিন্তু ধ্যানের বলে তাকে টেনে টেনে আনতে হয় ভ্রূমধ্যে। আস্তে আস্তে এমন হয়ে যায় যে, শ্বাসে প্রশ্বাসে নামের সাধন অবিচ্ছেদেই চলতে থাকে অথচ ফুস্ফুসে মন আসে না, মন ডুবে থাকে ভ্রূমধ্যে।

ভ্রূমধ্যসেবী ও সহস্রারসেবীর পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভ্রূমধ্যে মন ডুবিয়ে রেখেও সংসারের সহস্র প্রকারের কাজ চলে। কামান দাগা, বই লেখা, রান্না করা, পথ চলা,—সব চলে। সহস্রারে মন রেখে সব চলে না। এজন্যই সহস্রারে ধ্যান অপেক্ষা ভ্রূমধ্যে ধ্যানকে যোগীদের অনুশীলনে বেশী কৌলীন্য দেওয়া হয়েছে।

নাম-কীর্ত্তন ও ভগবানের তৃপ্তি

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা যে ভগবানের নাম-কীর্ত্তন কত্তে বসি, তখন আমরা কি ক'রে বুঝ্‌তে পার্ব্ব যে, ভগবান সন্তুষ্ট হয়েছেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের অন্তরের দিকে তাকাও। আত্ম-প্রসাদে, পরিতৃপ্তিতে, বিমল বিশুদ্ধ আনন্দে অন্তর কি পূর্ণ হয়ে গেছে ? যদি তা' হয়ে থাকে, তবে জান্‌বে যে তোমার নাম-কীর্ত্তনে ভগবানও সন্তোষ লাভ করেছেন। আর, তা' যদি না হয়, তাহ'লে জান্‌বে, তিনি তৃপ্ত হন নি।

নাম-কীর্ত্তন কি ভাবে করা উচিত ?

প্রশ্ন।—কি ভাবে কীর্ত্তন করা উচিত ? কেমন ক'রে কীর্ত্তন কর্‌লে অন্তরে তৃপ্তি আস্‌বে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথম কথা, প্রেম নিয়ে তাঁর নামগান কর্ব্বে, যশেরও লোভে নয়, আমোদের লালচেও নয়। দ্বিতীয়তঃ কণ্ঠকে উৎপীড়িতও না ক'রে কীর্ত্তন কর্ব্বে। তৃতীয়তঃ প্রেমিক, ভাবুক, রসগ্রাহী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে কীর্ত্তন কর্‌বে। চতুর্থতঃ সমগ্র কীর্ত্তনের পূর্ণ

শুভফল শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ ক'রে নাম-কীর্ত্তন কর্ব্বে। শ্রীভগবান এই ত' তোমার সাম্‌নেই ছিলেন, এই ত' তিনি তোমার কণ্ঠে তাঁর নিজের নাম-গান গাইবার জন্য তোমার ভিতরে এসে বস্‌লেন, তোমার সুরে সুর, তোমার ধ্বনিতে ধ্বনি দিয়ে নিজের নাম-গান সুরু কল্‌লেন,— এই রকম ভাব রেখে কীর্ত্তন কর্ব্বে। তাহ'লেই ভগবান সন্তুষ্ট হবেন, তোমার অন্তরও বিমল আনন্দে ভ'রে যাবে। তাহ'লেই ভগবানও তৃপ্ত হবেন।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

পুপুন্‌কী গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী সুগভীর জঙ্গলের মধ্যে যে কেহ কখনও আসিয়া বাস করিবেন বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন, একথা স্বয়ং বিধাতা ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। যে বনে সর্প আর নেকড়ে বাঘের রাজত্ব বলিয়া পুরস্কারের লোভ দেখাইলেও কেহ রাত্রিকালে যাইত না, যে বনের কঠিন মৃত্তিকা আবাদের অযোগ্য বলিয়া কেহ আজ পর্য্যন্ত জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইতে চাহে নাই, সেই বনে আজ সাধুর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ছাত্র-সমাগম হইতেছে, লোকজনের যাতায়াত হইয়াছে। কিন্তু আজও কেহ ঠিক্‌ঠিক্ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, প্রকৃতই এখানে একটা জিনিষের মত জিনিষ হইবে, জাতির মুখোজ্জ্বল করিবার মত একটা প্রতিষ্ঠান বাহুবলকেই দৈববল বলিয়া প্রমাণ করতঃ গড়িয়া উঠিবে। পূজ্যপাদ আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে একটা মাত্র ব্রহ্মচারী ব্যতীত আর কোনও সহকর্ম্মী নাই। শ্রীশ্রীবাবামণি দীর্ঘ দুই বৎসর কাল রক্ত-বমন

রোগে ভুগিয়া একেবারে অস্থিচর্ম্ম-মাত্র-সার, আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীটীও মাত্র অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক এবং শীর্ণকায়। এইরূপ দুইটী লোকের দ্বারা কি করিয়া যে এতবড় জঙ্গল পরিষ্কৃত হইবে, এতবড় মরুভূমির শুষ্কতা দূর হইবে, এত পাথর অপসারিত হইবে, তাহা সকলের কল্পনার অতীত।

আমি নই, তিনি

এই সকল বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ গভীর বন থাক্‌বে না, মাটীর এ কঠিনতা থাক্‌বে না, শত বাধা, শত বিঘ্ন পদ-বিদলিত হবে, সাফল্যের গৌরব-মুকুট একদিন তোদের শিরে শোভা পাবে, কিন্তু কার শক্তিতে জানিস্? একমাত্র নিরহঙ্কার কর্ম্ম-শীলতার শক্তিতে। কর্ম্মীকে কাজ কত্তে হবে প্রাণ দিয়ে কিন্তু মনে-প্রাণে জান্‌তে হবে, এ কাজের কর্ত্তা আমি নই, কর্ত্তা তিনি যিনি সকলের প্রাণ, সকলের আত্মা, সকলের প্রভু। বলহীন কখনও কোনো বড় কাজ কত্তে পারে না, বলহীনের জীবনধারণ এবং প্রাণ-পরিত্যাগ উভয়ই ব্যর্থ হয়, তার জীবনে জগতের মঙ্গল বাড়ে না, মৃত্যুতেও মঙ্গল বাড়ে না। তাই প্রত্যেক কর্ম্মীকে বলহীনতার অপবাদ থেকে মুক্ত হ'তে হবে এবং সকল পৌরুষ, সকল বীর্য্য লক্ষ্য-লাভে নিয়োজিত কত্তে হবে। কিন্তু এই বলপ্রয়োগ করার সময়ে তাকে অহরহ মনে রাখ্‌তে হবে যে, এ বল আমার নয়, সব বল তাঁর, এ শক্তি আমার নয়, সব শক্তি তাঁর। সাফল্যের সময়ে অনুভব কত্তে হবে, এ সাফল্য আমার নয়, তাঁর; অসাফল্যের সময়েও অনুভব কত্তে হবে, এ অসাফল্য আমার নয়, তাঁর। নিন্দাও তাঁর, প্রশংসাও তাঁর, আমার জন্য আছে শুধু কর্ত্তব্য-পালন।

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও সন্ন্যাস-প্রচার

আশ্রমের নিকটে কোনও জল-সংস্থান নাই। পূর্ব্বদিকে সিকি মাইল দূরে একটী জোড় (অর্দ্ধশুষ্ক ঝরণা) আছে, তাহাতে বৎসরে মাত্র কয়েক মাস কিছু কিছু জল থাকে। স্নানার্থ শ্রীশ্রীবাবামণি ও ব্রহ্মচারী জোড়ে যাইতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ত' গড়্‌তে যাচ্ছ, কিন্তু এখানকার ব্রহ্মচারী-বিদ্যার্থীরা সবাই যে সন্ন্যাসীই হবে না. হ'তে পারে না, হওয়া যে উচিত নয়, তা' মনে রাখ্‌তে হবে।

ব্রহ্মচারীর মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন একথা বল্‌ছি জানিস্? সন্ন্যাস সকলের জন্য নয় এবং সকলেও সন্ন্যাসের জন্য নয়। যে যার জন্য নয়, নির্ব্বিচারে তাকে তা' করে তোল্‌বার চেষ্টা সাধু চেষ্টা নয়; যার জন্য যেটা নয়, জোর ক'রে তার পেটে সেইটা ঢুকিয়ে দেওয়া ভাল কাজ নয়। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের উদ্দেশ্য হবে শুধু বিদ্যার্থীর দেহে ও মনে পূর্ণতা সঞ্চারিত করা, তার স্বাধীন কর্ম্মশক্তি ও স্বাধীন চিন্তা-শক্তিকে সঞ্জীবিত ক'রে দেওয়া, তার নিজের পথ নিজে বেছে নেওয়ার শক্তি তাকে দেওয়া। সন্ন্যাসের মহিমা প্রচার যেমন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না, গার্হস্থ্যের প্রসারও তেমন তার উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

ব্রহ্মচারীর ভাবী জীবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীর ভাবী জীবন সন্ন্যাসীর জীবনও হ'তে পারে, গৃহীর জীবনও হ'তে পারে। বিদ্যার্জ্জনের পরে সে নিজেকে যে আশ্রমের যোগ্য ব'লে অনুভব কর্ব্বে, তাকে সেই আশ্রমের সুগম পথটী খুলে দিতে হবে। সন্ন্যাসী যে হ'তে চায়, তার

জন্য বৃহত্তর সেবার ক্ষেত্র-সমূহ উন্মুক্ত রাখ্‌তে হবে ; গার্হস্থ্য যে নিতে চায়, তাকে সমভাবের ভাবুকা, সমসাধনার সাধিকা, সমশিক্ষায় শিক্ষিতা, পরিণয়েচ্ছুকা কুমারীর সঙ্গে পবিত্র ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ ক'রে দিতে হবে।

ভবিষ্যতের মহাজাতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সন্ন্যাসী যারা হবে, তারা বরং নিজেরাই নিজেদের কর্ম্ম-সাধনার ক্ষেত্র নির্ম্মাণ ক'রে নেবে কিন্তু গৃহী যারা হবে, তাদের যেন পথের কাঁটা একটী অবধি দূর করার চেষ্টা থাকে। গৃহী সাধকের সব চাইতে বড় কণ্টক তার অসাধিকা অশিক্ষিতা পত্নী। ছেলেদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম গড়্‌তে গিয়ে এই কথা তোমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। কেননা, ভারতবর্ষে এক মহাশক্তি-শালী জাতি-সৃষ্টির মূল কর্ম্মকৌশল এইখানে। যমের সঙ্গে যখন যমের বিয়ে হবে, তখন ছেলেমেয়েগুলি হবে সব মহাযম। 'যম' মানে সংযম, আর 'যম' মানে মৃত্যু। কার মৃত্যু ? অসংযমের মৃত্যু। এই সব মহা-যমেরাই নূতন ভারতবর্ষকে গ'ড়ে তুল্‌বে। অনাগত সেই ভারতবর্ষের পানেই আজ আমরা তাকিয়ে আছি।

মহিলা-প্রতিষ্ঠান

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহ'লে ত' মেয়েদের আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, নইলে স্নাতক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছেড়েই গিয়ে অম্‌নি কোথায় তাঁদের যোগ্যা সহধর্ম্মিণীদের পাবেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক্ ব'লেছ। মেয়েদের জন্যও প্রতিষ্ঠান গড়্‌তে হবে ! সে প্রতিষ্ঠান এক বাহু বিস্তার ক'রে কুমারীদের শিক্ষার

ভার নেবে, আর এক বাহু বিস্তার ক'রে অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী-সধবাদের চ'খের সম্মুখে জ্ঞানের মশাল ধর্‌বে। মহিলা-প্রতিষ্ঠান এক-দিকে যেমন ধীরে ধীরে কুমারীর সুকুমার দেহ-মনকে ভাবী জীবনের গুরুতর দায়িত্বসমূহের জন্য প্রস্তুত কত্তে থাক্‌বে, তেম্‌নি আবার অপর দিকে ছায়ায় ঢাকা গ্রাম্য কুটীরগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌বে একেবারে দাবানলের মত, যেন, যে-সব সধবা নিজেদের জীবনগুলিকে ব্যর্থতায়ই কাটিয়ে দিয়েছে, তারা আর নিজেদের কন্যাগুলিকে এই ব্যর্থতার নরকে ডুব্‌তে না দেয়। গার্হস্থ্য-জীবনের বর্ত্তমান অনাচারের উপরে, সধবা-জীবনের বর্ত্তমান পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘ-প্রসুপ্ত মনকে সতেজে বিদ্রোহী ক'রে তুল্‌তে হবে এবং যাদের তারা প্রসব ক'রেছে, তাদের জীবনকে গ'ড়ে তোলার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষায় তাদের উদ্দীপিত ক'রে তুল্‌তে হবে।

মহিলা-প্রতিষ্ঠানের বাধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য, মেয়েদের আশ্রম গ'ড়ে তুল্‌তে গিয়ে এক মহাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম কত্তে হবে। সে বিঘ্ন হচ্ছে উপযুক্ত কর্ম্মিণীর অভাবের। বড় কাজের ভার নিতে পারেন, এমন মহিলা-কর্ম্মীরা ত' আজও আত্মপ্রকাশ করেন নি! আর, যারা বা কর্ম্মের ভার নিতে চাচ্ছেন, তাদের মধ্যে সত্যিকার যোগ্যতা সঞ্চিত হয় নি। হয়ত লেখা-পড়া বেশ শিখেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এত অধিক পরিমাণে কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা, অভিমান ও অহমিকা পুঞ্জিত হ'য়ে আছে যে, জগদুদ্ধার সম্ভব হ'লে একাই কর্ব্বেন, অন্য কোন সহকর্ম্মিণীর সঙ্গ-সংস্পর্শ সইতে পারবেন না। হয়ত বড় বড় কথা মুখস্থ করেছেন, নানা আদর্শ-বাদের উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণে দু'চারটী দাঁত ভেঙ্গেছেন কিন্তু পুরুষজাতির সংস্রবে

এলেই ভিতরের রিরংসা তাঁদের মাথার ঘিলু তরল ক'রে দেয়॥ তবু হতাশ হ'লে চল্‌বে না। কর্ম্মিণী মা-দের ত্রিভুবন খুঁজে বের কত্তে হবে, তবে হবে। এই যে দেশের সর্ব্বত্র দুঃখ-দৈন্ত-ক্লিষ্টা হাহাকারগ্রস্তা বালবিধবাদের সমাজ, তারই মধ্য থেকে হয়ত অধিকাংশ কর্ম্মিণী-মাকে অন্বেষণ ক'রে বের কত্তে হবে। সমাজ সহস্র হস্তে রাজদণ্ড ধারণ ক'রে নারী-জাতিকে শাসন কচ্ছে, তার কবল থেকে দেশের কাজে মা-দের ছিনিয়ে আনা সহজ হবে না, কিন্তু যা' কঠিন, তাই সম্ভব কত্তে হবে, নইলে ছাড়াছাড়ি নেই। বাধা আস্‌বে সহস্র,—কর্ম্মিণী মা-দের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপরেও হয়ত কত পশু মিথ্যা কলঙ্কের পসরা চাপাতে চাইবে, কিন্তু দমে গেলে হবে না। যাঁরা মিথ্যা অপবাদে ভয় পাবেন না, লোক-নিন্দাকে গ্রাহ্য কর্ব্বেন না, এমন তেজস্বিনী মা-দের খুঁজে বের কত্তেই হবে।

কর্ম্মী সন্ধানের উপায়

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বের করবার উপায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অকপট আকাঙ্ক্ষা। এক কণা কপটতা যদি না থাকে, তবে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেই হবে। নিজের কোনও স্বার্থের যোগ যদি না থাকে, তাহ'লে তোমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপযুক্ত হৃদয়ে গিয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত কর্ব্বে,—যাকে দিয়ে যা করান অপ্রত্যাশিত, তাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেবে। কর্ম্মী খোঁজার মানে এই নয় যে, সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বক্তৃতা কত্তে হবে; কর্ম্মী খোঁজের মানে হচ্ছে, অসামান্য শক্তিশালী সুতীব্র কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাকে চিন্তার বলে জলে, স্থলে, ব্যোমে সর্ব্বত্র উল্কাবেগে পরিচালিত করা। হাজার বক্তৃতায় যা হবে না, একটা তপস্বী মন যদি

অক্ষুণ্ণ পবিত্রতার উপরে দাঁড়িয়ে মায়েদের সম্বন্ধে শুধু ইচ্ছার শক্তিকে প্রেরণ করে, তাহ'লে দেখ্‌তে পাবে, তার সহস্রগুণ কাজ নীরবে আরম্ভ হ'য়ে যাচ্ছে। মহিলা-প্রতিষ্ঠান গড়্‌বার জন্য আমরা সন্তানের জাতি সুতীব্র ও সুপবিত্র ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত কর্ব্ব,—আমাদের দায়িত্ব এই পর্য্যন্তই। দেখো, তারই ফলে মাতৃ-জাতির জীবনে কি অপূর্ব্ব নব-উদ্বোধন আস্‌বে, মায়েরা ঠিক্ মায়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেই বুক ফুলিয়ে সিংহ-বাহিনী হ'য়ে দাঁড়াবেন। কত কুমারী আস্‌বেন, কত সধবা আস্‌বেন, কত বিধবা আস্‌বেন। অপ্রত্যাশিত সব ব্যাপার ঘট্‌বে।

মহিলা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ

মহিলা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহিলা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হবে প্রত্যেকটী শিক্ষার্থিনী কুমারীর জীবনকে একটা নূতনত্বের, একটা অসাধারণত্বের দিকে প্রেরণা দেওয়া। এমন গঠন এদের দিতে হবে যেন, যে অবস্থায় লক্ষ-করা একটী সাধারণ মেয়েও বিচলিত না হ'য়ে পারে না, সে অবস্থায় প'ড়েও এরা বিচলিত না হয়, যে অবস্থায় সহস্রে একটী মেয়েও চরিত্রের দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতার দৃঢ়তা রক্ষা কত্তে পারে না, সেই অবস্থায় প'ড়েও এরা বিন্দুমাত্র না টলে। প্রকৃতিভেদে যখন পুরুষ ও নারীর কর্ম্মভেদ রয়েছেই, তখন এদের শিক্ষা ঠিক্ পুরুষদের শিক্ষার মতই হবে না সত্য, কিন্তু এমন যোগ্যতা এদের দিয়ে অর্জ্জন করিয়ে নিতে হবে যেন, একদিন হঠাৎ যদি ভারতের সমস্ত পুরুষগুলির পৌরুষ নির্ব্বাণ পেয়ে যায়, তবু যেন ভারতবর্ষ মহাসাগরের অতল জলে না ডোবে, মায়েরাই যেন তাদের শক্ত বুকের পাটায় দেশটাকে ঠেলে ধ'রে

রাখ্‌তে পারে। মহিলা-প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য আদর্শের হীন অনুকরণ কর্ব্বে না, প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি-পত্তন হবে ভাগবত-জীবনের প্রত্যক্ষ আস্বাদনের উপরে। যারা আত্মস্থ একক জীবন যাপনের জন্য তৈরী হবে, তারাও যেমন ভগবানকে সর্ব্বেশ্বর ব'লে জান্‌বে, যারা ভাবী দাম্পত্য জীবনের জন্য আত্মগঠন কর্ব্বে, তারাও তেমন ভগবানকেই ধ্রুব-তারা ব'লে জেনে তাঁর পানে চেয়ে পথ চল্‌বে। জীবনের সকল কাম এবং সকল অহঙ্কারকে তারা খর্ব্ব কর্‌বে ভগবৎসাধনের অকপটতা দিয়ে, পরিশুদ্ধ কর্ব্বে ভগবদ্দর্শনের দিব্য প্রভাব দিয়ে। মহিলা-প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রতিষ্ঠান হবে না, মানুষ একে গড়্‌বে না, মানুষ এতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে না, মানুষ এর শাসন-বিধি প্রণয়ন কর্ব্বে না, এ হবে ভাগবত প্রতিষ্ঠান, ভগবদ্বিহিত স্বাভাবিক আনুকূল্য এর জীবন-মরণের কোষ্ঠী রচনা কর্ব্বে। পরিশ্রমের সহিত সম্পর্কহীন ভাষা-শিক্ষা এখানকার শিক্ষার্থিনীদের মনুষ্যত্ব-সংগঠন কর্ব্বে না। কঠোর কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম এবং কঠোর দুঃখ স্বীকারের মধ্য দিয়েই ভোগ-বিলাস-বর্জ্জিনী ত্যাগিনী মায়েদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থিনীরা এখানে জীবন-গঠন কর্ব্বে।

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এরূপ প্রতিষ্ঠান কবে হবে, কোথায় হবে, তা' আমি বল্‌তে পারি না। কিন্তু এবে একদিন হবেই হবে, তা' জানি। হয়ত কে জানে, ছেলেদের আশ্রমগুলি ভাল ক'রে গ'ড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের প্রতিষ্ঠান মাথা তুল্‌বে। আমিই এই শরীরে নিজ হাতে এ সব গড়ে যেতে পার্ব্ব কিনা, তাও জানি না।

সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু

বৈকাল বেলা পুপুন্‌কী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র ও লক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র আশ্রমে আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি এবং সঙ্গীয়

ব্রহ্মচারী এতক্ষণ বনের গাছ কাটিয়া আশ্রম-কুটীরের সম্মুখভাগটা পরিষ্কার করিতেছিলেন। শরীর রোগ-দুর্ব্বল বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মাঝে মাঝে কুঠার ছাড়িয়া হাঁপাইতেছিলেন। হরিবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির হাত হইতে কুঠার ছিনাইয়া লইলেন এবং অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিজেই গাছ কাটিতে লাগিলেন। দেখাদেখি গ্রামিক আরও কয়েকটি লোক বৃক্ষচ্ছেদনে লাগিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বৃক্ষচ্ছেদন স্থগিত হইল। হরিবাবু এবং ব্রহ্মচারী কথা কহিতে কহিতে বনে প্রবেশ করিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামবাসী একটী নবদীক্ষিত যুবককে লইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপরে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকলেরই একটা লক্ষণ আছে, যা' দিয়ে তাকে চেনা যায়। যেমন, না ব'লে যে পরের জিনিষ নেয় বা রাত্রিতে পরের ঘরে সিঁদ দেয়, তাকে বলে চোর। যেমন, লাঠি-সোটা, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে গায়ের জোরে যে পরস্ব অপহরণ করে, সে হ'ল ডাকাত। ঠিক্ তেমনি যিনি বুক ঠুকে শিষ্যকে বল্‌তে পারেন,—"যে দিন দেখ্‌বি, আমি তোর কল্যাণের বিঘ্ন হচ্ছি, ধর্ম্মলাভের অন্তরায় হচ্ছি, ভগবানকে পাবার বাধা হচ্ছি, তখনি আমাকে ত্যাগ করে যাবি",—তিনিই হ'লেন সদ্‌গুরু। যিনি বল্‌তে পার্‌বেন,—"যেদিন, দেখ্‌বি, আমাকে ত্যাগ কর্ল্লে তোর সাধন-জীবনের গতি দ্রুত হবে, তুই সহজে পূর্ণতা লাভ কর্ত্তে পার্ব্বি, সেদিন আমার প্রতি ভালবাসা আছে ব'লে যেন পিছন তাকিয়ে চলিস্ না",—তিনিই সদ্‌গুরু। আর যিনি বলেন,—"আমায় ছাড়লে তোর অধোগতি হবে, আমাকে ত্যাগ কর্ল্লে তোর নির্ব্বংশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে, তিনি হচ্ছেন অসদ্‌গুরু।"

ত্রিবিধ গুরু

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি তিন শ্রেণীর গুরুর কথা বলিতে লাগিলেন,— এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা নিজেরা নিজেদিগকে ব্রহ্ম ব'লে কখনো উপলব্ধি করেন নি, কিন্তু অজ্ঞ মূর্খ অশিক্ষিত শিষ্যের কাছে বারবার শুধু এই কথাই ব'লে বেড়ান যে,—"গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি কত্তে নেই, গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম—ইত্যাদি" এবং এইভাবে চাল-কলার বরাদ্দটা বাড়িয়ে নেন। এঁরা অধম গুরু। আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন এবং নিজেকে ব্রহ্ম ব'লে বুঝেছেন এবং শিষ্যের নিকট নিঃসঙ্কোচে ব'লে বেড়ান,—"আমিই ব্রহ্ম, আমিই পরাৎপর পরমাত্মা, আমিই উপাস্যের উপাস্য, ঈশ্বরের ঈশ্বর।" এঁরা মধ্যম গুরু। আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা নিজেদিগকে ব্রহ্মের সাথে অভেদ ব'লে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ ক'রেছেন কিন্তু মুখে কখনো বলেন না,—"আমি ব্রহ্ম", বরঞ্চ সকল শিষ্যকে বার বার ক'রে মনে করিয়ে দেন যে, মানব-গুরুকে নিয়ে তুষ্ট থাক্‌লে চল্‌বে না, পৌছুতে হবে পরম ব্রহ্মে এবং গতি-পথে কোনও গতানুগতিকতার কাছে থেমে দাঁড়ান হবে না.—পূর্ণ লক্ষ্য লাভ পর্য্যন্ত চল্‌তেই হবে,—এঁরা উত্তম গুরু।

ত্রিবিধ শিষ্য

তৎপরে তিন প্রকার শিষ্যের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— এক প্রকারের শিষ্য আছেন, যাঁদের মতলব হচ্ছে ফাঁকি দেওয়া। গুরু-দেবের সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁরা মনে মনে বিচার করেন,—"গুরুর দেহটা ত' আর গুরু নয়। সুতরাং গুরুর দেহের পরিচর্য্যা ক'রে আর কি হবে? এঁরা অধম শিষ্য। আর এক প্রকারের শিষ্য আছেন, গুরুর

আত্মার সম্বন্ধে কোনও বিচার তাঁরা করেন না, তাই ঐ দেহটারই প্রাণপণে সেবা ক'রে যান, আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যান। এঁরা মধ্যম শিষ্য। আর এক প্রকারের শিষ্য আছেন, তাঁরা গুরুদেবের দেহের যথাশক্তি পরিচর্য্যা করেন কিন্তু দেহটাকে গুরু মনে করেন না, দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মাকেই গুরু ব'লে মনে করেন, শাশ্বত, সেই আত্মার নিত্যমধুময় সঙ্গকে লাভ করার উপায় হিসাবে গুরুর পাঞ্চভৌতিক তনুর করেন সাগ্রহ সেবা,—এঁরা উত্তম শিষ্য।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

টুপ্‌রা নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মাহাথার সহিত কালাপাথরের আম্র-বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আলাপ করিতেছিলেন।

শূদ্রের প্রণবে অধিকার

মাহাথা বলিলেন,—দিন কয়েক হয় আমার এক সন্ন্যাসী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলুম, তিনি বল্লেন, শূদ্রের ওঙ্কার উচ্চারণে অধিকার নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটার মানে অনেক রকম হ'তে পারে। প্রথমতঃ এতে এরূপ বুঝা যেতে পারে যে, শূদ্র যদি প্রণব উচ্চারণ কত্তে যায়, তাহ'লে শত চেষ্টা কর্লেও তার জিহ্বা তা' উচ্চারণ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। দ্বিতীয়তঃ এতে এরূপ বুঝাতে পারে যে, শূদ্র যদি ওঙ্কার উচ্চারণ করে, তাহ'লে তার জিভটা একেবারে খ'সে প'ড়ে যাবে। তৃতীয়তঃ এতে এও বুঝাতে পারে যে, শূদ্র যদি ওঙ্কার উচ্চারণ করে, ওঙ্কার জপ করে, তাহ'লে তার সেই জপে কোনো ফলই হবে না ব্রহ্মজ্ঞান

জন্মাবে না। কিন্তু সত্য কথাটা কি তাই? এসব কথা কি শূদ্রের উপরে জবরদস্তি নয়? অবিচার নয়?

বাম্‌নালির বড়াই

মাহাথা বলিলেন,—শুধু তাই নয়। সেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বল্‌লেন যে, খাঁটি ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো প্রণব বা গায়ত্রী উচ্চারণের অধিকার নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—খাঁটি ব্রাহ্মণের মানে?

মাহাথা বলিলেন,—আপনাদের দেশের রাঢ়ী, বারেন্দ্র, আর আমাদের দেশের মৈথিল, কনৌজিয়া।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বর্ত্তমানে যাঁরা ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সংঘর্ষে অব্রাহ্মণদের সেনাপতিত্ব কচ্ছেন, তাঁরা এসব খাঁটি ব্রাহ্মণদের কুলের খোঁটা ধ'রে, জন্মের দোষ ধ'রে এমন সব তথ্য আবিষ্কার কচ্ছেন, যাতে এসব বাম্‌নালির বড়াই দেখ্‌লে আর অবাক্ না হ'য়ে পারা যায় না। ব্রাহ্মণ্যের অনুশীলন যারা কর্‌ল না এক কণা, ম্লেচ্ছ-পদসেবার জন্য যাদের মধ্যে আজ তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে, বিদেশীর পদ-লেহনে যোগ্যতা কার কতটা বেশী, তাই নিয়ে আজ যাদের মধ্যে মারামারি রেশারেশি, যাদের মধ্যে আজ সব চাইতে বড় কুকুরটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় সম্মানের পাত্র, সেই লোকগুলির মুখে বাম্‌নালির বড়াই একান্তই অশোভন। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব'লে বড়াই কর্‌বি ত' আগে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম গ্রহণ কর্, জীবনের মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত কর্, ভোগ বিলাসের কামনার একেবারে মূলোচ্ছেদ ক'রে দে, পরার্থে আত্মোৎসর্গকে জীবনের পরম-সাধনা ব'লে গ্রহণ কর্, তবে ত! লম্বা টিকী, আর

খোলাই করা পৈতা দেখালে কি হবে, ওতে যুগ-পুরুষ ভুল্‌বেন না, তিনি কাণটী ধ'রে ব্রাহ্মণের উদ্ধত মাথাটাকে শূদ্রেরই পায়ের তলায় নত ক'রে দেবেন। খাঁটি ব্রাহ্মণ ব'লে গৌরব কত্তে চাস্ ত' ব্রাহ্মণের মত হ'— শুধু চেঁচালেই ত' কেউ ব্রাহ্মণ হয় না! তপস্যাই ব্রাহ্মণত্বের জননী।

আধুনিক ভারত শূদ্রের দেশ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখুন মাহাথা, "আমি ব্রাহ্মণ আর তুমি শূদ্র"—এসব চীৎকার হচ্ছে শুধু প্রলাপ। আদিতে ছিল ভারতে একটী বর্ণ, ব্রাহ্মণ। শ্রম-বিভাগ ক'রে হ'ল ত্রিবর্ণ। অনার্য্যদের জয় করার পরে হ'ল ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য। রঘুনন্দনের আমল থেকে চল্‌ছিল দুই বর্ণ—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, আর এখন ভারতবর্ষ হয়েছে শূদ্রের দেশ, চণ্ডালের দেশ, ক্রীতদাসের দেশ। জুতোয় যাদের উঠ্‌তে হবে, আর, জুতোয় যাদের বস্‌তে হবে, তাদের আবার জাতের বড়াই! আমাদের অত অভিমান ভাল নয়।

স্মৃতির পণ্ডিতের মুর্খতা

মাহাথা বলিলেন,—কিন্তু সব বড় বড় পণ্ডিতেরাই ত' জাতিভেদ সমর্থন করেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোথায় পণ্ডিত? এরা সব স্মৃতির পণ্ডিত, আর সব বিষয়ে মূর্খ। দুঃখীর দুঃখ দেখে যার প্রাণ কাঁদে না, পতিতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণে তাকে টেনে তুলে আন্‌বার জন্য যার বাহু প্রসারিত হয় না, কতকগুলি পুঁথি পেটে পুরে রেখেছে ব'লেই তাকে পণ্ডিত বল্‌তে হবে? তাহ'লে ত' ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর

আল্‌মারিগুলিকেও পণ্ডিত বল্‌তে হয়। নির্জ্জীব, প্রাণহীন, হৃদয় নাই, সেও পণ্ডিত !

পণ্ডিতের পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পণ্ডিতের পরিচয় তার পঠিত শাস্ত্রসমূহের বিশাল তালিকায় নয়, তার পরিচয় হচ্ছে নিজের জ্ঞান দিয়ে অপরের অজ্ঞানতা বিদূরিত করার সামর্থ্যে। এককণা জ্ঞান যে পেয়েছে, সে সেই এক কণাকেই অপরের অজ্ঞানতা অপসারণে নিয়োজিত করুক। সে ততটুকু পণ্ডিত। অগাধ জ্ঞান যে সঞ্চয় করেছে, সে তার সমুদ্রোপম গভীর, আকাশোপম বিরাট্ জ্ঞানকে সকলের হিতকার্য্যে নিয়োজিত ক'রে জ্ঞানকে করুক সার্থক, নিজেরও পাণ্ডিত্যের দিক যথার্থ পরিচয়। যথার্থ পণ্ডিত জ্ঞানের অধিকারকে সকলের মধ্যে বিস্তারিত ক'রে দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। অপণ্ডিত বা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি অন্যের জ্ঞানাধিকার সঙ্কোচ করার উপায় আবিষ্কারেই করেন সর্ব্বশক্তির নিয়োগ। এঁরা নিজেদেরও অহিতকারী, জগতেরও অমঙ্গলকারী।

স্বাধীনতার শক্তি

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি গান্ধাজোড় গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্রের ভবনে আগমন করিলেন। সঙ্গে পুপুন্‌কীর হরিহরবাবু। কুশল-প্রশ্নাদির পরে আশ্রমের দলিল-সম্পাদনের কথা উঠিল।

হরিবাবু বলিলেন,—ভাগ্যে যোগেনদা' সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন, নইলে আমরা হয়ত কত বড় এক ভুলই না করে ফেল্‌তাম।

যোগেনবাবু বলিলেন,—এজন্য তোমাদিগকে চিরকাল অনুতাপ কত্তে হ'ত। সহস্র অনুরোধ ক'রে হাতে-পায়ে ধ'রে যাকে একশত বিঘা জমির দান গ্রহণে স্বীকার করাতে হয়, তেমন ব্যক্তিকে এক কণা অবিশ্বাস কর্‌লে কখনো তোমার মঙ্গল হ'তে পারে না। ভিক্ষা করে না, চাঁদা তোলে না, এসব কথা আমি নী—বাবুর মুখে যখন শুনেছিলাম, তখনই বিস্মিত হয়েছিলাম। তবু যখন সশরীরে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেলাম, তখন আমার মনে একটু পরীক্ষা-বুদ্ধি ছিল। কিন্তু সর্ব্বসংশয় দূর হ'ল যখন আলাপ ক'রে দেখ্‌লাম। দেখ হরি ভায়া, স্বামীজীর মত মানুষকে দু' একশ' বিঘা জমি দিয়ে কেনা যায় না, এঁদের হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে মানুষ কৃতার্থ ই হয়। এইজন্যই আমি দলিলের মধ্যে কোনও ট্রাষ্টি নিয়োগ কত্তে দিই নাই। স্বামিজীর মত শক্তিমান পুরুষেরা কখনো কারো পরাধীনতা স্বীকার করেন না, একথা আমি জানি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কৈ, আমি ত' ট্রাষ্টি নিয়োগের প্রস্তাবে কোনও বিরোধ করি নাই, বরং প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্র সানন্দে সমর্থন করেছি।

যোগেনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশীবাবু বলিলেন,—ভিক্ষা করা যে বর্জ্জন করেছে, সে ত' ট্রাষ্টি-মাষ্টি কিছুকেই বিরোধ কর্ব্বে না। কেন না, দান ত' সে চাচ্ছে না।

যোগেনবাবু বলিলেন,—দানের কথা বল্‌ছেন? একদিন দেখ্‌বেন এই স্বামীজীর পদতলে কত দেশের কত দান এসে স্তূপীকৃত হচ্ছে। ইনি যত বল্‌বেন "চাই না," তত বেশী ক'রে আস্‌বে। স্বামীজী যে অভিক্ষু! স্বামীজী যে স্বাধীন! তাঁর এই স্বাধীনতার শক্তিই তাঁকে জগজ্জয়ী

করবে। ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে, চাঁদা আদায় ক'রে ভারতবর্ষের আজ পর্য্যন্ত কেউ যা কর্ত্তে পারে নি, আমাদের স্বামীজী ভিক্ষাবৃত্তি বর্জ্জন ক'রে তাই কর্ব্বেন।

সতীশবাবু বলিলেন,—স্বামীজী হয়ত কত কিছুই কর্ব্বেন কিন্তু আমরা করব কুব্যাখ্যা। আমরা করব তাঁর সেবা ও কৃতিত্বকে অস্বীকার। কি বল হরি।

যতীনবাবু বলিলেন,—মূর্খ লোকে হীরা-জহরতের মূল্য বোঝে না। দামী একখানা মাণিক্যকেও কাচের টুকরা ব'লেই মনে করে। তাতে কি হীরামাণিক্যের মূল্য কমে?

যোগেনবাবু বলিলেন,—যার পর-নির্ভর নেই, যার নিজের ভার নিজের ঘাড়ে, তার মূল্য কমায় কে? মানুষের মূল্য তার স্বাধীনতা দিয়ে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু যোগেন-দা, আমি যে প্রেমের অধীন।

সঙ্কল্পের শক্তি

অতঃপর পুপুন্‌কী আশ্রমের জলাভাব-নিবারণ প্রভৃতির কথা উঠিল।

হরিবাবু বলিলেন,—মানভূমের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এখন স্বরাজী নেতাদের হাতে। চাইলেই আশ্রমে একটা কূয়া ওঁরা ক'রে দেবেন। হুটমুড়া আশ্রমে ওঁরা একটা কূয়া খুঁড়ে দিয়েছেন। অনেক টাকাও দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে প্রার্থনায় অক্ষম! চাইতে ত' আমি যাব না!

শশীবাবু বলিলেন, - ঠিকই ত'। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের বিবেচনা থাকে ত' নিজেরাই এসে গরজ ক'রে খুঁড়ে দিয়ে যাক্ না। আমি নিশ্চিত

জানি, কারো কাছে স্বামীজীর কিছু চাইতে হবে না। ওঁর ইচ্ছা-শক্তিতে সব হবে, ওঁর ইচ্ছা-শক্তিতে এক একটা হিমালয় স'রে গিয়ে পথ ক'রে দেবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন। তৎপরে বলিলেন,—কূয়া আমি ইতি-মধ্যে স্বহস্তেই খোঁড়া আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।

উপস্থিত অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—পাথর বেরুলে কি কর্ব্বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাথর ত' দুচার হাত না খুঁড়তেই বেরুবে। কিন্তু পাথরের শক্তি কি সঙ্কল্পের শক্তির চাইতে বেশী? ভারতবর্ষের আজ সব চাইতে বড় অভাব কিসের জানেন? সঙ্কল্পের দৃঢ়তার। একবার যে সঙ্কল্প করেছি, তার চূড়ান্ত সাফল্য না দেখে কাজ ছাড়্‌ব না। বাধা দেখে থাম্‌তে পারি কিন্তু তা' শুধু বাধাকে নির্ম্মূল করারই আয়োজন সৃষ্টির প্রয়োজনে। কাজ ছেড়ে দিব, সেজন্য নয়।

সৎকার্য্য-সাধনে অসদুপায়

অতঃপর আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণের কথা উঠিল। আশ্রমের পর্ণকুটীর-খানার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া যোগেনবাবু বলিলেন,—পুরুলিয়ার কেউ কেউ বলেছেন যে, অমুক মঠের মোহান্তকে চাপ দেওয়া হউক যেন সে পুপুন্‌কী আশ্রমে একখানা দালান তুলে দেয়। মোহান্তকে ভয় দেখান হউক যে, তুমি অমুক অমুক কদাচার ক'রে দেবতার সম্পত্তির অপব্যবহার ক'চ্ছ, তুমি যদি পুপুন্‌কী আশ্রমকে একখানা দালান তুলে না দাও, তাহ'লে তোমার বিরুদ্ধে মামলা চালাব। তাহ'লেই সে প্রাণ বাঁচাবার জন্য দালান তুলে দেবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎকার্য্য-সাধনে অসদুপায়ের অবলম্বন কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। যে দিন জান্‌লাম জাতিকে স্বাবলম্বী করা চাই, সেদিন আমি উপায় থেকে ভিক্ষাকে বিতাড়িত করেছি। যে প্রতিষ্ঠান জাতিকে অভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, তার পুষ্টি কখনও কাউকে ভয় দেখিয়ে হতে পারে না। গৃহের জন্য আপনারা কেউ বিন্দুমাত্রও ভাব্‌বেন না। সব্‌ আপ্‌সে হো জায়েগা।

কলিকাতা

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

গত রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা আসিয়াছেন। কলিকাতার বহু স্কুল-কলেজের ছাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। একজন বিধবাদের কথা তুলিলেন।

বিধবার অন্নকষ্ট নিবারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিধবা-জীবনের দুঃখ দ্বিবিধ। এক হচ্ছে আর্থিক, অপর হচ্ছে নৈতিক। দুমুঠো অন্নের জন্য বিধবাকে পরের মুখ-পানে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়, আর নৈতিক অবনতি যদি তার একবার কোনও ক্রমে ঘটে, তাহ'লে চিরতরে আত্ম-সংশোধনের পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। এই যে দুইটী দুঃখ, তা' নিবারণ করার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা দরকার। অন্নাভাবের বিভীষিকা দূর হবে শিক্ষার বলে, আর নৈতিক পতনের সম্ভাবনা দূর হবে দীক্ষার গুণে। বাংলার দুই কোটি বিশ হাজার স্ত্রীলোকদের মধ্যে ক'জন লেখা-পড়া জানে? অথচ শিক্ষা-প্রচারের প্রয়োজন আছে এদের সকলেরই মধ্যে। বিশ লক্ষ মেয়ে আছে শুধু স্কুলে যাবার বয়সী আর তার মধ্যে স্কুলে যায় মাত্র তিন

লক্ষেরও কম। আর যে বাকী সতের লক্ষ, তাদের মধ্যে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কত্তে কতগুলি শিক্ষয়িত্রী দরকার ভেবে দেখ দেখি? বিধবাদের আমরা এই কাজটিতে লাগাতে পারি। এ ত' শুধু বাংলা-দেশের হিসাব দিলাম। সমগ্র ভারতের বিধবাদের সংখ্যা দেখ্‌তে গেলে তোমাদের মাথা গুলিয়ে যাবে। যাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বল্‌তে গেলে প্রায় নেই, আর থাক্‌লেও তা' খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে নয়, সেই হিন্দু-সমাজের লোকেরাই ভারতের মোট অধিবাসীদের বারো আনা। এজন্য বিধবাদের নিয়ে বিপুল সমস্যা ত' এই সমাজেরই সব চেয়ে বেশী।

অতীতের বিধবা ও বর্ত্তমান বিধবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগেকার দিনে অনেক বিধবাই পিতার, ভ্রাতার বা অন্য কোনও আত্মীয়ের সংসারে এসে অনাসক্ত কর্ত্তৃত্বের উচ্চ আসনে বস্‌তেন। সেই জীবনে দায়িত্ব ছিল, গৌরব ছিল, সার্থকতা ও সম্মান উভয়ই ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বেড়ে যাওয়ার ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সেই শুচি শুভ্র আদর্শ আজ অস্তগত। তাই বিধবা আজ সংসারের জঞ্জাল, পরিজনের গলগ্রহ, সমাজের অনাবশ্যক আবর্জ্জনা। এই গলগ্রহকে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ কত্তে হবে, এই আবর্জ্জনাকে সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবার কাজে লাগাতে হবে। এ দায়িত্ব আমার, তোমার, সকলের। সমস্যা দেখে পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় কোনও লাভ হবে না। যেখানে যখন যেমন গুরুতর সমস্যাই আসুক না কেন, আমাদিগকে বীরের মত তার সম্মুখীন হ'তে হবে, সংগ্রাম দিতে হবে, জয়ী হ'তে হবে।

বিধবা-জীবনে ভগবৎ-সাধনা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাইরের প্রয়োজনকে পূর্ণ কর্‌বার জন্য যেমন স্বাবলম্বনমূলক অর্থোপার্জ্জনের পথ চাই, ভিতরের প্রয়োজনকে পূর্ণ কর্‌বার জন্য তেমন বিধবার জীবনে ভগবৎ-সাধনেরও তীব্রতা চাই। শত প্রলোভন ও শত দুর্ব্বলতা বিধবা দমন কর্ব্বে তার ভগবৎ-সাধনের বলে। পতিহীনা বালিকার উপরে সমাজ জোর ক'রে বৈধব্য চাপাচ্ছে কিন্তু একবার চিন্তা ক'রে দেখ্‌ছে না, তার প্রাণের অফুরন্ত পিপাসা সে মিটাবে কাকে দিয়ে। ভালবাসার জন্য যে একজনকে চাই। ভোগ-সুখমত্ত ভ্রাতৃবধূদের দাসীত্বেই ত' সে তার প্রাণের পিপাসা মিটাতে পারে না। তাকে ভালবাসার ধন শ্রী-ভগবানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তবে ত' সে সংসারের সকল নীচতা, সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন কর্ব্বে!

বিধবার জরায়ু-রোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—গতকাল একটী বিধবা এসেছিল পুপুন্‌কী আশ্রমে ঔষধ নিতে। তার রোগ হচ্ছে, পেটের ব্যথা। জিজ্ঞাসায় বুঝ্‌লুম এ ব্যথা প্লীহা, যকৃৎ, পিত্তশূল বা অম্লশূলের নয়। তখন তার ভাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লুম; এ মেয়েটী বিধবা হ'য়েছে কত বয়সে। ভাই বল্লে—ছয় মাস বয়সে। এখন মেয়েটীর বয়স একুশ বাইশ। শরীরে অপর কোনও রোগ নেই, শুধু পেটে ব্যথা, আর তাতেই দিন দিন কৃশ হ'য়ে যাচ্ছে। আমার আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না, এই রোগ হ'ল কিসে। যৌবনের পূর্ণোদ্গম হ'য়েছে, ভোগ বাসনায় চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, অথচ বিধবার ত' পুনর্বিবাহ এখনও সচল হয়

নি, আবার সংযমের উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থাও নেই, কিম্বা সংযমের উপদেশও কোথাও পাচ্ছে না, ফলে ভোগ-চিন্তা জরায়ুকে রুগ্ন করেছে, সমগ্র শরীর তাতেই বিপন্ন হয়েছে। আমি তখন এক কৌশল কর্‌লুম। উনুন থেকে কতকগুলি ছাই তুলে এনে দিলুম প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে, আর ভগবানের একটী নাম ব'লে দিলুম প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় জপ কত্তে।

নামজপে রোগারোগ্য

একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামজপে রোগ সার্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,-কেন সার্‌বে না? * ইন্দ্রিয়ের রোগে ভগবানের নামের চাইতে বড় ঔষধ জগতে কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। নামের ভিতরে মন মজ্‌লে ইন্দ্রিয়-গ্রন্থি (Sexual Glands) সমূহের অনাবশ্যক রসনিঃস্রাব আপনি থেমে যায়, যে সকল গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় মন দুর্ব্বল হ'য়েছে তাদের সুস্থতা ফিরে আসে এবং এই ভাবে ভগবানের নাম ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ পূর্ণ শক্তি ফিরে পাবার সুযোগ ক'রে দেয়।

প্রচ্ছন্ন কাম ও তাহার প্রতীকার

একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—স্ত্রীলোক দেখ্‌লে সম্ভোগেচ্ছা আমার জাগে না, ইন্দ্রিয়ের কোনও উত্তেজনা হয় না, কিন্তু একটা অব্যক্ত হর্ষ-বোধ হয়। ইহা কি কাম?

---

* প্রকৃতই কথিত বিধবা মহিলাটী স্বল্প কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি। হাঁ, প্রচ্ছন্ন কাম।

প্রশ্ন।—ইহার প্রতীকার কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিয়ত নিত্যানিত্য চিন্তা, জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকা এবং ভগবানের নামের আশ্রয় নেওয়া। ভগবানের নামে অনুরাগ এলে প্রচ্ছন্ন আসক্তি আপনি দূরীভূত হয়।

ইষ্ট-নামে অনুরাগের লক্ষণ

প্রশ্ন।—ইষ্ট-নামে অনুরাগ এসেছে, তা' কিসে বুঝ্‌ব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যখন জগতের সকল ধ্বনিতে ইষ্ট-নামের ঝঙ্কার শুনতে পাবে, তখনই বুঝ্‌বে যে, এতদিনে অনুরাগ এসেছে। অনুরাগে পাখীর ডাকে ইষ্ট-নাম শুনা যাবে, বোমা-বিদারণেও ঐ ইষ্ট-নামই অনুভূত হবে। যাঁর প্রতি যখন অনুরাগ, তখন সমগ্র জগৎ তাঁতেই ভ'রে যায়।

সঙ্ঘারাম

ঘর লোকে ভরিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চল্, আমরা আমাদের প্রিয় সঙ্ঘারাম হেদুয়ার পার্কে যাই।

একজন বলিল,—ওটা ত' একটা মাঠ। ওটাকে বল্‌ছেন সঙ্ঘারাম ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ, সঙ্ঘারাম। সঙ্ঘভুক্তদের আরাম যেখানে, অফুরন্ত স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে অফুরন্ত তৃপ্তি যেখানে, যেখানে তারা গ'ড়ে ওঠে, বিশ্বের কাজে লাগবার উপযুক্ত হয়, তার নাম সঙ্ঘারাম। এই হেদুয়ার পার্কে বসে বসে তোমরা কত হাজার শক্তিশালী চিত্ত জীবনের পরম উদ্বোধন পেয়েছ, তা' জগতের কেউ জান্‌বে না, কিন্তু আমি জানি, তোমরা জান। চাঁদপুরের ঘোড়ামারার মাঠ, ঢাকার রমণার মাঠ,

কলকাতার হরিষ পার্ক, কালীঘাট পার্ক, আর হেদুয়ার পার্ক তোমাদের জীবনে সজ্যারামের কাজ করেছে এবং কচ্ছে।

ভগবানের সঙ্গে ওতপ্রোত হও

হেদুয়ার পার্কে আসিয়া পূর্ব্বোত্তর কোণে সকলে বসিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভগবানের নামে তোমাদের অন্তর-বাহির ভ'রে দাও। নিজের ভিতরে তাকালে যেন একমাত্র ভগবানের জন্য অকৃত্রিম ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে না পাও। বাইরের দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন কর্লে যেন একমাত্র ভগবানই সর্ব্বরূপে সর্ব্বদৃশ্যে সকল মূর্ত্তিতে অচল সচল সকল কিছুতে ফুটে উঠ্‌তে থাকেন। জানো, সব কিছুই একমাত্র ভগবানেরই প্রতীক। সবকিছুর মধ্য দিয়েই পরমমঙ্গল শ্রীভগবানে পৌছা যায় এবং পৌছুতে হবে। ভগবান তোমার অতীত, ভগবান তোমার বর্ত্তমান, ভগবান তোমার ভবিষ্যৎ—ভগবানকে বাদ দিয়ে তোমার অস্তিত্বের কোনও অর্থ নেই। বাইরে ভগবান, ভিতরে ভগবান, অন্তর্বহির্বর্জ্জিত তোমার অব্যক্ত অবস্থায়ও তুমি ভগবানের আধার, ভগবান তোমার আশ্রয়, ভগবানের সঙ্গে তুমি ওতপ্রোত। সর্ব্বশক্তি দিয়ে সাধন কর, আর এই অবস্থাটীতে গিয়ে পৌছ।

ঈশ্বর আছেন

একটী নবীন কিশোর আগাইয়া আসিয়া বলিল,—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। মনে হয় সাধারণ লোকদের প্রবঞ্চনা করার জন্য একদল পুরুত ঈশ্বর ব'লে একজনকে নিজেদের কল্পনার বলে সৃষ্টি করেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর মানো না ? বেশ কথা ! যে যা' না মানে, তা' তাকে জোর ক'রে মানাবার প্রয়োজন আমি দেখি না। তবে ঈশ্বরকে পুরোহিতেরা সৃষ্টি করেছেন, একথা সত্য নয়। মানুষের অন্তরে ঈশ্বর আমিত্ববোধরূপে নিত্যকাল বিরাজ কচ্ছেন। সেই "আমি" নিজেকে দে'খে, নিজেকে চি'নে, নিজেকে জে'নে কৃতার্থ হ'তে চায়। সান্ত এই দেহের মাঝখানে ব'সে সেই "আমি" পঞ্চভূতের বাঁধন-কষণে নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, চিনতে পাচ্ছে না, জান্‌তে পাচ্ছে না। তাই এই দেহের বাইরে বার বার দৃষ্টি দিচ্ছে, সেখানে তাকে পায় কিনা। নিকটে না দেখ্‌তে পেয়ে সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্ছে, সেখানে আছে কিনা। সম্যগ্‌দর্শীরা এসে তাকে বল্‌ছে,—"অত দূরে তাকাচ্ছিস কেন, ঈশ্বর ত' তোর ভিতরে রয়েছে ! ভিতরে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না ? বেশ ত', যে কোনও মনঃপ্রাণাভিরাম প্রতীকে সমস্ত মন-প্রাণ-অনুরাগ অর্পণ ক'রে পরমেশ্বরকে সেখানে কল্পনা কর্‌। কল্পনার চূড়ান্ত উন্নতি মনকে পরম একাগ্রতা দেবে। তখন 'কেনচিৎ কৌশলেন চ',—কোনও এক অদ্ভুত কৌশলের বলে—তুই নিজেকে দেখে ফেল্‌বি।" জ্ঞানীরা, ঋষিরা, দিব্যদর্শীরা জীবের কল্যাণের জন্য এইটুকু কাজ করেছেন। তারপরে এলেন পুরোহিতরা। মানুষ সামাজিক জীব,—দশজনকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে দিন-কর্ত্তন কত্তে চায়। ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টাটাকেও একটা আমোদে পরিণত করার তার রুচি হ'ল। অম্‌নি পুরুতঠাকুরেরা বসে গেলেন পূজার মঙ্গল-ঘট নিয়ে। তোমরা নিজেদের করণীয় কর্ত্তব্য পুরোহিতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার একটা জীবিকার পথও খুলে দিলে। এতে পুরুতের দোষের চাইতে আমোদ-প্রিয় সামাজিক মনের দোষটা বেশী। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন খেলনা

নিয়ে খেলা কত্তে ভালবাসে, মানুষের সামাজিক মন তেমন ঈশ্বরকে খেলনা ক'রে খেলা কত্তে ভালবাসে। কিন্তু তাতেই ত' বাবা প্রমাণ হয় না যে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর আছেন, তোমার তুমিত্ব হয়ে তিনি তোমার মাঝখানে বিরাজ কচ্ছেন, আমার আমিত্ব হয়ে তিনি আমার মাঝখানে বিরাজ কচ্ছেন। তোমার ঐ তুমিত্ব আর আমার এই আমিত্ব যে এক, এই সত্যটী যখন উপলব্ধিতে এল, তখন হ'ল ঈশ্বর-দর্শন। ঈশ্বরও সত্য, তাঁর দর্শনও সত্য,—বাইরের নানা মতবাদ শুনে তুমি বিভ্রান্ত হ'য়ে কয়েক দিন নিজেকে বুঝ মানিয়ে চল্‌তে চেষ্টা কত্তে পার, কিন্তু যিনি সত্য, তিনিই পরিণামে তোমার জীবনে জয়ী হবেন।

কলিকাতা

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রতী রহিয়াছেন।

একাই কি অমৃতাস্বাদন করিবে?

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবৎ-প্রেমরসের আস্বাদন করিতে হইলে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম এবং সংসর্গকে কমাইতে হয়, 'অরতি জন-সংসদি' বাক্যকে পালন করিতে হয়, বৃথা প্রসঙ্গ এবং বৃথা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু একাই তুমি অমৃত-রসের আস্বাদন করিবে আর নিখিল জগৎ তাহা হইতে বঞ্চিত রহিবে, এই জাতীয় স্বার্থপর মনোভঙ্গীও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তোমার পরিবারে বা গ্রামে বা সমাজে যতগুলি নরনারী আছে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহাদের সহিত তোমাকে কখনও না কখনও কোনও না কোনও প্রকারে সংস্রব রক্ষা করিতেই হয়। চেষ্টা

করিয়াও এই সংস্রব ত্যাগ করা যায় না। এই কারণেই তোমার অন্যতম এক কর্ত্তব্য হইবে ইহাদেরও প্রত্যেকের ভিতরে ভগবৎ-প্রেম-রস-পিপাসা জাগরিত করার চেষ্টা করা। যাঁহারা সরলচিত্ত এবং সদাত্মা, সর্ব্বপ্রথমে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদের সকলকে ভগবদ্‌ভক্তিবিমণ্ডিত পবিত্র জীবনের সুমোহন আলেখ্য-দর্শন করাও। নিজে ভগবৎ-প্রেমের অমৃত-রস আস্বাদন করিতে করিতে এভাবে ক্রমশঃ নিখিল জগতের প্রত্যেকটী অধিবাসীকে সেই অমৃত-রসের অধিকারী করিতে পারিবে। নিজে বঞ্চিত রহিয়া নহে, পরন্তু নিজে আকণ্ঠ সেই অমৃত-রস পান করিতে করিতে অপরকে তাহা পানে প্রবুদ্ধ কর, প্রবৃত্ত কর। পৃথিবী সত্যে, প্রেমে, জ্ঞানে, আনন্দে, সুখে, শান্তিতে, তৃপ্তিতে, আত্মপ্রসাদে, পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় এবং স্নেহদৃষ্টিতে পূর্ণ হইয়া উঠুক।

হতাশ হইও না

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হতাশ হইও না বাবা! মনকে দুর্ব্বল কেন করিবে? বিশ্বাস কর, তুমি অভয়ের সন্তান। বিশ্বাস কর, তুমি অমৃতের পুত্র। মন হইতে সকল শঙ্কা, কুণ্ঠা, দ্বিধা, আতঙ্ক বিদূরিত করিয়া দাও। চিত্তকে দৃঢ় কর, সঙ্কল্পকে কঠোর কর, নিজের ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস কর, সকল আত্ম-অবিশ্বাস চিরতরে পরিহার কর। জীবনের পরম সাধনায় তুমি সিদ্ধকাম হইবে, এই কথা কায়মনোবাক্যে স্বীকার কর।"

হীরা ভাঙ্গিয়া চিঁড়া কিনিও না

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহামহোৎসব করিয়াছ। কতই আনন্দের কথা। কতই সুখের বিষয়। কিন্তু এই শুভকার্য্য দ্বারা

নিজের প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধি কি তুমি চাহিয়াছ ? গুরুদেব বা গুরুতুল্য কোনও মহাপুরুষ তোমার গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন। হাজার লোককে জড় করিয়া আনন্দোৎসব করিলে। কতই না ইহা তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু গুরুসেবা বা সাধু-সেবার চাইতে আত্মসেবাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে, যদি ইহার ভিতর দিয়া যশ, প্রতিপত্তি, মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম বা কৌলীন্য লাভ তোমার গৌণ লক্ষ্যও হইয়া থাকে। শালগ্রাম দিয়া শিলনোড়ার কাজ করা যে কত বড় ভ্রম, তাহার সম্পর্কে সচেতন হইও। বড়লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছ কি তাঁহার দ্বারা জন-সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য, না তোমার নিজের সুনাম বর্দ্ধনের জন্য, তাহার হিসাব লইও। হীরা ভাঙ্গিয়া চিঁড়া কেনার মত মূর্খতা জগতে অনেক লোকেরই আছে। কিন্তু তুমি যেন ভ্রমেও কখনো তাহাদের দলে না ভিড়। কোন্ বস্তুতে তোমার নিত্যকালের প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া দেখ। যে সারাৎসার পরমতত্ত্বের সেবায় কোটি জন্মের প্রয়োজনের দাবী একদিনে এক লহমায় মিটে, তাহাকে বেচিয়া অনিত্য সুখ ও অনিত্য প্রতিষ্ঠা কিনিও না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কাচ বেচিয়া কাঞ্চন সংগ্রহ করেন। মূর্খেরা কাঞ্চনের বিনিময়ে দুনিয়ার যত ভাঙ্গা কাচের আবর্জ্জনা আনিয়া আঙ্গিনা ভর্ত্তি করে। তুমি যে প্রকৃতই ধীমান্, তাহা তুমি তোমার রুচি, প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা দিয়া প্রমাণিত কর।"

কলিকাতা
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

যৌবনের স্বরূপ

১৪ই অগ্রহায়ণ রাত্রে পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কলিকাতা শুভাগমন করিয়াছেন। ১৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে

(বর্ত্তমান ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট) অবস্থান করিতেছেন। বৈকাল বেলা ভবানীপুরে গমন করিলেন। সাউথ্ পার্কে অনেক স্কুল-কলেজের ছাত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—যুবকের আকাঙ্ক্ষা কি থাক্‌বে জানো? যুবকের আকাঙ্ক্ষা থাক্‌বে শুধু আত্মোৎসর্গের। প্রাণ দেওয়াই হবে তার সিদ্ধিমন্ত্র, যে-কোনও মহৎ কাজে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে আহুতি দেওয়াই হবে তার ব্রত। আত্মদানের ইচ্ছাই হচ্ছে যৌবনের প্রমাণ, মৃত্যুভয়হীনতাই হচ্ছে যৌবনের স্বরূপ। নিজেকে যুবক ব'লে পরিচয় দেবার আগে অন্তরের ভিতরে অনুসন্ধান কর, উৎসর্গের প্রেরণা জেগেছে কিনা, মৃত্যুভয় দূর হ'য়েছে কিনা। দুঃখের কথা ভেবে কি ভয় পাচ্ছ? লাঞ্ছনার সম্ভাবনা দেখে কি ভ্রূ-কুঞ্চন হচ্ছে? তাহ'লে জেনো তুমি যুবক নও, তুমি বৃদ্ধ, তুমি স্থবির, তুমি প্রাণহীন স্থাণু মাত্র।

প্রাণ-দানের লক্ষ্য

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ কার্য্যে প্রাণ-দান কর্ব্বার কথা বল্‌ছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কথা ব'লে দেবার অধিকার কারুর নেই। অনুসন্ধান কর তোমার প্রাণের ভিতর। প্রাণ যে কথা বল্‌বে, কেবল সেই কথা শোন। সহস্র কণ্ঠে যদি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, গ্রাহ্য ক'রো না। কি না হ'লে তোমার জীবন মিথ্যা? তাকে খুঁজে বের কর এবং তারই জন্য অবহেলে প্রাণদান কর। জীবন দিয়ে দিলেই হ'ল না, তার পূর্ণ মূল্য আদায় ক'রে তবে তাকে দিবে।

শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনে রেখ, যে-উৎসর্গ যত একান্ত যত নীরব, সে-উৎসর্গ তত মহান্। যে-আহুতি মান-যশের যত অগোচর সে-আহুতির তত গৌরব। শত সহস্র নর-নারীর করতালির সমক্ষে, লক্ষ লক্ষ উচ্চকণ্ঠের জয়ধ্বনির সমক্ষে নিজেকে বলি দেওয়াও আত্মোৎসর্গই বটে, এ উৎসর্গকারীও বীরই বটেন কিন্তু তিনি হচ্ছেন মহাবীর, যিনি করতালির অপেক্ষা রাখেন না, যিনি জয়ধ্বনিকে ঘৃণা করেন।

যৌবনের ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে উৎসর্গের উপাসনা। যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে, ক্রুদ্ধ সর্পকে মালার মত গলায় জড়ান, হিংস্র ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করা। যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে ব'সে শান্ত হ'য়ে থাকা, আর ফুলশয্যা মনে ক'রে শরশয্যায় শয়ন করা। যথার্থ যুবক কোন্ যন্ত্র বাজাবে জানো? বজ্র। কোন্ রাগিণী গাইবে জানো? দীপক। যৌবনের ধর্ম্ম পৃথিবীটাকে উল্‌টে দেওয়া, বরাহ-অবতার সেজে করাল-দংষ্ট্রাঘাতে জমি ওলট-পালট ক'রে দিয়ে তাতে কল্যাণের বীজ বপন করা।

ব্রহ্মচর্য্য ও প্রবুদ্ধ-যৌবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—আমি যে ব্রহ্মচর্য্যের সমর্থক, সে শুধু এই যৌবনের পুনর্জাগরণের লোভে। প্রবুদ্ধ যৌবনের সুখস্বপ্ন আমাকে ঠেলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়ে ফেলেছে। ভারতের বীর

আত্মা ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে প্রত্যক্ষের আলোকে যবনিকার ঘনান্ধকার ভেদ ক'রে এসে দাঁড়াবে। ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতলে দাঁড়িয়ে ভারতের লক্ষ কোটি উৎসর্গব্রতী বুকের পাঁজর দিয়ে ভগবানের পূজা-মন্দির রচনা কর্ব্বে, হৃদয়ের শোণিত দিয়ে ভগবানের অর্চ্চনা কর্ব্বে।

ব্রহ্মচর্য্যের ভণ্ডামি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে তোমরা মনে ক'র না যে, ব্রহ্মচর্য্যের নামে দেশের মধ্যে ভণ্ডামিও কম হবে। আসল জিনিষের নকলও হয়, খাঁটি জিনিষের মেকীও হয়। ব্রহ্মচর্য্যে জাতির অফুরন্ত প্রয়োজন কিন্তু দেখো আবার এই ব্রহ্মচর্য্যেরই নাম ক'রে কত দেশদ্রোহিতারই না সৃষ্টি হয়। কত ব্রহ্মচারী এসে হয়ত বল্‌বে, কৌপীন প'রে চুপ ক'রে বসে থাকা ব্যতীত আর সব কাজই মহাপাপ। কত ব্রহ্মচারী এসে বল্‌বে, ব্রহ্মচর্য্যের জন্য ভারতবাসীকে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী হ'তে হবে, নিরন্ন, উপবাসী হ'য়ে থাক্‌তে হবে, আত্মরক্ষার ঝঞ্ঝাট থেকে বিরত হ'তে হবে। কত জন হয়ত বল্‌বে,—ব্রহ্মচারী যখন হয়েছ, তখন নিজের দু'বেলার মালপোয়ার হিসাব রাখা ছাড়া আর কোনও কর্ত্তব্য তোমার নেই,—দেশের দশের দুঃখের কথা ভাবতে সুরু ক'রেছ কি ম'রেছ। কত জন হয়ত লম্বা গলায় প্রচার আরম্ভ ক'রে দেবে যে, দেশশুদ্ধ সব লোক গেরুয়া না পর্‌লে আর ব্রহ্মচর্য্য হবে না, পরান্নপুষ্ট, পরানুগ্রহ-পালিত না হ'লে ব্রহ্মচর্য্য হবে না, জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে গেলে ব্রহ্মচর্য্য হবে না। কত জন বলবে,—নারীকে নরকের দ্বার জ্ঞান ক'রে প্রাণপণে ঘৃণা কর আর সর্ব্ব সৎকর্ম্মে তাকে দূরে দূরে রাখো,—তা নইলে ব্রহ্মচর্য্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু এসব

অসত্যের আর অর্দ্ধ সত্যের, এসব অন্যায়ের আর অবিবেচনা-প্রসূত মতামতের সমর্থন ক'রে কি সত্য সত্য ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষ-সমর্থন করা হবে ? বরং ব্রহ্মচর্য্যকে গলা টিপে মেরে ফেলাই হবে। তাই আজ আমাদের কর্ত্তব্য কি জানো ? ব্রহ্মচর্য্যের ভণ্ডামিকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দেওয়া। চাই আসল ব্রহ্মচর্য্য, যা অন্তরে অক্ষত ও অটুট এবং বাইরে অপক্ষপাত ও অনাসক্ত।

যথার্থ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাইরের বাহাদুরী ব্রহ্মচর্য্যের জন্য আদৌ আবশ্যক নয়, আবশ্যক হচ্ছে আত্মগঠনের আন্তরিক চেষ্টা! লম্বা চুল, রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া কাপড় এ সবের কোনো দরকার করে না, দরকার করে শুভ-বুদ্ধির, সুদৃঢ় সঙ্কল্পের। তৈল-বর্জ্জন, পাদুকা-বর্জ্জন, ছত্র-বর্জ্জন—এসব বাইরের বর্জ্জন নিরর্থক। ভোগসুখেচ্ছা বর্জ্জনের জন্য অহর্নিশ প্রাণের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়ে রাখাই ব্রহ্মচর্য্যের মূলসূত্র। নিজের জীবনকে ভবিষ্যতের যে কোনও এক মহান্ উৎসর্গের দিকে উন্মুখ ক'রে রাখাই হ'ল ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের মূলভিত্তি। এইটুকু যে কত্তে পারে, সেই যথার্থ ব্রহ্মচারী। নিজের পিপাসাকে ক্রমশঃ কমিয়ে এনে বিশ্বের ক্ষুধা মিটাবার জন্য যে নিজেকে দেয় অনায়াসে বলি, সেই প্রকৃত ব্রহ্মচারী।

স্বদেশ ও ভগবান্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—উৎসর্গের এই সঙ্কল্পকে সর্ব্বদা জাগিয়ে রাখার অবলম্বন হচ্ছে দুইটী অদ্ভুত জিনিষ। একটী স্বদেশ,

আর একটী ভগবান। স্বদেশ দেন পরার্থে প্রেরণা, ভগবান দেন অমরত্বে বিশ্বাস। স্বদেশ দেন মৃত্যুতে অনুরাগ, ভগবান দেন মৃত্যুতে অভয়। স্বদেশ দেন দুঃখ-বরণ, ভগবান দেন দুঃখে সহনশীলতা। স্বদেশ দেন অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, ভগবান দেন ধীরতা, বিশ্বাস ও শান্তি। আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বিধানে জন্মভূমি ও শ্রীভগবান মুক্ত-হস্তে করুণা বিতরণ কচ্ছেন।

নাস্তিক ও দেশসেবা

রাত্রি অনেক হইল। সকলে যার যার গৃহে প্রস্থান করিলেন। শুধু একটী তরুণ যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পিছু পিছু আসিতেছিল। শ্রীশ্রী-বাবামণিকে একা পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা বাবা, ভগবানকে যে মানে না, সে কি দেশের সেবা কত্তে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পারে, যদি দেশকে ভগবান ব'লে গ্রহণ করে। স্বদেশই যার ঈশ্বর, পৃথক্ ঈশ্বর না মান্‌লেও তার চলে। নিষ্কপট প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যে মাতৃভূমির পূজা করে, সে ভগবানেরই পূজা করে। ভগবান কি মঠে আর মন্দিরে আবদ্ধ, না ধর্ম্মগ্রন্থেই বাঁধা প'ড়ে আছেন? যার জন্য যে অকাতরে প্রাণোৎসর্গ কত্তে পারে, সেই তার ভগবান।

তুমিই ভগবান্

যুবক।—ভগবান থাকলে কি দেশের এত দুঃখ এত দৈন্য সম্ভব হ'ত? অনেক সময় মনে হয়, ভগবান নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আরে বাবা, তুমি ত' আছ? তোমার অস্তিত্বই ত' আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তুমি আছ ব'লেই ত' দুঃস্থ দেশবাসীর

জন্য অত কাঁদ্‌ছ। তুমি আছ ব'লেই ত' দৈন্যপীড়িত কোটি প্রাণে একদিন শান্তি, সমৃদ্ধি, হাসি ফুটবে। আলাদা একজন ভগবানের প্রয়োজন কি? আমার দৃষ্টিতে তুমিই ভগবান।

জাগো ভগবান্

যুবককে বক্ষে নিপীড়ন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাগো আমার ভগবান্ নিখিল বিশ্ববাসীর দগ্ধ প্রাণে শান্তির অমিয় সিঞ্চন কত্তে। জাগো আমার ভগবান্ কোটি দুঃখার্ত্তের দুঃখ বিদূরণ কত্তে। হও তুমি আমার জাগ্রত, জীবন্ত, সত্য ভগবান্। যে ভগবানকে কল্পনা ক'রে অনুমান ক'রে অন্ধ বিশ্বাসের বশে মানতে হয় না, হও না বাবা তুমি আমার সেই ভগবান্। তুমি যে সত্য, একথা ত' প্রত্যক্ষ। এতে ত' আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই।

কলিকাতা
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪.

মালা জপ

ত্রিপুরার জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংখ্যা রেখে জপ করার ভাল এই যে, কাজ কম হয় না। কিন্তু দোষ এই যে, সংখ্যার দিকেই মন থাকে। কিন্তু সংখ্যা না রাখলে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যে শৈথিল্য আসে। তাই, শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বসা যে, উপাসনা তিন মিনিটই করি আর তিন ঘণ্টাই করি, নাম জপ দ্বাদশ বারই করি বা লক্ষ বারই করি, যতক্ষণ জপ কত্তে কত্তে বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত না হয়ে পড়ি, ততক্ষণ তা' ছাড়্‌ব না।

প্রাণ দিয়া নাম-জপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিয়মের জপের সময়ে এইটী থাক্‌বে তোমার প্রতিজ্ঞা। চার বার তোমার দৈনিক উপাসনা করাই চাই,—হাজার কাজের ঝঞ্ঝাট থাকুক, তবু নিয়ম রক্ষা কত্তেই হবে। সেই চার বারের দুইবার তুমি জপ করবে প্রাণ ভ'রে, হৃদয় ভ'রে, সর্ব্বস্বের বিনিময়ে। ঘরে যদি আগুন লাগে, তবু উঠো না তোমার জপ ছেড়ে; সিঁদ কেটে যদি চোর ঢোকে, তবু জপ ছেড় না তাকে বাধা দেবার জন্য; স্ত্রী যদি তোমার শয্যাপার্শ্বে প'ড়ে মহামৃত্যুর নাভিশ্বাস ছাড়ে, তবু বন্ধ ক'রো না তোমার কাজ। এমন জেদ, এমন দৃঢ়তা নিয়ে এই দুই সময়ে জপ চালাবে। বাকী দুটি বার কেবল নিয়ম-রক্ষা ক'রো, কেবল সময় রক্ষা কর্‌বার জন্য ব'সো।

নিয়ম-রক্ষার সুফল

প্রশ্ন। মনই যদি না বস্‌ল, তবে শুধু শুধু নিয়ম-রক্ষার জন্য ব'সে লাভ কি? ও ত' কেবল মনকে ফাঁকী দেওয়া মাত্র।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিয়মরক্ষাকে এক হিসাবে মনকে কলা দেখান বলা চলে। সত্যই এক হিসাবে ওটা একটা ফাঁকী। নামে মন মজালাম না, তবু টিপ টিপ ক'রে তিনটা প্রণাম ক'রে চখমুখ বুজে ব'সে পড়লাম পূজার আসনে, এও এক প্রকারের ভণ্ডামি। কিন্তু তার মধ্যে একটা জিনিষ বড় সার সত্য রয়েছে। সেইটী হয়েছে সময়মত বসার একটা অভ্যাস। মানুষ মাত্রেই অভ্যাসের বশ। ঠিক সময়-মত প্রতিদিন সাধনে বসার যে একটা অভ্যাস, এটা যদি এনে ফেলতে পার, তাহ'লে যেদিন তোমার কাজের ঝঞ্ঝাট নেই, চাক্‌রীর তাড়া নেই,

যেদিন পেয়েছ ছুটি বা বিশ্রাম, সেদিন ঐ সময়ে মনকে দীর্ঘকাল ধ'রে নামের সেবায় বসিয়ে রাখ্‌তে কষ্ট বোধ কর্ব্বে না। নিয়ম-রক্ষার অভ্যাস এইজন্যই এক মস্ত বড় সহায়ক। তাই একে একদম ফাঁকী ব'লে তুচ্ছ করা যায় না।

শ্রেষ্ঠ জপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মালা জপের চাইতে করে জপ শ্রেষ্ঠ। করে জপের চাইতে মনে মনে জপ করা শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জপ করার যত কৌশল আছে, তার মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে, শ্বাস-প্রশ্বাস অবিরতই ত' তোমার চল্‌ছে, ক্ষণকালের জন্যও থাম্‌ছে না। এই কারণে, সামান্য অভ্যাসের পরেই এটা এমন আয়ত্তে এসে যায় যে, নামজপ, শেষে জীবনের একটা অতি স্বাভাবিক ধর্ম্মে পরিণত হয়ে পড়ে। যাকে স্বভাবে পরিণত ক'রে নিতে পার্লে, জান্‌বে, তাই তোমার স্থায়ী সম্পদ হ'ল।

সর্ব্বকর্ম্মে নাম-জপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অন্য কাজ করার সময়ে শ্বাসে-প্রশ্বাসে মন রেখে নামজপ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। মনে কর, একখানা চিঠি লিখ্‌ছ। সেই সময়ে তোমার পক্ষে কলমের খচ্‌খচ্‌ আওয়াজের সঙ্গে নামজপ চালান সহজতর। লেখনী কত বিষয়ের কত কথাই হয়ত লিখে যাচ্ছে, কিন্তু তার গমন-কালীন আওয়াজটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখ্‌লেই তুমি তার সাথে সাথে তোমার ইষ্টনাম জপ কত্তে পার। তাতে লেখনীরও গতি-বিরাম বা শ্লথতা হয় না। অথচ সঙ্গে সঙ্গে

নামজপ করার সুফল তুমি অর্জ্জন কত্তে পার। পথ দিয়ে চলে যাচ্ছ, তখন তুমি তোমার পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম অবিচ্ছেদ নাম-স্মরণ কত্তে পার। এতে তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছার কোনও ব্যাঘাত হয় না অথচ নাম-জপের যে আনন্দ ও তৃপ্তি, তা' অনুক্ষণ লাভ কত্তে পাচ্ছ। ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, স্থায়ী-অস্থায়ী সকল কর্ম্মে এভাবে তুমি অবিরাম নাম-স্মরণ কত্তে পার। এমন মজা আর কিছুতেই নেই।

সর্ব্বাবস্থায় নাম-জপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু সর্ব্বকর্ম্মেই নয়, সর্ব্বাবস্থাতেই তুমি অবিরাম নাম-স্মরণ কত্তে পার। বারংবার স্মরণের নামই জপ, অবিচ্ছেদ ধারণারই নাম ধ্যান। জপ হচ্ছে খণ্ডিত ধ্যান, ধ্যান হচ্ছে অখণ্ডিত জপ। ব'সে আছ, হাতে পায়ে চখে মুখে কোনও কাজই হয়ত কচ্ছ না, তখনো তুমি অবিরাম নাম-স্মরণ কত্তে পার। তোমার শরীরের মধ্যে কোটি কোটি অণু পরমাণু অবিরাম ভগবানের নাম উচ্চারণ কচ্ছে, উচ্চারণ কচ্ছে অনন্ত প্রণব। বিরামহীন বিশ্রামহীন ভাবে তারা কেবলই গেয়ে চলেছে আদিহীন অন্তহীন ওঙ্কার-গীতি। তার দিকে লক্ষ্য দিয়ে তুমি সর্ব্বাবস্থায় নামের সেবা কত্তে পার।

নামসেবাও একটা আর্ট

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামসেবা একটা গ্রাম্য কাজ নয়, আনাড়ির কাজও নয়, এটা দস্তুরমতন একটা আর্ট। নৃত্য, গীত, নাট্য, কাব্য প্রভৃতির চর্চ্চা যেমন আর্টের চর্চ্চা, রসের চর্চ্চা জান্‌বে, নামের সেবাও তেমন একটা আর্টের চর্চ্চা, রসের চর্চ্চা। এ চর্চ্চা কত্তে কত্তে

আপনা-আপনি কত হাজার রকমের কৌশল বেরিয়ে যায়, যাতে অল্প শ্রমে মৌমাছির চাক থেকে অজস্র মধু আহরণ করা যায়। নাম-পাগ্‌লা লোকগুলি কেবলি পাগল নয়, তারা রসিকও বটে, অনেকে আবার দিব্য-রসের মহাজন।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

গাইবান্ধা-নিবাসী জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি, বলিলেন,—অদৃষ্ট কথাটার মানে "যাহা দৃষ্ট হয় নাই, যা' তুমি দেখ নাই।" ন-দৃষ্ট—অদৃষ্ট। সুতরাং অদৃষ্টের বিপরীত হ'ল প্রত্যক্ষ। অদৃষ্টকে পুরুষকারের বিপরীত ব'লে ধারণা ক'রো না। পুরুষকার হচ্ছে আলস্যের বিপরীত। তোমার পূর্ব্ব পুরুষকারের যে ফলটাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না অথচ ভুগ্‌তে হচ্ছে, তাকেই বল্‌ছ অদৃষ্ট।

অদৃষ্টকে কি ফিরান যায়?

প্রশ্ন।—অদৃষ্টকে কি ফিরান যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব যায়। আগে যতখানি মন্দ কাজ করেছ, এখন যদি তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল কাজ কত্তে পার, তবে মন্দের যে কুফল, তা' থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন, অতীতকালে তুমি পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করেছিলে। তার ফল কি? না, বাড়ী-ঘর নিলাম। কিন্তু প্রাণপণ পুরুষকারের বলে যদি তুমি দশ হাজার টাকা রোজগার কত্তে পার, তাহ'লে দেনা শোধ ক'রে, ঋণের ও সুদের টাকা চুকিয়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার না কি? এই ভাবে পুরুষকারের বলে নিলামের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। শুধু তাই নয়, দু' একখানা

মোটর-গাড়ীও কেনা যায়। অতীতে যারা ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা ক'রে দেহ-মনের সর্ব্বনাশ করেছে, তারাও যদি হতাশ না হ'য়ে পূর্ব্বের ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার চেয়েও অনেক অধিক পরিমাণ সংযমের চর্চ্চা করে, তাহ'লে পূর্ণ স্বাস্থ্য, পূর্ণ বল, পূর্ণ শান্তি লাভ কত্তে পারে। অতীত কার্য্যের যে ফলটা ভবিষ্যতে ফল্‌ছে, তাকেই বলে অদৃষ্ট। আর অতীত কু-কার্য্যের কুফলকে যে সৎ-কার্য্যের সুফল দ্বারা নিবারণ করা যায়, তাকেই বলে পুরুষকার। তোমরা সব পুরুষকারে নির্ভর কর, বাহুবলে বিশ্বাস কর, ক্লীব-কাপুরুষের মত অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ভবিষ্যৎকে নষ্ট ক'রে দিও না। ভগবন্নির্ভর আর অদৃষ্ট-নির্ভর এক নয়, আত্মনির্ভরেরই অপর নাম ভগবন্নির্ভর।

ভারতে অদৃষ্টবাদ-বিশ্বাসের মূল কারণ

প্রশ্ন।—তবে দেশজোড়া সকল লোক কেবল অদৃষ্টের দোহাই দেয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কারণ বহু। অনেকগুলি কারণ মিলে একটা জটিল মানসিকতা এই দেশে সৃষ্ট হয়েছে, যার পরিণাম-ফল দাঁড়িয়েছে প্রায় সর্ব্বজনিকভাবে অদৃষ্টবাদ-বিশ্বাসে। আসলে এদেশের চিন্তা অদৃষ্টবাদের সমর্থক নয়। এদেশের দৃষ্টিতে কর্ম্মই ব্রহ্ম, কর্ম্মই সর্ব্বফল-দাতা, কর্ম্মই জীবের ভাবী গতির নিয়ামক। যে যেমন কর্ম্ম কর্‌বে, সে তেমন ফল পাবে। কর্ম্ম নাই ত' ফলও নাই। সৎকর্ম্ম দেবে সৎফল, অসৎকর্ম্ম দেবে অসৎ ফল। সৎকর্ম্মে সৎফল অবশ্যম্ভাবী ব'লেই ত' জীব সৎকর্ম্ম করে। কিন্তু আসক্তি নিয়ে কাজ কল্লে সেই কাজে কিছু না কিছু গলদ থেকে যায়, সুতরাং সৎকর্ম্মও আংশিক ভাবে বিকলাঙ্গ

হয়ে যায়। এই জন্যই এদেশের মনীষী উপদেশ কর্লেন অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার জন্য। কিন্তু ঈশ্বরে যার পূর্ণ নির্ভর নেই, তার পক্ষে অনাসক্ত কর্ত্তব্যপালন অসম্ভব। অতএব এল উপদেশ, যা যখন কর, সব ঈশ্বরেই কর অর্পণ,—নিজের হাত কাজে লাগাও সকল কর্ত্তৃত্ব নিজের হাত থেকে ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে। চমৎকার কথা।। কিন্তু ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দিয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করা কি সামান্য ব্যক্তির কাজ? এ যে মহাবীর্য্যশালী ধীমান্ ব্যক্তির কাজ! বীর্য্যবান্ সাধকই সকল অবস্থায় পরমেশ্বরে নির্ভরের সমর্থক। কিন্তু বীর্যহীন দুর্ব্বল ব্যক্তি কি নির্ভরের অভিনয় কত্তে পারে না? নির্ভরের বীর্য্য নাই অথচ নির্ভরের অভিনয় এল। বিপদ ঘটল। "যা করেন ভগবান্ তাই মেনে নিব",—বীরের এই বজ্রবাণীর তর্জ্জমা হয়ে গেল,—"যা আছে, তাই যে রে হবে"—এই ক্লীব-সুলভ দুর্ব্বল নতি-স্বীকারে। অদৃষ্ট এসে ভগবানের আসন কেড়ে নিল, সিংহ-শাবকেরা শৃগালের ধর্ম্ম নিল। এই ভাবেই ত' ভারতে অদৃষ্টবাদের রাজত্ব এল।

অদৃষ্ট ও ভগবান

প্রশ্ন।—এর কি প্রতীকার নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন থাকবে না? এমন কি রোগ আছে, যার চিকিৎসা নেই? এমন কি সমস্যা আছে, যার সমাধান নেই? অদৃষ্ট আর ভগবান যে এক নয়, এ কথাটা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তুমি কর্ম্ম কর, সেই কর্ম্মের সব ফল তুমি হাতে হাতে পাও না, কতক কর্ম্মফল তোমার স্কন্ধে এসে পড়ে এমন সময়ে, যখন তোমার মনে নেই যে, কোন্ কর্ম্মের এই বিচিত্র ও প্রতিকূল ফল,—তারই নাম অদৃষ্ট। তোমার

অদৃষ্টকে ত' প্রকারান্তরে তুমিই তৈরী করেছ। অদৃষ্টকে খণ্ডনের শক্তিও তোমার আছে। বলীয়ান্ ব্যক্তি অদৃষ্টকে খণ্ডন কত্তে পারেন। অদৃষ্ট আর ভগবান এক বস্তু নয়। ভগবান তোমার স্রষ্টা আর তুমি তোমার অদৃষ্টের স্রষ্টা।

জাতিভেদ ও গুণভেদ

প্রশ্ন।—জাতিভেদ-প্রথা পালন করা কি উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কারো পক্ষে উচিত, কারো পক্ষে অনুচিত এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেওয়া যেতে পারে না।

প্রশ্ন।—আমার ত' জাতিভেদ মান্‌তে ইচ্ছা হয় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাহ'লে তুমি মেন না। কিন্তু একটা জিনিষ মেন,—সেটা হচ্ছে গুণভেদ। রজস্বলা স্ত্রীলোকের স্পৃষ্ট খাদ্য কেউ খায় না। কেন খায় না রে? তার কারণ, রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীলোকের মনে স্বভাবতঃ কামের প্রাবল্য থাকে। কামুকের স্পৃষ্ট খাদ্য অখাদ্য, তাই খায় না। ইনি যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও স্ত্রী হন, ইনি যদি গুরুপত্নীও হন, তবু কেউ তাঁর স্পৃষ্ট বস্তু খাবে না। কেন রে? জাতিভেদকে মানা হচ্ছে ব'লে? না, গুণ-ভেদকে মানা হচ্ছে ব'লে? জাতিভেদ না মান ক্ষতি নেই কিন্তু গুণভেদ না মান্‌লে বিষম ক্ষতি। ক্রুদ্ধ, কামুক, লোভী ও বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকের হাতের অন্ন বিষতুল্য,—এমন কি তিনি যদি তোমার জন্মদাতা পিতাও হন। মায়ে-জেঠীতে ঝগড়া ক'রে যখন ছেলে-মেয়ের অন্ন পরিবেশন করেন, তখন সেই অন্নে বিষাক্ত বীজাণু কিলিবিলি করে। কাম-সম্ভোগ ক'রে এসে যখন বামুন-ঠাকুর

আহারীয় পরিবেশন করে, তখন সেই আহারীয়ের সঙ্গে ভোগ-লুব্ধতার ক্লেদ-পঙ্ক মিশান থাকে। মেসে-হোষ্টেলে রাঁধুনী-কুল-তিলকদের যে রান্না খাও, অজ্ঞাতকুলশীলা ঝি-চাকরাণীদের হাতের যে জল খাও, প্রায় সবই এই রকম দোষে দূষিত।

জাতিভেদের ভবিষ্যৎ

প্রশ্ন। বর্ত্তমান জাতিভেদ কি কখনো উঠে যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' যাবে বৈকি? বর্ত্তমান আকারে জাতিভেদ কিছুতেই টিঁকে থাক্‌তে পারে না। ব্রাহ্মণ-বংশজাত বারনারীসেবী মাতালটাকেও ব্রাহ্মণ ব'লে মানা আর চণ্ডাল-বংশে জাত ব্রহ্মদর্শী পরার্থসেবী পুরুষকেও ছোটজাত ব'লে ঘৃণা করা,—এ কিছুতেই আর চল্‌তে পারে না। তবে, জাতিভেদ যে রূপান্তরিত হবে, সেইটা ধীর আন্দোলনের পথে। হঠাৎ-বিপ্লবে অনেক অপ্রার্থনীয় প্রতিক্রিয়া আসে। স্থলবিশেষে প্রতিক্রিয়া-সম্ভাবনা-সত্ত্বেও বিপ্লবই বরণীয়। তবে জাতিভেদ-সম্পর্কে দেশ-মধ্যে যে বিপ্লব হচ্ছে, তার ফলটার স্থায়িত্ব হবে ব'লেই ওটা হচ্ছে ধীরে ধীরে। ব্রহ্মচর্য্যের বুকের উপরে দাঁড়িয়ে যখন সর্ব্বজাতি-সমন্বয়ের আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেই দিনই যথার্থ স্থায়ী বিপ্লব সাধিত হবে এবং তার কোনও গুরুতর প্রতিক্রিয়াও আসবে না।

জাতিভেদ তুলিয়া দিবার নিরাপদ পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ তুলে দেবার নিরাপদ পন্থা হচ্ছে ব্রাহ্মণের শুচিতা, ব্রাহ্মণের জীবনাদর্শ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সাধনাধিকার

সর্ব্ববর্ণের হাতে তুলে ধরা। কাউকে অবজ্ঞা না ক'রে, কাউকে তুচ্ছ মনে না ক'রে, সকলের ভিতরেই পরমেশ্বর নিত্য-বিরাজমান জেনে সকলকে শুচি, শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর, দিব্য জীবন যাপনের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। যে সাধনা শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করে, চণ্ডালকে দ্বিজ করে, অতিশূদ্র নিষাদাদিকেও বিপ্রত্ব দান করে, সেই সাধনার রুচি এবং অধিকার সকলের জন্য অবারিত কত্তে হবে। কারো হয়ত রুচি আছে কিন্তু অধিকার নেই, কারো হয়ত অধিকার জন্মে গেছে কিন্তু রুচি নেই—এদের সেই অভাবটী দূর করে দিতে হবে। কেবল আগ্রহের বলে কারো শূদ্রত্ব-মোচন হয় না,—অনুশীলন চাই। কাছাটিলা অনু-শীলনও ফলপ্রসূ হয় না, প্রগাঢ় আগ্রহ নিয়ে অনুশীলন চালান চাই। সর্ব্বজাতিকে কদাচার, অনাচার, হীনাচার দিয়ে শূদ্র ক'রে এক করার কোনও অর্থ হয় না। সকলকে সদাচারী, দিব্যজীবন-যাপনকারী, পবিত্র ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শানুসরণকারী ক'রে ব্রাহ্মণ ক'রে এক কত্তে হবে। এই ভাবে যদি জাতিভেদ দূর করার সত্যিকারের চেষ্টা এদেশে হয়, তবেই জাতিভেদ উঠ্‌বে। সবাইকে অনাচারী, হীনাচারী শূদ্র ক'রে এক করা যাবে না, কারণ ঋষির ভারতে ঋষি-প্রতিভা ব্রাহ্মণ্যের বৈজয়ন্তী আকাশে উড্ডীন ক'রে বারংবার বল্‌তে থাক্‌বে,— "ভারতে ব্রাহ্মণ্যের মৃত্যু কখনো হয় নি, কখনো হবে না, কখনো হ'তে পারে না।"

জাতিভেদ-বিরোধীদের চেষ্টা কেন বিফল হইল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণ্যের ভণ্ডামির কথা বল্‌ছি না, ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের মৃত্যু এদেশে কখনো সম্ভব নয়। এই কথাটী বুঝ্‌তে

পারেন নি বা এই কথাটা বিশ্বাস করেন নি ব'লেই আমাদের আগে যাঁরা জাতিভেদ-বিমর্দ্দনের জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলন সব চালিয়ে জীবন-ক্ষয় কর্‌লেন, তাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ গুরুশ্রম জাতিভেদের কাঠামো বদলাতে পারে নি। জীর্ণ প্রাসাদের কোথাও তাঁরা চূণের পলস্তারাটুকু মাত্র সরাতে পেরেছেন, কোথাও বড়-জোর দু' একটা পুরানো জানালা সরিয়ে বায়ুর গতায়াতের পথ একটু উন্মুক্ত করেছেন। ভিত্তির মূলে একটুখানি চোটও দিতে পারেন নি।

নামজপ ও রূপধ্যান

কালীঘাট-নিবাসী জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—নাম জপ কর্‌বার সময়ে কোন্ রূপ ধ্যান কর্ব্ব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে রূপটা স্বভাবতঃ তোমার চ'খের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌বে, সেই রূপটা। নামের অর্থে মনঃসন্নিবেশ ক'রে ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য রেখে একাগ্র-চিত্তে জপ কত্তে থাক্‌বে। এর ফলে যখন যে রূপটাতে তোমার রুচি যাবে, তখন সেই রূপটাই ধ্যেয়। ভগবানের ত' আর একটা ধরা-বাঁধা রূপ নেই, তাঁর রূপ অনন্ত। ভগবানের প্রিয় নাম ধ'রে তাঁকে ডাক্‌তে থাক, এর ফলে রূপের আপ্‌নি প্রকাশ হবে ; একটা নির্দ্দিষ্ট রূপের নয়,—অনন্ত রূপের খনি তোমার নয়ন-সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে।

ওঙ্কার বনাম অপরাপর সাম্প্রদায়িক নাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নাম-জপ কত্তে বস্‌লে নির্দ্দিষ্ট রূপই ধ্যান কত্তে হয়, কিন্তু ওঙ্কারের মত

অসাম্প্রদায়িক নাম-জপ কত্তে আর নির্দ্দিষ্ট কোনও রূপ ধ্যান কত্তে হয় না। নাম-জপের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আধ্যাত্মিক অবস্থার ক্রমোন্নতি-অনুযায়ী রুচি পরিমার্জ্জিত এবং পরিশোধিত হ'তে থাক্‌বে। এইজন্যই ওঙ্কার মন্ত্র রাজাধিরাজ। এক এক দেশের রাজার এক এক দেশীয় প্রজার উপর কর্ত্তৃত্ব কিন্তু সম্রাটের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদেশীয় প্রজার উপরে। ঠিক্ তেম্‌নি এক একটী মন্ত্রে এক একটা নির্দ্দিষ্ট রূপের উপরে ধ্যানের বিধি কিন্তু ওঙ্কার-মন্ত্রে ধ্যান চলে সর্ব্বদেবতার। হ্রীং জপ ক'রে কৃষ্ণ-ধ্যান করা যায় না, ক্লীং জপ ক'রে কালী-ধ্যান করা যায় না, কিন্তু ওঁ জপ ক'রে কালীও চলে দুর্গাও চলে, কৃষ্ণও চলে, শিবও চলে। প্রণবে সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সর্ব্ব-বিরোধের সমন্বয়, সর্ব্ব-সাধনের সমন্বয়। এইজন্যই ওঙ্কারের এত কৌলীন্য, এত সমাদর।

ওঙ্কার-জপের কৌশল

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,– ওঙ্কার-জপের কৌশল কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার গুরু যাকে যেভাবে জপের উপদেশ দিয়েছেন, তার ওঙ্কার-জপ সেভাবেই হওয়া উচিত। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া আর গুরু ডিঙ্গিয়ে সাধন করা প্রায় সমান ব্যাপার। করে বা মালায় স্থূল জপ চলতে পারে। সূক্ষ্ম জপ হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। সূক্ষ্মতম জপ হচ্ছে শরীরস্থ প্রতি অণুপরমাণুর অপরিব্যক্ত সঙ্গীতের সঙ্গে। অনন্ত ব্যোম ব্যেপে নিয়ত ওঙ্কার-ধ্বনিই হচ্ছে। তার সঙ্গেও গভীর নিশীথে বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ওঙ্কার-জপ চলতে পারে।

জপের সহজতম কৌশল

প্রশ্ন।—জপের সহজতম কৌশলটী কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে বিন্দুমাত্র বল-প্রয়োগ না ক'রে তার আগম-নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে জপ করাই হচ্ছে সহজতম কৌশল।

বিবাহিত-জীবনে সুখানুসন্ধান

অতঃপর বিবাহ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহটাকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে না দেখে সাধক-গৃহী কর্ত্তব্যের দৃষ্টিতে দেখেন। বিবাহের পর থেকেই যদি স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারগুলি পশুর মত না হয়, বিবাহিত-জীবন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি স্ত্রীকে ভগবৎ-সাধনের দিকে টেনে আনা যায়, তাহ'লে সাধক-পুরুষের আবার ভয় কিরে? ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে যদি বিবাহের পর দু' চার বছর থাকৃতে পারিস্, আর সেই সময়টা যদি কোমলা বালিকার হৃদয়টাকে ভগবানের প্রতি উন্মুখ ক'রে দিতে পারিস, তবে ত' রাজর্ষি জনক হয়ে গেলি! শুধু ধর্ম্মকথা শুনালেই চল্‌বে না, স্ত্রীকে দিয়ে দস্তুরমত সাধন করিয়ে নিতে হবে। স্বামি-স্ত্রী যদি সাধক-সাধিকার জীবন-যাপন কত্তে প্রস্তুত হয় তবে তাদের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার জগতে আর কি আছে?

দাম্পত্য-জীবনে স্বদেশ-সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—প্রত্যেক দম্পতীর জীবনের উপরে দেশের দাবীও যে অফুরন্ত! দেশের দুঃখ, দেশের দুর্গতি শুধু

কুমার ব্রহ্মচারী এবং কুমারী ব্রহ্মচারিণীদের মুখপানেই তাকিয়ে নেই। দেশ তার করুণ আর্ত্তনাদ বিবাহিত নরনারীদের কর্ণেও প্রবিষ্ট কত্তে চাচ্ছে। দাম্পত্য-জীবনের উপরে দেশের যে দাবী, তারও পূরণের গোড়ার কথা উভয়ের সম্মিলিত সাধন-নিষ্ঠা। সমযোগে পরিচালিত সাধন উভয়ের চরিত্রের পার্থক্যকে দূরীভূত করে, উভয়ের ঐক্যকে সহজ করে, একের স্বদেশ-সাধনার বাধা অপরের শক্তিতে দূরীভূত হয়। এইজন্য প্রত্যেক দম্পতীর জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সাধন-ভজন প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

বিবাহের তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দম্পতীকে দুটো দেহ, দুটো মন, দুটো আত্মা, দুটো অস্তিত্ব ব'লে ভাবা ভুল। স্বরূপতঃ তারা এক, বাহ্যতঃ তারা দুই। তত্ত্বতঃ তারা এক, দৃশ্যতঃ তারা দুই। বাইরের এই দুইকে অন্তরের একে পরিণত করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তাই হচ্ছে দাম্পত্য ব্যবহার। এই মূল্যবান্ কথাটিকে ভুলে না গিয়ে জীবনের পথে নির্ভয়ে চল। দুইকে মিলিয়ে পূর্ণ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এক ক'রে নেওয়া, এই হ'ল বিবাহের তাৎপর্য্য। দুই যখন সত্য সত্য এক হয়, তখন আর চঞ্চলতা, পঙ্কিলতা, উচ্ছ্বাস, বিক্ষেপ, বিক্ষোভ, লালসা, বাসনা, ভোগাসক্তি এ সব কিছুই থাকে না। তখন ইন্দ্রিয়গুলি করে অতীন্দ্রিয় জগতের সেবা, রক্তমাংস তখন হয় দিব্য সাধনার সহায়ক। সসীম দেহ তখন অসীম অনন্তের সহযাত্রী।—বিবাহ তখন দিব্যজীবন, বিবাহ তখন ভাগবতী প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতা
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণির রচিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরিত হইল :—

শিক্ষায় স্বাধীনতা

(১)

পরমুখাপেক্ষী ক্লৈব্য-সমাচ্ছন্ন ভারতীয় মহাজাতি আজ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া শিক্ষার জন্য, দীক্ষার জন্য সাত-সমুদ্র তের-নদীর ওপারে কাঙ্গালের মত প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। সেখান হইতে বিলাতী কারিগরের হাতে সুশিক্ষার মদিরা বিলাতী বোতলে বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌছিবে, আর আমরা নাকি দেশের লোকের চ'খে ধূলি দিয়া গোপনে গোপনে লেবেলটা বদলাইয়া জাতীয় শিক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা নামে তাহা চালাইব এবং এইভাবে দেশের দুঃখময় জীবনকে সুখের পথে, শান্তির পথে, মনুষ্যত্বের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইব। ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সময়ে একশ্রেণীর স্বদেশপ্রাণ ত্যাগী কর্ম্মীর ঝোঁক।

লেবেলটা যে গোপনে বদলাইয়া দেওয়া হইতেছে, ইহা দেখিবার বুঝিবার বা বিচার করিবার অবসর আত্মসুখ-সুপ্ত জনসাধারণের হইয়া উঠিতেছে না। তাই তাহারা বোতলের উপরে "স্বদেশী কারখানায় প্রস্তুত" কথা কয়টী বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেছেন এবং দেশের যে প্রকৃতই উন্নতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে অযথা আত্মশ্লাঘায় আত্মহারা হইতেছেন।

কিন্তু যাঁহারা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় বস্তু-বিচার করেন না, চাক্‌চিক্য দেখিয়াই ভুলেন না, কথার চটকে দিগ্‌ভ্রান্ত হন না, সেই সজাগ প্রহরীরা কিন্তু এই লেবেলের দেশিত্বের পশ্চাতে বিদেশী চোরের সিঁদকাটি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, সুশিক্ষার নামে যত কিন্তু প্রশংসনীয় চেষ্টাতেই আমরা আত্মনিয়োগ করিনা কেন, যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা না যাইতেছে, ততদিন আমাদের মঙ্গল-প্রয়াস নিষ্ফলতা আহরণ করিতে বিরত হইবে না। বজ্রদেহ দৃঢ়কর্ম্মা পুরুষদের আবির্ভাব কামনা করিয়া আমরা শিক্ষার বিস্তার করিব, আর পরাধীনতার ইক্ষুমাড়া কলে নিষ্পেষিত হইয়া বিদ্যার্থীরা বাহির হইবে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে আর্ত্ত-চীৎকার করিতে করিতে। বহ্নিশিখাবৎ প্রতিভা-সমুজ্জ্বল জলন্ত জীবনের প্রদীপ্ত তেজস্বিতা লইয়া অন্ধতমসাচ্ছন্ন ধরা-বক্ষে ত্রিলোক-পাবন জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়া আমরা গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠা করিব, আর পরাধীন মনোবৃত্তি বহ্নির করিবে তেজোহরণ, মস্তিষ্কের করিবে বুদ্ধি-বিলোপ, জ্যোতিষ্কের করিবে গতি অবরুদ্ধ। জয়ধ্বনি-মুখরিত দুন্দুভি-নিনাদিত গগনের প্রান্তে দিগ্‌বালাগণ যখন ভবিষ্যৎ ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়কবর্গের গলায় পরাইয়া দিবার জন্য পারিজাত-হার লইয়া শিক্ষা-নিকেতনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবেন, পরাধীনতা-ক্লিষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতি যখন বাহির করিয়া দিবে এমন এক দল অকর্ম্মণ্য অপদার্থ পঙ্গু অলসকে, যাহাদের শ্রীহীন মুখের দীপ্তিহীন চাহনি দেখিয়া, জীবন্মৃত-দেহের অবসাদ ও মুমূর্ষা দেখিয়া ত্রিদিবের জয়-ঢক্কা থামিয়া যাইবে—ক্ষুব্ধতায়, আর দিগ্‌বালাগণের করযুগ হইতে জয়মাল্য খসিয়া পড়িবে—হতাশায়। অতীতের ভারত ভবিষ্য ভারতের হস্তে

সুদর্শন-চক্র সঁপিয়া দিতে আসিয়া দেখিবে শ্রীকৃষ্ণ নাই, গীতা ও গাণ্ডীব দিতে আসিয়া দেখিবে অর্জ্জুন নাই, যোগ-বাশিষ্ঠের জ্ঞান এবং হরধনু-ভঙ্গের প্রেরণা দিতে আসিয়া দেখিবে রামচন্দ্র নাই, ব্রাহ্মণ্য বিলাইতে আসিয়া দেখিবে সত্যকাম-জাবালি নাই, সিদ্ধ-সঙ্কল্প বিশ্বামিত্র নাই ; আছে পরানুকারী ভীরু কাপুরুষের দল, আর, বৃথা-বাক্য-পরায়ণ চির-চীৎকার-কুশল কতকগুলি কর্ম্মকুণ্ঠ অলস।

(২)

অতীতের সহিত ভবিষ্যতের শৃঙ্খলার বন্ধন আছে। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রতি আমরা একান্ত বদ্ধদৃষ্টি বলিয়া এবং সেই দৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যত্বের দাবী অপেক্ষা জিহ্বোপস্থের দাবীটা প্রবলতর বলিয়া বিগতের সহিত অনাগতের সেই অপরিহার্য্য সম্বন্ধসূত্র আমরা যেন দেখিয়াও দেখি না। তাই অধিকাংশ সময়েই আমরা একথা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হই যে, আমাদের মধ্য হইতেই পুনরায় দধীচির আবির্ভাব হইতে পারে। সেই তপঃ-কৃশ-তনু মহর্ষির অস্থিদান যে এই ভারতের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে শতবার পুনরভিনীত হইবে, আমাদের উদরের ক্ষুধা, আমাদের বিষয়-ভোগ-লিপ্সা তেমন ভরসা করিতে আমাদিগকে দেয় না। "হা-অন্ন, জো-অন্ন" করিয়া আমরা বিদেশীর পাদপীঠতলে ধন্না দেই, "ম্যয় ভুঁখা হুঁ" বলিয়া আমরা বিশ্ব-বিপণির ধূলি-মলিন পথ-কোণে দাঁড়াইয়া পরানুগ্রহ-দত্ত নীবার-কণা সংগ্রহ করি। ভুলিয়া যাই, হরিশ্চন্দ্র সসমুদ্র সাম্রাজ্য এক কথায় দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভুলিয়া যাই, কংস-বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিজিত রাজ্য নিজে ভোগ না করিয়া উগ্রসেনকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাই দিকে দিকে যখন আমরা সাধনা-মন্দির গড়িয়া তুলি, শিক্ষা-নিকেতন নির্ম্মাণ করি, সঙ্ঘ, সমিতি বা সমবায় সংগঠন করি,

তখন সেই ত্যাগের গৈরিকাচ্ছাদিত প্রতিষ্ঠানের পশ্চাৎ হইতে এক বিশীর্ণ-কঙ্কাল প্রেতমূর্ত্তি তাহার তুষার-শীতল ভয়াবহ হস্ত প্রসারিত করে। সেই প্রেতমূর্ত্তির নাম "ক্ষুধা"।

এই ক্ষুধার জ্বালা আমাদিগকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে, হুজুগ-বিহীন নীরব সাধনার দ্বারা সুধীর প্রাণপাত শ্রমে জাতির ভবিষ্যৎ-গঠনে অনাগ্রহী করে, বর্ত্তমানের মিথ্যার সহিত, বর্ত্তমানের দাসত্বের সহিত, চাকুরীর বাজারের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া চলিবার জন্য আমাদের কল্যাণ-বুদ্ধিকে বারংবার প্ররোচিত করে। ফলে, নালন্দা, তক্ষশিলা বা নৈমিষারণ্যের ট্রেড্‌মার্ক লাগাইয়া আমরা নকল অক্স্‌ফোর্ড এবং জাল কেম্ব্রিজ্‌কে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিদের নামের মাহাত্ম্যে ক্ষুধাক্লিষ্ট অন্ধ জন-সমাজের মধ্যে চালাইতে আরম্ভ করি। অন্ধ কিনা, তাই সকলে নির্ব্বিবাদে সেই বিলাতী "পোরিজ" স্বদেশী ভাবিয়া গলাধঃ-করণ করে এবং কাল্পনিক স্বাদে মুগ্ধ হইয়া কপিল-কণাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

কিন্তু কি লাভ হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-দশটা তক্‌মাধারীর চাকুরী-চতুর কেরাণীর সৃষ্টি করিয়া? ভবিষ্যতের ভারত তাহার অগণিত সন্তান-সন্ততি লইয়া যে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবেন, তাহারই যদি না হইল কোনও প্রকৃত প্রতীকার, তবে আজিকার দুই-চারিটা ক্ষুধার্ত্ত জঠরের সাময়িক পূর্ণতার জন্য কেরাণী-গিরির দাসত্ব-লাঞ্ছিত কুঞ্চিত ললাট শিরিস কাগজ দিয়া পালিশ করিবারই বা কি দরকার, বি-এ, এম-এর গাম্বোজ বার্ণিশ দিয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিবার চেষ্টারই বা কতখানি সার্থকতা? ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ যখন আমাদের নিকট কৃতকর্ম্মের

হিসাব চাহিবে, কতজন ব্যাস-বাল্মীকিকে আমরা রেল-অফিসের টালি-ক্লার্ক করিয়াছি, কতজন কালিদাস-ভবভূতিকে আমরা ঘোড়দৌড়-অফিসের টিকেট-বিক্রেতা বা জেল-দারোগা করিয়াছি, কতজন অশোক-সমুদ্রগুপ্তকে আমরা নাক-কাণ মলিয়া ডেপুটিগিরিতে বহাল করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ যখন তীব্রস্বরে আমাদিগকে এই প্রশ্ন করিবে, তখন আমরা কোন্ জবাব দিয়া দুষ্কৃতির দায় হইতে অব্যাহতি পাইব ?

অতএব আজ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেই প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে, যেখানে ভারতীয় বীজ ভারতীয় মৃত্তিকার রস আহরণ করিতে গিয়া চাকুরীর মোহে বক্র গতিতে বাড়িবে না ; ভারতের মাটীর সরস স্নেহ, ভারতের তপনের উদার কিরণ, ভারতের মলয়-মারুতের স্নিগ্ধ-মধুরতা পান করিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইবে অবাধ্য উদ্যমে এবং মূল ও শাখা ভ্রাতৃত্ববোধের অপূর্ব্ব শিহরণ লইয়া ছড়াইয়া পড়িবে ভারতবর্ষের সুবিশাল বক্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া। সেই প্রতিষ্ঠান আজ গড়িতে হইবে, যেখানে শিক্ষার্থী নিজের মাটীতে নিজের কোদাল চালাইবে, নিজের চরকায় নিজের তাঁতে নিজের কাপড় বুনিবে, নিজের বাহুবলে নিজের অন্নার্জ্জন করিবে, নিজের সামর্থ্যে জ্ঞান-সমুদ্র আলোড়িত করিবে, নিজের শক্তিতে মনুষ্যত্বের উন্মেষণ ঘটাইবে। সেই প্রতিষ্ঠান আজ চাই, যেখানে শিক্ষার্থী আগে শিখিবে নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিতে এবং পরে বাহির হইবে বহির্জগতে দিগ্বিজয়ের অপরাজেয় অভিযান লইয়া। সেই প্রতিষ্ঠান আজ চাই, যেখানে রুটির টুক্‌রার চাইতে মনুষ্যত্বের সাধনার দাম বেশী, আত্মসুখ-সেবার চাইতে পরার্থে স্বার্থোৎ-সর্গের মূল্য অধিক।

পুপুন্‌কী আশ্রমের কার্য্যপদ্ধতি

যে সব যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থী হইয়া আগমন করিলেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাদের আশ্রমের কার্য্যপদ্ধতি কি হইবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি একখণ্ড মুদ্রিত অনুষ্ঠান-পত্র প্রশ্ন-কর্ত্তার হস্তে দিলেন। সেই অনুষ্ঠান-পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান-পত্র

প্রাথমিক শিক্ষা অবধি গাবেষণিক শিক্ষা পর্য্যন্ত সকলেরই সুব্যবস্থার ভার "আশ্রম" গ্রহণ করিবেন। শিক্ষাকালে বিদ্যার্থীর অন্ন-বস্ত্র-পুস্তকাদি আশ্রম হইতেই বিনা ব্যয়ে প্রদত্ত হইবে। ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য সম্প্রদায়-বুদ্ধিহীন আচার্য্য থাকিবেন এবং সকল ছাত্রকেই জাতি-নির্ব্বিশেষে পূর্ণ শিক্ষার সমান সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইবে! আশ্রম হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যাঁহারা বাহির হইবেন, উপযুক্ত মূলধন অভাবে যদি তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়াদি করিয়া সসম্মানে জীবিকার্জ্জন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য আশ্রমই দায়ী রহিবেন এবং আশ্রম-সমিতির অন্তর্গত শিক্ষা, সেবা অথবা বাণিজ্য বিভাগেরই কোনও দেশহিতমূলক কল্যাণ-কর্ম্মে উপযুক্ত বৃত্তিতে নিয়োগ করিবেন।

প্রত্যেকটী আশ্রমকেই (উহা প্রাথমিক হউক আর গাবেষণিকই হউক) আহার্য্য এবং পরিধেয় বস্ত্রের উৎপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করা হইবে। আশ্রম-সংলগ্ন বিশাল শস্যক্ষেত্র, কার্পাসক্ষেত্র এবং

গোচারণভূমি রক্ষিত হইবে। দুগ্ধাদির জন্য গো-শালা, সর্ব্বপ্রকার পুষ্টি-কর ফলের জন্য ফলের বাগান এবং বস্ত্র-নির্ম্মাণের জন্য তন্তুশালা প্রত্যেক আশ্রমেই থাকিবে।

বিজ্ঞানাগার ব্যতীত সাধারণ পাঠগৃহে টুল, টেবিল, চেয়ার, থাকিবে না। পরিষ্কার মাদুর, শীতলপাটী অথবা অজিনাসনে ছাত্রেরা এবং বেদীর উপরে অধ্যাপক উপবেশন করিবেন। লিখিবারও ও পড়িবার সুবিধার জন্য প্রত্যেকের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্ততঃ একটী প্রাদেশিক ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে প্রচলিত আন্তর্জ্জাতিক ভাষা, সংবাদ-পত্র পাঠ এবং কথোপকথনের উপযোগী শিখিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগি-পরিচর্য্যা অবশ্য-শিক্ষণীয়। কৃষি, বস্ত্রশিল্প, গো-পালন, উদ্যানরক্ষা, চিত্রবিদ্যা ও মুদ্রাঙ্কন (Printing) প্রভৃতির মধ্যে অন্ততঃ একটীতে প্রত্যেককেই পারদর্শী হইতে হইবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাদির উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ছাত্রগণের ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং মনোবৃত্তির গঠনের উপর নির্ভর করে। সুনির্ব্বাচিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র অবশ্য পাঠ্য থাকিবে। স্বাস্থ্য-পরীক্ষক সপ্তাহে একবার করিয়া প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং কাহারও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার প্রকৃত কারণ বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্ণয় করিয়া ছাত্রের নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিবেন।

আহার-ব্যবস্থা যথাসম্ভব পুষ্টিকর এবং দেহ ও মনের কঠোর পরি-শ্রমের উপযোগী হইবে। অধ্যাপকদের জন্য ছাত্রদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে না।

টালি বা ইষ্টকে নির্ম্মিত সুপরিচ্ছন্ন বায়ুচল গৃহে তিনজন করিয়া বিদ্যার্থী বাস করিবেন। প্রতি পঞ্চদশ দিবসে ছাত্রদের এই ত্রয়ী

(Combination) পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহার ফলে ছাত্রগণের মধ্যে সখ্যভাব ব্যাপকভাবে জন্মিবে কিন্তু অতিরিক্ত ও অবৈধ ঘনিষ্ঠতার পন্থা রুদ্ধ রহিবে।

প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ সমূহে "স্থানীয়" ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালকগণকে গ্রহণ করা হইবে। নবগৃহীত ছাত্রগণকে প্রথম তিনমাসকাল স্বগৃহে আহারাদি করিতে হইবে কিন্তু পুস্তক-ব্যয় আশ্রমই বহন করিবেন। এই তিনমাস অবৈতনিক শিক্ষার পরে বিদ্যাপীঠ-পরিদর্শক সপ্তাহকাল বিদ্যাপীঠে অবস্থান করিয়া যাঁহাদিগকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিবেন, আশ্রমের অন্নবস্ত্র দিয়া একমাত্র তাঁহাদিগকেই শিক্ষা দান করা হইবে। প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিতে এবং নৈশ আহার নিজগৃহে সমাপন করিয়া জননীর স্নেহাঞ্চলে আবৃত রহিয়া নিশিযাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু বিদ্যাপীঠে সাধারণতঃ পিতৃমাতৃহীন উপযুক্ত অনাথ বালকদিগকেই গ্রহণ করা হইবে বলিয়া এই ব্যবস্থা অনেকের পক্ষেই আবশ্যক হইবে না। যে সকল বালক ভবিষ্যতে ইংরাজি-বিদ্যালয়াদিতে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, সাধারণ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিদ্যাপীঠে গ্রহণ করা হইবে না। প্রাথমিক বিদ্যাপীঠে শিক্ষাকাল তিন বৎসর। বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী কতিপয় প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের কেন্দ্রস্থলে একটী করিয়া সামাপ্তিক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রাথমিক বিদ্যাপীঠোত্তীর্ণ ছাত্রগণ ইহাতে গৃহীত হইবেন। এই-স্থানেও শিক্ষাকাল তিন বৎসর। প্রত্যেক সামাপ্তিক বিদ্যাপীঠে একটী করিয়া দাতব্য ঔষধালয় থাকিবে।

কতিপয় সামাপ্তিক বিদ্যাপীঠের কেন্দ্রবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে একটী করিয়া কর্ম্মপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সামাপ্তিক বিদ্যাপীঠোত্তীর্ণ ছাত্রগণ

ইহাতে গৃহীত হইবেন। এক বৎসরের মধ্যে যাঁহারা কোনও প্রকার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী বা পর্ব্বতসঙ্কুল অতিশয় স্বাস্থ্য-প্রসাদক স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মপীঠে প্রেরণ করা হইবে। প্রত্যেক কর্ম্মপীঠের সংলগ্ন একটী করিয়া রুগ্নশালা স্থাপিত হইবে। ফলে সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার শিক্ষা হাতে-কলমে হইবে। কর্ম্মপীঠের শিক্ষাকাল চারি বৎসর। কর্ম্মপীঠগুলি হইবে প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটা কারিগরী বিদ্যালয় বা Technical School.

সাধারণ বিদ্যার্থীর ছাত্রজীবন কর্ম্মপীঠেই সমাপ্ত হইবে কিন্তু বিশেষ কৃতী ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আশ্রমের ব্যয়ে দেশভ্রমণ করিয়া তৎপরে "গবেষণা-মন্দিরে" বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আবিষ্কার-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবেন। কর্ম্মপীঠের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরাই বিদ্যাপীঠ সমূহের শিক্ষকতা করিবেন।

আদর্শের দাবী

একজন প্রশ্ন করিলেন,—এই অনুষ্ঠান-পত্রানুসারে আশ্রম প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। তবে আমি ত অভিক্ষু, অযাচক, ধনজনবলহীন দরিদ্র সন্ন্যাসী। অন্যে যে পথ ধনবলে মোটরে চ'ড়ে এক ঘণ্টায় অতিক্রম করবে, তা কত্তে আমার প্রয়োজন হবে পদব্রজে তিন দিন। ফলে কাজ হয়ত অনেক দেরীতে হবে। কিন্তু তাই ব'লে লক্ষ্য-চিন্তনে দুর্ব্বলতা রাখ্‌ব কেন? লক্ষ্যকে ছোট ক'রে দেখ্‌বই বা কেন? আর, প্রতিষ্ঠান যদি কিছু গ'ড়ে তুলতে

না'ও পারি, অভিক্ষার আদর্শকে যে জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা কত্তে চেষ্টা নিশ্চিতই কর্ব্ব, এটাই কি আমার পক্ষে সান্ত্বনা হ'তে পারে না? কয় মাইল পথ পর্য্যটন কর্লাম, তীর্থযাত্রীর পক্ষে সেটাই বড় কথা নয়; কেমন মন, কেমন প্রাণ, কেমন উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চল্‌লাম, এইটাই প্রধান কথা। কাজ যতটুকুই করি, আদর্শকে ক্ষুণ্ণ কর্ব্ব না।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও জাতিভেদ

প্রশ্ন।—আশ্রমে আপনারা জাতিভেদ রাখ্‌বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—জাতিভেদ নয়, শ্রেণীভেদ।

প্রশ্ন।—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী। আশ্রমের বিদ্যার্থীরা হবে সব ব্রহ্মচারী জাতি। শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারা অব্রহ্মচারী জাতির সঙ্গে যতটা সম্ভব কম মিশ্‌বে।

বিদ্যার্জ্জনের পরে আশ্রমের ব্রহ্মচারীর জাতিভেদ

প্রশ্ন।—বিদ্যার্জ্জনের পরে যখন এরা আশ্রম থেকে বেরুবে, তখন কি এরা জাতিভেদ মান্‌বে? পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা কর্ব্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার উপর ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের হাত নেই। আশ্রম থেকে বেরিয়ে গিয়ে কে কি কচ্ছে, তা' নিয়ন্ত্রণ করার ভার আশ্রমের নয়। সে ভার হচ্ছে যার যার বিচার-বুদ্ধি ও সৎ-সাহসের।

আশ্রম ও ভাতের হাঁড়ি

প্রশ্ন।—আশ্রমে কি ভিন্ন ভিন্ন জাতের ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন ভাতের হাঁড়ি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভিন্ন হাঁড়ি স্তর-বিশেষে হবে, স্তর-বিশেষে হবে না। কিন্তু কে পৈতাধারীর ছেলে আর কে অপৈতকের ছেলে, তার মুখ চেয়ে হাঁড়ির বিভিন্নতা হবে না। হাঁড়ির ভিন্নতা হবে স্বাবলম্বনের মুখ চেয়ে। স্বপাক-আহার স্বাবলম্বনী চিত্তবৃত্তির পরিপ্রসারক।

আশ্রমে কাহারা গ্রহণীয়?

প্রশ্ন।—আশ্রমে সকলকেই বিদ্যার্থীরূপে গ্রহণ কর্ব্বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পিতৃমাতৃহীন বা দরিদ্র সন্তানের দাবী সর্ব্বাগ্রে। গ্রহণ-বিষয়ে জাতি-বিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাভাবিক রুচি-প্রকৃতিও এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বে।

বিদ্যার্থী ও গৈরিক ধারণ

প্রশ্ন।—বিদ্যার্থীরা গৈরিক বস্ত্র পর্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না। কেন না, গৈরিক হচ্ছে ত্যাগের ব্রত গ্রহণের চিহ্ন। যে বালক ত্যাগ কি জানে না, ত্যাগের মর্য্যাদা কি বুঝে না, তাকে গেরুয়া পরান অপরাধ। শুধু তাই নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেউ আমৃত্যু ত্যাগের সঙ্কল্পকে দৃঢ় ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে পার্ব্বে ব'লে ভিতরে বল পাচ্ছে, ততক্ষণ তার পক্ষে গৈরিক ধারণ করা শুধু লোক-প্রবঞ্চনাই মাত্র। দেশ গৈরিকের ছড়াছড়ি চাচ্ছে না, চাচ্ছে শক্ত চরিত্র, সুদৃঢ় মনুষ্যত্ব।

আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি হেদুয়ার পার্কে (কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে) বসিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতা হইতে কয়েকটী উৎসাহী যুবক আসিয়াছেন উপদেশ-

প্রার্থী হইয়া। তন্মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—পুপুন্‌কীতে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা কচ্ছেন, তার উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আশ্রম স্থাপনেরও যা উদ্দেশ্য, জীবনেরও তাই। জীবনের উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে আশ্রমের উদ্দেশ্যকে আলাদা ক'রে চিন্তাও করা যায় না। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্ররূপে গড়ে নেওয়া। আর তার উপায় হচ্ছে, নিঃস্বার্থ নিস্কাম অন্তরে জীব-সেবা করা, যার যে অভাব, তার সেই অভাব দূরীকরণে চেষ্টা করা।

পুপুন্‌কীর আদিম রূপ

সকলেই পুপুন্‌কীর বিবরণ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমস্ত জমিটা জোড়া মোটা মোটা শাল গাছের গুঁড়ি, তার মধ্য থেকে ছোট ছোট শালের ফেঁকড়ী বেরিয়ে ভূমিতলে সূর্য্য-কিরণের আগমন-পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, পলাশ, সিধা আর মঞ্জুরের ঝাড়-ঝোড়ে চারদিকের দৃষ্টি হচ্ছে অবরুদ্ধ, পাথরের টুকরো আর কাঁকরের কণা সমস্ত জমিগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে অন্তহীন প্রাচুর্য্যে, প্রায় প্রত্যেকখানা পাথরের তলায় উঁকি মেরে বসে আছে একটা দুটা পাঁচ-ছয়-ইঞ্চি লম্বা কাঁকড়া বিছে, উঁচু-নীচু জমির ফাঁকে ফাঁকে অজস্র শুষ্ক পাতা, আর সেই পাতার নীচ থেকে হঠাৎ আবির্ভাব মনসানন্দন খড়িশ (গোখুরা) সাপের,—এই হ'ল পুপুন্‌কীর বন।

সুখিন্দার বন

একজন উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল,—আর এইখানেই প্রতিষ্ঠা কর্লেন আপনি আপনার আশ্রম?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এতেই ভয়ে মরে গেলি ? একবার উড়িষ্যার অন্তর্গত সুখিন্দার জঙ্গলে গিয়েছিলাম আশ্রম কত্তে। ঘরে খিচুড়ী চাপিয়ে জল আনবার জন্য বালতি নিয়ে বাইরে যেতেই দেখি, জলের মধ্যে জিভ দিয়ে ব্যাঘ্রনন্দন চক্ চক্ করে জল খাচ্ছে। দয়া করে সে যে লম্ফ দিয়ে ঘাড়ে চাপে নি, এটাই পরম ভাগ্য ! পরদিন বনে বেড়াতে বেড়াতে পিঠের উপরে পড়্‌ল সাপের লেজের স্পর্শ। উপরে তাকিয়ে দেখি, কদ্রুনন্দনকে বিনতা-নন্দন ময়ূর মশাই ভক্ষণ কচ্ছেন। তবু ভয় পাই নি। আজ পুপুন্‌কীর জঙ্গলেই ভয়ে মরে যাব ?

দৈব ও পুরুষকার

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, এই ভয়ঙ্কর স্থান আপনি পরিত্যাগ করে চলে আসুন বাবামণি। আশ্রম গড়ার আর কি জায়গা কোথাও নেই পৃথিবীতে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছে। কিন্তু আমি ওখানে বসেই পরীক্ষা করে দেখব যে; দৈবই বড় না পুরুষকার বড়। দৈব-নির্ভর জাতি বিপদ দেখলেই পাঁজি-পুঁথি বের ক'রে পলায়নের ফিকির খোঁজে। পুরুষকার কোষ্ঠী-ঠিকুজী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অসাধ্যকে সুসাধ্য করার জন্য করে চেষ্টা। যেখানে বিপদ, কাজ করায় সেখানেই ত আনন্দ রে! যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা শত-করা এক'শ ভাগ, সেখানেই জয়-গৌরব অর্জ্জনে আত্মপ্রসাদ। একদল লোক অবশ্য আমার পুরুষকার-প্রবুদ্ধ অবাধ্য সাহসকে অহংবুদ্ধির বিজৃম্ভন বলে ব্যখ্যা করবে, কিন্তু দৈব ও পুরুষকার, এই উভয়েরই যিনি স্রষ্টা, আমি তাঁর শক্তিতে অফুরন্ত বিশ্বাস রাখি ব'লেই ত দৈবকে গ্রাহ্য করি না, এই

কথাটা তোরা মনে রাখিস্। তোদের মধ্যে অনেককেই ত নিজ নিজ জীবনে অসাধ্য সাধনের প্রয়োজনে আত্মাহুতি দিতে হবে,—তোরা একমাত্র ঈশ্বরেই বিশ্বাস করিস্. দৈবে নয়, অদৃষ্টে নয়।

আসল কাজ অন্তরে

অপর একজন প্রশ্ন করিল,—আপনি ত্রিপুরা জেলার অনেকগুলি গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, অনেক গ্রামের যুবকদের দিয়ে পুষ্করিণীর সংস্কার, পথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজ সুরু করিয়েছিলেন, কত গ্রাম-গ্রামান্তরে ভ্রমণ ক'রে ক'রে অজ্ঞান যুবকদের জ্ঞান দিয়েছেন, দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে তাদের টেনে নিয়ে এসেছেন সুরুচি, সুনীতির সুন্দর পথে,—আপনি পুপুন্‌কীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌লে সে সব কাজ যে বাবামণি বন্ধ হ'য়ে যাবে!

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কাজ বন্ধ হবে কি রে! কাজ কি মানুষ শুধু হাত, পা, চখ, মুখ, নাক, কাণ দিয়েই করে? কাজ করে মানুষ তার মন দিয়ে। যার মন যত শক্তিশালী, সে তত দূর থেকে আর তত প্রচ্ছন্ন-ভাবে জনসমাজের সেবা কত্তে পারে। তোরা যদি আমার কাছ থেকে হাজার যোজন দূরে বাস করিস আর আমি যদি মনের শক্তিতে দূরত্বের এই বিরাট ব্যবধানকে নস্যাৎ করে দিয়ে তোদের কাজ কত্তে পার্ল্লাম, তবেই ত' কাজ কর্ল্লাম রে! আমি কাজ কত্তে চাই তোদের মনে, আমি আশ্রম গড়তে চাই তোদের প্রাণে, আমি তোদের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ রাখতে চাই আমার দেহ-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ আত্মার বলে। বাইরে একটা দুটা বা পাঁচটা দশটা জল-মাটি-কাদার আশ্রম গড়্‌তে ব্যস্ত আছি ব'লেই আমার সেই আসল আশ্রম গড়ার কাজ বন্ধ

থাকৃতে পারে না। যা আসল, তার জয় সুনিশ্চিত। বাইরে তার প্রকাশ নেই বলেই সত্য কখনও মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না!

মুখের কথা ও প্রাণের কথা

একজন প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা বাবামণি, আপনার পিছনে পিছনে দলে দলে যুবকেরা ঘুরে বেড়ায় কেন? আপনি ত আমাদের এক-জনকেও ত বলেন নাই, আয় কাছে আয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার আগের কথাটাতেই এসে পড়্‌লি। মুখে না ডাকি, মনে মনে ত ডাকি! অন্তরের অভিপ্রায় মুখের কথার চাইতে অনেক অধিক শক্তিশালী, অনেক অধিক দ্রুতধাবনক্ষম। এই জন্যই যোগীরা বাইরের প্রচারের চেয়ে মনের আকর্ষণকে বেশী সম্মান দেন। মুখের কথার চাইতে প্রাণের কথার দাম বেশী।

মানুষের আকর্ষণী শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধন কত্তে কত্তে সাধকের ভিতরে দিব্য আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ পায়। এ আকর্ষণী শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই অল্প-বিস্তর স্বভাবতই রয়েছে। এই জন্যই বিনা কারণেও এক মানুষ আর এক মানুষের কাছে এসে বসে, সেধে পরিচয় করে, যেচে কথা কয়, হাসি মুখে এক আমোদের অংশ দশ জনে নেয়। কিন্তু সাধন কত্তে কত্তে এই শক্তির পরিবিকাশ ঘটে; যা ছিল অতি সামান্য পরিমাণে অন্তরে নিহিত, তা যেন সমগ্র দেহ-মনের আধার উপচে চারিদিকে ছড়াতে থাকে। ফলে দলে দলে নরনারী তার পানে আকৃষ্ট হয়ে আসৃতে থাকে। আমি যদি ভগবানকে মনঃপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি আর

ডাকি, তাঁর সৃষ্ট জগতের সকলেই আপনা আপনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে থাকবে। এটা ভগবানেরই নামের মহিমা, ভগবানেরই প্রেমের গৌরব, আমার মহিমা বা আমার গৌরব নয়। ভগবানকে যে ভালবাসে, বিশ্ব তাকে ভালবাসবে। ভগবানে যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, বিনা প্রার্থনায় বিনা কামনায় ভগবান তাকে বিশ্বের আপন করে দেন, আপনা আপনি সকলে আপন হ'য়ে তার কাছে আসে।

আকর্ষণী শক্তির বিপজ্জনক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই আকর্ষণী শক্তি যখন বাড়্‌তে থাকে, তখন সাধকদের বড় সতর্ক থাকা দরকার। প্রাণের আকর্ষণে যখন শত শত নরনারী অন্ধের মত ছুটে আসে, তখন চাই সাধকের নিষ্কাম সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে ইষ্টানুভূতি, সকলের মধ্যে পরব্রহ্মের করুণাঘন মূর্ত্তির সুস্পষ্ট দর্শন। নইলে সে হয়ত কারো মায়ায় পড়ে যাবে, হয়ত এক নির্দ্দোষ সংশ্রবকে অবলম্বন ক'রেই লালসার কলুষ সংগ্রহ কর্ব্বে। জীবের স্বাভাবিকী আকর্ষণী শক্তি যখন বাড়্‌তে থাকে, তখন লোকের উপরে তার প্রভাব বাড়ে সত্য, তেমন আবার সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতনের রাস্তাও খুলে যেতে পারে। এই জন্যই তখন খুব সতর্কতার প্রয়োজন। এই জন্যই ভক্ত সাধকেরা বারংবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে ভগবান্, দৈবী বিভূতির উৎপাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। জ্ঞানীরা এই সকল দৈবী সম্পদকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করেন। কর্ম্মীরা এই সকল শক্তিকে প্রয়োজন মত কাজে লাগান এবং মানুষের প্রতি বাহ্য সমাদর প্রদর্শনের ভাব পরিহার ক'রে কৃত্রিম কুলিশ-কঠোর পরুষ ভাব ধারণ করেন। আমি যে তোমাকে আকর্ষণ করি, তার অর্থ এই নয়, যে,

তুমিই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছ। আমিও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি। তুমি যদি হও উত্তম আধার, তাহলেই আমার বাঁচোয়া। তুমি যদি হও অধম আধার, তা হ'লে তোমার সংশ্রবে যে আমার চিত্তে মালিন্য আসতে পারে না, তা নয়। যাই দেখ্‌লুম, তোমার মধ্য থেকে আমার আরাধ্য দূরে সরে গেছেন, অমনি তুমি আমার মহাবিপত্তির কারণ হলে। যতক্ষণ দেখ্‌ছি, তোমার ভিতরে আমার প্রাণের প্রভু নিত্যবিরাজ কচ্ছেন, ততক্ষণ আর ভয়-ভাবনার কোনও কারণই নেই। আমার ভিতরে থেকে তোমাকে আকর্ষণ কচ্ছেন কে? তিনি কি ব্রহ্মই নন? নিজের ভিতরের সেই চৌম্বক শক্তিরূপে পরমেশ্বরকে যতক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছ, ততক্ষণই বা ভয় কিসের? ভয় ত শুধু নিজের ভিতরে পরম-পুরুষকে না দেখে নিজের অহঙ্কার-রূপ শূন্যতাকে পরমেশ্বরের সিংহাসনে বসালে। কুকুরকে পশুগণের রাজা ক'রে দেওয়া হ'ল, তবু সে জুতা কামড়ানো ছাড়তে পারল না। দুর্দ্দৈব তার এতেই ঘট্‌ল। অহংকারকে জীবনের প্রভু ক'রে দিলাম, অহংবুদ্ধি সৃষ্টি করল অজ্ঞানতাকে, অজ্ঞানতা আন্‌ল লালসা, লালসা সৃষ্টি করল দুঃখ, দুঃখ নিয়ে এল অনুতাপ, অনুতাপ বাড়িয়ে দিল দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বলতা দান কর্ল্ল হতাশা, আর হতাশা দলিল লিখে দিল অনন্ত অবনতির। অহংকারের পূজা করলে এই ভাবেই আসে পতন।

আম্র-বীজ সংগ্রহ

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবামণি দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—ভাল কথা, তোদের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে আমি একটা জরুরী কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। এক্ষণি আমাকে বড়বাজার যেতে হবে আমের বীজ সংগ্রহের জন্য।

প্রশ্ন।—আমের বীজ দিয়ে কি হবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পুপুন্‌কীতে চারা কর্ব্ব, আগামী বর্ষায় বিতরণ কর্ব্ব,—বৃক্ষোৎপাদন ওদেশে আশু-প্রয়োজন। কিন্তু চিন্তার বিষয় হয়েছে এই যে, দুষ্প্রাপ্য জাতের আম ছাড়া অন্য আমের বীজ ভাল অবস্থায় এই অসময়ে পাওয়া যাবে না। শুষ্ক বীজে চারা জন্মাবে না। পুপুন্‌কী আশ্রমেও সিকি মাইল দূর থেকে জল এনে তবে চারা বাঁচাতে হবে। সারা বৎসর জল দিয়ে যাকে বাঁচাব, তাকে আগামী বর্ষায় যখন বিতরণ কত্তে সুরু কর্ব্ব, তখন হয়ত আবার গ্রাম্য কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই * দিতে হবে। লোকের বিশ্বাস, গাছে গাছে ভূত থাকে। বনের

---

* এ লড়াই সত্যই দিতে হইয়াছিল। ফলের চারা বিতরণ করিয়া বনের ভূতগুলিকে গ্রামে পাঠান হইতেছে বলিয়া এক দারুণ কুণ্ঠা জন-সাধারণের মনে জাগিয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীবাবামণিকে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া হরিদ্রাবর্ণ কাগজে লাল কালীতে ছাপাইয়া বঙ্গানুবাদসহ গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার প্রচার-পত্র বিতরণ করিতে হইয়াছিল,—

"নিরস্তে পাদপে দেশে বর্ষণং ন ভবেত্ততঃ
পুণ্যানামেব পুণ্যং তু পাদপানাং বিরোপণম্।
অতিথেঃ পূজনং পুণ্যম্ অন্নদানে ততোঽধিকম্,
ফলবৃক্ষ-রোপণাৎ তু অশ্বমেধ-ফলং ভবেৎ।
মূলে তু সিঞ্চয়েৎ তোয়ং পুণ্যকল্যাণলিপ্সু যঃ,
পাদপে যানি পত্রাণি তানি লক্ষাণি স্বর্গভুক্।

"অর্থাৎ যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে বৃষ্টি হয় না। তাই বৃক্ষরোপণ মহাপুণ্য কার্য্য। অতিথি-সেবায় পুণ্য আছে, অন্নদানে ততোধিক পুণ্য, কিন্তু ফলবৃক্ষরোপণে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। বৃক্ষমূলে পুণ্যকল্যাণলিপ্সু হইয়া যে (প্রচুর) জল ঢালে, ফলবৃক্ষে যত পত্র হয়, ততলক্ষ বৎসর তাহার স্বর্গবাসে অধিকার জন্মে।"

এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছিলেন —"সংস্কৃত শ্লোক ছাড়া ভূত তাড়ান যায় না। তাই আমি এখনি শাস্ত্র-রচনা করিতেছি, যাহা ভবিষ্যতে দেশের সকল লোকের কাজে আসিবে।" অঃ সঃ সঃ

গাছ কেটে ত বনের ভূতগুলিকে নিরাশ্রয় করা হচ্ছে। তারা গ্রামে যাবে না ত যাবে কোথায় ?

সেবা এবং ভালবাসা

রাত্রে জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জন-সেবা কার্য্যের পবিত্র অধিকার পাইয়াছ। এই অধিকারকে অক্লান্ত শ্রমের মধ্য দিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণিত কর। বুকের উপরে সেবকের 'ব্যাজ' ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেই কেহ সেবক হয় না। প্রকৃত সেবককে অহমিকা-বর্জ্জিত হইয়া অনুগত চিত্ত লইয়া কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়া সেবাও করিতে হয়। চেষ্টা, উদ্যোগ, সাহস ও এক-নিষ্ঠার দ্বারা, মানব-জীবনের যতখানি সাধ্য, ততখানি সেবা দেশকে এবং জগৎকে দাও। কে রুষ্ট হইল, কেবা স্তুতি গাহিল, সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়া, জীবনের অমূল্য সময় কতখানি একপ্রাণ সেবায় সার্থক হইল, তাহার হিসাবে লক্ষ্য দাও। তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ অসীম এবং অফুরন্ত। তোমাদের অকৃত্রিম সেবার মধ্য দিয়া আমার সেই স্নেহকে উপলব্ধি কর। তোমাদের আলস্য ও ঔদাস্যের জন্য আমি তোমাদিগকে মাঝে মাঝে তীব্র তিরস্কার করিলেও একথা জানিও যে, আমা অপেক্ষা বেশী ভাল জগতে আর কেহ তোমাদের বাসে না। আমার হৃদয়টা ভালবাসা দিয়াই গড়া। আমার চিত্ত ভালবাসারই আকর। ভাল-বাসাই আমার একমাত্র স্বভাব-ধর্ম্ম। নিজের চেষ্টা, উদ্যম, যত্ন, অধ্যবসায়, মনুষ্যত্ব এবং নিষ্কাম-সেবা দ্বারা এই ভালবাসার যোগ্য অধিকারী বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও। দেশ, সমাজ ও জগৎকে যে যত অধিক পরিমাণে সেবা দিবে, সে আমাকে তত অধিক

বুঝিবে। যার সেবা যত নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, অকপট ও গভীর হইবে, সে আমাকে তত অধিক বুঝিবে। আমাকে বুঝিতে হইলে জগৎকে ভাল বাসিতে হয়। কেননা, সেবা এবং ভালবাসা একই বস্তুর দুই নাম।"

ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ

ময়মনসিংহ

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শ্রীশ্রীবাবামণি ময়মনসিংহ আসিয়াছেন। অনুরাগী যুবকগণের সহিত কথা হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ এক অত্যাশ্চর্য্য মহামিলনের ভূমি হবে। কেউ কারো ধর্ম্ম, সমাজ, মত ও পথ পরিত্যাগ না ক'রেও প্রাণের যোগে বিরাট্ এক ভ্রাতৃত্বের মিলন-ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবে। প্রেমের মহাসমুদ্রে সেদিন বিপরীত দিক্ থেকে নানা বিরুদ্ধ সভ্যতা, নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত, নানা বিরুদ্ধ জীবনাদর্শ প্রবল স্রোতে এসে অবগাহন কর্ব্বে এবং সর্ব্বসমন্বয়ের জয়ধ্বনি কর্ব্বে। শুদ্ধি আন্দোলন, তাঞ্জিম্ ও তব্‌লীগ আন্দোলন এসবের প্রয়োজন আছে। কিন্তু গুরু নানকের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার ভার যিনি নেবেন, তাঁর কর্ম্ম এসব আন্দোলনের চাইতে ঢের বেশী উঁচু হবে,—ঢের বেশী গভীর হবে। আমি তাকাচ্ছি ঐ তিনশ' বছরের পরের ভারতবর্ষের দিকে, যখন বুদ্ধ ও মহম্মদ গলাগলি ধরে মানব-কল্যাণ কর্ব্বেন, যখন যীশু ও শ্রীকৃষ্ণ একই রথের সারথ্য কর্ব্বেন, একই বাঁশরী বাজিয়ে মানব-চিত্ত আকুল কর্ব্বেন। মহাসমন্বয়ের পূর্ব্বগামী মলয় পবন বইতে আরম্ভ করেছে মাত্র।

ওঙ্কারের তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু মলয় পবন এসে ভবিষ্যতের বার্ত্তা আমার কাছে ব'লে গেল, তা নয়। আমার দৃষ্টি সেই দূরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছে। এই পবনের আর এই নয়নের গতি যখন দুই বিপরীত দিক থেকে ছুটে এসে একটা জায়গায় মিল্‌ল, তখন দেখেছি, পবিত্র ওঙ্কার বিশ্বের সকল সত্যকে স্বীকার ক'রে আলিঙ্গন ক'রে, বুকে ধ'রে দাঁড়িয়েছে। পরমেশ্বরের অতিগুহ্য চিরগুপ্ত অনুচ্ছিষ্ট নাম কোটি বৈচিত্র্যকে স্নেহের কোলে ঠাঁই দিয়ে বল্‌ছেন,—"আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি।" পরমেশ্বরের পরম স্নেহের অমৃত ঝরিয়ে প্রণব-মন্ত্র ডেকে বল্‌ছেন,—"সবাইকে আমি স্বীকার করি, সবাইকে আমি মর্য্যাদা দেই, সবার আমি প্রাণ-স্বরূপ,—তাই আমার অর্থ,—হাঁ, Yes. মঞ্জুর, Agreed!" মহামন্ত্র ওঙ্কার স্নিগ্ধ কণ্ঠে দীপ্ত স্বরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন,—"সকল মত, সকল পথ, সকল মন্ত্র, সকল তন্ত্র, সকল ধ্যান, সকল উপলব্ধি আমার মধ্যেই আছে লুকিয়ে। আমি সর্ব্বমন্ত্রের, সর্ব্বতন্ত্রের, সর্ব্বসত্যের স্বীকৃতি, সমাহার ও সমন্বয়।"

ময়মনসিংহ
২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

সংযমের মূল

দ্বিপ্রহরে কয়েকটী মুসলমান যুবক সংযম সম্বন্ধে উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকল সংযমের মূল কোথায় জানিস? ভগবানের পাদ-পদ্মে। নিয়ত যে ভগবানের নাম স্মরণ করে, শ্বাস-

প্রশ্বাসেও যে ভগবানকে ভোলে না, কাম-ক্রোধ রিপুচয় তাকে দশ সহস্র যোজন দূরের পথ থেকে প্রণাম ক'রে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। ভগবানের নামের যারা সাধক, তাদের অসাধ্য কিছু নেই।

সাধনের প্রণালী

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু সাধনের প্রণালী কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রণালী হচ্ছে স্বাভাবিকতা। অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে যে সাধন, তার নাম কৃচ্ছ্রসাধন। তোমাদের কৃচ্ছ্রসাধনের পথে যেতে হবে না, হবে সহজের পথে অগ্রসর হ'তে। যে শ্বাস-প্রশ্বাস তোমার স্থৈর্য্যের স্বাভাবিক বিঘ্ন, তাকেই স্বাভাবিক বন্ধুরূপে পরিণত ক'রে নিতে হবে। কৌশল অতি সহজ, কিন্তু সহজ ব'লেই তা' কঠিন ব'লে মনে হবে। তাই তীব্র একনিষ্ঠা চাই। মন-প্রাণ এক ক'রে ভগবানকে ডাক্‌বে, অন্তরের ভক্তি দিয়ে তাঁকে আহ্বান কর্ব্বে, বুক-ভরা আকুলতা নিয়ে তাঁর প্রতীক্ষা কর্ব্বে। প্রেমই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রধান সাধক; পরমপ্রেমময়কে ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রেমময় স্বভাব লাভ কর, কাম-ক্রোধ চিরতরে লোপ পাবে।

শ্বাসে জপ ও মালায় জপ

মুসলমান যুবক কয়টী নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনোপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে একটী মহিলার সমাগম হইল। তিনি পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণির জ্যেষ্ঠা ভগিনী কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষিতা হইয়া তাঁহার কন্যাগণের অন্যতমা হইয়াছেন। তিনি কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন।

তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মালায় বা করে জপ করার কোনও গুরুতর আবশ্যকতা নাই। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপই শ্রেষ্ঠ জপ! বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে, বিনা শ্রমে আপনা আপনি যে শ্বাস ও প্রশ্বাস বইতে থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে নাম করে যেও। মনের অতিরিক্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনে কখনো কখনো মালায় জপ চালাতে পার, তাতে বাধা নেই। কিন্তু সেই মালা যেন ওজনে ভারী না হয়, তার আকার যেন বৃহৎ না হয়। শরীর খুব অসুস্থ থাকলে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ কর্ত্তে কষ্ট হয়, তবে তখন মালাতেই জপ করবে। ভগবানের নাম ভক্তিভরে একবার জপ কর্ল্লে সেই একবারেই কিছু না কিছু ফল হয়। নামজপ কখনো নিষ্ফল হয় না।

নাম-সাধনা ও কর্ম্ম-সাধনা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম-সাধনা যে কর্ম্ম-সাধনার বিরোধী, একথা বলে অজ্ঞানরা। প্রত্যক্ষদর্শী একথা বলেন না। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি ভ্রূ-মধ্যে মনঃসন্নিবেশ ক'রে ভগবৎ-স্মরণ কত্তে উপদেশ দেন নাই? কিন্তু সেই উপদেশ কি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরিপন্থী হ'য়েছে? কৃষ্ণ বলছেন,—হে অর্জ্জুন, যুদ্ধ কর, শত্রু-বধ কর, রাজ্য-ভোগ কর, আবার তপঃসাধন ক'রে যোগাভ্যাস ক'রে জেনেও নাও তাঁকে, যিনি পরাৎপর আত্মা, যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি চরাচরব্যাপী জগৎপতি পরমেশ্বর। গীতার মর্ম্ম যাঁরা বুঝেছেন, তাঁরাই জানেন যে, ধর্ম্ম-সাধনায় ও কর্ম্ম-সাধনায় কোনও বিরোধ নেই,—যদি মানুষ বাস্তবিক সাধন করে। তোরা কেউ সাধন কর্‌বি না,

শুধু লম্বা লম্বা বুলি মুখে আওড়াবি। সত্য কারো মুখের কথার বাধ্য নয়, সত্য শুধু বাধ্য অক্লান্ত সাধনের।

ময়মনসিংহ

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

স্ত্রীলোকের বিবাহ ও কৌমার্য্য

কতিপয় স্ত্রী-ভক্তের নিকটে কথা-প্রসঙ্গে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর জীবনী বলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পূর্ণতা লাভের দুইটী পথই খোলা। একটী পথ মৈত্রেয়ীর ন্যায় সংসারীর, অপরটী গার্গীর ন্যায় সন্ন্যাসের। যে যে-পথেই চল না কেন ; এগিয়ে যদি যেতে পার, তবে তাতেই পূর্ণতা-লাভ। মৈত্রেয়ী স্বামী-স্বীকার ক'রে গৃহিণী সেজে তার সঙ্গে ঘর-কন্নাও কর্লেন, আবার ব্রহ্ম-সাধনাও কর্লেন। আর গার্গী ঘর-সংসারীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেড়ে নিয়ত ব্রহ্ম-ধ্যানেই ডুবে রইলেন।

চির-কুমারীর মহিমা ও জীবনাদর্শ

প্রশ্নকর্ত্রী বর্ত্তমান যুগে চিরকৌমার্য্যের কথা তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তদুত্তরে বলিলেন,—পুরুষেরই হোক আর স্ত্রীলোকেরই হউক, চির-কৌমার্য্য প্রকৃতই এক গৌরবের জিনিষ, এক পূজার বস্তু। সম্যক্ পবিত্রতার উপরে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কৌমার্য্য একটা আশ্চর্য্য বস্তুতে পরিণত হয়, তার মঙ্গল-প্রভাব চতুর্দ্দিকে সহস্র যোজন পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই কৌমার্য্য হওয়া চাই জ্ঞান-সহকৃত। কুলীনের ঘরের কত কন্যা চিরকুমারী থাকতে বাধ্য হ'য়েছে, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের

বিয়ের বর জোটেনি ব'লে। এ কৌমার্য্যের কোনও মঙ্গল-প্রভাব সমাজ-মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে না। বরং উল্টো বিপত্তি ঘট্‌তে পারে। বর্ত্তমানে সুশিক্ষিত কোনও কোনও সমাজে মেয়েদের ভিতরে কৌমার্য্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু এ কৌমার্য্যও কতকটা অবস্থার সৃষ্টি ব'লে, এ কৌমার্য্যের মূলদেশে স্বার্থগন্ধহীন কোনও ভাগবতী প্রেরণা নেই ব'লে, তার প্রভাব সমগ্র জাতির মঙ্গলকে জাগ্রত কচ্ছে না। তন্ত্রে কুমারী-পূজার ব্যবস্থা আছে। সেখানে কুমারীকে নাম দেওয়া হয়েছে,—"কামহা", "কামাতীতা", "তপস্যা", "ভূর্ভুবঃস্বঃ-স্বরূপা।" এর মানে এই যে, কৌমার্য্যব্রত-ধারিণীকে এমন হ'তে হবে, যেন তাকে দর্শনমাত্র কামুকের কাম দূরীভূত হয়, লম্পটের লালসামূলক চিন্তানিচয় নিস্তব্ধ হয়। কিন্তু নিজে যে কামের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা কত্তে পারে নি, তাকে দেখ্‌লে ত' কারো কাম দূর হ'তে পারে না। তাই কুমারীকে হ'তে হবে কামাতীতা। কামাতীতা হ'তে হ'লে কঠোর সাধন চাই, তাই কুমারীর আর এক নাম দেওয়া হয়েছে "তপস্যা।" তপস্যাই তাকে আত্মনিষ্ঠ করে, ব্রহ্মনিষ্ঠ করে, সৎ-চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপিণী করে, তাই তার নাম "ভূর্ভুবঃস্বঃ-স্বরূপা।" চিরকুমারী হওয়ার মানে জগতের জননী-স্বরূপা হওয়া। চিরকুমারী থাকা এত বড় গৌরবময় পদবী যে, যে তা' হ'তে পারে, তার জননী এবং জন্মভূমি অসীম পুণ্য লাভ করেন, তার কুল উদ্ধার হয়।

সংসারকে শান্তিময় করিবার উপায়

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারকে সুখময়, শান্তিময় ও তৃপ্তিময় করিবার একটীমাত্র উপায় আছে। তাহা হইতেছে সংসারের প্রত্যেকটী প্রাণীকে লইয়া প্রত্যহ

নিয়মিত উপাসনায় বসা। একত্র উপাসনা করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে জাত নানা বিচ্ছেদ-বিধায়ক ভাব ও সংস্কারগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যায়। পারিবারিক সমবেত উপাসনা যে গৃহস্থের গৃহকে কত দ্রুত আনন্দ-নিকেতনে পরিণত করিতে পারে, তাহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ এবং দেখিয়া অবাক্ হও। জগতের সহস্র ঝঞ্ঝার আক্রোশ এবং মেঘের গর্জ্জন দেখিতে না দেখিতে, দেখিবে, লয় পাইয়া যাইবে। সকলের মন যেখানে ভগবল্লক্ষ্য, সাধ্য কি পৃথিবীর নানা বহির্ম্মুখ যন্ত্রণার যে, একজনের মনেও সেখানে কেহ স্বেচ্ছায় দুঃখের আঁচড়টী কাটিতে পারে? ত্রিভুবনকে লইয়া এক হইবার আগে তোমরা পরিবারস্থ প্রত্যেককে লইয়া এক হইবার সাধনটী কর। ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বধূতে বধূতে, স্বামীতে পত্নীতে, ননন্দায় ভ্রাতৃবধূতে, ভগ্নীতে আর ভগ্নীতে, প্রভুতে আর ভৃত্যে সংসারের মধ্যে যত প্রকারের কলহ-কচায়ন আছে, প্রাত্যহিক নিয়মিত উপাসনার অনুশীলনের দ্বারা যত দ্রুত পার, তাহা সমূলে বিধ্বস্ত কর। সংসার অমৃতের রসে সিক্ত হইবে, চখের পাতায় প্রত্যেকের মধু'র রেখা ফুটিয়া উঠিবে, রসনায় প্রত্যেকে ক্ষীরের আস্বাদন পাইবে, কর্ণে প্রত্যেকের ইষ্ট-চরণের নূপুর বাজিয়া উঠিবে, দগ্ধ পৃথিবী নূতন প্রেমের নবারুণ-কিরণে উজ্জ্বল হইবে, সুন্দর হইবে, আকাশ-বাতাস নির্ম্মল হইবে, পরম সুখপ্রদ হইবে।"

একনিষ্ঠার মূল্য

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে একনিষ্ঠার যাহা মূল্য, এত মূল্য বোধ হয় আর কোনও সদ্‌গুণের নাই। বুদ্ধিহীন লোকও একনিষ্ঠার গুণে অসাধ্য-সাধন

করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিও একনিষ্ঠার গুণে অসামান্য-বলসাধ্য মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করে। সহায়হীন, সম্পদহীন, অনাদৃত, সামান্য ব্যক্তিও অসামান্য একনিষ্ঠার গুণে ক্রমশঃ নানাবিধ অদৃশ্য সহায়সমূহ প্রাপ্ত হয় এবং জগতে মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করে। সাধনে, ভজনে, পরোপকারে জীবসেবায়, দেশের কাজে, ব্যক্তিগত অভ্যুদয় সম্পাদনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় শক্তি হইতেছে একনিষ্ঠা। তোমরা একনিষ্ঠ হও। বারংবার নৌকা-বদল করিও না। বারংবার মত ও পথ চাখাচাখি করিতে গিয়া জীবনের মূল্যবান সময়, সুযোগ ও অবসর-সমূহকে বৃথা চলিয়া যাইতে দিও না।"

হাবলাউচ্চ, ত্রিপুরা
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

জীব ও শিব

শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা জেলান্তর্গত এই পল্লীতে ক্ষুদ্র একটী প্রতিষ্ঠান দেখিতে আসিয়াছেন। একটী চরিত্র-গঠনেচ্ছু-যুবক নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শৈশবে শিশু যে-কোনও স্ত্রীলোকের কোলেই উঠুক না কেন, শুধু স্তন দুটোই খোঁজে। কিন্তু প্রজাসৃষ্টির ক্ষমতা যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুর মধ্যে জন্মে, তখন সে স্ত্রীলোক দেখলে স্বভাবতঃই ভোগেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ভোগেচ্ছাটা তার আত্মকৃত অপরাধ নয়, এটা যৌবনের প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে যে জয় কত্তে পারে, সেই হচ্ছে শিব। যে এই প্রকৃতির দাস হ'য়ে পড়ে থাকে, সে হচ্ছে পশু বা জীব। মনের ভিতর কামচিন্তা

জেগেছে বলেই হতাশ হ'য়ো না, এই কামকে দমন করার শক্তি তোমার যে আছে, তা' জেনে পুরুষকারের বলে জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ কর। উদ্যম পরিহার ক'রো না।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কামের মধ্যেও স্বাভাবিকতা আর অস্বাভাবিকতা আছে। পুরুষের স্বাভাবিক কাম নারীকে আশ্রয় ক'রে। নারীর স্বাভাবিক কাম পুরুষকে আশ্রয় ক'রে উদ্দীপিত হয়। অস্বাভাবিক কামে এই ভেদ-বিচারটুকু থাকে না। অস্বাভাবিক কামের হেতু হচ্ছে অস্বাভাবিক জীবন-যাপন, কদর্য্য সঙ্গ এবং কুৎসিত অভ্যাস।

কাম-দমনে সাধারণ মানুষ ও মহাপুরুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু স্বাভাবিক কাম সবারই হয়। শঙ্কর বল, আর বুদ্ধ বল, সবাই একদিন স্বাভাবিক কামের সঙ্গে সংগ্রাম কত্তে বাধ্য হ'য়েছিলেন,—যীশু, মহম্মদ কেউ বাদ যান নি। তোমরা যে মনে কর, মহাপুরুষেরা সব এক লাফেই গাছের আগায় গিয়ে উঠে বস্‌লেন, ওটা একটা মস্ত ভুল। তোমাদের মত লড়াই সবাইকেই দিতে হয়েছে। তবে, তোমরা লড়াই কত্তে কত্তে আত্ম-অবিশ্বাস ক'রে মিনিটে দশবার ক'রে হাতিয়ার ছেড়ে দাও, মহাপুরুষেরা তা' করেন নি। তাঁরা সংযম-সিদ্ধ অবস্থালাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত শ্রমে হাতিয়ার চালিয়েছেন। তাঁদের জয়লাভের কারণ তাঁদের একনিষ্ঠা আর তোমাদের পদে পদে পরাজয়ের কারণ আত্ম-বিশ্বাসের অভাব, সাহসের অভাব, লেগে থাক্‌বার উদ্যমের অভাব।

স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—স্ত্রী-জাতিতে কামভাব দূর করার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তাঁদের প্রতি মাতৃভাব আরোপ করা। যাই দেখ্‌লে একটী স্ত্রীলোক,—অম্‌নি 'মা' 'মা' ব'লে মনে মনে তাঁকে ভক্তিভরে পূজা কর। চিন্তা কর, তোমার মা এক বয়সে এইরূপ ছিলেন এবং পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে একদিন নূতন দেহে এই রকমটী হবেন। যার মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, সে চেষ্টা কর্ব্বে যেন স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই মনে হয়, আমার মা পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ ক'রে এখন সমগ্র নারীজাতির মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছেন। ভাব্‌তে হবে, এমন নারীদেহ নেই, যার ভেতরে মা আমার অবস্থান কচ্ছেন না। ঐ যে মেয়েটীর সুন্দর হাসিমাখা মুখখানা দেখ্‌ছি, ওতে যেন আমার মায়েরই ছবিখানা কে তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে। ঐ যে কিশোরীর টল্‌টলে চ'খ দুটী দেখ্‌ছি, ও যেন ঠিক আমার মায়েরই চ'খ। ঐ যে পূর্ণ যুবতীর নিটোল সুডৌল সুঠাম দেহলতা দেখ্‌ছি, ওতে আমার মায়েরই সেই রূপটী ফুটে উঠেছে, যে রূপে তিনি আমাকে দুধ খাওয়াতেন, ঘুম পাড়াতেন। এই ভাবে অভ্যাস কত্তে কত্তে এমন হবে যে, কিছুতেই আর স্ত্রীলোক-দর্শনে মা-ছাড়া অন্যভাব মনোমধ্যে উদিত হবে না। আমার সংসারাশ্রমের এক গুরুজন এই রকম অভ্যাস করেছিলেন। ফলে এমন হ'ল যে, নিজের স্ত্রীকে দেখলেও বাধ্য হ'য়ে মনে মনে মা ব'লে ভাব্‌তে হ'ত। স্ত্রীকে স্ত্রী ব'লে ভাব্‌তে তাকে দস্তুরমত চেষ্টা পেতে হ'ত। এর ফলও হ'য়েছিল অভাবনীয়। তাঁর প্রথম ছেলেটী সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন, জীব-জগতের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রে ধন্য হ'লেন।

সৎচিন্তার বিনাশ নেই,—সচ্চিন্তা তার প্রভাব পুরুষানুক্রমে বিস্তার করে।

কামদমনে উদাসীনভাব

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কামদমনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে উদাসীন ভাব। স্ত্রীলোক দেখ্‌লেও তাকে স্ত্রীলোক ব'লে মনে করা নেই, পুরুষ দেখ্‌লেও তাকে পুরুষ বলে মনে করা নেই। স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ-জ্ঞানটা থেকে একেবারে দূরে থাকা। এইটাই হ'ল জিতেন্দ্রিয়ত্বের পরাকাষ্ঠা। মাঠে যেমন শত শত গাভী আর ষাঁড় চ'রে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোন্‌টা ষণ্ড, সেই দিকে তোমার কোনও সাগ্রহ লক্ষ্য নেই, ঠিক্ তেম্‌নি জগতের সকল স্ত্রী-পুরুষকে তুমি দেখে বেড়াচ্ছ, তবু কে স্ত্রী আর কে পুরুষ, সেই দিকে তোমার গ্রাহ্য নেই,—এইটাই হ'ল উদাসীন ভাব। স্ত্রীলোক তোমার কাছে এল, তাই ব'লে সশঙ্ক হবার দরকার নেই। সে স্ত্রী কি পুরুষ, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে কি হবে? তার সঙ্গে তোমার কোনও কর্ত্তব্যের দায় থাকে ত' চুকিয়ে দিয়ে খালাস হও। তুমি হয়ত স্ত্রীলোক,—পুরুষ তোমার কাছে এল,—তাতেও তোমার বিব্রত হবার দরকার নেই। আগন্তুক ব্যক্তি পুরুষ কি স্ত্রীলোক যাই হোক্ গে, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার সঙ্গে তার যা দরকার, সেইটুকু মিটিয়ে দিয়ে রেহাই পাচ্ছ। তবে, এই উদাসীনভাব কখনো সহজে আসে না, সাধন-কত্তে কত্তে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের চঞ্চলতা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-বুদ্ধি থাকবেই। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরতার সময়েই উদাসীনভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরতা না আস্‌ছে, ততক্ষণ মাতৃভাব তোমার

সাধ্য। শ্বাস-প্রশ্বাস যাই স্থির হ'ল, অম্‌নি উদাসীনভাব তোমার সিদ্ধ।

কাম-সংগ্রামের হাতিয়ার

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কামের-সঙ্গে সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হচ্ছে ভগবানের নাম। ভগবানের নামের অসি হাতে নিয়ে অগণিত বিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়ে অকুতোভয়ে অগ্রসর হও। শতবার তুমি পদস্খলিত হ'তে পার, কিন্তু হাতের অসি ছেড় না। কি স্ত্রী কি পুরুষ, প্রত্যেকেরই এই সংগ্রামে জয়লাভ করার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন নাম। নামে বিশ্বাস কর, নামে নির্ভর কর, নামের বলে জয়ার্জ্জন কর।

ভারতে নারীনিন্দা

একজন বলিলেন,—ভারতে নারীজাতি চিরকাল নিন্দিতাই হয়েছেন। তার ফলে নারীজাতির প্রতি আমাদের স্বাভাবিক সম্ভ্রম ক'মে গেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী কেবলই নিন্দিতা হয়েছেন, একথা সত্য নয়। বৈদিক যুগে নারীরা দলে দলে ঋষিত্ব অর্জ্জন করেছেন, অনেকে বেদমন্ত্র রচনা ক'রে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অতুল সম্পদ সংযোজন করেছেন। যে সমাজে নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবুদ্ধি নাই, সে সমাজে শত শত নারী এভাবে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠ্‌তে পারেন না। তবু যে তোমাদের নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি কম, তার প্রধান কারণ এই যে, পুরুষদেরই মধ্যে আত্মসম্ভ্রম-বোধ কয়জন লোকের আছে?

শাস্ত্রে নারীনিন্দার কারণ

প্রশ্ন ।—শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকারেরা অনেকেই কি নারীকে নরকের দ্বার ব'লে প্রচার করেন নি? তার ফলেও কি আমাদের মনে নারীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্ট হয় নি?

শ্রীশ্রীবাবামণি ।—হয়েছে। কিন্তু তোমাদের নিজেদের আত্ম-সম্ভ্রমবোধ কম বলেই ত এসব উপদেশের প্রয়োজন হ'ল। যে জানে নিজেকে চিদানন্দস্বরূপ শিব বলে, তাকে প্রলোভন থেকে রক্ষার জন্য নারীনিন্দার প্রয়োজন হয় না। তোমার দুরবস্থা দেখে শাস্ত্রকার নারী গর্হণ ক'রে তোমাকে প্রলোভন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। যেখানে তুমি সাধনবলে বলীয়ান পৌরুষ-প্রবুদ্ধ মহেশ্বর, সেখানে তোমার জন্য নারী-বিভীষিকা দেখাবার প্রয়োজন ত হয় নি।

তন্ত্রে নারীর স্থান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৃষ্টান্তস্বরূপ তন্ত্র-শাস্ত্র দেখ। সেখানে দেওয়া হয়েছে, "স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যম্"—সর্ব্বদা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা কর্ব্বে, তাকে বর্জ্জন ক'রে নয়। স্ত্রীদের সংস্রবে পুরুষের অধঃপতন আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, তবু সেখানে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই সাধন কত্তে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য্য এই যে, গোড়ায় তোমাকে যে নিজের পর্য্যন্ত রূপান্তর চিন্তা ক'রে নিতে হবে,—"স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং, স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ",—সমগ্র জগৎকে স্ত্রীময় জান্‌বে এবং নিজেও পুরুষাভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে স্ত্রীই হয়ে যাবে। এক স্ত্রীর কাছে অপর স্ত্রীর আর ভয়ের বিষয় কি আছে? তন্ত্রে নারীকে "স্ত্রিয়ো দেবাঃ, স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ, স্ত্রিয় এব বিভূষণম্"—এই ব'লে প্রশংসা করা হয়েছে। নারীকে বাদ

দিয়ে পৃথিবীতে চলা বড়ই কঠিন, তাই তাদের বিদ্বেষ না ক'রে পূজার মধ্য দিয়ে মিত্র করা উচিত। বলেছেন,—"স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো।" আরও বলেছেন,—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ",—নারীর যেখানে পূজা হয়, সেখানে দেবতারা আনন্দে বিভোর হন।

নারীকে মর্য্যাদা দানের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীর এই মর্য্যাদা তুমি রক্ষা ক'রে চলতে তখনই সমর্থ হবে, যখন তোমার নিজের মর্য্যাদা কোনও দুর্ব্বলতায় টুটবে না। আপন ভাল ত জগৎ ভাল, নিজে মন্দ ত জগৎ মন্দ। পাপী জগৎকে পাপময় দেখে, পুণ্যবান জগতের সর্ব্বত্র পুণ্য দর্শন করে। তোমরা দেবতা হও, দেখ্‌বে, তখন নারীকে দেবতার মর্য্যাদা দেওয়া কত সহজ।

পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা

অপর একটী যুবক ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে যেন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। সে বলিল,—যেই যখন আপনার কাছে আসে, তখনি আপনি তাকে প্রথম উপদেশ দেন, পিতামাতাকে ভক্তি কর্ব্বে। এর তাৎপর্য্য কি? আপনি ত যুবকদের স্বাধীন বুদ্ধিকে খর্ব্ব ক'রে দিচ্ছেন। পিতামাতাকে প্রণাম করা না করা ত আমার ইচ্ছাধীন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতামাতার কাছে তোমার কত ঋণ, তা ত' তুমি জান না! তাই এই প্রশ্ন কচ্ছ, তাই এমন সব কথা বল্‌ছ। কারো পিতামাতা হয়ত নিজ পুত্রকন্যাকে স্বচ্ছল সংসারের অক্লেশ আরাম দিতে পারেন নি, তাতে তাঁদের ঋণ অস্বীকার করার যুক্তি হয়

না। তোমার শরীরের ও মস্তিষ্কের প্রায় সবগুলি গুণই তুমি পেয়েছ তাঁদের কাছ থেকে। তোমার মনের প্রাথমিক স্নেহ-দয়া-মায়া ত তাঁদের কাছ থেকে হয়েছে সংক্রামিত। পিতামাতার যেখানে যোগ্যতার অভাব দেখ্‌ছ, সেখানে তাঁদের উপরে দোষ না চাপিয়ে, নিজের অতীত জন্মের কর্ম্মগুলির কথা চিন্তা কর। তোমার কর্ম্ম তোমাকে নির্দ্দিষ্ট বংশে নির্দ্দিষ্ট গর্ভে ও ঔরসে এনে ফেলেছে। তাঁদের অযোগ্যতা ত তাঁদের কর্ম্মজ, কিন্তু তুমি যে তাঁদের ঘরে এসে পড়েছ, এটাও তোমারই নিজ কর্ম্মফল। অদৃষ্ট নয়, তোমার স্বকৃত কর্ম্মেরই এটা জলজ্যান্ত পরিণতি। সুতরাং পিতামাতার নিন্দায় মুখর না হ'য়ে তাঁদের কাছে যেটুকু ভাল পেয়েছ, তার জন্য হও কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও মহৎ কর্ব্বে। কৃতজ্ঞতা মনুষ্য চরিত্রের অনুপম অলঙ্কার, কৃতজ্ঞতা মানুষের কৃতিত্বকে করে অপূর্ব্ব মধুর, কৃতজ্ঞতা মানুষের অন্য দশটা অপূর্ণতার করে সহজ অনুপূরণ। জগতে তুমি যাই হও না কেন, অকৃতজ্ঞ হ'য়ো না। এমন পাপ আর কিছুতে নেই।

নামজপে নিষ্ঠা

জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নামজপে নিষ্ঠা খুব বড় একটা সম্পদ। নিষ্ঠা মানে একই নামে লাগিয়া থাকিবার দৃঢ়তা, বহু নাম হইতে রুচিকে টানিয়া আনিবার সফলতা আর প্রত্যহ নামজপের নির্দ্দিষ্ট সময়টীকে কঠোর নিয়মে রক্ষা। এই নিষ্ঠা যার আছে, পাথর খুঁড়িয়া সে প্রস্রবণ-ধারাকে বাহির করে এবং প্রাণ ভরিয়া সুশীতল বারি পান করিয়া জীবনের সকল পিপাসা পরিতৃপ্ত করে। নাম-সাধনায় বীর্য্য চাই, বীর্য্যবানই সাফল্য লাভ করে।

ভগবচ্চরণে অন্য কোনও প্রার্থনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তাঁহার চরণে যদিই কোনও মিনতি জানাইতে হয়, তবে মাত্র ইহাই জানাও,—'হে ভগবান্, নামে রুচি দাও, নামে মতি দাও, নামে নিষ্ঠা দাও, নামে বীর্য্য দাও, নামের সেবায় জীবন-পাত করিবার ধৈর্য্য দাও।" নামকে শক্ত করিয়া ধরিতে জানিলে ভগবানকে পাইতে আর কতক্ষণ? ভগবানের নামকে জীবনের পরম আশ্রয় বলিয়া জানিও এবং পরিপূর্ণ পৌরুষ সহকারে নামেতে আত্ম-নিমজ্জন করিও। নামে যে যতখানি ডুবিয়াছে, সে ভগবানকে ততখানি পাইয়াছে জানিও। নামের অকপট সেবককে পূজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিও, ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত জানিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় রূপে গ্রহণ করিও। নিষ্ঠাবান্ নাম-সেবকের সঙ্গ তোমার নিষ্ঠাবর্দ্ধন করিবে।"

হাবলাউচ্চ, ত্রিপুরা
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

পিতৃ-মাতৃ-সেবা পরম ধর্ম্ম

ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া পুপুন্‌কী আশ্রমে যোগ দিতে চাহেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা হয় না। তোমার পিতামাতা সর্ব্বস্ব পণ ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'রে একটার পর একটা ক্লাসের পড়ার খরচ তোমার চালিয়েছেন। আজ তুমি একটুখানি লেখাপড়া শিখেছ ব'লেই স্বাধীন ভাবে চ'রে বেড়াবার সাহস পাচ্ছ। আজ তোমার সেই বৃদ্ধ পিতা-মাতার মুখের অন্নগ্রাস আমি কেড়ে নিতে পার্ব্ব না। "পিতা স্বর্গঃ,

"পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা হি পরমন্তপঃ",—একথা কেবল মুখের কথাই নয়। "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ",—একথা কেবল বাত্‌কে বাত নয়, এর মধ্যে সত্য আছে। পিতৃসেবা মাতৃসেবা পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে ব্যাহত ক'রে সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া কোনও কাজের কথাই নয়।

অবাধ্যতা ও সন্ন্যাস

একটী যুবক বলিল,—ভারতবর্ষে হাজার হাজার সন্ন্যাসী। আপনি কি বল্‌বেন যে, তাঁরা ভ্রান্ত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাজার হাজার বল্‌ছ কি হে, লাখ লাখ সন্ন্যাসী—সংখ্যা তাঁদের চুয়ান্ন লাখ। তাঁদের মধ্যে কে ভ্রান্ত আর কে অভ্রান্ত, সে বিচার কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে মানুষ আগাগোড়াই মানুষের মত থাকবে, এটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কৈশোরে যৌবনে যে পিতামাতার প্রতি হ'ল অবাধ্য, প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে সে জগতের কল্প মহাকল্যাণ,—এটা অন্ততঃ আমার দৃষ্টিতে পূর্ণ মধুর দৃশ্য নয়। যে সন্ন্যাসী হবে, সে পিতামাতার অনুমতি নিয়েই তা হবে, পালিয়ে নয়। সংসার ত্যাগের আগে সে পিতামাতার মনে সান্ত্বনা দিয়ে যেতে অন্ততঃ সক্ষম হবে যে, সে যা কত্তে যাচ্ছে, তা প্রকারান্তরে পিতৃমাতৃসেবা। সংসারে যে পিতামাতার অবাধ্য হয়েছে, আশ্রমে এসে সে গুরুদেবের অবাধ্য হবে,—অবাধ্যতা এমনই এক দুরন্ত রোগ।

অযোগ্যের সন্ন্যাস

একটী যুবক হতাশ হইয়া বলিল,—তবে আর আমাদের যাওয়া হ'ল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাই বা হ'ল! লেখাপড়া না শিখে আশ্রম-বাসেও সুখ নেই। সেদিন নিত্যগোপাল আমাকে বল্‌ছিল কি, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বৃত্তি পেয়েও সে আর পড়্‌ল না। বৃত্তিটা মাঠে মারা গেল। চখের উপরে দেখ্‌ল সে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিরা চাকরী বাকরী ছেড়ে অভয়-আশ্রমে ঢুকেছেন, সেও ঢুকে পড়্‌ল। কিন্তু বিদ্যার নাই জোর, তাই ডাঃ ব্যানার্জ্জি আর ডাঃ ঘোষ কচ্ছেন নেতাগিরি আর নিত্যগোপাল কচ্ছে অভয়-আশ্রমের অতি নীচ হীন কাজ। এতে তার আত্মগ্লানি এসেছে। অথচ যোগ্যতা যার কম, তার হাতে বড় কাজের ভার ভদ্রলোকেরা দেনই বা কি ক'রে? এখন নিত্যগোপাল ভাবছে ফিরে ঘরে যায়, আবার স্কুলে প'ড়ে, বিদ্যার্জ্জন ক'রে তবে আসবে অভয়-আশ্রমের কাজ কত্তে। কিন্তু দরিদ্রের সন্তান সে, বৃত্তিটি ত আর আসবে না! পড়্‌বে কি ক'রে? যে যেখানে যে কাজেই যাও রে বাবা, পেটে বিদ্যা, মগজে বুদ্ধি, দেহে স্বাস্থ্য নিয়ে যেও। সন্ন্যাস, জনসেবা-ব্রত বা সংসার-ত্যাগ এদের কোনটাই তুচ্ছ কাজ নয় যে, তুচ্ছ লোকগুলির দ্বারা অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। অযোগ্যের সন্ন্যাস ত সমাজের গলগ্রহ-বৃদ্ধির নামান্তর।

পিতৃভাগ্য

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—আপনিও ত সন্ন্যাসী। আপনি কি আপনার পিতার অনুমতি পেয়েছিলেন? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত আপনাকেও কৌশল কত্তে হয় নাই?

অট্টহাস্যে গগন বিদীর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন;—আরে না। কৌশল এক কণাও কত্তে হয় নাই। চুরি ক'রে চিরতরে পালিয়েও আস্‌তে হয় নাই। এমন পিতাই পেয়েছিলাম, যিনি কবি, দার্শনিক, কর্ম্মী এবং সাধক, যিনি নিজের যৌবনে বারংবার গৃহত্যাগ ক'রে যাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমার সরল নিরীহ মায়ের দিকে তাকিয়ে তার বুকে বজ্রাঘাত কত্তে প্রাণের সম্মতি পান নি। তিনি যখন দেখলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বার বার সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন নিজেই ডেকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন, কেন পুত্রের এই দুর্ম্মতি। পিতা-পুত্রে যুক্তি-বিনিময় হ'ল। পিতা বল্লেন,—তেজস্বী মহচ্চরিত্র লোকগুলি সংসার ছেড়ে চলে যাবে আর অর্দ্ধক্লীব দুর্ব্বলেরা বংশবৃদ্ধি ক'রে ক'রে সংসার ছেয়ে ফেল্‌বে,—এটাই কি বাঞ্ছনীয়? পুত্র বল্লে,—পরান্নজীবী দুর্ব্বলেরা সংসার-সংগ্রামের অযোগ্যতা বশতঃ সংসার ছেড়ে চলে যাবে আর এক টুকরা গেরুয়া, একটা ত্রিশূল বা ত্রিদণ্ডী, কয়েকটা রুদ্রাক্ষের মালার প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ডে জগদ্‌গুরু সেজে সেজে ধর্ম্ম নিয়ে অনাচার কর্ব্বে,—এটাই কি বাঞ্ছনীয়? পিতা বল্লেন,—আম্রবৃক্ষে আম্র জন্মে, তার সুমিষ্ট স্বাদে জগৎ তুষ্ট হয়। পুত্র বল্লে,—ইক্ষুতে ফল হয় না, সে নিজেই নিজেকে স্বাদ-লোভীর দশন-নিষ্পেষণের মধ্যে ফেলে দেয়, তার রস আম্ররসের চেয়ে শতগুণ মিষ্টি। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পিতা-পুত্রে এই আলোচনা চল্‌ল। তারপরে পিতা নিজ হাতে পুত্রকে গৈরিক পরিয়ে দিয়ে বল্লেন,—যা তোর নিজ পথে, আমি আপত্তি কর্ব্ব না, তোর সাথে আমি বাদ সাধব না, আশীর্ব্বাদ করি মানুষের মত মানুষ হ। এমন পিতৃভাগ্য বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য কারো ছিল না। তাই ত আজ অনুভব কত্তে পাচ্ছি যে, পিতৃমাতৃ-ভক্তির মত মহদ্‌গুণ জগতে আর নেই।

ভিতরের পচনশীলতাকে ঠেকাও

প্রশ্ন উঠিল,—যাঁদের বাপ-মা তেমন নয়, তারা কি সংসারেই পচে মরবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পচনশীলতার বীজাণু যার মধ্যে রয়েছে, সে সংসারে থাক্‌লেও পচে মরবে, সন্ন্যাসী হ'লেও পচে মরবে। ভিতরের পচনশীলতাকে আগে ঠেকাও। আর সে কাজ কর্ত্তে হ'লেই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হবে পিতৃমাতৃ-ভক্তির। পিতৃমাতৃ-ভক্তি একটা কুসংস্কার মাত্র নয়, নিজ জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে তোমার সকলের আগে এই জিনিষটাই হচ্ছে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

পিতৃমাতৃভক্তি লাভের উপায়

প্রশ্ন।—পিতৃমাতৃভক্তি লাভের উপায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথমে জেনে নাও, তোমার ভিতরে পরমেশ্বর নিয়ত বাস কচ্ছেন। তারপরে জেনে নাও, তোমার পিতামাতার ভিতরেও সেই একই পরমেশ্বর বাস কচ্ছেন। যিনি তোমার ভিতরে, তিনি তাঁদেরও ভিতরে। তোমার এই দেহের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশমান হবার চেষ্টা যেদিন কর্ল্লেন, তার কত আগে থেকে তোমার পিতামাতার দেহের ভিতর দিয়ে প্রকাশমান হবার চেষ্টা তিনি ক'রে এসেছেন। তোমার পিতৃমাতৃদেহের ভিতর দিয়ে পরমেশ্বর নিজেকে প্রকাশিত কর্ব্বার চেষ্টার ফলেই তোমার দেহ পৃথিবীতে রূপ নিল। তুমি তোমার পিতৃমাতৃদেহস্থিত পরমেশ্বরের নিকটে ঋণী, তোমার পিতা-মাতার দেহের নিকটেও ঋণী। মনে মনে ভাব্‌বে, হয়ত অনেক কিছু আশ্চর্য্য সদ্‌গুণ তুমি লাভ কর নি, কিন্তু মনুষ্য-জন্ম লাভই সব চেয়ে

তোমার বড় লাভ। কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর হ'য়েও যদি কেউ মনুষ্য-জন্ম লাভ কত্তে পারে, তা হ'লে তার ফলে সে অতীতের শত জন্মের দুষ্কৃতির কুফল এই এক জন্মের সাধনা দ্বারা বিদূরিত করার সুযোগ নিতে পারে। এই জন্যই মনুষ্য-জন্মকে এমন দুর্লভ ও বাঞ্ছনীয় ব'লে যোগী, ঋষি, মুনিরা বর্ণন করেছেন।—এই ভাবে চিন্তা কত্তে থাক্‌লে তেমন দুর্ব্বৃত্ত ছেলেমেয়েরও মাতৃপিতৃভক্তি জন্মে। জগতের সমস্ত মহচ্চিন্তা ও মহদনুভূতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সচ্চিন্তার ঐকান্তিক অনুশীলনের ফল।

পর-নিন্দায় বিশ্বাস করিও না

অতঃপর লোকনিন্দা সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিন্দা শুন্‌লে তা' বিশ্বাস ক'রো না। কারণ, অনেক নিন্দাই মিথ্যা থেকে উদ্ভূত হ'য়ে থাকে। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও চিরকাল লোকাপবাদে জর্জ্জরিত হ'য়ে সমাজের কাছে ছোট হ'য়ে থাকেন। কত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে যে লম্পট অখ্যাতি সইতে হয়েছে, কত সাধুকে চোর আখ্যায় আখ্যাত হতে হয়েছে, তা' কি জানো? সুতরাং কারো নিন্দা শুনেই অম্‌নি বিশ্বাস ক'রে বস্‌বে না। একটী দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি, তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে। মনে কর,—কোনও গ্রামের কোন এক লম্পট ব্যক্তি বারনারী-গৃহ থেকে ফিরে এসে তার স্ত্রীকে মারধর আরম্ভ করেছে। স্ত্রী বার বার বল্‌ছে,—"যত সব গয়না ছিল, সবই তোমাকে দিয়েছি, আর ত' আমার কিছুই নেই, আর গয়না আমি তোমাকে কোথা থেকে দেব?" মাতাল স্বামী তাতে কর্ণপাত না ক'রে তাকে ক্রমাগত মার্‌ছেই। শেষটায় মাতালটা কর্‌লে কি, স্ত্রীকে লাঠি মার্‌তে মার্‌তে ধরাশায়িনী ক'রে ঠেলে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়ে দরজায় খিল দিল।

স্ত্রী কত অনুনয়-বিনয় কর্লে,—"ওগো অন্ধকারে আমার বড্ড ভয় কচ্ছে, আমাকে ঘরে নাও, এই অবস্থায় লোকে দেখ্‌লেই বা কি বল্‌বে?" স্বামী ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঘরের ভিতর থেকে উত্তর দিল,-"ছোট-লোকের বাচ্চা কোথাকার, গয়না খুলে দিতে পার না, আবার ঘরের ভিতর আস্‌তে চাও। যা অসতি, বেশ্যাবৃত্তি ক'রে খা গিয়ে, আমি আর তোকে পুষ্‌তে পার্ব্ব না, আমার ঘরে তোর স্থান নেই।" শীতের রাত্রি, স্ত্রীটী ভয়ঙ্কর কাঁপছে, শরীরের আহত স্থানগুলি শীতে একেবারে কন্‌কন্ কচ্ছে; তার উপরে এসব বিশ্রী কথা। এতদিন কত কদর্য্য কথাই এই সাধ্বী স্ত্রীটী চুপ ক'রে হজম ক'রেছে, কিন্তু আজ আর তার মন মান্‌ল না। সে ভাব্‌ল,—"স্বামীই যদি স্ত্রীকে বলে বেশ্যাবৃত্তি কত্তে, তবে তার চেয়ে মরণ ভালো।" সঙ্কল্প স্থির ক'রে সে দূরবর্ত্তী এক পুকুরের দিকে অগ্রসর হ'ল। উঠানের কোণেই ছিল একটা পরিত্যক্ত কলসী, সেটা সে কুড়িয়ে নিল। তারপরে কাপড়ের আঁচল দিয়ে কলসীটাকে বেশ ক'রে গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিল। এদিকে রাত্রি দুটোর গাড়ীতে একজন যুবক সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশনে এসে নাব্‌লেন। তিনি কোনও একটা গ্রামে তাঁর এক গৃহী গুরু-ভ্রাতার গৃহে যাবেন। যে পুকুরে মেয়েটী গলায় কলসী বেঁধে ঝাঁপ দিয়েছে, সন্ন্যাসী ঠিক সেই পুকুরের পার দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনি জলের ভিতরে একটা বিরাট্ আলোড়নের শব্দ শুন্‌তে পেলেন। প্রথমতঃ ভাব্‌লেন, বুঝি মাছ। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লেন, এত বড় আলোড়ন মাছের হ'তে পারে না। শেষরাত্রির দিক্‌টায় চাঁদের সামান্য আলো গাছের ডাল-পালা ভেদ ক'রে পুকুরের কতকটা অংশে পড়্‌ছিল। ভাল ক'রে চেয়ে দেখে তাঁর মনে এক ভয়ঙ্কর সন্দেহ হ'ল। প্রাণের মায়া না ক'রে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসী

ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়্লেন, অনেক কষ্টে টেনে সেই স্ত্রীলোকটীকে উপরে তুল্লেন। তুলে দেখেন, মেয়েটীর শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। তখন তিনি হাত-পা টেনে এবং গুটিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা আরম্ভ কর্লেন। সন্ন্যাসীর সবল হস্তের চাপে মেয়েটীর হাতের পায়ের অনেক জায়গায় সন্ন্যাসীর হাতের স্পষ্ট স্পষ্ট দাগ প'ড়ে গেল। কিন্তু শ্বাস ফিরে এল না। তারপর সন্ন্যাসী মেয়েটীর নাসারন্ধ্রে মুখ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা কর্লেন, কিন্তু তাতেও ফল হ'ল না। তখন তিনি দেখ্লেন, মুখের মধ্য দিয়ে বাতাস না ঢুকাতে পার্লে সম্ভবতঃ আর শ্বাস ফিরে আস্বে না। কিন্তু সন্ন্যাসী হ'য়ে কি ক'রে স্ত্রীলোকের অধর স্পর্শ কর্ব্বেন? সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে, কাম-কাঞ্চন-বর্জ্জনকারী ব্রহ্মচারী হ'য়ে তিনি যে একটা স্ত্রী-দেহের নানাস্থান স্পর্শ করেছেন, এ-টাই প্রচুর জুলুম হ'য়ে গেছে। তার উপরে আবার ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করাবেন কি ক'রে? তিনি এক মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন কিন্তু শেষটায় সিদ্ধান্ত কর্লেন যে, উদ্দেশ্য যখন তাঁর মহৎ, তখন স্ত্রীলোকের অধর স্পর্শ ক'রে তিনি কোনও প্রকারের প্রত্যবায়ভাগী হ'তে পারেন না। তখন তিনি নিজ ঠোঁট্ লাগিয়ে মেয়েটীর ফুস্‌ফুসের ভিতরে বায়ু-চালনা আরম্ভ কর্লেন, তার দুই গাল চেপে ধ'রে ঠোঁট দুটোর ভিতর দিয়ে ফুঁ দিয়ে বায়ু চালাতে চালাতে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস এল, কিন্তু সন্ন্যাসীর দাঁতের আঘাত লেগে মেয়েটীর ঠোঁটে দু-একটা জায়গা একটু কেটেও গেল। মেয়েটীর জ্ঞান হ'তেই সন্ন্যাসী বল্লেন,—"মা, আত্মহত্যা মহাপাপ, কেন তুমি এমন কাজ কত্তে গেলে? এখন বল, তোমার কোন্ বাড়ী, আমি তোমাকে সেখানে দিয়ে আসি।" মেয়েটী বল্লে,—"বাবা, আমি বড়ই দুঃখিনী, আমার মরাই উচিত ছিল, কেন আপনি আমাকে রক্ষা

কর্লেন ? আমি আর ঘরে যাব না,—বাঁচিয়েছেন যখন, তখন আমাকে আপনার সঙ্গেই নিয়ে যান।" সন্ন্যাসী বল্লেন,—"না মা তোমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বল, কোন্ বাড়ী তোমার।" অনেকক্ষণ কথা কাটা-কাটির পর শেষটায় মেয়েটী বল্লে,—"আপনি যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে না যান, তবে আমি চীৎকার ক'রে লোক জড় কর্ব্ব এবং আপনার সম্পর্কে আমি এমন ভয়ঙ্কর অভিযোগ কর্ব্ব, যাতে মনুষ্য-সমাজে আপনি আর মুখ দেখাতে পার্ব্বেন না।" সন্ন্যাসী বিপদ গণ্লেন, তিনি ভীত হলেন,—শেষটায় মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন। কিন্তু নিজে তিনি একজন যুবক, এ অবস্থায় এই সময়ে একটী যুবতী মেয়ে-মানুষ নিয়ে তিনি কি ক'রে গুরুভ্রাতার ঘরে গিয়ে উঠেন ? অগত্যা তিনি ফিরে ষ্টেশনের দিকেই অগ্রসর হ'লেন। ভাব্লেন,—"সহরে গিয়ে কোনও অনাথা-আশ্রমে মেয়েটীকে রেখেই চ'লে আস্‌বেন। ভিজে কাপড়ে স্ত্রীলোকটী শীতে কাঁপ্ছিল, তাই তিনি তাকে নিজের একখানা শুষ্ক গেরুয়া কাপড় পর্‌তে দিলেন এবং গায়ে দেবার জন্য একখানা কম্বল দিলেন। এদিকে মদের ঝোঁক কমে আস্‌তেই সেই মাতাল স্বামীর মনে হ'ল যে, স্ত্রীটাকে সারা রাত বাইরে ফেলে রাখা ভাল হচ্ছে না। তাই সে দরজা খুলে বাইরে এল। কিন্তু চেয়ে দেখে, স্ত্রী নেই। খুঁজতে আরম্ভ কর্ল্ল, কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। তখন ভাব্লে যে, বেশ্যাবৃত্তি কর্ব্বার কথা বলাতে বোধ হয় রাগ ক'রে নিকটবর্ত্তী গ্রামে তার পিত্রালয়ে চলে গেছে। স্বামী ত' সেই গভীর রাত্রিতেই স্ত্রীর বাপের বাড়ী গিয়ে হাজির। কিন্তু সেখানেও তাকে পেল না! তখন সদলবলে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হ'ল। ষ্টেশনে এসে দেখে স্ত্রীলোকদের বসবার ঘরে গেরুয়া কাপড় প'রে একটী মেয়ে বসে আছে। হাত-পা দেখেই

তার সন্দেহ হ'ল। হঠাৎ মাথার কাপড় টেনে নিতেই সে দেখলে, এ তার স্ত্রী-ই বটে, কিন্তু তার ঠোঁটে দুই তিন জায়গায় দংশনের চিহ্ন, হাতেও অনেক জায়গায় বল-প্রয়োগের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। আর যাও কোথা ? তখনি বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই মিলে সাধুকে লম্পট ব'লে ধ'রে খুব মারলে এবং অপবাদ রটনা হ'ল যে, গভীর রাত্রিতে স্বামীটী তার ঘরের মধ্যে ছিলেন ঘুমিয়ে আর স্ত্রীটী গিয়েছিলেন বাইরে শৌচ কত্তে, এই সময় অমুক সন্ন্যাসী এ'সে স্ত্রীটীকে একাকী পেয়ে তার উপরে বলাৎকার করেন এবং পরে ধর্ম্মের নামে ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে গেরুয়া পরিয়ে নিজের আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছিলেন।—এ রকম মিথ্যা অপবাদ জগতের অনেক মহাপুরুষকে সহ্য কত্তে হ'য়েছে। কাশীর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে ত' মিথ্যা অভিযোগে জেল পর্য্যন্ত খাটতে হ'য়েছিল। আদালতের বিচারের জন্য জাল প্রমাণ তৈরী কত্তে কূটবুদ্ধি লোকের কতক্ষণ লাগে ?

স্ত্রীলোকের প্রতি উপকার-বিষয়ে কর্ত্তব্য

জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে কি এইরকম অবস্থায় কোনও মজ্জমানা স্ত্রীলোককে জল থেকে উদ্ধার কর্ব্ব না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কর্ব্বে, কিন্তু যতখানি অপবাদ, সবই ঐ পুকুরপারেই পাওয়া ভাল। ষ্টেসনে এসে পাওয়া ভাল নয়। স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে নিয়ে আসাতে যখন সন্ন্যাসীর মনে দ্বিধা জাগ্‌ছিল, তখন তাকে না আনাই উচিত ছিল। অপবাদ হবার ভয়ে যে তিনি বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ কর্ল্লেন, এটাই তিনি দোষ কর্ল্লেন,। সৎকাজ ক'রে যদি অপবাদের সম্ভাবনা জন্মে, তাহ'লে নির্ভয়ে সে অপবাদকে গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু মিথ্যা অপবাদ থেকে বাঁচ্‌বার লোভে বিবেকের বিরুদ্ধে এক চুলও অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

নামই প্রেমের খনি

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধনে বসিবে মনে প্রাণে ইষ্টলাভের ব্যাকুলতা লইয়া। অমনি নামজপ করিয়া গেলে যে ফল, অন্তরে সুগভীর অনুরাগ ও অকপট ব্যাকুলতা লইয়া নাম জপ করিলে তার শতগুণ ফল হয়। ভগবানের কাছে নিয়ত প্রার্থনা জানাও,—'হে ভগবান, এমন করিয়া তোমাকে ডাকিতে শিখাও, যেন এক ডাকে শতবার ডাকের কাজ হইয়া যায়।' সাধন করিতে বসিয়া প্রাণের ভাণ্ডার পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ না করিয়া উঠিবে না। যতক্ষণ তুমি ভগবানের নামে বসিয়া আছ, ততক্ষণই মাত্র তুমি নিজেকে জীবিত বলিয়া গণনা করিও। ভগবানের নাম ভুলিয়া বাঁচিয়া থাকা আর মরিয়া থাকা এক কথা। প্রেম আসিলে কেহ কাহাকেও ভুলিতে পারে না। ভগবানকে যাহাতে না ভুলিয়া যাও, তাহার জন্য অবিরাম তাঁর নাম এমন ভাবে করিতে থাক, যেন আপনা আপনি অপার অসীম অগাধ অনন্ত প্রেমের সঞ্চার হইয়া যায়। নামই প্রেমের খনি। যত গভীরে নামিবে, ততই প্রেম-মাণিক্য অধিক পরিমাণে পাইবে।"

অসুস্থ ও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নামজপ ও ধ্যান

আর এক পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সপ্তম, অষ্টম, নবম মাস গর্ভাবস্থায় শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ

স্ত্রীলোকদের পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে। এই সময়ে মালাজপ চলিতে পারে। সীমা-সংখ্যার নির্দ্দেশ নাই, যতক্ষণ মনঃপ্রাণ না শান্তিতে ভরিয়া যায়, ততক্ষণ নামজপ চলিবে। ধ্যানের কেন্দ্র ভ্রূমধ্যে হইলে যাহাদের এই সময়ে অসুবিধা হয়, তাহারা শয়নকালে নাভিমূলে ধ্যান করিবে। ধ্যানের সহিত জপের অতি নিগূঢ় নিকট সম্পর্ক। ধ্যান মানে লম্বিত জপ, জপ মানে খণ্ডিত ধ্যান,—এই উভয়ের পার্থক্য এইটুকু। স্ত্রীপুরুষ সকলেই অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মেরুহীন মালা জপিতে পারে, তাহাতে দোষ নাই।"

চাঁদপুর
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

অভিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর আসিয়াছেন। চাঁদপুরের স্বদেশ-প্রেমিক উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ঘোষ শ্রীশ্রীবাবামণির বিশেষ অনুরাগী, তাঁহার গৃহে বসিয়া নানা কথা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃতই এদেশে স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। কিন্তু তার উপায় ভিক্ষা নয়। একমাত্র অভিক্ষার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। যখন ত্যাগীদের মনুষ্যত্ব এমন অভ্রভেদী হবে যে, ধনী এসে তাঁদের পদতলে ধন সমর্পণ ক'রে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন, প্রকৃত স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থশালী অর্থ দিতে আস্‌বেন চোরের মত সসঙ্কোচে, ধনগর্ব্বিত অনুগ্রহকারীর মত নয়, তবে সেই অর্থ দিয়ে স্বাধীন ব্রহ্মচর্য্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন দেশে যা সব হচ্ছে, তা ত' দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। হয়ত একটা ঘসা পয়সাই ভিক্ষা করা হ'য়েছে,

আর ভিক্ষাদাতা মনে কচ্ছেন যে, ত্যাগী কর্ম্মীদের বাপ-পিতামহের মাথার টিকী কিনে নিচ্ছেন। ভিক্ষা দিবেন কাণা কড়ি, তাতে আবার শতবার প্রশ্ন,—"হো মশাই, এই পয়সা আশ্রমে না লাগিয়ে যদি আপনি নিজে খান ?" দেশের ত্যাগীরা ভিক্ষা চাইতে যাচ্ছেন ব'লেই ত' কাণা-কড়ি-দাতারও স্পর্দ্ধার অন্ত নেই। কিন্তু এই সব নীচমনা সঙ্কীর্ণচেতা দাতার দানে ত' কোনও মহৎ কাজ হ'তে পারে না! মহৎ কাজে নীচমনা হীনবুদ্ধি সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তির দান এলে, কাজে তামসিকতা প্রবেশ করে। তাই আমার ব্রত অভিক্ষা। কারো যদি কিছু দিতে হয়, শ্রদ্ধায় এসে সেধে দিয়ে যাবেন, ভালবেসে নিজের গরজে এসে দান কর্ব্বেন। আমি কেন আবার চাইতে গিয়ে সময়ের অপচয় কর্ব্ব, আমি কেন আবার প্রার্থনা জানাতে গিয়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রমাণিত কর্ব্ব ? কারো কাছে যদি কিছু চাইতে হয়, তবে সে হচ্ছে আমার বাহুবল, যে বাহুবল ভগবান দিয়েছেন দয়া ক'রে।

ভারতের অবনতির কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি* বলিলেন,—সমগ্র জাতি আজ অবসাদ-জড়তা-গ্রস্ত, কোনও দুর্লভ বস্তু লাভের তার যেন ক্ষমতাই নেই। এর মূল কারণ হচ্ছে বাহুবলে অবিশ্বাস, আত্মশক্তি:ত অনাস্থা। দৈবের ঘাড়ে চেপে আমরা স্বর্গে যেতে চাই, পায়ে হেঁটে যুধিষ্ঠিরের মত হিমালয়ের চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গতে চাই না। অভিক্ষা-ব্রতের যদি কোনও Mission (মহদুদ্দেশ্য) থাকে, তবে তা' হচ্ছে, এই দৈবরূপী ভূতকে পুরুষকাররূপী মন্ত্রপূত সর্ষপের বলে জাতীয় জীবনের ঘাড় থেকে নামানো।

---

* শ্রীশ্রীবাবাকে এখন পৃথিবীজোড়া সকল স্থানের ভক্তেরাই "বাবামণি" বলিয়া ডাকেন। এই জন্য ইহার পর হইতে "শ্রীশ্রীবাবা" স্থলে আমরা "শ্রীশ্রীবাবামণি"ই লিখিব। অঃ সঃ।

নিষ্কলুষ জীবসেবা

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া ডাকাতিয়া নদীর তীরে বসিলেন। ধীরে ধীরে দুই একটি পরিচিত যুবক আসিয়া জুটিলেন। আলাপ চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবসেবাকে লক্ষ্য কর, নারীর সেবা বা নরের সেবা নয়। নরনারী-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীব-হিতসাধনের মহৎ ব্রতের মধ্যে তোমার সকল সেবা স্থান গ্রহণ করুক। পুরুষ যখন নারীহিত-চিন্তায় নিজেকে নিবিষ্ট করে, তখন যদি তার নারীত্বের দিকটা বাদ দিয়ে তার হিতচিন্তা না কত্তে পারে, তা হলে মনের অজ্ঞাতে অনেক দুর্ব্বলতা ভিতরে এসে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করে। নারীর পক্ষেও তাই। নারী যখন পুরুষের নরত্বের দিকটা বাদ দিয়ে তার হিতচিন্তা কত্তে অক্ষম হয়, তখন সে অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতে নিজেকে লালসার জালে আবদ্ধ করে। নারী ও নরের পার্থিব সম্পর্ক এতই অকাট্য আর নারী ও নরের মধ্যে জৈব আকর্ষণ এতই স্বাভাবিক যে, নারীকে নারীত্বের ঊর্দ্ধে, নরকে নরত্বের ঊর্দ্ধে নিয়ে ভাবতে না পারলে জনহিত-সাধন কত্তে গিয়েও কলুষের পথে এসে যেতে পার।

কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সংমিশ্রণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোককে পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখবার বা পুরুষকে দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টাটা ব্যর্থ হবেই। এমন একটা সময় দেশে আস্‌বেই আস্‌বে, যখন দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণকর নানাবিধ কর্ম্মের ক্ষেত্রে বহু অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকেই একত্র অবস্থান কত্তে হবে, অবাধভাবে মিশ্‌তে হবে।

চেনা-পরিচয় থাকা বা আত্মীয়তা থাকা ত দূরেরই কথা, যে পুরুষ যে নারী পরস্পর পরস্পরকে আগে কখনো দেখেনি, দেশ জাতি জগতের প্রয়োজনে তাদের দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি একত্র অবস্থান কত্তে হতে পারে। রোগাতুরা পৃথিবীর ক্ষুধাতুরা সভ্যতা তার বর্ব্বর অভিযানে কখন কোন্ দেশে কোন্ অপ্রত্যাশিত বিপত্তির সংঘটন ক'রে নারী ও পুরুষকে দীর্ঘকালের জন্য একত্র এক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে বাস কত্তে বাধ্য করে, কে তা জানে? সকলের তৈরী থাকা দরকার।

ব্যভিচার দমনে সাধন-বলের আবশ্যকতা

একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু তাতে ব্যভিচার আসবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্ম-সম্মান-জ্ঞান তাদের রক্ষা কর্ব্বে আর সাধন-বল থাক্‌লে ব্যভিচার দশ-যোজন দূরে পালাবে।

সমাজে সাধন-বল-সম্পন্ন নারীর স্থান

প্রশ্ন।—কার সাধন-বল? নারীর না পুরুষের?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উভয়ের, বিশেষ ভাবে নারীর।

প্রশ্ন।—নারীকে এর মধ্যে বিশেষ কচ্ছেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি। তার কারণ দুইটী। প্রথম কারণ এই যে, স্বভাবতঃ নারীর কাম-দমনের ক্ষমতা পুরুষের চাইতে বেশী। এর সঙ্গে যদি সাধন-বল মিশ্রিত হয়, তাহ'লে তার প্রভাব পুরুষ-চিত্তের বহ্নিকে অজ্ঞাত-সারেই নিবিয়ে দিতে সমর্থ হবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নারী হচ্ছে মূর্ত্তিমতী আকর্ষণী-শক্তি। রূপ বা গুণ না থাক্‌লেও স্বভাবের শক্তিতেই পুরুষকে সে তার দিকে টেনে আন্‌তে পারে। তার ভিতরে যদি সাধন-

বল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে তার আকর্ষণী-শক্তি মোহিনী-মায়া বিস্তার না ক'রে পুরুষের চখে জ্ঞানাঞ্জনী শলাকার কাজ কর্ব্বে। নারী তখন পুরুষের কাছে মদন-মদিরা না হ'য়ে মৃত-সঞ্জীবনী হবে, নারী তখন পুরুষের মৃত্যুর কারণ না হ'য়ে গুরু-স্থানীয়া হবে, অমৃতত্বের পথ-প্রদর্শিকা হবে। একটী তপস্বিনী নারীকে কেন্দ্র ক'রে হয়ত সহস্র সহস্র নরনারী পরার্থে প্রাণদানে বদ্ধপরিকর হবে।

নারীজাতিকে সাধন-বল-সম্পন্ন করিবার উপায়

প্রশ্ন।—সমগ্র নারীজাতিকে সাধন-বল-সম্পন্ন করা কি কখনও সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সমগ্রকে না হোক্, অধিকাংশকে করা সম্ভব।

প্রশ্ন।—উপায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিদেশী ভাবে ভাবিত মেয়ে স্কুল-কলেজগুলির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির আওতায় না এসে সমগ্র দেশব্যাপী স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কাজ খুব সোজা নয় কিন্তু মোট সংখ্যার শতাংশের একাংশ বিধবা মায়েরাও যেদিন প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন, সেদিন এই অসম্ভব সম্ভব হবে কটাক্ষের ইঙ্গিতে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে বালিকাদের ভিতরে ধর্ম্মের নূতন এক বন্যা আন্‌তে হবে। ইংরেজী-শিক্ষার ফলে সমাজের মধ্যে চরিত্রগত পবিত্রতার বিরুদ্ধে যে এক ভোগ-মূলক দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তার শিকড় যাতে একটীও গ্রাম্য বালিকার মনের ভিতরে গিয়ে শাখা ছড়াতে না পারে, তার জন্য জাতীয়-বৈশিষ্ট্য-বোধের তাজা চূণ তাদের মনের জমিতে মুক্ত হস্তে ছড়াতে হবে। বাকী কাজটুকু ঈশ্বরাদিষ্ট যোগীরা কর্ব্বেন।

ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও নাদ-সাধন

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ ক'রে নাদের সাধন কি করা যায়? ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে আর নাদ-সাধনে কি একটা পরোক্ষ-বিপরীত-ভাব নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, তা নেই। এমন কি প্রত্যক্ষেও নেই। ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র ভর্গোর অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ জ্যোতির ধ্যান-সঙ্কল্প। জ্যোতি মানে রূপ, মানে আলো। আলো মাত্রেরই একটা ধ্বনি আছে। স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্ম-জ্যোতির স্বয়ংসিদ্ধ ধ্বনি হচ্ছে প্রণব। আর প্রণব হচ্ছে সকল নাদের আদি, সকল নাদের অনাদি, সকল নাদের অন্ত, সকল নাদের অবধি, সকল নাদের প্রাণ এবং সকল নাদের সমন্বয়। সুতরাং জ্যোতির্ধ্যানের সঙ্কল্প হ'লেও ব্রহ্মগায়ত্রী নাদ সাধনারই ভূমিকা মাত্র। তাই ব্রহ্মগায়ত্রী জপের পরেই তুমি ওঙ্কারজপ আরম্ভ ক'রে দিতে পার। শুধু পার বল্‌বই বা কেন। ব্রহ্মগায়ত্রী জপই ত কচ্ছ ওঙ্কার-সাধনায় এর পরক্ষণেই নেমে যাবে ব'লে।

শ্বাস বড় না নাম বড়

একজন প্রশ্ন করিল,—শ্বাস বড় না নাম বড়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ডাল বড় না ভাত বড়, বল্‌তে পার? ডাল দিয়ে মেখে ভাত রুচিকর হয়, বলকরও হয়। অমনি নাম-সাধনা না ক'রে শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম করলে নাম তেমনি রুচিপ্রদ হয়, সুপথ্য হয়। যে ডালের খোঁজ জানে না, সে কি অমনি ভাত খায় না? তাতে পেট ভরে না? নামই আসল, শ্বাস তার সাধনের সহযোগী মাত্র। শ্বাসকেই প্রধান বলতে গিয়ে এদেশে শ্বাস-প্রশ্বাসের অনেক রকমের

কসরতের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নামহীন হঠযোগ শুষ্ক ও নীরস ব'লে আস্তে আস্তে লোকে তা ছেড়েই দিল। এমন কি শেষে একদল সাধক বলতে লাগলেন যে, শ্বাসযোগ কলিযুগের জন্য নয়, কলির হচ্ছে কেবল নামজপ, নাম-কীর্ত্তন আর নামানুস্মরণ।

শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের আদি প্রচারক কে?

প্রশ্ন।—শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের আদি প্রচারক কে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ প্রশ্নের জবাব হয় না। জবাব দিতে পারাও যায় না। জবাব দিতেই হবে, এমন হলে বল্‌তে হয়, যিনি জীবকে শ্বাস দিলেন, আর নামের শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয় দিলেন, সেই অনাদি পরমেশ্বরই শ্বাস-যোগের আদি। শব্দ মাত্রই ব্রহ্ম, শ্বাসের শব্দও ব্রহ্ম। কেউ কেউ নিজ শ্বাসের শব্দের মধ্যে ব্রহ্মনামের ধ্বনি শুন্‌তে পেলেন, পেয়ে নিজ অভিনিবেশকে প্রগাঢ়তর ক'রে কর্লেন তাতে নিয়োগ। এর ফলে দিব্য অনুভূতি এল। এর ফলে তিনি শিখলেন, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-সাধনের কৌশল। আমরা আমাদের কচি কৈশোরে গুরু-জনদের মুখে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর কথা শুনেছি। সব লোকেই বল্‌ত, তিনি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের উপদেশ দেন। তারপরে প্রতিবেশী এক সাধু ব্যক্তি নিত্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ উপলক্ষে প্রায়ই বিজয়কৃষ্ণের নানা উপদেশ পাঠ কত্তেন বা শুনাতেন। তাই থেকে আমরা জানলুম যে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ এক আশ্চর্য্য কৌশল। শিক্ষিত সমাজে শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের সংবাদটা বিজয়কৃষ্ণই ব্যাপক ভাবে প্রচার করেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে দেখি, অতি নিম্নস্তরের বাউল, আউল, ফকীর সবাই

কোনও না কোনও ঢং-এর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামজপ কচ্ছে। একটা মসজিদের বারান্দায় বসে সন্ধ্যার সময়ে মনে মনে নামজপ কচ্ছি, দেখি যে, ভিতরে একদল মুসলমান নিজেদের নমাজ সেরেই শ্বাসে শ্বাসে বিরাট শব্দ করে করে আল্লা আল্লা জপ্‌ছে। এঁরা একে বলেন নাম টানা। অর্থাৎ শ্বাসে নাম টানা। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সাধুদের কার যেন লেখায়, লেখাটা হয়ত ষোড়শ শতাব্দীর, পড়েছিলাম,—breathe God,—ঈশ্বরকে শ্বাসের বায়ুরূপে গ্রহণ কর। কথাটা তিনি আলঙ্কারিক অর্থে বলেছিলেন না আক্ষরিক অর্থে বলেছিলেন, বোঝা কঠিন। তবে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করা যে অনেক কালের জিনিষ, এ ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে। অনেকে মনে করেন, নাথপন্থী যোগীরা এই অপূর্ব্ব কৌশলের আবিষ্কারক। কেউ মনে করেন, তারও আগে শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং নাথপন্থী যোগীরা তাঁদের কাছ থেকে এবং তাঁদের অনেক পরে এই কৌশল শিখেন।

দুই গুরু হইলে কি কর্ত্তব্য ?

প্রশ্ন।—একজন আমাকে ভগবানের একটী নামে দীক্ষিত করেছেন। আর একজন আমাকে সেই নামটীই শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপের কৌশল বলে দিলেন। আমার এই দুই গুরুর মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গুরু যখন দুই হবেন, তখন গুরুর গুরু পরমেশ্বরকে গুরু ক'রে পথ চল। নইলে মিথ্যা দ্বন্দ্বে, বৃথা সংশয়ে, অলীক আশঙ্কায় দিন কাটাতে কাটাতে জীবন মাটি হয়ে যাবে।

ভগবানে লগ্ন হও

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসল সম্বন্ধ তোমার ভগবানের সঙ্গে। মন দিয়ে তাঁর সঙ্গে লগ্ন হও। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর সঙ্গে লগ্ন হও। অহঙ্কার দিয়ে তাঁর সঙ্গে লগ্ন হও। চিত্ত দিয়ে তাঁর সঙ্গে লগ্ন হও। সর্ব্বস্ব দিয়ে তাঁর সঙ্গে লগ্ন হও। তোমার তুমিত্বের যত প্রকারের আকার, বিকার, প্রকাশ, প্রমোদন, সঙ্কোচ, বিস্তার আছে, সব কিছু দিয়ে তাঁর সঙ্গে লগ্ন হও। তোমার প্রয়োজন ভগবানের সঙ্গে লগ্ন হওয়া,—কয়জন গুরু এসে তোমাকে কখন সাহায্য করে তোমাকে কিনে নিলেন, তার বিচার করে করে সময় নষ্ট করো না। জগতে অনন্ত কোটি নরনারীর কাছে তোমার ঋণ। সকলের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ কত্তে গেলে তোমার সাধ্যে বা পরমায়ুতে কুলুবে না। তাই ভগবানে একান্ত ভাবে লগ্ন হয়ে যাও আর তাঁকে বল,—"হাজার লোকের ঋণ শোধের আমার ক্ষমতা নেই প্রভু, তুমি আমার হ'য়ে সকলের ঋণ শোধ করে দাও।"

চাঁদপুর
১লা পৌষ, ১৩৩৪

জ্ঞানের উৎস

প্রাতঃকালে জনৈক দূরাগত ভদ্রলোক আসিলেন। সমাগত কাহারও মুখে তিনি শুনিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি আকুমার ব্রহ্মচারী হইয়াও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"অবিবাহিত ব্যক্তি কি করিয়া 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য'

গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হন ? যাঁর সেই বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, তিনি কি করিয়া সেই বিষয়ে উপদেশ দেন ?"

শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মৌনী থাকিবেন। তিনি শ্লেটে লিখিয়া দিলেন,—"স্থির মন ও ভগবৎ-সমর্পিত বুদ্ধির নিকটে বিশ্বের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। তাই স্থূল বিষয় ভোগ না করিয়াও যোগী সকল জ্ঞান লাভ করেন। পরন্তু অস্থির চঞ্চল মন লইয়া লোভী গৃহী নিয়ত বিষয় উপভোগ করিয়াও ভোগের প্রকৃত বিজ্ঞানে অন্ধ থাকে। প্রত্যক্ষ ভোগও স্থূলাসক্ত ব্যক্তিকে অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন রাখে, অহরহ বিষয়-ভোগ করিয়াও সে বুঝিতে পারে না যে, কি সে করিল, পরন্তু সর্ব্ববিধ ভোগ ত্যাগ করিয়াও ব্রহ্ম-পদে সমর্পিত-চিত্ত ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ ও অখণ্ড জ্ঞান আহরণ করেন।"

আস্তিক ও নাস্তিক

বৈকালবেলা শ্রীশ্রীবাবামণি জুবিলী স্কুলের হলে বসিয়া আছেন, একটী কলেজের ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে শত শত theory (মতবাদ) দেখে একেবারে নাস্তিক হ'য়ে উঠেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানে, এই সব theory (মতবাদ) যে আজগুবি, মিথ্যা, এই রকম মনে কচ্ছ। একে নাস্তিক্য বলে না। এইগুলি সব মিথ্যা হ'লে হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে কিছু আছে, তা' ত' তুমি মান্‌ছ ? বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতির দ্বারা ব্যাখ্যাত দার্শনিক মতবাদও মিথ্যা হাতে পার, কিন্তু যথার্থ সত্যের অস্তিত্ব তাতে অসিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি সত্যেরও অস্তিত্ব মানে না, তাকেই বলা চলে নাস্তিক।

ব্রহ্মের অস্তিত্ব

প্রশ্ন।—আমার ত' মনে হয়, ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অর্থাৎ ব্রহ্ম বল্‌তে তুমি একটা defined (সংজ্ঞাযুক্ত) কিছু মনে কচ্ছ। তাই তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার সংশয়ের অবকাশ হচ্ছে। কিন্তু ব্রহ্ম বল্‌তে প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝ্‌তে হবে Truth (সত্য) কে, unqualified, unmodified, unlimited truth (অসংজ্ঞিত, অখণ্ডিত, অসীমিত সত্য) কে। ঈশ্বর আর ব্রহ্ম এই দুটো কথাকে একটু পৃথক্ ভাবে বুঝ্‌তে হবে। 'ঈশ্বর নাই'—এই কথাটাই যদি হয় The whole truth (পূর্ণ সত্য), তাহ'লে জান্‌বে, ঈশ্বরের এই অনস্তিত্বটাই ব্রহ্ম। "ব্রহ্ম" শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে "সত্যম্", ভগবান বা ঈশ্বর নয়।

মীমাংসার পথ তর্ক নয়

প্রশ্ন।—বিভিন্ন পন্থীর মতবাদ যে মনকে গুলিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু রসগোল্লা মিষ্টি কি তেঁতো, টক্ কি ঝাল, তার মীমাংসা তর্ক দিয়েও হবে না, কিলাকিলি ক'রেও হবে না। হবে শুধু রসনায় আস্বাদন ক'রে। শত শত বিভিন্ন মতবাদ দেখেও তোমার ভড়্‌কে যাবার কোনও দরকার নেই। এগুলি হয়ত সবই সত্য, হয়ত সবই মিথ্যা। অথবা কতকগুলি সত্য এবং কতকগুলি মিথ্যা। এই সব মতবাদকে তাদের ভাবে থাকৃতে দিয়ে তুমি স্বাধীন চেষ্টায় আগে রসগোল্লার প্রত্যক্ষাস্বাদন ক'রে নাও। 'পরের মুখে ঝাল খেয়ে তুই ডুবিস্ না অতলে।'

মীমাংসার পথ রসাস্বাদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ হয়ত বলবেন, "রসগোল্লা তেঁতো, কেন না, তিনি দেখেছেন, ময়রা এক নিমগাছের তলায় ব'সে রসগোল্লা

তৈরী কচ্ছিল। নিম যদি রসগোল্লায় নাই লাগ্‌বে, তাহ'লে ময়রা নিমতলায় বস্‌বে কেন? আচ্ছা মশাই, নিম কি তেঁতো নয়?" আর একজন বল্‌বেন,—"ওসব বাজে কথা,—রসগোল্লা হচ্ছে ঝাল। কেন না, আমি নিজ চক্ষে দেখ্‌লাম, ময়রার ছেলে বাপের ডাক শুনে এক ঝুড়ি কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এসে হাজির। লঙ্কা দিয়েই যদি রসগোল্লা না তৈরী হবে, তবে এত লঙ্কার আমদানীর প্রয়োজন কি ছিল? কি মশাই, এখন কথাটি বলছেন না কেন? লঙ্কা কি বাস্তবিকই ঝাল নয়?" তৃতীয় ব্যক্তি বল্‌বেন,—"ওসব ছেলেমানুষী অনুমান মাত্র,—আমি যা বল্‌ছি তাই সত্য। কারণ, আমি স্পষ্ট দেখ্‌লাম, ময়রার স্ত্রী উনানের পাশখানটায় ব'সে আধমণ তেঁতুলের বীজ ছাড়াচ্ছে। নিশ্চয় তেঁতুল রসগোল্লার প্রধানতম উপাদান। ওকি মশাই, পালিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? তেঁতুল কি টক্ নয়?" এই রকমই চলেছে মতবাদের কলহ। সেইদিক মন দিলে তোমার চল্‌বে কেন? রসগোল্লার দাম ত' চার পয়সা! এই চার পয়সা সদ্‌গুরু তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন। একটু কষ্ট ক'রে বাজার পর্য্যন্ত হেঁটে গেলেই হয়। এইটুকু খাটুনি তোমাকে খাট্‌তে হবে। পয়সা চারটী দিলেই রসগোল্লা তুমি স্বয়ং আস্বাদন কত্তে পার্ব্বে, তর্কাতর্কি ক'রে রসগোল্লার প্রকৃত স্বাদ-নির্ণয়ের চেষ্টা কত্তে হবে না।

সাধনে বাধা

প্রশ্ন।—কিন্তু বাজারে যাবার অর্দ্ধপথেই যদি প্রচণ্ড বাধা উপস্থিত হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হোক্। বরং অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য অবরুদ্ধ হ'তে পারে এই ত'? কিন্তু পয়সা চারটী হাত-ছাড়া ক'রো না।

প্রশ্ন।—কিন্তু প্রচণ্ড বিরুদ্ধ অবস্থায় প'ড়ে যদি পিছিয়েই পড়ি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ক্ষতি কি ? কাপড়ের খোঁটে পয়সা চারটা বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে নিও। বিপদ যতই হোক্, রসগোল্লার দাম হাতছাড়া করা হবে না। বল্‌তে হবে—

আসুক গভীরা রজনী,
আমি ভয় ত' করিনা তারে।
নাম যে আমার পরম সঙ্গী
জপিব তা বারে বারে।

সাধনে অবিশ্বাস

প্রশ্ন।—যদি পয়সার যাথার্থ্যে অবিশ্বাস হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হোক্! অবিশ্বাস দিয়েইত' বিশ্বাস তার প্রতিষ্ঠা পায়। পয়সাগুলি জাল কিনা, তা' ত রসগোল্লার দোকানে গিয়ে পৌছুলেই প্রমাণ হবে। প্রমাণ না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পয়সাগুলি হাত-ছাড়া ক'রো না এবং উদ্যমহীন হ'য়ো না। বিচারালয়ে দেখ্‌ছ ত' যে, আসামীর বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে পূর্ণ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাকে হাজতখানায় কয়েদ করে রাখা হয় ?

ভগবান্ কি ?

অতঃপর শ্রীমান্ মাখনলাল চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান্ কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁকে দিয়ে যার সসীমত্ব খণ্ডিত হয়, তিনিই তার ভগবান। কাঁকে দিয়ে কার সসীমত্ব খণ্ডিত হবে, সেটা নির্ভর করে যার যার নিজের সসীমত্ব সম্বন্ধে ধারণার উপরে। 'মাখন' বা 'উমেশ'

লেবেল দেওয়া সাড়ে তিন হাত দেহটার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি বাস কচ্ছে। সেই শক্তিটা নিয়ত মনে কচ্ছে,—"এই সাড়ে তিন হাত দেহটার মধ্য দিয়ে যেটুকু সামর্থ্যের প্রকাশ হ'তে পারে, ততটুকুই আমার শক্তি। যেইটুকু এই সাড়ে তিন হাত দেহের অতীত, সেটুকু আমার অভাব।" এই ভাবনার ফলে মাখনের মধ্যস্থিত অনির্ব্বচনীয় শক্তি সসীমতা লাভ কচ্ছে। তাই, তার পূর্ণতার জন্য পৃথক্ একটা অসীম শক্তির কল্পনার প্রয়োজন পড়ে। এই অসীম কিছুই 'মাখনে'র বা "উমেশে'র ঈশ্বর। নিজের সসীমত্ব সম্বন্ধে ধারণা প্রত্যেকের এক নয়, নিজের অভাব সম্বন্ধে কল্পনা প্রত্যেকের এক নয়, নিজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে অনুভূতি প্রত্যেকের এক নয়; তাই, সর্ব্বাভাব-পূরণকারীর সম্বন্ধেও সকলের ধারণা এক নয়। তাই, এক এক জনের ভগবান্ এক একপ্রকারের। কারো ভগবান্ কালী, কারো বা দুর্গা, কারো বা যীশু, কারো বা কৃষ্ণ, কারো বা জননী, কারো বা গুরু, কারো বা স্বদেশ, কোনো নারীর পক্ষে বা স্বামী। যে যেমন অবস্থায় যখন পৌঁছাচ্ছে, তখন তার সর্ব্বাভাবপ্রপূরক ভগবান সম্বন্ধে ধারণা তেমনই হচ্ছে। এই সব ধারণা-গুলি একটাও অসত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য মাত্র, These are circumstantial truth. নিজেকে যে যতটুকু অভাবগ্রস্ত ভাব্‌ছে, ভগবান্‌কে সে ততটুকু অভাব-প্রপূরক ব'লে জান্‌ছে। অক্ষম দুর্ব্বল তাঁকে দীনবন্ধু ব'লে ডাক্‌ছে, সক্ষম সবল তাঁকে কর্ম্মফলদাতা ব'লে ভাব্‌ছে। আবার যিনি নিজেকে সসীম ব'লে জানেন না, খণ্ডিত ব'লে ভাবেন না, অপূর্ণ ব'লে অনুভব করেন না, তার পক্ষে আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই, তিনি বলেন, - "সোঽহং", তিনি বলেন,—"আয়নাল্ হক্।" কথায় বলে,—কৃষ্ণ কেমন? উত্তর হচ্ছে,—যিনি যেমন।

বিভিন্ন মতবাদ-সম্পর্কে কর্ত্তব্য

অতঃপর পূর্ব্বোল্লিখিত কলেজের ছাত্রটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিভিন্ন মতবাদ যখন নানা বিরুদ্ধ ভাবের আলোড়নে মনকে ব্যস্ত করে, তখন উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেকটী মতবাদকে ভদ্রলোকের উপযুক্ত সম্মান কর্ব্বে, বৈঠকখানায় বসিয়ে পান-তামাক দিয়ে সমাদর কর্ব্বে, কিন্তু অন্তঃপুরে সবাইকে ঢুক্‌তে দেবে না। প্রাণপণে সাধন কর, আর সাধন-লব্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বলে বিচার ক'রে দেখ যে, কোন্ মতবাদটীর সাথে তোমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কতখানি মিল আছে। যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির মিল নেই, তাকে বৈঠকখানা ছাড়িয়ে আর আস্‌তে দেবে না। যার সঙ্গে কিছু মিল আছে আর কিছু অমিল আছে, তাকে তোমার আলোচনা-কক্ষে নিয়ে বেশ ক'রে পরীক্ষা ক'রে তার অঙ্গ থেকে আপত্তিজনক বেশ-ভূষাগুলি খসিয়ে নাও এবং তোমার নিজ রীতি অনুযায়ী প্রিয় পরিচ্ছদগুলি পরাও, তারপরে অন্তঃপুরে নিয়ে খেতে বস্‌তে দাও, তোমার খাদ্যে, তোমার ভাবে পরিপুষ্ট হবার সুযোগ দাও। প্রথম দিনেই মেয়েদের দিয়ে অন্ন-পরিবেশন করিও না, ছোট ছেলেদের দিয়ে সেই কাজটী সারবে। কয়েকদিন পর্য্যবেক্ষণের পরে যখন দেখ্‌বে আগন্তুক তোমার বাড়ীর স্ত্রীদের উপরে কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে না, কোনও চরিত্র-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে না, কুলস্ত্রীদের মধ্যে বর্ণসাঙ্কর্য্যের কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন স্ত্রীদের দিয়ে পরিবেশন করাবে। আরও কিছুদিন গেলে যখন দেখ্‌বে, প্রকৃতই এই মতবাদের উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়, তখন মেয়েরা ঘোম্‌টা খুলে ব'সে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে

গল্প-স্বল্প, আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টাই করুক না! ক্ষতি কি? কিন্তু এমন বিশ্বাস-ভূমিতে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছাড়া কাউকে আসৃতে দেওয়া হবে না।

বিচার-বিভ্রান্তি নিবারণের উপায়

প্রশ্ন।—কিন্তু আমার পর্য্যবেক্ষণে যদি ভুল থাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাত' থাকৃবেই! তারই জন্য চাই নিরন্তর সাধন। তোমার চক্ষু বা তোমার বুদ্ধি তোমাকে প্রতারিত কত্তে পারে, কিন্তু সাধন-লব্ধ প্রজ্ঞা কাউকে প্রতারিত করে না। শত শত বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রকৃত উপায় হচ্ছে সুতীব্র সাধন। সাধনের ফলে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তার কাছে বিদ্বানের বিদ্যার, তার্কিকের তর্কের, কথকের কথার এবং ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যার ভুলচুক্ ধরা পড়ে। সাধন কর্ বেটারা, সাধন কর্। শুধু তর্ক ক'রে আর কতটা কি কর্ব্বি?

কুমিল্লা
২রা পৌষ, ১৩৩৪

জীবনটা কি সত্য, মিথ্যা, না পরীক্ষা?

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা আসিয়াছেন। দিগম্বরীতলা শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্যের বাসায় উঠিয়াছেন।

বৈকাল বেলা দুইটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কেউ কেউ বলেন,—"Life is real", জীবন সত্য, কেউ বলেন,—"Life is unreal", জীবন মিথ্যা, আবার কেউ কেউ বলেন,—"Life is an experiment with Truth", জীবন সত্যের পরীক্ষা,—এই তিনটা কথার কোন্‌টা সত্য ?

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী জ্যামিতির চিত্র অঙ্কন করিলেন। প্রথমতঃ A B C একটী সমত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া লিখিলেন,—
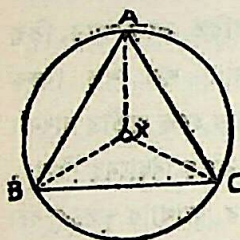
A=Life is real (জীবন সত্য)।
B=Life is unreal, (জীবন অসত্য)।
C=Life is an experiment with Truth. (জীবন সত্যের পরীক্ষা)।

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরস্পর-বিরোধী এই তিনটী কথাই সত্য। যদি যে-কোনও দুইটা vertex (শীর্ষবিন্দু) থেকে একটা ক'রে perpendicular (লম্ব) টানা হয়, তা' হ'লেই centre (কেন্দ্র) বেরিয়ে যায় এবং centre (কেন্দ্র) বেরিয়ে গেলেই একটা common circumference এর (সর্ব্বসামান্য পরিধির) মধ্যে সব বিরোধ সামঞ্জস্যী-ভূত হয়। এই perpendicular (লম্ব) এবং circle (বৃত্ত) আঁকার কাঁটা-কম্পাস হচ্ছে—সাধন। সাধন কর, সব বিরোধ দূর হবে। We should look upon life as real, as unreal and as an experiment—all at the same time. We shall stand on the centre only and not view life from any angle. How to find out the centre ?—By 'Sadhan.' (সত্য, মিথ্যা এবং

পরীক্ষা এই তিনটী দিক্ হইতেই জীবনকে আমরা যুগপৎ দেখিবে। কেবল কেন্দ্রেই দাঁড়াইব, কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট কোণ হইতে জীবনকে দেখিব না। কিন্তু কেন্দ্রস্থ হইবার উপায় কি? তাহা হইতেছে 'সাধন'।)

৩রা * পৌষ
১৩৩৪

বিদ্রোহ ও বশ্যতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি দশটার ট্রেণে কুমিল্লা ত্যাগ করিতেছেন। ট্রেণে একটী পরিচিত যুবকের সহিত দেখা হইল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কুমিল্লার যুবকদের এবার কেমন দেখ্‌লেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ্‌বার সুযোগ পাইনি। কারণ, এই একটী ছেলে ছাড়া কেউ আসেই নি।

যুবক।—আসে নি কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—জান না? ওরা আমায় বয়কট করেছে যে!

যুবক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বয়কট? বয়কটের কারণ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলে,—কারণ হচ্ছে আমার অরাজনৈতিকতা। আর আর বার আমি কুমিল্লায় আস্‌ব শুন্‌লে যারা সাত দিন আগে থেকে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেয়, এবার তারা সবাই পনের দিন আগে থেকে আমার আস্‌বার তারিখ জেনেও ঠিক্ আমার আস্‌বার একদিন কি দুই দিন আগে সহর ছেড়ে পালিয়েছে।

---

* অদ্যকার কথাবার্ত্তার তারিখ ও স্থানের সঠিক নির্দ্দেশ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় নাই।

যুবক বলিল,—কি আশ্চর্য্য!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্চর্য্য নয়, স্বাভাবিক। ওরা যুবক, যৌবনের ধর্ম্ম ওদের মধ্যে থাকবেই। যৌবনের ধর্ম্ম ভালবাসা, যৌবনের ধর্ম্ম প্রাণ দেওয়া। ওরা দেশের কাজে প্রাণ দিতে চাচ্ছে, আর আমাকে চাচ্ছে সঙ্গীরূপে। কারণ, এটাই ভালবাসার ধর্ম্ম। কিন্তু প্রাণ দেওয়া বলতে ওরা যা বোঝে, আমি তা বুঝি নি। এইখানেই বিরোধ। এই বিরোধকে মনে মনে লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ্য বিদ্রোহে যে ফুটিয়ে ওরা তুলতে পেরেছে, এটা ওদের একটা কৃতিত্বেরই পরিচায়ক, প্রাণ-বত্তারই প্রমাণ।

৫ই পৌষ, ১৩৩৪

ভারতের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের দিন

শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরার একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনের সার্থকতার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেদিন কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, কুমারীরা বিবাহ ব্যতীত গর্ভধারণ কর্ব্বে, নারীজাতি সতীত্বের সুমহান্ আদর্শকে কুসংস্কার ব'লে ঘৃণা কর্ব্বে, হীনচরিত্র নর-নারী প্রকাশ্যভাবে জন-সমাজে পূজিত হবে, সন্তানেরা জারজ ব'লে নিজেদিগকে পরিচিত কত্তে লজ্জাবোধ কর্ব্বে না, সেই দিনটা ভারতবর্ষের পক্ষে সব চাইতে দুর্ভাগ্যের দিন।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ দুর্ভাগ্যের কি আর বাকী আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ দুর্ভাগ্যের প্রথম পরিচয় জাতির ললাটে ফুটে উঠ্‌ছে কিন্তু এখনও একে প্রতিরুদ্ধ করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে যায় নি।

দীক্ষা ও সিদ্ধ সাধক

দ্বিপ্রহরে গ্রামবাসী অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁর প্রদত্ত সাধন পরিত্যাগ ক'রে অন্য সাধন গ্রহণের ক্ষমতা আপনার কিছুতেই হয় না, তিনিই সিদ্ধ সাধক। যাঁর প্রদত্ত সাধন পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলেও আবার তাঁরই দত্ত সাধনকেই পরিশেষে আদর ক'রে কণ্ঠহার ক'রে রাখ্‌তে হয়, তিনিই সিদ্ধ সাধক।

অব্যর্থ দীক্ষা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—জগৎ-কল্যাণ-সঙ্কল্প আর স্থির প্রশান্ত মন নিয়ে যখন সাধক-গুরু দীক্ষা দেন, তখন সে দীক্ষা অব্যর্থ। বহুপুরুষ যাবৎ দেশে যে দক্ষিণার লোভে দীক্ষা চলে এসেছে, তারই ফলে শিষ্য-সমাজে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব বেশী হ'তে পাচ্ছে না। দল বাড়াবার বুদ্ধি নিয়ে দীক্ষা দেবার যে ঝোঁক অনেকের দেখা যায়, তাও অনেক ক্ষেত্রে অকুশল সৃষ্টি করেছে।

ছোটলোক কে?

সন্ধ্যার পরে নীচজাতীয় একটী বালককে আদর করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বল্ দেখি বাবা, ছোটলোক কে?

শ্রীশ্রীবাবামণির আদরে জড়সড় হইয়া ছেলেটী বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া চুপটী করিয়া রহিল।

তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার মন থাকে ছোট কাজে, সে-ই হচ্ছে ছোট লোক। ছোট বংশে জন্মালেই কেউ ছোট লোক হয় না। তোমরা সব ছোট কাজ থেকে, নোংরা কাজ থেকে, মনকে ঠেলে উপরে তোল, নীচুতে যেতেই দেবে না।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরকের জীব

তারপর অপর এক ভক্তের দিকে চাহিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনকে রাখ্‌বে ভ্রূ-মধ্যে। জননেন্দ্রিয়ে যেতেই দেবে না। নাভির নীচে যারা মন রাখে, তারা নরকের জীব। যারা কণ্ঠের নীচে মন রাখে, তারা মর্ত্ত্যবাসী। যারা তার উপরে ভ্রূ-মধ্যে রাখে, তারাই স্বর্গের দেবতা। তোরা সব স্বর্গবাসী হ'। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সব স্ত্রী-পুরুষ স্বর্গবাসী হোক্। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের তথা জগতের যত পুত্রকন্যা সব এই স্বর্গবাসীদের ঘরে জন্মাক, নরক-নিবাসী আর মর্ত্ত্যের জীবেরা সব এভাবে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক্।

৬ই পৌষ, ১৩৩৫

ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও উপায়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বিহার-প্রবাসিনী জনৈক স্ত্রী-ভক্তকে একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার অংশ-বিশেষ নিম্নে অনুলিখিত হইল। যথা,—

"প্রতিদিন উপাসনা করিতে বসিয়া এই তীব্র সঙ্কল্প করিবে যে, ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা চাই। লোকে যে কথায় কথায় ভগবানের দোহাই দেয়, সেই ভগবান্ প্রকৃতই যে আছেন, প্রকৃতই যে তিনি ভক্তের যোগচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, প্রকৃতই যে তিনি জ্ঞান-স্বরূপ,

প্রেম-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, তাহা নিজের উপলব্ধির দ্বারা জানা চাই। শাস্ত্রে ভগবানের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে ; বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যে সকল ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যও মিথ্যা নহে ; কিন্তু মুনি-ঋষিরা, সিদ্ধ-যোগীরা যে ভাবে ভগবানকে দেখিতেন, তোমারও সে ভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখা চাই, তাঁহারা যে ভাবে ভগবানের অঙ্গস্পর্শ পাইতেন, তোমারও তেমন পাওয়া চাই, তাঁর সঙ্গে প্রাণের কথা মুখামুখি বসিয়া বলিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়ান চাই। তাঁহাকে তাঁহার সুমধুর নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকিবে, আর বারংবার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিবে যে, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া ছাড়িবে না, তাঁহার পরম-প্রেম-রসের আস্বাদন না করিয়া সাধন-বিরত হইবে না। ব্রহ্মাণ্ড তোমার বিরোধী হউক,—তবু তোমাকে ভগবদ্দর্শন করিতেই হইবে। তাঁহাকে তাঁহার নামের মধ্য দিয়াই পাওয়া যায়, নামের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার বিচিত্র রূপরাশি প্রকাশিত করেন, নামের মধ্য দিয়াই তিনি ভক্তকে তাঁহার সুকোমল অঙ্গের স্পর্শ দেন, সুমধুর ভাষায় সম্বোধন করেন।”

গতি ও গন্তব্য

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত “মুক্তি” পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী লিখিয়া পাঠাইলেন। যথা,—

“সভ্যতার ধ্বজা উড়াইয়া বর্ত্তমান জগৎ তীরবেগে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কোথা যাও ভাই ?” সে বলিল,—“আগে চল্।” প্রশ্ন করিলাম,—“আগে চলিয়া কি লাভ হইবে ?” সে বলিল,—“আগে চল।” পুনরায় প্রশ্ন করিলাম,—“আগে

না চলিলেই বা কি ক্ষতি হইবে?" সে এবারও উত্তর করিল,—"আগে চল্।"

'বর্ত্তমান জগৎ সভ্যতার অঙ্কুশ-তাড়না পাইয়া এমনি করিয়া দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া নিয়ত ছুটিয়াই চলিয়াছে। এ গতির তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অতীতের ঘটনাবলী কি শিক্ষা দিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ লইবার অবকাশ নাই, ভবিষ্যৎ জগতের মূর্ত্তিটাই বা কোন্ সৌষ্ঠবে অলঙ্কৃত হইবে, তাহার কল্পনা করিবার জন্য এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইবার অবসর নাই। শুধু চলাই এই সভ্যতার চিরন্তনী প্রকৃতি; কোন্ লক্ষ্যে তাহার গন্তব্য, কোন্ উদ্দেশ্যে তাহার গতি ইহা সে সম্যক্ বিস্মৃত হইয়াছে।

এইজন্যই সভ্যতা-বিমুগ্ধ পাশ্চাত্য জাতি আজ পায়ে হাঁটিবার জায়গায় রেলগাড়ী করিয়াও প্রাণে শান্তি পাইল না, কণ্ঠ-সঙ্গীতের বদলে গ্রামোফোন আবিষ্কার করিয়াও তৃপ্ত হইল না, চিত্রকরের তুলিকার স্থলে ফটোগ্রাফের চলন করিয়াও খুসী হইল না। সে আরো চায়। দাঁতে চিবাইয়া আহার করিয়া সে তুষ্ট নয়, পারিলে সে মেশিনে খাদ্য চিবাইয়া লয়, সম্ভব হইলে সে মেশিনের সাহায্যে আহারীয় জীর্ণ করে। পাশ্চাত্য পুরুষ আজ সন্তানের জন্ম দিয়া রাষ্ট্রতন্ত্রের মেশিনারীর ঘাড়ে চাপাইতে চাহে পুত্র-কন্যার অন্ন যোগাইবার ভার, আর পাশ্চাত্য নারী হাসপাতালের যন্ত্রপাতির সহায়তায় নিজেকে চাহে সন্তান-প্রসবের অপরিহার্য্য দুঃখ, যন্ত্রণা ও দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে।

'বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ সভ্যতা-নামধেয় এই মৃত্যুসঙ্কুল দুরবস্থার উপাসনা করিবে না। ভারতবর্ষও আগে চলিবে বটে কিন্তু চলিবার পূর্ব্বে সে প্রথমেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে, কোথায় তাহাকে যাইতে

হইবে, আর কখন কি অবস্থায় তাহার গতিবেগ কি হারে কমিবে ও বাড়িবে। অতীত ইতিহাসের শিক্ষাটুকু হইতে নিজেকে সে বঞ্চিত করিবে না, আশু-কর্ত্তব্যের গুরুভার প্রশমিত করিতে যাইয়া বিগতের ভ্রমের সে পুনরভিনয় করিবে না, চারিদিকের পীড়ন দেখিয়া সোজাসুজি পথ কাটিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ের খোঁজ সে করিবে না। ভারতবর্ষের মাটী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর, সিন্ধু-কাবেরী-ব্রহ্মপুত্রের, নর্ম্মদা-কৃষ্ণা-গোদাবরীর শ্যামল-পর্ণাঞ্চিত তটবিস্তারে স্বাভাবিকভাবে যে শান্তি-রস-স্নিগ্ধা পরমরমণীয়া চিরসুখসেব্যা সভ্যতার স্পর্শ পাইয়া আসিয়াছে, স্বাভাবিকভাবে যে গতি ও গন্তব্যের পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহারই সমগ্র অবদানটুকুকে নিজস্ব-রূপে পাইয়া ভারতের আগে চলিবার আগ্রহ ও প্রযত্ন অনন্ত ভবিষ্যতের পানে লীলা-চঞ্চল চরণে বিসর্পিত হইবে। শুধু আগে চলিবার জন্যই সে চলিবে না, শুধু নিত্য নূতন মেশিন আবিষ্কারের মাদকতায়ই সে ছুটিবে না, সে চলিবে গতি ও গন্তব্যের মর্ম্মকথা বুঝিয়া, গোড়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া। যে বৃক্ষ মূলকে মাটীর নীচে গভীরভাবে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, সে দীর্ঘ হয় শুধু থুবরিয়া পড়িবার জন্য ; যে পাখীর ডানায় জোর নাই, সে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হয় শুধু উড়িতে গিয়া জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য।

'ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা এই গোড়া বাঁধিবার সাধনা, বৃক্ষের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির জন্য শুধু স্বভাবেরই উপর নির্ভর করিয়া শিকড়কে মাটীর মধ্যে সুদূর-প্রসারী করিবার সাধনা। ভারতবর্ষ আজ এই সাধনাকে গ্রহণ করিবে। কোন্ পথে তাহার মুক্তি, ভারত আজ তাহা এই সাধনার মধ্য দিয়া অনুসন্ধান করিবে। অতীতের অদমিত অসংযম, অতীতের অমার্জ্জনীয় অনাচার, অতীতের যাবতীয় কদর্য্য আসক্তি চিরতরে পরিহার করিয়া

ভারতবর্ষ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া মহাবীর্য্য সঞ্চয় করিবে এবং তাহারই সহায়তায় জগতের বুকে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ভারতবর্ষও আগেই চলিবে, পিছনে সে পড়িয়া থাকিবে না, কাহারও অনুগ্রহের কাঙ্গাল হইয়া পরপদলেহীর চিরদুঃখময় অনার্য্য অস্তিত্ব সে বহন করিবে না, কাহারও অনুকম্পার পাত্র হইয়া লাজে ভয়ে ম্রিয়মাণ পদানত জীবন সে যাপন করিবে না। "আগে চল্"— এই মহামন্ত্রের সেও সাধনা করিবে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সে করিয়া লইবে মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন, সর্ব্বাগ্রে সে জাগাইয়া লইবে ঘুমন্ত জাতির কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে।'

৭ই পৌষ, ১৩৩৪

বনবাস ও মহাপুরুষ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বহু মহাপুরুষের জীবন-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—তোমরা মনে ক'র না যে, মহাপুরুষ হ'তে হ'লেই বাঘছাল পর্‌তে হবে আর বনে গিয়ে তপস্যা কত্তে হবে। তপস্যার সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ হচ্ছে মনের, বনের সঙ্গে সম্পর্ক গৌণ, অতি গৌণ। বনের গভীরতা দেখেই মনে ক'র না, এ বনে যে এসে বাসা বেঁধেছে, সেই মহাপুরুষ। বনের ভিতরে বাঘও থাকে, ভালুকও থাকে, দস্যুও থাকে।

মনে, বনে, কোণে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহতেরা উপদেশ দিয়েছেন সাধন কত্তে মনে, বনে আর কোণে। তার মানে হচ্ছে এই যে, বাইরের ভড়ং বর্জ্জন ক'রে, সরল অনাড়ম্বর ভাব নিয়ে, নীরবে, নিভৃতে করবে তপস্যা। কোণ লোকচক্ষুর অন্তরাল স্থান, সেখানে সাধক সহজ সরলতায় নিঃশঙ্ক

নীরবতায় কাজ কত্তে পারে। বন লোকালয়বর্জ্জিত নিরিবিলি স্থান, সেখানে সংসারের সহস্র প্রলোভন ও চঞ্চলতা এসে তপোভঙ্গের চেষ্টা কত্তে সুযোগ পায় কম। আর, মন হচ্ছে সব চেয়ে সেরা তপস্যার স্থান, যেখানে ডুবতে পারলে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও আলোড়ন তোমাকে স্পর্শ কত্তে পারবে না, যেখানে ডুবতে জান্‌লে তুমি লক্ষ লোকের মাঝে বসেও একান্ত, নিরালা, নির্জ্জন হয়ে কাজ কত্তে পার। এই মনে যাঁর তপস্যা, তিনিই সহজে সিদ্ধি অর্জ্জন করেন।

বাঘাউড়ার পরমহংস মা

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ত্রিপুরা জেলায় আমি অনেকানেক মহাপুরুষ দেখেছি, যাদের হয়ত মহাপুরুষ ব'লে অনেক লোকে চিন্‌তেও পারে নি। তার কারণ তাঁরা সংসারী জীবের মতই চলেছেন, সংসারীর মতই লোকের সঙ্গে মিলেছেন, মিশেছেন! তার মধ্যে বাঘাউড়ার পরমহংস মা সর্ব্বোত্তম। ইনি ছিলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, সারারাত্রি জেগে উনি সাধন কত্তেন। ঘুম আস্‌ত ব'লে চ'খে লঙ্কা বেটে দিতেন। এই রকম কত্তে কত্তে শেষটায় অন্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু অন্ধাবস্থাতেই তাঁর দিব্যজ্ঞান ফুট্‌ল। তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমতী গীতা, লেখাপড়া জান্‌তেন না, বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না, কিন্তু গীতার শ্লোকগুলির এমন ব্যাখ্যা কত্তেন যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লোকও অমন পারেন না। পরমহংস মা আমাকে ডাক্‌তেন "বাবা বৈদ্যনাথ" বলে। বল্‌তেন,—"ত্রিশকোটি ভারতবাসীর আধি-ব্যাধি হরণ ক'রে নিও বাবা।" আমি বল্‌তাম,— "আমি যে মা মানুষ, মানুষের যা সাধ্য, তার বেশী আমি কর্ব্ব কি করে?" পরমহংস মা বল্‌তেন,—"মানুষই ত' বাবা ভগবান্‌, ভগবান্‌ কি আকাশ ফেড়ে নামেন?" আমি আর তর্ক কত্তাম না, চুপ ক'রেই বসে তাঁর

মধুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনতাম। একদিন তিনি বল্লেন,—"দেখ বাবা বৈদ্যনাথ, আমি অন্ধ হয়েও তোমার সুন্দর মুখখানা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার মুখখানার উপরে আমার মুখখানাও যেন চিত্রিত রয়েছে। আরও দেখ্‌তে পাচ্ছি যেন, ঐ দু'খানা মুখের ভিতর দিয়ে আর একখানা মুখ ঝিক্‌মিক্ কচ্ছে—সে হচ্ছে আমার গুরু-ধনের মুখ। একখানা মুখেই যেন সবগুলি মুখের ছবি ফুটে উঠ্‌ছে।" একদিন পরমহংস মাকে কিছু কিস্‌মিস্ নিয়ে দিলাম,—একটা মুখে দিলেন, দিয়ে বল্লেন,—"বাবা বিশ্বনাথের কথা মনে পড়্‌লে আমার জিভ্ এই রকম মিঠা স্বাদ অনুভব করে।" একদিন আমি একটা ভগবৎ-সঙ্গীত গেয়ে চুপ করেছি, তিনি আমাকে ধরে হাউমাউ ক'রে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্ল্লেন,—বল্লেন,—"ঠাকুরের কথা যে কয়, সে আমার কলিজার চেয়েও আপন, আমার প্রাণের চেয়েও আপন।" পরমহংস মার এক পৌত্রের অসুখ, আমি যেতেই পরমহংস মায়ের ছেলে বন্ধুগোপাল বল্লেন,—"আপনি একটা ওষুধ দিন।" আমি বল্লাম,—"মায়ের পায়ের ধূলো দিন্, তাতেই সেরে যাবে।" বন্ধুগোপাল ধূলো চাইলেন। পরমহংস মা বল্লেন,—"আমি যে শুধু আমি রে, আমার হাত নেই, পা নেই, রূপ নেই, রস নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই।" বন্ধুগোপাল তবুও জেদ্ কর্‌লেন। তখন তিনি বল্লেন,—"নিরাকারের আবার পূজা কি, অনির্ব্বচনীয়ের আবার অর্চ্চনা কি ?"

বাঘাউড়ার বন্ধুগোপাল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমহংস মায়ের ছেলে বন্ধুগোপালও বড় সহজ মহাপুরুষ নন্। শীতের রাত্রে কি ক'রে তাঁর বন্ধুর, মানে শালগ্রাম

শিলার, গা থেকে লেপখানা খসে পড়েছে, আর তুই মাইল দূরে যাত্রা-গান শুন্‌তে ব'সে গোপালের গায়ে কম্প দেখা দিল। "হায় বন্ধু, হায় বন্ধু" কত্তে কত্তে ছুটে এসে তিনি ঘরের তুয়ারে আঘাত কত্তে লাগ্‌লেন। ঘরের লোকেরা জিজ্ঞেস কল্লে,—"ব্যাপার কি?" গোপাল বল্লেন,—"আরে তাড়াতাড়ি তুয়ার খোল্, কথা বলিস্ পরে,—আমার বন্ধু যে শীতে কাঁপ্‌ছে।" ঘরের লোকেরা বল্লে,—"সে কি? শোবার সময়ে যে আমরা স্পষ্ট দেখেছি, বন্ধুর গায়ে লেপ।" গোপাল কি আর সে কথা শুনেন? তুয়ার ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তিনি ঘরের ভিতর উন্মত্তবৎ ঢুক্‌লেন। সবাই দেখ্‌ল, কি আশ্চর্য্য, সত্যই বন্ধুর গা থেকে কি ক'রে লেপখানা খসে নীচে পড়ে গেছে!

বাঘাউড়ার ছালা-বুড়ী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আর এক আশ্চর্য্য সাধু ছিলেন এই বাঘাউড়াতে। লোকে তাকে বলত ছালা-বুড়ী। কারণ, তিনি কাপড় পর্‌তেন না, পর্‌তেন ছালা (বস্তা)। তিনি নাথ-জাতীয়া বিধবা মেয়ে, বন্ধুগোপালের শিষ্যা হ'লেন, নিজের যা-কিছু ভূ-সম্পত্তি সব গুরুকে দিয়ে গুরুর আর গুরু পত্নীর সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু গুরু-গৃহের প্রচণ্ড দারিদ্র্য ঘোচে না। তখন ভিক্ষা কত্তে বেরুলেন। নিজে তিন দিন চার দিন উপবাসিনী থেকে ভিক্ষা ক'রে যা-কিছু পেতেন, গুরুর পায়ে সমর্পণ ক'রে গুরুদেবের আহারাদি শেষ হবার পরে প্রসাদ পেতেন। যুবতী মেয়ে, তাতে ব্রহ্মচারিণী, অঙ্গ বেয়ে লাবণ্য পড়্‌তে লাগ্‌ল। দেখে কতকগুলি লম্পটের মনে তুষ্টবুদ্ধি জাগ্‌ল। তারা ভিক্ষা দেবার নাম ক'রে কৌশলে তাঁকে বন্দিনী করলে। কিন্তু ছালা-বুড়ি

ভয় পেলেন না। দুর্ব্বৃত্তেরা যখন অত্যাচারে উদ্যত হ'ল, তখন "জয়-গুরুদেব" ব'লে এক গভীর গর্জ্জন ক'রে নৃমুণ্ডমালিনীর সাজে ছালা বুড়ী দাঁড়িয়ে উঠে লাঠি চালাতে আরম্ভ কর্লেন। সেইদিনের পরে আর কখনও কোনো লম্পট ছালা-বুড়ীর গায়ে হাত তোলে নাই।

ভক্ত আপ্তাবুদ্দিন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি মাঝে মাঝে শিবপুরে আপ্তাবুদ্দিনের বাড়ী যেতাম। যে দিন আমি প্রথম গেলাম, সেদিন আমাকে দেখা মাত্রই কাঁদতে কাঁদতে আর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আপ্তাবুদ্দিন স্খলিত কণ্ঠে গাইতে লাগলেন,—

"যারে দেখ্‌লে প্রাণ কেঁদে উঠে,
হরিনাম আপনি ফোটে,
তেমনি মনের মানুষ মিলে কই ?
আমি, পাই যদি সেই মনের মানুষ
কুল দিয়ে তারে কোলে লই।" (৺মনোমোহন দত্ত)

তারপরে যা' অবস্থা, সে কি বল্‌বার ? তিনি কে, আর আমি কে, তার খোঁজ রাখে কে ? তোমরা বল ম্লেচ্ছ আর যবন। এই ম্লেচ্ছের ছেলের পায়ের ধূলো নিলেও তোমরা উদ্ধার হ'য়ে যাবে। আহা ! যখন তিনি

"শিখায়ে দে মা আমারে
কেমন ক'রে তোরে ডাকি,
এক ডাকে ফুরায়ে দে-মা
জন্মভরা ডাকাডাকি ?" (৺মনোমোহন দত্ত)

গাইতে গাইতে একেবারে ভাবস্থ হয়ে যান, তখন সে পবিত্র দৃশ্য দেখ্‌লে কার না নয়ন সার্থক হয় ?

মহাত্মা হরিষ-সাধু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারপর তোমাদের হরিষ-সাধু? কত্তেন পোষ্ট অফিসের পিওনি চাকুরী আর এখন হয়েছেন রুদ্রাক্ষবাড়ীর শ্মশানের যোগিরাজ শিব। আমাকে একদিন বল্লেন,—“যে সব মহাপুরুষের চরণ-দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক হরিদ্বার, হৃষীকেশে যায়, এদেশের ভাগ্যে তাঁরা আজ গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।” আমি বল্লাম,—“এ কথাগুলি আমাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌বেন না। এ কথায় লক্ষিত হউন আপ্‌নি। শুধু চিন্তার শক্তিতে আপনি এদেশের লম্পটদের জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন।” তিনি বল্লেন,—“আপনি আর আমি ত' এক, অভেদাত্মা,—আপনার শক্তিই আমার ভিতর দিয়ে কাজ কচ্ছে।” দেখ দেখি, কি বিনয়! চৈতন্য-চরিতামৃতের বা ভাগবতের একটা লাইন অশুদ্ধ ভাবে পড়্‌বারও যার শক্তিটুকু আছে, সেও নিজেকে অবতার ব'লে প্রচার করে, আর, পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান করামলকবৎ আয়ত্ত ক'রেও এই মহাত্মা সকলের দাসানুদাস হ'য়ে রইলেন। এইখানেই ভক্তের ঐশ্বর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যে রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে দেওয়ার ভার নিয়েই সব চাইতে বড় সম্মান লাভ ক'রেছিলেন, এ সব মহাত্মারা সে কথা কখনো ভোলেন না।

হরিষ-সাধুর স্ত্রী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরিষ সাধুর স্ত্রীই কি একজন সামান্য ব্যক্তি? বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে শ্মশানে ব'সে তাঁর পাগলা স্বামী তন্ময় হ'য়ে তপস্যা কচ্ছেন, তিনি কি ক'রে ঘরে ব'সে থাকেন? অথচ রাত্রিতে স্বামীর কাছে বাস করার অনুমতি তিনি পান নাই। এক গলা জল ভেঙ্গে এই দীর্ঘ পথ তিনি প্রতিদিন অতিক্রম ক'রে

স্বামীর আহারীয় নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরে এসেছেন। বাড়ী পৌছুতে পৌছুতে রাত হ'য়ে গিয়েছে, সাঁতরাতে সাঁতরাতে কতদিন কত বিষধর সর্প গায়ে বেয়ে উঠেছে, কিন্তু অতটুকু ভয় পান নাই। ছয় দিন সাত দিন পর্য্যন্ত হয়ত স্বামী চ'খই খোলেন নাই, খাওয়া ত' দূরের কথা। সাধ্বী স্ত্রীও এই ক'দিন নিরম্বু উপবাস ক'রে স্বামীর ধ্যান-ভঙ্গের অপেক্ষা ক'রেছেন। এ সব কি সহজ তপস্যা? বনে গিয়েই বা কয়জন এত কৃচ্ছ্র সহ্য করে?

জ্ঞান-যোগী বিপিন-বিহারী

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিরামপুর গ্রামের বিপিন বর্দ্ধন মশায়ও বড় সামান্য ব্যক্তি নন্। এ রকম একটা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে থেকে যে হঠাৎ এত বড় একজন বেদান্ত-কেশরী আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌তে পার্ব্ব, এ কথা আমি কখনো ভাবি না। সারদা ডাক্তারের বাড়ী গেলাম, দেখি এক বৃদ্ধ এলেন, আমাকে খুব সম্মান ক'রে প্রণামাদিও কর্ল্লেন, নানাপ্রকার শিষ্টাচারাদিও প্রদর্শন কর্ল্লেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁকে একজন খুব ভদ্রলোক ব'লেই বুঝ্‌লাম। কিন্তু তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের ফোয়ারা ছুট্‌ল তখন, যখন বস্‌লাম নিভৃত আলোচনায়। বেদ-বেদান্তের গভীর অনুভূতি তাঁর সব চ'খে মুখে ফুটে উঠ্‌তে আরম্ভ কল্ল। একদিন তিনি আমাকে বল্লেন,—"স্বামীজী, কর্ম্মযোগীর ইউনিফর্ম্ম পরেছেন, অনেকে যে আপনাকে চিন্‌তে পার্ব্বে না।" আমি বল্‌লাম,—"উপায় কি? যুগের বাণীই যে কর্ম্মযোগ।" তিনি বল্লেন—"কিন্তু অন্তরঙ্গদের যেন জান্‌তে দেন যে, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" আমি বল্লুম,—"আমার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ নেই, সবটাই অন্তরঙ্গ।" তাঁর দৃষ্টি স্থির হ'ল, নিমেষ

মধ্যে ধ্যানস্থ হ'লেন, পরে বল্লেন,—"জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম তিনই এক, একই তিন, এর মাঝেও ভেদ-কল্পনা চলে না।" আর এক দিন তিনি বল্লেন,—স্বামীজী, আপনাকে, সারদা ডাক্তারকে আর নগরবাসীকে দেখ্‌লে আপনা-আপনি আমার ভিতরে ব্রহ্মনামের হুঙ্কার উঠ্‌তে থাকে।"—আমি বল্লাম,—"ইহাই ব্রহ্মকৃপা।" তিনি বল্লেন,—"কৃপা কাকে বলে জানেন স্বামীজী? ক'রে পাওয়া।"

ভারতের পল্লী-সম্পদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এই সব মহাত্মারা ভারতের পল্লী-সম্পদ। কাঞ্চনের নামে কাচও যে চলে যাচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু যে দু-দশটী খাঁটী সাধু গার্হস্থ্যাশ্রমের মশারী খাটিয়ে তার আড়ালে ব'সে ভাগবতী উপলব্ধি লাভ কচ্ছেন, তাঁরাই আমাদের অজ্ঞাতসারে সমগ্র জাতিটার মেরুদণ্ডটাকে শক্ত ক'রে দিচ্ছেন। দিকে দিকে এঁরা সব যদি ছড়িয়ে না থাক্‌তেন, তাহ'লে হাজার বছরের পরাধীন জাতিটার নৈতিক অবস্থা কি হ'ত জান? একজনের নারীকে নিয়ে দশজনে টানাটানি কর্‌ত, একটা পুরুষের হাড়গোড় সব দশটা স্ত্রীলোকে চিবিয়ে খেত, ঘরে ঘরে ঔপসর্গিক ব্যাধির আড়ৎ খুলে যেত। কিন্তু সব নিবারিত হয়ে রয়েছে ভগবদ্দর্শী সাধুদের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে।

পল্লী-সম্পদের আর একটা দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, পল্লী-সম্পদের আর একটা দিক্‌ও আছে, যে দিকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি। সেইটা হচ্ছে এই যে, দেশের

কর্ম্মী-লোকেরা সব গ্রাম ছেড়ে সহরে গিয়ে ভীড় করেছেন, গ্রামগুলি অকেজো নির্ব্বোধ আত্ম-কলহপরায়ণ অকুশল-কৌশলী লোকের আবাসস্থলে পরিণত হ'য়েছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার সব বাস কচ্ছেন সহরের যক্ষ্মা-বীজাণুর আকরে এবং পুরুষানুক্রমে অকালে ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধের চিঁড়া খাওয়াচ্ছেন, আর শেয়াল, কুকুর, ছাগল এরা সব সহরে যাবার শক্তির অভাব-হেতু উপায়ান্তর না দেখে গ্রামের যক্ষ্মাবীজাণুহীন বায়ু সেবন ক'রে, মাঠে কোদাল পেড়ে ঝাড়ে বংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে, কর্ম্মীদের এসে গ্রামে ঢোকা এবং শেয়াল-কুকুরের সংস্কারে আবিষ্ট পুরুষ-সিংহগুলিকে জাগিয়ে তোলা। ভারতের নরনারী বস্তুতঃ শেয়াল-কুকুর নয়, সিংহেরই শাবক, কিন্তু যুগ-যুগ-সঞ্চিত কর্ম্ম-হীনতার গ্লানিতে শেয়াল-কুকুরের স্বভাব পেয়ে বসেছে।

কামের বহুমূর্ত্তি

কুমিল্লা হইতে জনৈক ভক্ত-যুবক কয়েকদিন যাবৎ এই পল্লীতে আসিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার পরে নানা কথার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে বলিলেন,—কাম কামরূপী। সে কখনও স্নেহ-ভক্তির রূপ ধ'রে, দয়া-কৃতজ্ঞতার পুণ্য বেশ প'রে, পবিত্র প্রেমের ফোঁটা-তিলক কেটে দস্তুরমত সাধু সেজে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু জান ত', রামনামের কাছে ভূত টিঁকতে পারে না,—সে যে বেশ ধ'রেই আসুক না কেন, রামনাম উচ্চারণ কত্তেই নিজমূর্ত্তি ধ'রে প্রাণের ত্রাসে অন্তর্হিত হয়। কাম যেরূপ ছলনাময়ী মূর্ত্তি ধ'রেই আবির্ভূত হোক্, সর্ব্ব-বিপদহারীর পবিত্র নামে আত্মসমর্পণ কর্লেই সে নিজের

প্রকৃত মূর্ত্তিটী ধ'রে বিকট চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

স্ত্রীজাতিতে ঔদাসীন্য

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীজাতির স্ত্রীত্বে উদাসীনতাই হচ্ছে কামদমনের শ্রেষ্ঠ উপায়। রাস্তায় একপাল গরু দেখ্‌লে যেমন তাদের মধ্যে কোন্‌টা স্ত্রী, কোন্‌টা পুরুষ এরূপ কোনো প্রশ্নই মনে আসে না, তেমনি কোনো মানুষ দে'খে যখন মনে কোনো প্রশ্ন উঠ্‌বে না, লোকটা পুরুষ কি স্ত্রী, তখনই কামজয় সম্ভব হবে। কিন্তু সকলের পক্ষে তা' ত' সম্ভব নয়! তাই অনেকের পক্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাবের আশ্রয় নিতে হবে।

মাতৃভাবের সাধন

শ্রীশ্রীবাবামণি মাতৃভাবের সাধন সম্বন্ধে বলিলেন,—দিবা-নিশি মা মা ব'লে ডাকৃতে হয়। যাই দেখ্‌লে স্ত্রীলোক যাচ্ছে, অম্‌নি মা মা ব'লে ডাক্‌তে থাকৃবে। শুধু স্ত্রীলোক নয়, গাভী দেখ, ছাগী দেখ, কুক্কুরী দেখ, শূকরী দেখ,—আর অম্‌নি মা মা ব'লে ডাক। ডাকৃতে ডাকৃতে এমন হবে যে, স্ত্রীজাতি দর্শন হোক্ আর নাই হোক্, মনটা সব সময় মাতৃভাবেই মাতোয়ারা হ'য়ে থাকৃবে। একটী সংযম-সাধকের খবর আমি জানি, তিনি মাতৃভাবের সাধনা আরম্ভ কর্ল্লেন, হ'তে হ'তে এমন দাঁড়াল যে, গাছ দেখ্‌লেও তিনি মা বলেন, পাথর দেখ্‌লেও তিনি মা বলেন। একদিন পায়খানায় বসে শৌচ কচ্ছেন, এমন সময়ে সাম্‌নে দিয়ে বিষ্ঠা-লোলুপা একটা কুক্কুরী যাচ্ছিল,—সেটার আবার গায়ে ছিল প্রচণ্ড রকমের ঘা। দেখে সাধকের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত

হ'ল, তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"আহা মা, তোর এত কষ্ট! কতই না জানি মা যন্ত্রণা পাচ্ছিস্‌!"

৮ই পৌষ, ১৩৩৪

শুদ্ধি কাহাকে বলে?

সন্ধ্যার সময়ে দারোরা, নবীনগর, বাঙ্গোরা প্রভৃতি স্থান হইতে কতিপয় যুবক-ভক্ত সমাগত হইলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর প্রসঙ্গ-ক্রমে শুদ্ধি-আন্দোলনের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুদ্ধি কাকে বলে জানিস্‌? একজন লোক পাপে তাপে অপরাধে জর্জ্জরিত হ'য়ে পশুর জীবন যাপন কচ্ছে, তোরা তাকে মনুষ্যত্বের থাকে টেনে তুল্‌লি, এরই নাম শুদ্ধি। রহিমকে রাম আর করিমকে কালাচাঁদ ব'লে ডাকলেই শুদ্ধি হয় না, অধোগত মানব-সন্তানকে ঊর্দ্ধে টেনে তোলার নাম শুদ্ধি। একজন পবিত্রচেতা হিন্দু যদি একজন অমানুষ অহিন্দুকে মনুষ্যত্ব দিতে পারেন, তবে একটা শুদ্ধি হ'ল। আবার একজন পশুপ্রায় হিন্দুকে যদি একজন দেবচরিত্র অহিন্দু নিজ জীবনের মহত্ত্বের স্পর্শ দিয়ে চরম চরিতার্থতার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তবে এটাও একটা শুদ্ধিই হ'ল। শুদ্ধির অন্তর্নিগূঢ় মানে হিন্দু নামে ডাকা বা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করাই নয়। শুদ্ধির প্রকৃত মানে হচ্ছে নীতিহীনকে নীতি দান, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান, অপ্রেমিককে প্রেম দান, অসংযমীকে সংযম দান, অপূর্ণকে পূর্ণতা দান এই দানটা কলিমুল্লাই করুন, মিষ্টার ডগ্‌লাসই করুন বা যদু ভট্‌চায্‌ই করুন, তাতে কি তফাৎ?—মন-প্রাণের শুদ্ধতা সম্পাদনের নামই শুদ্ধি।

ভারতে ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য এবং এক ধর্ম্মাবলম্বীর অপর ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু-ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম বা মুসলমান-ধর্ম্ম এর কোনও একটা যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, তেমন সম্ভাবনা দু-চার শতাব্দীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। বিচিত্র যাঁর মহিমা, সেই ভগবানকে লোকে চিরকালই নানা বিচিত্র ভাবে ভজনা কর্ব্বে। তবে, প্রত্যেক ধর্ম্মই বিভিন্ন যুগে যুগোপযোগিভাবে রূপান্তর লাভ কর্ব্বে। শুদ্ধি-কার্য্য, কল্‌মা পড়ান, ব্যাপ্টিজম্ তিনটারই চেষ্টা সমান ভাবে চল্‌তে থাক্‌বে এবং দিন দিন আরো কত কত নিত্য নূতন ধর্ম্মমতের আবিষ্কারও হবে। যখন যে ধর্ম্মাবলম্বী সমাজের ভিতরে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, তখন সেই ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের গ্রাস কত্তে থাক্‌বে। আজকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ব্রহ্মদর্শী পুরুষের সংখ্যা বেশী হচ্ছে ব'লেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম্মকে এত বিপন্ন মনে কচ্ছেন। ভবিষ্যতে যদি খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-দর্শনকারীদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তখন দেখ্‌বে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বেচ্ছায় দলে দলে খ্রীষ্টান ও মুসলমান হচ্ছে। ধর্ম্মমতের দার্শনিকতা বিচার ক'রে কয়জন লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে? যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সরস জীবনের মধুময় স্পর্শ পেয়ে মুগ্ধ হ'য়েই মানুষ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অকপট সাধক পুরুষ নিজ সাধনের শক্তিতে বিশ্বজগৎ বশ ক'রে রাখেন। সাধন-পথ তাঁর যাই হোক্ না, সাধন-নিষ্ঠার জোরেই তিনি শত শত বিরুদ্ধ মনকে অভিভূত ক'রে নিজ সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করেন। যারা চালাকী ক'রে, গায়ের জোরে, ভয় বা প্রলোভন

দেখিয়ে কিম্বা মিথ্যার সহায়তা নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার করে, তাদের কাজের আবার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াও আসে।

প্রতিক্রিয়ার নানাবিধ রূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এই প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে সহস্রবিধ রূপ ধারণ ক'রে। যে ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়ে প্রচারিত হ'য়েছে, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরে অস্বাভাবিক কামের দুরন্ত অত্যাচার আরম্ভ হয়। যে ধর্ম্ম ঐহিক সুখের লোভ দেখিয়ে প্রচারিত হ'য়েছে, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে স্বার্থপরতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। যে ধর্ম্ম চালাকী ক'রে প্রচারিত হ'য়েছে, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে লোক-প্রবঞ্চকদের প্রাচুর্য্য ঘটে। যে ধর্ম্ম কারো দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কিম্বা অস্ত্রবলে প্রচারিত হ'য়েছে, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের সমাজ কাপুরুষ এবং গুপ্ত-ঘাতকের জন্মদান করে। এই সব প্রতিক্রিয়া শেষটায় সেই ধর্ম্মেরই ধ্বংস সাধন করে। যাঁরা সাধনের বলে ধর্ম্মপ্রচার করেন, নিজেদের পবিত্র জীবনের প্রভাব দিয়ে বিদ্বেষীদের মনোভাবকে অনুকূল করেন, তাঁদের কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের এই সব প্রতিক্রিয়া আসে না।

বিবাহ ও অবিবাহ

ইহার পরে বিবাহ ও অবিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"বিয়ে করব না," এ প্রতিজ্ঞা করা সহজ কিন্তু বিয়ে না ক'রে পবিত্র জীবন যাপন করাই কঠিন। কিছুদিন আগে শুন্‌লাম, কোনও এক কলেজী প্রফেসার বিয়ে করেন নি, লোকটী নাকি ভারী দাতা, পরোপকারী, আর্ত্তের বন্ধু, রুগ্নের সেবক। শুনে আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হ'য়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলুম,—"ঠাকুর, এমন

মহাপুরুষকে দীর্ঘজীবী কর।" দিনকতক পরে ঐ প্রফেসারের এক ছাত্রের মুখে শুন্‌লুম, তিনি নাকি ক্লাসে ইংরিজী সাহিত্যের পড়া নিতে ব'সে আদিরসাত্মক এমন সব অশ্লীল রসিকতার চর্চ্চা করেন, যা পিতাপুত্রে একত্র ব'সে শুন্‌তে পারে না। শুনে আমার অন্তরটা ব্যথিত হ'ল। আমি কাতর-প্রাণে প্রার্থনা কর্‌লুম—"ঠাকুর, এ লোকটাকে সুমতি দাও, মিথ্যা-কৌমার্য্যের মোহে লোকটা তার ভোগলোলুপ চিত্তটাকে খামখা পীড়ন কচ্ছে, আর এঁকে অন্ধভাবে রেখ না প্রভো, এঁকে বিবাহের রুচি দাও, বিবাহের সাহস দাও!" সম্প্রতি শুন্‌লুম,—তিনি নাকি বিয়ে করেছেন। শুনে মন থেকে বড়ই একটা উদ্বিগ্নতা দূর হ'ল। কারণ, সাধন-ভজনহীনের কৌমার্য্য ত' শুধু গুপ্ত পথে সমাজের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবল করার জন্যে। এ কৌমার্য্য কখনই সমর্থন করা যায় না।—তোমরা কেউ "বিয়ে কর্‌ব না—বিয়ে কর্‌ব না" বলে ক্ষেপে ব'স না। কত্তে হয় বিয়ে কর্ব্বে, না হয় না কর্ব্বে, ওতে কৌলীন্যের কিছু হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। আসল কথা হচ্ছে সাধন-ভজন। এই দিকে যার নজর কম, সে আকাশে হাজার মাইল উপরে উঠ্‌লেও শকুনীর মত শুধু মরা গরুর পচা নাড়ী-ভূঁড়ির দিকেই দৃষ্টি রাখে,—অবিবাহিত থেকেও সমাজের পাপই বৃদ্ধি করে। একটা কথা তোমরা সব সময় মনে রেখ,—বাজারের পতিতা মায়েরা সমাজের পক্ষে যেমন ভয়ঙ্কর জিনিষ, প্রচ্ছন্ন লম্পট অবিবাহিত পুরুষগুলি সমাজের পক্ষে তার দশগুণ অনিষ্টকর।

কৌমার্য্যের দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কি নারীর, কি পুরুষের, কৌমার্য্যের দায়িত্ব বড় ভয়ঙ্কর। বিবাহ না কর্লেই কৌমার্য্য বজায় রইল,

তা কিন্তু নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভিতরে পবিত্রতা অটুট রাখবার প্রবল সঙ্কল্প চাই, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। ব্রহ্মচারী অমুক আর কুমারী তমুক ব'লে নাম ফাটাতে পার্লেই কৌমার্য্য রইল, তা নয়। তোমার সংস্পর্শে এসে কারো চরিত্রচ্যুতি ঘট্‌বে না, কারো সংস্পর্শে এসে তোমারও চরিত্রচ্যুতি ঘট্‌বে না,—এই হ'ল সত্যিকার কৌমার্য্য। তোমার কোনও আচরণে যদি জগতের একটী চিত্তেও কামনার আগুন জ্বলে, জান্‌বে, কৌমার্য্যের মর্য্যাদা তুমি রাখ্‌তে পার নি। তোমার কোনো বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা বা ইঙ্গিতের ফলে যদি একটী প্রাণেও চপলতা জাগে, একটী প্রাণও যদি পবিত্রতা হারায়, জান্‌বে, তুমি তোমার কৌমার্য্যের সম্মানকে রক্ষা কত্তে পার নি। অবিবাহই কৌমার্য্য নয়, জিতেন্দ্রিয়ত্বই কৌমার্য্য।

জিতেন্দ্রিয়ত্বের সাধন

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি জিতেন্দ্রিয়ত্বের সাধন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জিতেন্দ্রিয়ত্বের তিনটী সাধন। আতঙ্ক দমন, প্রলোভন-দমন আর প্রতিক্রিয়া-দমন। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সম্ভাবনা ঘটে নি, তবু আতঙ্ক হচ্ছে বুঝি এই গেলাম এই মর্‌লাম। এই যে আত্ম-অবিশ্বাস, এটা জিতেন্দ্রিয়ত্বের শত্রু। প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে এসে উপস্থিত, আর প্রাণের মধ্যে বারংবার শুধু ভোগ-কামনাই জেগে উঠ্‌ছে, উপস্থিত সুযোগকে ত্যাগ না করার জন্য ভিতরের কুপ্রবৃত্তি বারংবার কেবল প্ররোচনাই দিচ্ছে,—এই যে প্রলোভনের মুখে প্রবৃত্তির প্রেরণা, এও হচ্ছে জিতেন্দ্রিয়ত্বের এক পরম শত্রু। এই শত্রুটা হচ্ছে একেবারে প্রত্যক্ষ শত্রু। তারপরে আর এক শত্রু হচ্ছে, প্রতিক্রিয়া। প্রলোভনের সম্মুখে চিত্তে চঞ্চলতা এল না, বেশ ধীর স্থির পবিত্র মনে

প্রলোভনের সাম্‌নে দিয়ে নির্ভয়ে চ'লে এলুম, কিন্তু তার অনেক পরে ঐ প্রলোভনের বিষয়কে অবলম্বন ক'রে প্রাণের ভিতরে তুমুল ঝড় বইতে আরম্ভ কর্ল্ল। এই যে ত্রিবিধ শত্রু, তাদের যতদিন না সম্পূর্ণরূপে শাসন কত্তে পাচ্ছ, ততদিন পর্য্যন্ত কৌপীন যতই শক্ত ক'রে আট না কেন, তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যের সাধক বল্‌ব, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধ বল্‌ব না। এই তিনটি শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নারী-পুরুষ সকলেরই হয় এবং সাধনের বলে, ভগবৎ-শক্তির বলে এই তিনটী শত্রুকেই নারী-পুরুষ প্রত্যেকে নিপাত কত্তে পারে।

জিতেন্দ্রিয়ত্বের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম শত্রুটীর যখন নিপাত হয়, তখন নারী পুরুষকে আর পুরুষ নারীকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে না, নারী পুরুষকে ফাঁসীর দড়ি, আর পুরুষ নারীকে কালভুজঙ্গী ব'লে ভয় করে না, এক জাতি অপর জাতির কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য অস্বাভাবিক কোনো প্রয়াস আর পায় না। দ্বিতীয় শত্রুটীর যখন নিপাত হয়, তখন দেবরাজ ইন্দ্রকেও প্রণয়াকাঙ্ক্ষিরূপে অগ্রসর হ'তে দেখে নারী পবিত্রতা থেকে ভ্রষ্টা হয় না, স্বর্গের অপ্সরী উর্ব্বশী বা মেনকাকে বশীভূতা জেনেও পুরুষের চিত্তবিকার আসে না। তৃতীয় শত্রুটীর যখন নিপাত হয়, তখন "ভোগের সুযোগ হারিয়েছি" ব'লে নর-নারীর মন অনুশোচনায় রত হয় না, "হায় হায়" করে না, অতীত জীবনের প্রলোভন-দমনের দৃষ্টান্তগুলির প্রতি সে দিগ্বিজয়ীর দৃষ্টিতেই তাকায়, সুযোগ-হারা অনুতপ্তের লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় না। জিতেন্দ্রিয়ত্বের এই যে পূর্ণতা, তা লাভ হয় শুধু সাধনে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জিতেন্দ্রিয়ত্বের এই যে পূর্ণতা, তাকেই বিদ্যার্থীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়া হবে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য। পুপুন্‌কীর সেই পাথরের মত শক্ত মাটিতে যে প্রাণপণে গাঁইতি চালান আরম্ভ হয়েছে, তার পিছনের প্রেরণাটা হচ্ছে এই। তিন দিকে দূরে দূরে কয়েকখানা গ্রাম, উত্তর দিকে শুধুই জঙ্গল। নেকূড়ে বাঘের ভয়ে রাত্রিতে কেউ সে পথ মাড়ায় না। তার মধ্যে একখানা ভাঙ্গা কুটীরে বাস ক'রে আশ্রম-নির্ম্মাণ হচ্ছে। কেন হচ্ছে জান? ত্যাগের দম্ভে স্ফীত কতকগুলি ভোজন-বিলাসী সন্ন্যাসীর আড্ডা গড়ার জন্যে নয়, গেরুয়া-পরা কতকগুলি পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুকের সৃষ্টি করার জন্য নয়। সহস্র বার যারা সংসারাশ্রমীদিগকে বিষ্ঠার কীট ব'লে নিন্দা ক'রে থাকে আর নিজেরা গৃহীদেরই দত্ত ঘৃতান্নে শরীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিপুষ্ট ক'রে সাধনের অভাব বশতঃ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অধীর হ'য়ে গোপন ব্যভিচারে সমাজের পবিত্রতা নষ্ট করে, তাদের জন্যও নয়। নীরবে যাঁরা জাতির জন্য, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ কর্ব্বেন,—সন্ন্যাসের পথে না গার্হস্থ্যের পথে, তা' জানি না,—লোকমান্যের মুখ না তাকিয়ে যাঁরা মৃত্যু পর্য্যন্ত পরেরই জন্য বুক চিরে রক্ত ঢাল্‌তে থাক্‌বেন, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সেই সব ছেলেমেয়েদের পদ-সেবার জন্য।

শক্ত দেশে অভিক্ষার কঠিন পরীক্ষা

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানভূমে গিয়ে কি দেখ্‌লাম জানিস্? মানুষের পেট-ভরা ক্ষুধা আর বুক-ভরা

নিশ্চিন্ততা। বছরে তিন মাস মহুয়া ফুল খেয়ে গরীব লোকগুলি দিন কাটায় কিন্তু কি কর্লে সারা বৎসর পেট ভরে খেতে পাবে, তার উপায় চিন্তা করে না। ভেবেছিলাম, সেখানে বিরাট এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গ'ড়ে তুলব কিন্তু এখন দেখছি আগে দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন অন্নসৃষ্টির, বৃক্ষরোপণের, কৃষির উন্নতির আর গো-পালনের। মানুষের দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা, অদৃষ্টনির্ভরতা আর পুরুষকারহীনতা যেন যোট বেঁধেছে সেখানে। আর তেমন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশেই ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন অভিক্ষার পরীক্ষা দিতে। বড় শক্ত দেশ, বড় কঠিন ঠাঁই, নিষ্প্রাণ মানুষ, নির্ম্মম হৃদয়, আর তারই মধ্যে পাথর-কাঁকর ভাঙ্গার কাজ নিয়ে আমাকে যেতে হ'ল। ধন্য ভগবান, তুমি দুঃখ দিয়েই তৃণকে বজ্র কর।

রুদ্রাক্ষবাড়ী আশ্রম
১০ই পৌষ, ১৩৩৪

মহাত্মা হরিষ সাধু

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি রুদ্রাক্ষবাড়ী শ্মশানে শ্রীমৎ হরিষ সাধু মহারাজের আশ্রমে শুভাগমন করিবেন। চতুর্দ্দিকের প্রায় চারি পাঁচখানা গ্রাম হইতে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ মহাপুরুষ-দর্শনের জন্য আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। হরিষ সাধু মহোৎসাহে কেবল বলিয়া বেড়াইতেছেন,—মহারাজা আসিতেছেন, মহারাজা আসিতেছেন।

দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। প্রায় চারি পাঁচ শত মহিলা উলুধ্বনি দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, কেহ কেহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে

হরিষ সাধু ও শ্রীশ্রীবাবামণি পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। কি স্বর্গীয় সেই দৃশ্য।

চতুর্দ্দিকে প্রণামের ভিড় পড়িয়া গেল। দুই মহাত্মার পদধূলি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। হরিষ সাধু যে কায়স্থ-সন্তান, গোঁড়া ব্রাহ্মণেরাও ক্ষণকালের জন্য তাহা বিস্মৃত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে হরিষ সাধু বলিলেন,—মায়েরা ছেলেকে পাইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ দিকে চলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে 'গিয়া দাঁড়াইলেন—পুনরায় গগন-বিদারী উলুধ্বনি উঠিল। একদল মায়েরা থামেন ত' আর একদল মায়েরা মধুর স্বরে উলু দিতে লাগিলেন।

তারপরে আসিলেন হরিষ সাধু মহারাজের পুণ্যময়ী সহধর্ম্মিণী আরতির উপচার লইয়া। নিজেকে যিনি সহস্র বার "ঈশ্বর নহি, দেবতা নহি, মানুষ মাত্র" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, একে একে চারি পাঁচ শত ভক্তিমতী মা তাঁহাকে পূজা করিলেন, আরতি করিলেন, প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির দুই গণ্ডে শুধু প্রবহমানা অশ্রুধারা, আর হৃদয়বিপ্লাবিনী "মা" "মা" ধ্বনি!

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরা যাঁর যাঁর পল্লীগৃহে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রী-বাবামণির সহিত আলোচনাপ্রার্থী ভক্তদের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে আশ্রম কতকটা খালি হইল। তখন মহাত্মা হরিষ সাধু শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট তাঁর নিজ জীবনের অসংখ্য আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিতে লাগিলেন এবং যে সব ঘটনায় শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত তাঁহার প্রাণের বন্ধন দৃঢ় হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

হরিষ সাধু বলিলেন,—যেদিন আপনি বলিলেন,—"আমি বাঘ খাই, ভালুক খাই, সাপ খাই, ব্যাং খাই, কুমীর খাই, কচ্ছপ খাই, কৃমি খাই, কেঁচো খাই, ঘোড়া খাই, গণ্ডার খাই,"—সেই দিনই বুঝিয়াছি যে, আপনি জগতের সবাইকে আপনার-জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার কেহ পর নাই।

হরিষ সাধু আরও বলিলেন,—গুরু কতকদিন চক্ষু বুজাইয়া রাখিয়াছিলেন, কথাও বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন। কত সময় কত কাণ্ড দেখিতাম, আর স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। একদিন দেখি, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিতেছেন,—"আমি আসিয়াছি, চক্ষু খুলিয়া দেখ্।" যে চক্ষু টানিয়া খুলিতে পারি নাই, সেই চক্ষু সহসা নিমেষের মধ্যে আপনা-আপনি খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, যার মুখ পানে তাকাই সেই মুখখানাই আমার গুরুর মুখ। স্ত্রীর মুখপানে তাকাই, দেখি গুরু ঐ মুখের মধ্য দিয়া হাসিতেছেন। ছেলের পানে তাকাই, দেখি ঐ মুখেও গুরুই বিরাজ করিতেছেন। মৌন ভাঙ্গিল, ভয় দূর হইল,—ভাবিলাম, গুরুর কত দয়া রে! যার জন্য জাতি-কুল-মান সব দিয়াছিলাম, সমাজে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছিলাম, তাকে আজ সকলের মাঝেই লাভ করিলাম। আজ আপনি আসিয়াছেন, আপনার মধ্যেও জগদ্গুরুকেই দেখিতেছি। কল্পনায় নয়, স্পষ্ট ও সাক্ষাৎ দেখিতেছি।

হরিষ সাধু বলিতে লাগিলেন,—আপনি তখন বাঘাউড়া থাকিতেন। রুদ্রাক্ষবাড়ীর জয়চন্দ্র সরকারের ছেলে যতীন্দ্র আপনার নিকট প্রায়ই যাইত, আর আপনি কি করেন আর কি বলেন, সবই আসিয়া আমার নিকট বলিত। যতীন্দ্র একদিন আসিয়া আপনার লিখিত কয়েকখানা বই আমাকে পড়িতে দিল। পড়িয়া আমি যতীন্দ্রকে বলিলাম,—

"লোকটা সাধন করে না।" গুরুনিন্দা শুনিয়া যতীন্দ্র বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। কয়েকদিন পর আসিয়া বলিল,—"আপনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বলিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ইহাতে তিনি কি উত্তর করিলেন?" যতীন্দ্র বলিল,—"শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরিষ পাগ্‌লাকে বলিস্‌, এ কথার জবাব আমি নিজের মুখে দিব।" ইহার পরে কয়েকদিনের মধ্যে আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম,—আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য আমি বাঘাউড়া গিয়াছি, যাওয়া মাত্রই আপনি আমাকে এক বাটী গরম দুগ্ধ আর মিশ্রি খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম,—"আপনি?" আপনি বলিলেন,—"আমাকে এখন দু'-হাজার চিঠি লিখ্‌তে হবে, দুধ তুই খা।" আমি দুধ খাইয়া মুখ ধুইয়া আসিতেই আপনি আমার কাণ দুইটা ধরিয়া বলিলেন,—"তবে রে শালা! নিজে অনাহারী থাকিয়া পরকে দুধ খাওয়ান কি সাধন নয়? গাঁজায় দম দিয়া চক্ষু না বুজিলে বুঝি সাধন হয় না?" ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াই দেখি প্রাতঃকাল হইয়াছে, পাখীরা ডাকিতেছে। রওনা হইলাম বাঘাউড়ার দিকে। বাঘাউড়া পৌঁছিয়া দেখি, ঠিক তেম্‌নিভাবে আপনি বসিয়া আছেন। দুই পাশে চিঠির স্তূপ। সেই গরম দুধের বাটি মিলিল, মিশ্রি মিলিল কিন্তু মিলিল না শুধু শালা-সম্বোধন আর কাণমলা।

বিরামপুর, ত্রিপুরা

১৬ই পৌষ, ১৩৩৪

শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামান্তরে আসিয়াছেন। অপরাহ্নে প্রথমতঃ জনৈক বৈষ্ণব সাধুর বাড়ীতে উঠিলেন। বসিতেই সাধুনিন্দার কথা উঠিল।

সাধু ও নিন্দা

বৈষ্ণব সাধু বলিলেন,—যারা সাধু-নিন্দা করে, তারা পাপ-সঞ্চয় করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অপর দিকে, নিন্দকের ক্ষুরধার জিহ্বা সাধুপুরুষের গায়ের ময়লা দূর করে, তাঁকে সুন্দর করে।

বৈষ্ণব সাধু বলিলেন,—পেচক সূর্য্যালোকের দিকে তাকায় না, অন্ধকারই ভালবাসে। লোকের সহস্র গুণ থাক্‌লেও নিন্দুক তার দিকে তাকায় না, শুধু দোষই খুঁজে বেড়ায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকে যাকে নিন্দা করে, সে বড় ভাগ্যবান্। পরমদয়াল গুরু লোকের জিহ্বায় বাস ক'রে যাকে শাসন করেন, তার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে আছে?

অন্ধবিশ্বাস ও অবিশ্বাস

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক বৈদান্তিক ডাক্তারের বাড়ীতে আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্ধবিশ্বাস আর অবিশ্বাস একই কথা; কারণ, প্রত্যক্ষ ব্যতীত কখনও প্রকৃত বিশ্বাস হয় না। অন্ধবিশ্বাসী যতক্ষণ বিগ্রহের কাছে ব'সে থাকে, ততক্ষণই বিশ্বাসী, কিন্তু উঠে দাঁড়ালেই অবিশ্বাসী। নারদ সেজে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনেতা বেশ হরি-গুণগান কচ্ছেন আর বীণ্ বাজাচ্ছেন,—আবার পরক্ষণেই গ্রীণরুমে গিয়ে অভিনেত্রীদের সঙ্গে এয়ার্কি ঠুক্‌ছেন। এই নারদের হরি-প্রেম যতক্ষণ, অন্ধবিশ্বাসীরও বিশ্বাস ততক্ষণ। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব আজ সবাই বল্‌ছেন,—অন্ধবিশ্বাসী হও, তাতেই শান্তি, তাতেই সুখ। সবাই

বল্‌ছেন,—সন্দেশের নাম শুনেই জিভে মিষ্টি আস্বাদ অনুভব কর, নইলে মোক্ষ হবে না। মুস্কিল আর কি! কেন বাবা, অন্ধবিশ্বাসের অত প্রশংসা, অত স্তুতি? প্রত্যক্ষ লাভ কি অসম্ভব? প্রত্যক্ষ কি কেউ করে নাই, না কেউ কত্তে পার্ব্বে না? প্রত্যক্ষ করার খোলা পথ রয়েছে, তবু বলে কিনা অন্ধবিশ্বাস ভালো। যে বিশ্বাস প্রত্যক্ষের উপর দাঁড়ায় নি, তার নাম যে অবিশ্বাস! যে ভক্তি প্রত্যক্ষের উপর দাঁড়ায় নি, তার নাম যে অভক্তি! যে জ্ঞান প্রত্যক্ষের স্পর্শ পায় নি, তার নাম অজ্ঞান।

প্রণাম ও ভণ্ডামি

তারপরে প্রণামের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পায়ে প'ড়ে লম্বা হয়ে যত লোক প্রণাম করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই করে ভণ্ডামি। সাধু পেয়েছ, আর কি, তার পা-টাকে টেনে একবার দাও মাথায়, একবার দাও মুখে, একবার দাও বুকে, একবার দাও পেটে, একবার দাও পিঠে। আসল ভক্তি এসব বাড়াবাড়িতেই ম'রে গেল, পৃথিবী শুধু কপটতা, মিথ্যা আর কদাচারে ভ'রে গেল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—হাঁ, স—বাবুর বাড়ীতে যে একজন আপনাকে প্রণাম কচ্ছিল, তাকে আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, "প্রণামের এত ঘটা কেন?" সে বল্লে,—শিব-জ্ঞানে প্রণাম কচ্ছি। তাতে আমি বল্লাম—শিব কি আমিও নই?

জীবে জীবে শিবজ্ঞান, আধ্যাত্মিক ভিক্ষাবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক বলেছেন, শিবই যদি ভাব্‌তে হয়, তবে জীবে জীবে শিব-জ্ঞান। একজন শিব, আর একজন অশিব, এ ত' হ'তে পারে না! আসল কথা, সাধন-ভজন কেউ কর্ব্বে না, নিজে

মেহনত কর্ত্তে কেউ রাজী নয়। কি অর্থ-জগতে, কি ধর্ম্ম-জগতে সবাই রয়েছে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে, দু'মুঠা ভিক্ষার কাঙ্গাল হ'য়ে। প্রত্যেকে চাচ্ছে, আর একজনার পায়ের তলায় প'ড়ে থেকে ফাঁকি দিয়ে ভগবান্ লাভ সম্ভব হয় কি না, তাই একবার দেখা যাক্। রামপ্রসাদ বল্‌তেন,— "মুণ্ডমালা ছিঁড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বার চড়াব।" এ রকম সৎসাহস কোনো সাধকের নেই। দেখুন ডাক্তারবাবু, আমরা সব ফোঁটা-তিলকের সাধক, চিম্‌টা-বাঘছালের সাধক, কৌপীন-কমণ্ডলুর সাধক, ভগবানের সাধক নই। তাই এই দুর্গতি, তাই এই অধঃপতন।

গুরু

অতঃপর গুরুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুর চেয়ে আপন নাই। কিন্তু গুরু কে? ব্রহ্মই গুরু। কিন্তু ব্রহ্মই যে গুরু, তা' যিনি বুঝ্‌তে পারেন না, তাঁর উপায়? তাঁর পক্ষে গুরু-নির্ণয়ের পথ অভয়। যাঁর দর্শনে ভয় দূরে যায়, যাঁর স্পর্শনে ভয় দূরে যায়, যাঁর স্মরণে ভয় দূরে যায়, তিনিই সদ্‌গুরু! যাঁর মুখের কথাটী শুন্‌লে ভয় পালায়, প্রাণ নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক হয়, তিনিই সদ্‌গুরু। যিনি তা' নন্ তিনিই অসদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বলেন,—ওরে দেখ্, ব্রহ্মপূজাই আমার পূজা, জগৎ-কল্যাণে আত্মসমর্পণই আমার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন; আমার পূজার জন্য যে ব্রহ্মপূজায় অবহেলা করে, আমার সম্মানের জন্য যে জগৎকল্যাণে শৈথিল্য করে সে আমার কেউ নয়। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বলেন,—দেখ্, সত্যের জন্য যেদিন আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না, সেই দিনই তুই প্রকৃত শিষ্য। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বলেন,—আমার চেয়ে

যাঁরা বড়, তাঁদের চেয়ে আমাকে বড় ভাবিস্ না, তাদের উপরে আমাকে স্থান দিস্ না। সদ্‌গুরু শিষ্যের চাল-কলার বাধ্য নন্, তার প্রকৃত উন্নতিরই বাধ্য।

গুরু-শিষ্যের নানা ব্যবহার

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি গুরু-শিষ্যের নানা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বলিতে লাগিলেন,—সদ্‌গুরু বল্লেন, হে শিষ্য, তুমি নাকি আমার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলেছ? শিষ্য বল্লেন,—একথা সত্য, কারণ আপনার পথ আমার ভাল লাগ্‌ল না। সদ্‌গুরু বল্লেন,—বেশ করেছ, খুসী হ'য়েছি, তোমার স্বাধীনতা দিয়েই তোমার সাথে আমার সম্বন্ধ, পরাধীনতা দিয়ে নয়। অসদ্‌গুরু বল্লে,—হে শিষ্য তুমি নাকি আমার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরেছ? শিষ্য বল্লে,—আজ্ঞে হাঁ। অসদ্‌গুরু বল্লে,—তোমার নির্ব্বংশ হোক, তুমি জাহান্নমে যাও, তোমার চৌদ্দপুরুষ নরকে ডুবুক্। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বল্লেন,—বাবা! শিষ্য বল্লেন,—আমাকে পুত্রভাবে সম্বোধন কর্ব্বেন না, আমি আপনার পুত্র নই। সদ্‌গুরু বল্লেন,—বন্ধো! শিষ্য বল্লেন,—আমি আপনার বন্ধুও নই, মুখ সামলে কথা বলুন। সদ্‌গুরু বল্লেন,—ভাই! শিষ্য বল্লেন,—আমি আপনার ভাইও নই, বেশী আত্মীয়তা কর্ব্বেন না। সদ্‌গুরু বল্লেন,—আচ্ছা সবই মান্‌লুম, হে নিঃসম্পর্কীয়, হে সম্বন্ধাতীত! শিষ্য চুপ ক'রে রইলেন। সদ্‌গুরু বল্লেন,—নিঃসম্পর্কের মধ্য দিয়েই তোমার আমার সম্বন্ধ, এ সম্পর্কের আর ছেদ-ভেদ নেই, এ সম্বন্ধের আর ছাড়াছাড়ি নেই।

১৭ই পৌষ, ১৩৩৪

বিদ্বেষ জরামরণের অধীন

শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরার জনৈক পল্লী-সেবক কর্ম্মীকে বলিলেন,—বিদ্বেষের উপর দাঁড়িয়ে যে আন্দোলন সুরু হয়, তা' কখনও স্থায়ী হয় না। স্ফীতি তার যথেষ্ট, কিন্তু মরে সে সকালে। কারণ, প্রেমই অমর, বিদ্বেষ জরা-মরণের অধীন।

সত্য ও বিদ্বেষ

কর্ম্মী বলিলেন,—বিদ্বেষমূলক আন্দোলনও স্থায়ী হ'তে পারে, যদি সত্য তাতে থাকে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্য সব আন্দোলনেই আছে। একমণ তূষ মাটীতে ছড়িয়ে দাও, দেখ্‌বে, তোমার অজ্ঞাতসারে সেই তূষের মধ্যে লুক্কায়িত একটী মাত্র ধানের বীজ মাটিতে প'ড়ে কত বীজের ধান উৎপন্ন কচ্ছে। আবার, বীজের জন্য সযত্নে রক্ষিত ধানগুলি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দাও, দেখবে, তার ভিতরেও তূষ আছে। তূষগুলি মাটীতে প'ড়ে পচে যাবে, তূষ থেকে গাছ হবে না। সত্য আন্দোলনের ভিতর যে অসত্যটুকু আছে, তা' মাঠে প'ড়ে বৃষ্টির জলে প'চে মরবে, আর, অসত্যের আন্দোলনে অজ্ঞাতসারে যে সত্যের বীজ আছে, অজ্ঞাতসারেই তা' অঙ্কুরিত হবে, পল্লবিত হবে, জগৎকে লাভবান্ কর্ব্বে।

সাধারণের ধর্ম্মবোধের উৎস

বৈকালে গ্রামান্তর হইতে একটী যুবক আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুর-ঘরে যে ওঙ্কার-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁকে প্রণাম করেছ ?

যুবক বলিলেন,—সম্মুখেই মালিক থাকতে অপর বিগ্রহকে কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ও সব ছেঁদো কথা। ওঙ্কার-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কিনা, তাই তাঁকে প্রণাম কত্তে মন যায় না। কিন্তু যদি কালী-মূর্ত্তি থাকত, তবে বাপুরা সব ওলাউঠার ভয়ে প্রণাম কত্তো। মনসা থাক্‌লে সাপে খাওয়ার ভয়ে, শীতলা থাক্‌লে বসন্তের ভয়ে, আর শিব থাক্‌লে ত্রিশূলের ভয়ে,—কেমন এই না ? মোট কথা, জগতের অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্মবোধ জাগ্রত হয় ভয় থেকে। প্রেম থেকে ধার্ম্মিক আর কয়জন ?—কোটিতে গোটিক হয়।

মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্মবোধ সহজাত

গ্রামেরই একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন,—তবে আপনারা এত ঘটা ক'রে ধর্ম্মপ্রচার করেন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্ম কোনও প্রচারের অপেক্ষা রাখে না। ধর্ম্মবোধ মনুষ্যমাত্রেরই সহজাত। কিন্তু সেই সহজাত বোধ সুপ্ত হ'য়ে প'ড়ে থাকে,—তাই, মানুষ আকারে মনুষ্য হ'য়েও প্রকারে পশুই থাকে। সেই সুপ্ত ধর্ম্মবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমরা ধর্ম্মপ্রচার করি। যা' ছিল না, তাকে সৃষ্টি করার জন্য নয়, গুপ্ত, সুপ্ত ভাবে যা' লুপ্তপ্রায় অবস্থায় ছিল, তাকেই প্রকট ক'রে তোলার জন্য আমরা ধর্ম্মপ্রচার করি। প্রচার ব্যতীতও এই ধর্ম্মবোধ কারো কারো জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। কারো জাগে প্রেমে, কারো জাগে ভয়ে। ভয়ের জাগরণ স্বার্থপরায়ণ ধার্ম্মিক-তার উদ্ভব ঘটায়, প্রেমের জাগরণ সমগ্র জীবনকে নিঃস্বার্থ কর্ম্মে মহিমময় করে। বোধস্বরূপ পরমেশ্বর প্রতি জীবের মধ্যে আছেন, তিনি সকলের মধ্যে প্রকট হবার জন্য প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতি রোমকূপে, প্রতি অণু-

পরমাণুতে ওঙ্কার-রূপে নিজ-গৌরব-গীতি গান কচ্ছেন। এই কথাটুকু জান্‌লেই জীব নিশ্চিন্ত।

ওঙ্কার

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওঙ্কার জিনিষটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার ভগবানের সংক্ষিপ্ততম নাম। জগতের সকল নাদের বৈষম্যটুকু দূর হ'লে যেটুকু সকলের মধ্যে পাওয়া যায়, তাই ওঙ্কার। আবার সকল ধ্বনি একত্র সম্মিলিত হ'লে যা' হয়, তাও ওঙ্কার। ওঙ্কার সকল ধ্বনির প্রাণ। ওঙ্কার সকল ধ্বনির সমন্বয়, স্বীকৃতি ও সমাহার।

ওঙ্কারের ঐতিহ্য

প্রশ্ন।—ওঙ্কারের উপাসনা কে প্রবর্ত্তন করেছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিরা। আর, এর প্রবর্ত্তন হয়েছে মানুষের সর্ব্বসাহিত্য রচনার পূর্ব্বে, এমন কি বেদ-শাস্ত্রেরও আগে। ভগবানকে প্রণব অবলম্বনে সাধন করা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাধনা। প্রণবের আধারেই বেদ-মন্ত্রের আবির্ভাব, প্রণবের মাধ্যমেই যাবতীয় অনার্য্য জাতির সকল সাধন-সম্পদ, কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য আর্য্য জাতির কৃষ্টি ও সংস্কারের অঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়ে এত বড় বিরাট ভারত-সভ্যতার সৃষ্টি করেছে।

ওঙ্কারের প্রকৃত উচ্চারণ

যুবক বলিলেন,—ওঙ্কারের উচ্চারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শুনান কঠিন, কিন্তু সাধন কত্তে কত্তে বোঝা যায়। সাধন কর, শুন্‌তে পাবে। যে মন্ত্র ধ'রেই ভগবান্‌কে ডাক না কেন, সকল নামের শেষ পরিণতি যেই অখণ্ড অনাদি অনির্ব্বচনীয় ধ্বনিতে,

তাই ওঙ্কার। লোকে যে 'ওম্', 'ওম্' ক'রে জপ করে, প্রকৃত ওঙ্কার তা' নয়। তবে তা' হচ্ছে প্রকৃত ওঙ্কারের নিকটতম ধ্বনি, নিভুর্লতম আভাস এবং ঐ ভাবে জপ কত্তে কত্তে ক্রমে তা' শুনা যায়।

ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণের সহজ উপায়

যুবক।—কোনো সহজ উপায় নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আছে। চ'খ মুখ বুজে স্থির হ'য়ে বসে দেহের মধ্যে মন স্থির কর। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বনির সমষ্টিও যা, সমগ্র দেহের ধ্বনির সমষ্টিও তাই। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব আছে। প্রথমতঃ শুন্‌তে পাবে, ফুস্‌ফুসে কাঁসারীর ভস্ত্রা চল্‌ছে। তারপরে শুন্‌তে পাবে, হৃৎপিণ্ডের ভিতরে কামারের হাতুড়ী চল্‌ছে। পাকস্থলীতে শুন্‌তে পাবে, কত শব্দ ক'রেই বয়লার জ্বল্‌ছে। মূত্রস্থলীতে শুন্‌তে পাবে, ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরণা ব'য়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শুন্‌তে পাবে, যেন দশলক্ষ টেলীগ্রাফ্-যন্ত্রের টরে-টক্কা একই সময়ে চল্‌ছে। দেহের যে শব্দ অম্‌নি শুন্‌তে পাও না, মন স্থির ক'রে বস্‌লেই তা' স্পষ্ট অনুভূতিতে আস্‌বে। এইসব রকমারি শব্দের হট্টগোলে প'ড়ে প্রথমটাতে ত' যাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখ্‌বে, যেন ঐক্যবাদন। এক সঙ্গে সেতার, এস্রাজ, সুরবাহার, বীণ্, বাঁশী, বেহালা বাজ্‌তে থাক্‌বে। তারপর সব মিলে একটা হবে, যার আর তুলনা দেবার সাধ্য নেই। তাই হচ্ছে ওঙ্কার।

জপকালে ওঙ্কারের উচ্চারণ

যুবক।—জপকালে ওঙ্কারের উচ্চারণ কি হওয়া উচিত? ওম্ হবে, না ওং হবে, না অউম্ হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—জিহ্বাকে তালুমূলে রেখে জপ করার কালে আপনিই উচ্চারণ "ওং" হয়। জিহ্বাকে দাঁতের কাছে রেখে উচ্চারণ কল্লে এই অনুনাসিক ভাবটা কিছু কম হয়। ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ কল্লে "ওম্"ই আপনা-আপনি আসে। খুব দীর্ঘ ক'রে উচ্চারণ কত্তে গেলে "অউম্" উচ্চারণ আপনিই আসে। এই যে কয় রকমের উচ্চারণ, সবই অবস্থা-ভেদে স্বাভাবিক উচ্চারণ, তাই তাদের শুদ্ধ ব'লেই গণনা কত্তে হবে। সাধন কত্তে কত্তে অভ্যাসের ফলে সাধকের মুখে "ওং" এবং "ওম্" এই দুইটী উচ্চারণের মধ্যবর্ত্তী একটী উচ্চারণ আসে, যাকে কোনও অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না ব'লেই "ওঁ" এই প্রতীকটী দ্বারা তাকে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে।

যুবক।—তাহ'লে ওং, ওম্, অউম্, এইসব উচ্চারণের একটীও ভুল নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না। তবে "অম্" বা "অং" বা আম্" কখনো ব'লো না।

১৮ই পৌষ, ১৩৩৪

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে কথাবার্ত্তা হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাজনীতিতে আর ধর্ম্মনীতিতে বড় ঝগড়া। রাজনীতিকেরা মনে করেন যে, ধর্ম্ম রাজনীতির শত্রু, তাই তাঁরা ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে বড় গালাগালি করেন। এতকাল রাজনীতির চর্চ্চাকারীদের মধ্যে প্রকৃত ত্যাগী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বড় অল্প দেখা যেত, তাই এই গালাগালিগুলি ভিত্তিহীন

-ব'লে মনে করা হ'ত। কিন্তু আজকাল স্বার্থত্যাগী চরিত্রবান্ পুরুষদের সংখ্যা রাজনীতি-চর্চ্চাকারীদের মধ্যে ক্রমশঃ বাড়্ছে। সুতরাং এই গালাগালিগুলি সবই যে মিথ্যা, তা' মনে করা চলে না। এদিকে একদল ধর্ম্মনীতির সেবক রাজনীতিকে ধর্ম্মের বিঘ্ন ব'লে মনে ক'রে থাকেন এবং নিন্দা-বাদও করেন। লোকে এঁদের কথাও মিথ্যা ব'লে মনে করে না। এক্ষণে এই দুই বিরোধী মতের সামঞ্জস্য কোথায়? আমার ত' বিশ্বাস, ধর্ম্মে আর রাজনীতিতে প্রকৃত কলহ কিছুই নেই। পেটের ক্ষুধা থেকে রাজনীতির উৎপত্তি, আর প্রাণের ক্ষুধা থেকে ধর্ম্মনীতির উৎপত্তি। একটা মানুষের দুটো ক্ষুধাই থাকে, তাই দুটোরই তা'র সামঞ্জস্য ক'রে চল্‌তে হবে। যার যেটার ক্ষুধা বেশী, সে বরং সেটার দিকে একটু বেশী লক্ষ্য রাখ্‌বে, এই পর্য্যন্ত। রাজনীতি-পন্থীরা অনেকে যে ত্যাগী ও জিতেন্দ্রিয় হ'য়েও ধর্ম্মকে গাল দেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন নি, ভগবৎ-প্রেম যে কত মধুর, ভগবৎ-সাধনা যে মেরুদণ্ডে কতখানি বল বাড়ায়, তা' কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি। আবার ধর্ম্ম-নীতির সেবকেরা যে রাজনীতি-পন্থীদের নিন্দা করেন, তার কারণ এই যে, তপস্বী যে সামান্য অন্ন একবেলা খেয়ে তপস্যা করেন, সেই অন্ন কোথা থেকে আস্‌ছে, কেমন ক'রে আস্‌ছে, কে দিচ্ছে, কত কষ্ট স'য়ে দিচ্ছে, এই বিষয়ে কোনোও খবর রাখেন না। তাই এত ভেদবিসম্বাদ। নইলে সবাই ত' এক জগন্মঙ্গলেরই উপাসক! আমি রাজনীতি-প্রচার করি না ব'লে রাজনীতিপন্থী ভাই আমাকে দেন ক'ষে গালাগালি, আর অন্য একজন ফোঁটা-তিলক কাটেন না ব'লে আমি দেই তাঁকে ক'ষে গালাগালি,—এসব হিংসার লক্ষণ। আমার বিশ্বাস, ভগবৎ-প্রেমিক পুরুষ যেদিন দেশের দুঃখে ব্যথিত হবেন, আর স্বদেশ-প্রেমিক পুরুষ

যেদিন ভগবানের মুখের পানে তাকিয়ে চল্‌বেন, সেইদিন ভারতবর্ষ তার প্রকৃত দুঃখ কটাক্ষে দূর কত্তে পার্ব্বে।

ধর্ম্মপ্রচারকের রাজনীতি-চর্চ্চা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন আস্‌তে পারে যে, ধর্ম্মপ্রচারকেরা রাজনীতি-চর্চ্চা কর্ব্বেন কি? এর সহজ জবাব কিছু হয় না। ধর্ম্মের কাজ সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা সৃষ্টি ক'রে জীবে জীবে ঐক্য-সাধন, ধর্ম্মের কাজ জীবের জীবত্ব ঘুচিয়ে তাকে শিবত্ব দান। রাজনীতির কাজ হচ্ছে নাগরিকরূপে যার যা অধিকার, তা' আদায় করা, কোনও উচ্চতর শক্তি স্বৈরমদে তা' কেড়ে নিতে না পারে, তার জন্য আন্দোলন করা। দুটী জিনিষের লক্ষ্য আলাদা। দুটী জিনিষের প্রকৃতিও আলাদা। ঘৃণা, দ্বেষ ও মিথ্যার অনুশীলন ছাড়া রাজনীতি-চর্চ্চা বড় কঠিন। রাজনীতিকেরা অধিকাংশ সময়েই ভাষার লালিত্যে ,ঘৃণা-দ্বেষ-অসত্যকে ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়ে কাজ ক'রে থাকেন। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচারকদের রাজনীতির রাস্তায় পদচারণা করা সাধারণ ক্ষেত্রে নিশ্চিতই ক্ষতিকর। কিন্তু তুমি ধর্ম্ম নিয়ে আছ ব'লেই রাজনীতি-চর্চ্চার একচেটিয়া অধিকার তুমি অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছ বা তাদের কাছে বন্ধক রেখেছ, এমন ধারণা অন্যায়।

গুরূপদেশ ও প্রত্যক্ষ

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরু এক মন্ত্র দিয়েছেন, ওটাই ঠিক পথ কিনা, সংশয় হয়, এখন উপায় কি কর্ব্ব?

উঃ।—ঐ পথেই চল্‌তে থাকুন, শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছে যদি দেখেন, গুরু না জেনে একটা ভুল পথ দিয়ে দিয়েছেন, তবে তখন তাঁর কাণ দু'টো বেশ ক'রে ম'লে দেবেন।

প্রঃ।—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা কি ক'রে জান্‌ব?

উঃ।—প্রাণপণ সাধনের ফলে প্রত্যক্ষ ক'রে জানুন। প্রত্যক্ষই যথার্থ জ্ঞানের জনক, লোক-ভাষণ নয়। কেউ বল্‌বে সত্য, কেউ বল্‌বে মিথ্যা, কিন্তু তাতে কি এগুবে? শুধু সংশয়ই বাড়্‌বে। একমাত্র প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই সংশয়চ্ছেদন কত্তে পারে, আর কিছুতে পারে না। যে পথটাতে চল্‌ছেন, ওটা প্রকৃতই যদি মিথ্যা হয়, তবে সাধনের চরম অবস্থায় তা' অবশ্যই জানতে পার্ব্বেন।

প্রঃ।—কিন্তু শেষটাতে যদি দেখি এটা মিথ্যাই বটে, তবে ত' এত শ্রম সবই বৃথা হবে!

উঃ।—না, বৃথা হবে না। একটা মিথ্যাকে যিনি নিজের শক্তিতে ঠিক্ ঠিক্ অভ্রান্ত ভাবে মিথ্যা ব'লে জান্‌তে পারেন, তিনি সকল সত্যের সাক্ষাৎকার অম্‌নি পান। তার জন্য আর গুরূপদেশের আবশ্যকতা পড়্‌বে না। কঠিন শ্রম ক'রে যদি গৃহীত পন্থাকে নির্ভুল ভাবেই মিথ্যা ব'লে বুঝ্‌তে পারেন, তখন দেখ্‌বেন, জগতের সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত সত্যের দুয়ার আপনার সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত!

প্রঃ।—কিন্তু শাস্ত্রে বলে, বদ্ধজীবের মুক্তি নেই! সেই জন্যেই বড় চিন্তিত।

উঃ।—মুক্তির জন্য ভাব্‌বেন কেন? আপনার মত দু'একটা লোকের মুক্তি না হ'লে কি যায় আসে? যে পথ পেয়েছেন, এটা প্রকৃতই মিথ্যা কি না, তার চরম খোঁজ ক'রে নিয়ে তারপরে মুক্তির জন্য লালায়িত

হবেন। মুক্তির লোভে নিত্য নূতন পথের পানে তাকানো কতবড় ঝকমারি, তা' কি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না? অপর কর্ত্তৃক দীক্ষিত ব্যক্তিকে পুনরায় যাঁরা দীক্ষা দিতে চান, তাঁরা ত' উচ্ছিষ্ট-ভোজী। ওঁদের কাছে যাবেন না। নিজের শক্তিতে নির্ভর করুন, ভক্তি-মুক্তি আপনার করায়ত্ত হবে।

সাধু চিনিবার উপায়

উক্ত ভদ্রলোক চলিয়া গেলে বিরামপুর-নিবাসী সাধক শ্রীযুক্ত সারদা ডাক্তারের সহিত কথা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁকে দেখ্‌লে প্রাণের ভিতর আপনা-আপনি ইষ্টনাম হ'তে থাকে, তিনিই সাধু। এইটী হচ্ছে সাধু চিন্‌বার উপায়। যাঁকে দেখ্‌লে জীবে প্রেম জন্মে, তিনিই সাধু। এইটী হচ্ছে দ্বিতীয় উপায়। যাঁকে দেখ্‌লে সংশয়-নাশ হয়, তিনিই সাধু। এইটী হচ্ছে তৃতীয় উপায়। যাঁর সঙ্গ কর্‌লে সংশয়-নাশ হোক্ আর না হোক্ নূতন সংশয় জন্মে না, তিনিও সাধু। এইটী হচ্ছে চতুর্থ। সাধুর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে এই যে, তিনি সাধন করেন। কিন্তু কে সাধন করেন, আর না করেন, তা' জান্‌ব কি ক'রে? তাই, এসব সাধু চিন্‌বার উপায়।

শূদ্র, প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী

তৎপর ওঙ্কার সম্বন্ধে কথা উঠিল। জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—শূদ্রে ওঙ্কার উচ্চারণ কল্লে পতিত হয়!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শূদ্রত্ব থেকে পতিত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়।

সকলে হাসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দুঃসাহস ক'রে এমনও বলেন যে, শূদ্ররা প্রণব বা ব্রহ্মগায়ত্রী উচ্চারণ কর্লে নরকে যায়। ঢের শূদ্র এই কথা বিশ্বাসও করে। কিন্তু এই সহজ যুক্তিটা কারো মাথায় আসে না যে, যা উচ্চারণ বা জপ কর্লে শূদ্রের নরক হবে, তা' উচ্চারণ বা জপ ক'রে ব্রাহ্মণ কি ক'রে স্বর্গলাভ কর্ব্বে? ওঙ্কার বা গায়ত্রী যদি বিশ্ব-পাবন-মন্ত্র হয়, তবে সকলকেই উদ্ধার কর্ব্বে। অগ্নিতে যদি দাহিকা শক্তি থাকে, তবে ব্রাহ্মণের শবও পোড়াবে, শূদ্রের শবও পোড়াবে,—পক্ষপাতিত্ব ক'রে কাউকে বেশী বা কাউকে কম ক'রে দগ্ধ কর্ব্বে না। প্রণব আর ব্রহ্মগায়ত্রীর মহাবলেই ত' কোটি কোটি অনার্য্যকে একদিন আর্য্য জাতির অঙ্গীভূত করা হয়েছিল, তখন প্রণব বা গায়ত্রী উচ্চারণের দ্বারা কারো নরক হ'ত না। যাই ব্রাহ্মণেরা কূপমণ্ডুক হ'লেন, সঙ্গে সঙ্গে নরকের আমদানী হ'ল। যেই মুহূর্ত্তে আর্য্যজাতি সম্প্রসারণ-শীলতা ত্যাগ কর্ল্ল, সেই মুহূর্ত্ত হ'তেই অকারণ অনুষ্টুপ রচনা ক'রে ক'রে মানুষে মানুষে ভেদকে পাকা করার চেষ্টা হ'ল। এসব গ্রাহ্য করার দিন আর নেই।

ব্রাহ্মণের ওঙ্কার ও শূদ্রের নম-নম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বল্‌তে পার, বলবান্ ব্যক্তিরই ঘৃত সহ্য হয়, দুর্ব্বল ব্যক্তি ঘৃতের বদলে সর্ষের তেলই খাবে,—ব্রাহ্মণেরা ওঙ্কার উচ্চারণ কর্ব্বেন আর অব্রাহ্মণেরা কর্‌বে নম-নম। এ যুক্তি খাটে না। দুর্ব্বল ব্যক্তিও বেরিবেরি থেকে বাঁচতে হ'লে সর্ষের তেল বর্জ্জন ক'রে ঘৃতই খাবে। বেশী হজম কত্তে না পারে, কম কম খাবে। আস্তে আস্তে অভ্যাস কর্লে ঘৃতের বল ও পুষ্টি দুর্ব্বলের শরীরেও আসতে থাক্‌বে।

শূদ্রেরা কেন প্রণবাধিকার-বঞ্চিত হইল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টার বিচার করা সঙ্গত। শূদ্র ওঙ্কারমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল, ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার পেল কিন্তু এই দীক্ষার আর এই অধিকারের সদ্ব্যবহার সে কর্ল্ল না। সে অনাচার, কদাচার, নীচাচার বর্জ্জন কর্ল্ল না। সে পাপ থেকে, মিথ্যা থেকে, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ-দর্প-দম্ভ থেকে নিজেকে দূরে রাখল না। সে কদাচার, হীনাচার, নীচাসক্তি, জীবন-যাপনের জঘন্যতা এবং অপরিচ্ছন্নতা ছাড়ল না। তেমন ব্যক্তির কাছে অশেষ উদারতা ক'রে প্রণব ও গায়ত্রীর অমৃতভাণ্ড খুলে ধরলেও ত' কোনো লাভ নেই! আমার মনে হয়, শূদ্রকে প্রণবাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার মধ্যে এই কারণটী একান্ত তুচ্ছ নয়। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ্যের অধিকার বারংবার দেওয়া হয়েছে এবং সে শূদ্রোচিত নীচতা পরিহার না ক'রেই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাটুকু আহরণে চেষ্টিত হয়েছে। আমি নিজের চক্ষে যা' দেখ্‌তে পাচ্ছি, প্রাচীনের ব্রাহ্মণেরা সেই দৃশ্য বারংবার দেখে দেখে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শূদ্ররা এজন্যই স্থায়ী ভাবে প্রণবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়্‌ল। পাপ ছাড়া পতন হয় না, পাপে চিরন্তনী একনিষ্ঠা থাকার দরুণ পতিতের পুনরভ্যুদয়ও ঘটে না। শরীর ও মনের অশুচিতা কেবল পাপই নয়, সংক্রামক পাপ।

ধর্ম্মের জীবন্ত লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, কিন্তু সেই অধম, পতিত, অভাজনগণেরও ভিতরে ব্রহ্ম আছেন। সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে সনাতন ধর্ম্ম তার অবিসংবাদিত গরিমায় বিগুমান থাক্‌বেন। পতিতকে যে টেনে তোলা যায়, এইটাই ধর্ম্মের জীবন্ত সত্তার লক্ষণ।

শক্তি-সঞ্চালনী পরিভ্রমণের উপযোগিতা

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি বলেছেন মনটাকে দেহের মধ্যে ভ্রমণশীল রাখ্‌তে। এর লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—লাভ এই যে, যে মনটা কামাতুর হ'য়ে বার বার জননাঙ্গে বস্‌তে চায়, পরিভ্রমণের অভ্যাসের ফলে সে দেহের সর্ব্বাঙ্গে চল্‌তে থাকে, একখানে এসে ব'সে থাকা আর তার হ'য়ে উঠে না, তাই কাম থেকে উদ্ধার হয়। মন উপস্থে এলেই বিপদ। তাই, তাকে উপস্থ থেকে দূরে রাখ্‌বার জন্য এই কৌশল। এইভাবে বার বার পরিভ্রমণ ক'রে যখন তার কামের কথা ভুল হ'য়ে যায়, তখন তাকে সহজেই ভ্রূ-মধ্যে আনা চলে এবং নাম-সাধনে আনন্দও তখন গভীর হয়।

যৌগিক পরিভ্রমণ ও দেহাত্মবোধ-নাশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যৌগিক পরিভ্রমণের আর একটা সুফল হচ্ছে ক্রমশঃ দেহাত্মবোধের নাশ। তুমি যে কে, সেই পরিচয় তোমার এখনো হয় নি কিন্তু দেহটাকে 'আমি' 'আমি' ব'লে জ্ঞান ক'রে দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবীর কাছে নিয়ত নিজের লক্ষ্যকে, নিজের সত্তাকে বলি দিচ্ছ। কিন্তু এই দেহের ভিতর দিয়ে বারংবার মনকে ভ্রমণশীল রাখ্‌তে রাখ্‌তে ক্রমশঃ তোমার সুস্পষ্ট উপলব্ধি এসে যাবে যে, দেহটা তোমার কাজ কর্ব্বার যন্ত্রমাত্র, দেহটা তুমি নও, দেহটা তোমার স্বরূপ নয়। এ ভাবে তোমার দেহাত্মবোধ কম্‌তে থাক্‌বে। অতএব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ইন্দ্রিয়াসক্তির তীক্ষ্ণ মুখগুলি ক্রমশঃ ভোঁতা হ'য়ে যেতে থাক্‌বে।

যৌগিক পরিভ্রমণ ও জগন্মঙ্গলের যোগ্যতাসঞ্চয়

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—তোমার দেহাত্মবোধের নাশ হচ্ছে মুখ্যত তোমার ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপার। কিন্তু সমগ্র দেহ জু'ড়ে পরিভ্রমণ কচ্ছ ত' জগতের মঙ্গল-সঙ্কল্পকে সাথে নিয়ে। এতে তোমার দেহের প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশে জগতের কল্যাণমূলক শুভবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কখনো মনে ক'রো না যে, সঙ্কল্প-সাধনে কেবল মস্তিষ্কই তোমার সহায়ক,—শরীরের প্রত্যেকটা অণুপরমাণুকে সঙ্কল্পের প্রভাবে অনুকূল ক'রে নিতে হয়। তোমার দেহটা তোমার হাতের যন্ত্র কিন্তু দেহটা একটা দুইটা অণুপরমাণুর সমষ্টি নয়, কোটি কোটি অণুপরমাণুর সমষ্টি। প্রত্যেকটা অণুপরমাণুর প্রাণ আছে, আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। স্বৈরতন্ত্র দেশে রাজা বা ডিক্টেটার যেমন ধারণাও কত্তে পারে না যে, গণ-সাধারণের প্রতিজন মুক, মৌন, নীরব থাক্‌লেও তাদের সঙ্গে সংযোগ-সাধন ব্যতীত রাজ্য চালান অসম্ভব, ঠিক্ তেম্‌নি তোমরাও জান না যে, দেহ-রাজ্য সেই রাজ্যের কোটি কোটি মূক, মৌন, নীরব জনতাস্বরূপ অণুপরমাণুদের সহিত শুভ-সংযোগ সাধন ব্যতীত সুষ্ঠু ও সঙ্গত ভাবে পরিচালন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রে যেমন শাসন-কুশলতার জন্য গণ-সংযোগ প্রয়োজন, দেহে তেমন মহৎ ব্রত সম্পাদনের জন্য অণু-সংযোগ প্রয়োজন। যৌগিক জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণের দ্বারা তুমি তোমার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুর সঙ্গে একটা অদ্ভুত গণ-সংযোগ সাধন কচ্ছ। এতে তোমার জগন্মঙ্গল কর্ম্মে যোগদানের অদ্ভুত সামর্থ্য বেড়ে যাবে। তোমাদের যৌগিক পরিভ্রমণের এটা হচ্ছে সার্ব্বভৌমিক দিক্, সার্ব্বজনিক দিক্,—যেটা তোমার ব্যক্তিগত সকল লাভের চেয়েও কৌলীন্যে অনেক বড়।

উপভুক্তা স্ত্রীদেহ ও মাতৃভাব

একজন প্রশ্ন করিলেন,—যে স্ত্রীদেহটাকে একবার ভোগ করা হ'য়েছে, তার প্রতি কি মাতৃভাব আস্‌তে পারে ?

উঃ—। খুব পারে, সাধন কর্লেই পারে। স্কুলে যার সঙ্গে পড়েছ আর দাদা বলে ডেকেছ, গল্প-এয়ার্‌কী মেরেছ, তার বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করার পর তাঁকে শ্বশুরমশাই ভাবা যায় না ?

আসক্তি-বর্জ্জিত মন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাপে আসক্তি থাক্‌লে পূর্ব্বকৃত পাপকে ভোলা শক্ত। পূর্ব্বে যারা পাপের-সঙ্গী ছিল, এইজন্যই তাদেরও ভোলা শক্ত। পাপ পাপ-সঙ্গীকে আর পাপ-সঙ্গী পাপকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন অন্তর থেকে পাপাসক্তিকে দূর ক'রে দেওয়া। একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিলে পাপ করেছ, এখন তুমি সেই সঙ্গীটীর কোনও সম্পর্ক রক্ষা কচ্ছ না, এর ফল বড় জোর এই হ'তে পারে যে, তার প্রতি তোমার প্রবল কুভাব আর এল না। কিন্তু অন্তর থেকে কুভাব তুমি সম্পূর্ণ দূর কর নাই, তাই সেই কুভাব অন্য কাউকে অবলম্বন ক'রে নিজেকে চরিতার্থ কত্তে চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। এভাবে নিজ জীবনের পূর্ব্বসঙ্গীদের কাছ থেকে পাপ-ভাবের স্মৃতি আস্তে আস্তে মলিন হয়ে আসতে থাকলেও একেবারে লুপ্ত হ'ল না। কিন্তু মনকে যদি পাপাসক্তি থেকে মুক্ত ক'রে ফেলতে পার, তখন দেখ্‌বে, অতীতে যার সঙ্গে মিশে অনেক পাপ করেছ, তার কাছে ব'সে থেকেও আর পাপ-চিন্তা আস্‌ছে না। তখন পূর্ব্বোপভুক্তা স্ত্রীলোকের প্রতি

মাতৃভাব বা পূর্ব্বোপভুক্ত পুরুষের প্রতি সন্তান-ভাব আনা অতি সহজ। অন্তর আসক্তি-বর্জ্জিত হ'লে সে অসাধ্য-সাধন কত্তে পারে। মনকে ভগবৎ-সাধনের দ্বারা আসক্তি-বর্জ্জিত কর।

মেড্ডা
১৯শে পৌষ, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপকণ্ঠে মেড্ডা গ্রামে আসিয়াছেন বৈকাল বেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্কুলসমূহের ছাত্রেরা আসিয়া মিলিত হইলেন।

যথার্থ আচার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—তাঁকে তোমরা আচার্য্য ব'লে মেন না, যিনি শত শত বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য না কত্তে পার্ব্বেন। তিনি ত্যাগী হ'তে পারেন, তিনি কর্ম্মী হ'তে পারেন, তিনি জিতেন্দ্রিয় হ'তে পারেন, কিন্তু সত্যপথ প্রদর্শন কর্ব্বার সময়ে যিনি জগতের সকল সত্যের প্রতি সমান সম্মান দেখাতে না পার্ব্বেন, তাঁর উপদেশ নির্ব্বিচারে গ্রহণ ক'রো না। প্রত্যেকের প্রত্যেক কথা কাণ পেতে শুনো, কিন্তু বিচার ক'রে গ্রহণ ক'রো। তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্যে যখন যিনি যে মুদ্রা দিতে চাইবেন, হাত পেতে তা' নিও, কিন্তু পকেটে ফেল্‌বার আগে ভাল ক'রে বাজিয়ে নিও। বাজিয়ে নেবার যারা বিরোধী, মনে রেখো, তাদের মুদ্রায় জাল-জুচ্চুরী থাকার সম্ভাবনা বেশী।

সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাস-বিরোধী সাহিত্য

কুমুদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজকাল সন্ন্যাসবিরোধী একটা সাহিত্য দিনের পর দিন পুষ্ট হচ্ছে, এই বিষয়ে আপনার মত কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যা' হচ্ছে, ঠিকই হচ্ছে। যুগের যখন যা' প্রয়োজন, তখন তাই হবে। সন্ন্যাস-বিরোধী যে সব চিন্তা চারদিকে ছড়াচ্ছে, তাদের মূলে একটা মস্ত সত্য এই নিহিত রয়েছে যে, সন্ন্যাস সবার জন্য নয়, এতে অধিকারীর বিচার আছে। যাদের জন্য সন্ন্যাস নয়, তারা যখন সন্ন্যাস নেয়, তখন সন্ন্যাসের মহিমা খর্ব্ব হয়, তখন লোকে দু'-পয়সার মুড়ি-মুড়কি কেন্‌বার জন্যে বাজারে গিয়ে সোনার মোহর ভাঙ্গায়। তাই নারায়ণ জনমতের চক্র পরিচালন ক'রে সন্ন্যাসি-দলন করেন।

সন্ন্যাসীর আধিক্য

কুমুদবাবু।—বর্ত্তমান সময়ে সন্ন্যাসীর এত আধিক্যের কারণ কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।–সব চাইতে বড় কারণ, গৃহি-জীবনের আদর্শচ্যুতি। আজকালকার গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য দিয়ে প্রাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলির পূরণের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি সন্ন্যাস-জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাইছে। কিন্তু বুদ্ধি ত' মানুষের চরম গুরু নয়, তাই, বুদ্ধির অনুসরণকারীরা শেষে পস্তাচ্ছেন। প্রাণের অহেতুক টান যেখানে সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তক, সেখানেই সন্ন্যাস সম্পূর্ণ সার্থক। গার্হস্থ্য জীবনকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পার্লেই এই দুঃখাতঙ্কী সন্ন্যাসের প্রদীপ নিবে যাবে। তাতে জগৎ লাভবান হবে।

সংসার, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য

কুমুদবাবু অতঃপর কতিপয় সন্ন্যাসদ্বেষী লেখকের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের মতামত বিবৃত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ সব মতামতে আংশিক সত্য আছে, কিন্তু সবগুলি কথাকেই যদি ষোল আনা সত্য ব'লে মনে কত্তে যান, তাহ'লে ভুল কর্ব্বেন। মতামত-প্রচারকারীরা উৎসাহের আতিশয্যে অনেক সময় বিরুদ্ধ মতের সত্যের প্রতি অন্ধ হন। সংসার ও সন্ন্যাস এ দুটোই সত্য,—তাই এদের একটারও বিনাশ নেই। কিন্তু সত্যকে আশ্রয় ক'রে যখন মিথ্যা আপন বিস্তার ঘটাতে চান, তখনই ঘটে যত অনর্থ। কত সন্ন্যাসী জগতের সবাইকে গেরুয়া পরাতে চাইলেন,—পার্লেন কি? আবার, প্রায় সকল গৃহীই সন্ন্যাসীদের বিয়ে করিয়ে খোঁয়াড়ে বন্ধ কত্তে চাইলেন,—তাই কি পার্লেন? কত মণ্ডন মিশ্র ঘরদোর ছেড়ে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী হ'লেন, কত নিত্যানন্দ আবাল্য-পোষিত সন্ন্যাস-সংস্কার গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে গৃহস্থ হ'লেন, কিন্তু তবু সংসারও উঠে গেল না, সন্ন্যাসও উঠে গেল না। আমার ভাব অবিরোধী। সন্ন্যাসের যিনি আধার, তাঁর কাছে আমি সন্ন্যাসের প্রচারক, গার্হস্থ্যের যিনি আধার, তাঁর কাছে আমি গার্হস্থ্যের সমর্থক এবং এই জন্যেই আমি ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলনকারী। ব্রহ্মচর্য্য গৃহীকে গার্হস্থ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, সন্ন্যাসীকে প্রকৃত সন্ন্যাসী কর্ব্বে। সত্যকে, কল্যাণকে জীবনে ধারণ ক'রে রাখ্‌বার ক্ষমতা ব্রহ্মচর্য্যই পক্ষপাতহীন-ভাবে দেবে গৃহীকেও, দেবে সন্ন্যাসীকেও। ব্রহ্মচর্য্য গৃহীকে নিরর্থক কাম থেকে বাঁচাবে, প্রচ্ছন্ন আসক্তি থেকে রক্ষা কর্‌বে। ব্রহ্মচর্য্য গৃহীর কামচঞ্চল মনকে শান্ত কর্‌বে, তাকে দেবে অনাসক্ত ভোগের অধিকার, আর সন্ন্যাসীর ত্যাগ-বুদ্ধিকে কর্‌বে সুদৃঢ়, তাকে দেবে জগৎ-কল্যাণে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দেবার সাহস ও শক্তি। আজকের যুগ গার্হস্থ্যের বা সন্ন্যাসের মন্দির-চূড়ার উপাসক হবে না, আজকে সে চাইবে জীবন-গঠনের মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যকে

জাতীয় জীবনের গোড়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখ্‌তে। আজকের হোতা হচ্ছে "যৌবন", আজকের আহুতি হচ্ছে "জীবন"। তাই, আজ ব্রহ্মচর্য্যের জন্য এত ব্যাকুলতা। আজকের যুবক ব্যর্থতার শত দংশনে ক্লিষ্ট হ'য়ে হ'য়ে বারংবার এই একটা কথাই বুঝ্‌তে পাচ্ছে—কেন তার স্বদেশ-সাধনা বিশ্ব-সাধনা ঠিক্ ঠিক্ মত হচ্ছে না। যে শক্তি থাক্‌লে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তি-ভাবকে অটুট অচল ক'রে বুকের মাঝে আমৃত্যু ধ'রে রাখা যায়, সে শক্তিতে আজ সে বঞ্চিত। সে জান্‌ছে, অব্রহ্মচর্য্যই তার এ দুর্গতির মূল। তাই আজ সর্ব্বপ্রথমে চাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের পরে কার জীবনে গার্হস্থ্যের দীপ্তিময় হাস্যরেখা ফুটে উঠবে, কার জীবনে সন্ন্যাসের শান্তি-ময় গৈরিকপতাকা উড্ডীয়মান হবে, সেই অনাগত চিন্তায় আমাদের কোনও প্রয়োজনই নেই। হিমালয়ের বুক চিরে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র আগে বের ত' হোক্। কোন্ পথে কে গিয়ে সমুদ্রে পড়বে, সে চিন্তা, সে বিচার তারা নিজেরাই কর্ব্বে, সে উপায় তারা নিজেরাই দেখ্‌বে। কিন্তু হিমালয়ের পাষাণ-স্তূপের নীচে চাপ খেয়ে যে স্ফাটিক-জলপ্রবাহ ব্যর্থতার আক্রোশে কেঁদে মর্‌ছে, তাকে আগে সহস্র ধারায় বেরিয়ে আস্‌বার পথ ক'রে দিতে হবে। যুবকের বুকে সাহসকে চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে, তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অচঞ্চল বিদ্যুতের মত করবার ক্ষমতা দিতে হবে। সে ক্ষমতার মূল ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য, বুজ্‌রুকী স্বদেশসেবা ও বিশ্ব-সেবা

কুমুদবাবু ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন সম্বন্ধে অপর এক প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রী-বাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলনটাকে একটা

বুজ্‌রুকীর আন্দোলনে পরিণত কত্তে গেলে দেশের মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত করা হবে। দেশের অর্দ্ধজাগ্রত যুবক-সম্প্রদায় আজ সত্যিকার জাগরণ চায় ব'লেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তাদের এই শ্রদ্ধার সুযোগকে যদি ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনকারীরা সম্প্রদায়পুষ্টির জন্য ব্যবহার করেন, নব নব অবতার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করেন, তাহ'লে দেশের শত্রুতা করা হবে। অজাগ্রতকে জাগরণ দিতে হবে, এই জন্যেই ব্রহ্মচর্য্য। অর্দ্ধ-জাগ্রতকে পূর্ণ জাগরণ দিতে হবে, এই জন্যেই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য মানে ভেল্কি-বুজ্‌রুকী নয়, ব্রহ্মচর্য্য মানে সত্য লাভের পন্থা, শক্তিলাভের পন্থা, সর্ব্বকার্য্যে অসামান্য বীর্য্য, অসাধারণ পৌরুষ, অপূর্ব্ব অধ্যবসায় লাভের পন্থা। ব্রহ্মচর্য্যের নাম ক'রে স্বদেশ-সাধক যুবকের প্রাণের স্বদেশ-ভক্তির এক কণাকেও কক্ষচ্যুত কর্ব্বার অধিকার কারো নেই, বিশ্বের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত-জীবন বীর-বালকের চিত্তে এক কণা আত্ম-অবিশ্বাস সৃষ্টি করার অধিকার কারো নেই। ব্রহ্মচর্য্য বলের সাধনা,—বাহুবলেরও সাধনা, মনোবলেরও সাধনা, ব্রহ্মবলেরও সাধনা ; ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে স্বদেশ-সেবারও বিরোধ নেই, বিশ্ব-সেবারও বিরোধ নেই।

বুদ্ধ, শঙ্কর ও নিরামিষ

অতঃপর বুদ্ধ, শঙ্কর ও নিরামিষের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বুদ্ধ, শঙ্কর বা নিরামিষের দরুণ এদেশ পরাধীন হয়েছে, ওটা একটা আজগুবি অনুমান মাত্র। পরাধীনতার আসল কারণ হচ্ছে, স্বাদেশিকতার অভাব। দেশের প্রতি দেশের লোকের প্রেম ছিল না, তাই দেশ পরপদানত হয়েছে। দেশের এক প্রান্ত

আক্রান্ত হ'লে অন্য প্রান্ত থেকেও যে শত্রু ঠেকান দরকার, তা' কেউ জান্‌ত না, বুঝ্‌ত না, তাই দেশ পদানত হয়েছে। ভারতবর্ষ তুর্কী ও পাঠানদের বিরুদ্ধে তিন শ' বছর লড়াই চালিয়েছে, তবে পদানত হয়েছে। বলুন দেখি, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন্ জায়গায় এত দীর্ঘ প্রতি-রোধের প্রমাণ মিল্‌বে! সুবিশাল রোমক সাম্রাজ্য কয় দিন গথ্ ও ভ্যাণ্ডালদের সাথে লড়াই করেছিল? ব্রিটিশ জাতি জুলিয়াস্ সীজারের সঙ্গে কতকাল যুদ্ধ করেছিল? হিন্দুরা বুদ্ধ-শঙ্করের শিষ্য হয়েও, অনেকে মৎস্য-মাংস পরিত্যাগী হয়েও, অনেকে জাতিভেদ মেনেও যে তিন শ' বছর লড়াই চালাল, এটা কি হিন্দুর দুর্ব্বলতার প্রমাণ? মোট কথা, সমাজ-সংস্কারের বা জাতীয় উন্নতির আগ্রহাতিশয্যে যিনিই যা' বলুন, পরাধীনতার মূল কারণ, দেশের প্রতি মমত্ব-বোধের অভাব। যে দেশে বুদ্ধ-শঙ্কর জন্মান নি, যে দেশে সবাই আমিষাশী, যে দেশে জাতিভেদ নেই, সেই দেশেও যদি জগৎশেঠ আর মীরজাফরের অপ্রাচুর্য্য না থাকে, তবে তার পরাধীনতা অনিবার্য্য। পরাধীনতাকে দূর কত্তে হ'লে বুদ্ধ-শঙ্করকে বয়কট করা-না-করায় কিছু যায় আসে না, আমিষাহার প্রচলিত করা-না-করায় কিছু যায় আসে না, জাতিভেদ রাখা-না-রাখায় কিছু যায় আসে না, যাতে কিছু যায় আসে, তা' হচ্ছে দেশাত্মবোধ। সবাই যখন দেশকে আপন ব'লে ভাব্‌বে, সবাই যখন দেশের ক্ষতিতে নিজের ক্ষতি ব'লে অনুভব কর্ব্বে, সবাই যখন দেশের মহৎ মঙ্গলের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে অকুণ্ঠিত হবে, পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল তখনি চূর্ণ হবে। নইলে, বুদ্ধ-শঙ্করের প্রভাবকে দেশ থেকে দূর করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌বেন কোম্‌ৎ-মিলের প্রভাব এসে পড়েছে। জন্মগত জাতি-ভেদের অবিচার দূর করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌বেন, কাঞ্চন-কৌলীন্যের

অবিচার এসে বাসা বেঁধেছে,—পরন্তু, কি দুর্ভাগ্য, পরাধীনতার দৃঢ় বন্ধন এক কণাও শিথিল হয় নি, দূর হওয়া ত' দূরেরই কথা।

সেবার সহজ অধিকার

আব্দুল আজিজ ভৌমিক নামক একটী মুসলমান শিক্ষক ঈশ্বরগঞ্জ হইতে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ-মানসে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—মুসলমান যুবকদের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী নিয়ে যাই, হতাশ হ'য়ে ফিরে ফিরে আসি। অথচ হিন্দু যুবকদের কাছে এই সকল কথা তোলা মাত্র তারা আদর ক'রে সব কথা শোনে, আগ্রহ ক'রে সব জান্‌তে চেষ্টা করে। আমি কি হিন্দুদের মধ্যেই কাজ কর্ব্ব বাবামণি ? ছেড়ে দেব মুসলমানদের সেবা ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না আজিজ। তুমি যেই জাতিতে, যেই সমাজে জন্মেছ, সেখানেই তোমার জীব-সেবার প্রথম ও সহজ অধিকার। সেই অধিকার তুমি পরিত্যাগ কত্তে পার না। নিজ সমাজের লোকদের মধ্যে উন্নত আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভিন্ন সমাজের লোকদের মধ্যেও কাজ সম্ভব হয়, তবে সেই অতিরিক্ত জনসেবা দোষের নয়, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু জন্মেছ যাদের ঘরে, জীবন কাটাবে যাদের নিয়ে, মৃত্যুকালে কবর দেবে যেই সমাজের লোক, তাদের প্রতি তোমার প্রথম দায়িত্ব তুমি কোনও যুক্তিতেই এড়িয়ে যেতে পার না। তারা অনাগ্রহী, তারা উদাসীন, তারা সন্দিগ্ধচেতা, তারা তোমার সেবার উপরে নানা উদ্দেশ্য আরোপ কচ্ছে, - এসব যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবু উপযুক্ত যুক্তি নয়। এতটুকু বাধায় তুমি তোমার সহজ অধিকার পরিত্যাগ কত্তে পার না।

জন-সেবার কৌশল

বরহিত হইতে আগত শ্রীঅমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—মাষ্টার সাহেব ব্রহ্মচর্য্যের বাণী নিয়ে যে সকল মুসলমান যুবকের কাছে যান, তাদের অনেকে ব্রহ্মচর্য্যকে একটা কুসংস্কার ব'লে মনে করে। কেউ কেউ এমনও মনে করে যে, তিনি যখন মুসলমানের ছেলে হয়েও বাবামণির শিষ্য হয়েছেন, তখন তিনি ত' এক-নম্বরের কাফের। তার মুখের হিতোপদেশ আবার শুনতে হবে কেন? হু'চারজন এমনও ভাবে যে, ব্রহ্মচর্য্যের নাম ক'রে আজিজ মিঞা আস্তে আস্তে মুসলমানদের হিন্দু ক'রে ফেল্‌বার ফিকিরে আছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ জন্যই আব্দুল আজিজের উচিত মুসলমান যুবকদের মনে সহজে শ্রদ্ধা আসে যেই সব শাস্ত্র থেকে কথা বল্‌লে, সেই সব শাস্ত্র থেকে উপদেশ সংগ্রহ ক'রে শোনান। পৃথিবীর প্রায় সব শাস্ত্রেই সৎকথাগুলি প্রায় এক রকমের। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে যদি কাজ করা যায়, তাহ'লে মুসলমান-শাস্ত্র থেকেই হিতবচন উদ্ধার ক'রে ক'রে মুসলমান ছেলেদের মনে আত্মসংযম, প্রলোভন-দমন, স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্মাননাবোধ, চরিত্র-গঠন ও কদভ্যাস বর্জ্জন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। একই উপদেশ বিভিন্ন সমাজের গঠনানুযায়ী হয়ত একটু রকমফেরে বলা হয়েছে। তার তাৎপর্য্য বুঝে কাজ কত্তে পাল্লে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে সৎ করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কাউকে হিন্দু বা মুসলমান করা আমাদের লক্ষ্য হ'তে পারে না। যে যেই ভাষা বোঝে, যে যেই শাস্ত্র বোঝে, যে যেই যুক্তি বোঝে, তাকে সেই ভাষায়, সেই শাস্ত্রে, সেই যুক্তিতে উপদেশ দেওয়াই হচ্ছে জনসেবার প্রকৃত কৌশল।

জাতিতে জাতিতে সাম্য ও ঐক্য স্থাপনের উপায়

সেহড়া-নিবাসী শ্রীআলতাফ আলি বলিলেন,—আমার সমধর্ম্মী যুবক-বন্ধুরা বলেন যে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ দূর কত্তে হ'লে জাতিতে জাতিতে বৈবাহিক আদান-প্রদান এবং সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ ধনসাম্য স্থাপন করা দরকার। ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার এক্ষেত্রে অবান্তর।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ কথায় আংশিক সত্য নিশ্চিতই নিহিত আছে। কিন্তু এইটুকুই পূর্ণ সত্য নয়। এক ধর্ম্মাবলম্বী পুত্রকন্যার সঙ্গে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কন্যাপুত্রের বিবাহ হ'লে দুইটী পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাজনিত সম্প্রীতি স্থাপন সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু "নানা বিচিত্র ভাবে হ'লেও সকল ধর্ম্ম একই ঈশ্বরকে ভজনা করে", এই সত্যে যতক্ষণ না তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কচ্ছ, ততক্ষণ ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ কমবার কোনও উপায় নেই। সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ ধনসাম্য স্থাপন ক'রে দেবার পরেও দেখা যাবে যে, কতক লোকের অর্জ্জনের যোগ্যতা অধিক, কতক লোকের কম। তখন যোগ্যতানুযায়ী ধনবৃদ্ধি হ'তে হ'তে হঠাৎ দেখা যাবে যে, আবার ধনবৈষম্য এসে যাচ্ছে। ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার পরেও একজন চাপরাশী আর বড়বাবুর মাইনে, একজন কেরাণী আর ম্যাজিষ্ট্রেটের মাইনে সমান হবে না। উভয়ের বেতন সমান হলে কেউ কষ্ট ক'রে বড়বাবু বা ম্যাজিষ্ট্রেট হবার যোগ্যতা সঞ্চয়ের চেষ্টা কর্ব্বে না। জোর ক'রে এক দু'বার ধনসাম্য তোমরা প্রতিষ্ঠা ক'রে দিলেও কতক দিন পরে শুধু এই কারণেই আবার সমাজ-মধ্যে ধন-বৈষম্য দেখা দিতে শুরু কর্‌বে। তাই প্রতিকারের পন্থা হচ্ছে, প্রত্যেকটী মানবের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ উন্নতি লাভের উৎকৃষ্টতম সুযোগ উপস্থিত ক'রে রাখা।

তাতে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ দূর হবার প্রত্যক্ষ সহায়তা না হ'লেও প্রতিটী সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষ হবার সুযোগ পেলে অনেক মানুষের ভিতরেই সকলের জন্য দরদ ও সহানুভূতির সৃষ্টি সহজে হবে। সুযোগবঞ্চিত মানুষগুলিই সমাজের প্রধান শত্রু হয়, তারাই সমাজের অধিকাংশ পাপ ও অপরাধে লিপ্ত হয়। সুতরাং এভাবে মানবজাতির উন্নতির মান বেড়ে যাবে, অবনতির স্তরগুলি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাক্‌বে। কিন্তু তথাপি স্বার্থবোধ একের প্রতি অপরের দ্বারা অন্যায় অনুষ্ঠান করাতে বিরত হবে না। তাই, মানুষে মানুষে যদি বিদ্বেষ দূর কত্তে চাও, জাতিতে জাতিতে বৈর যদি লোপ কত্তে চাও, তবে সকলের প্রাণে এই বিশ্বাস আগে জাগাতে হবে যে, সকলেই এক পরমেশ্বরের সন্তান, এক মানব অপর মানবের ভ্রাতা বা ভগিনী, এক মানব অপর মানবের শ্রদ্ধাভিবিঞ্চনীয় জ্যেষ্ঠ, এক মানব অপর মানবের স্নেহানুলেপনীয় কনিষ্ঠ। চরিত্রবান্, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এই বোধ অন্তরে জাগিয়ে রাখা সহজতর। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য প্রচার একটা অবান্তর বিষয় নয়, একটা আবশ্যকীয় বিষয়।

তর্কে প্রমত্ত হইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে কখনো প্রমত্ত হ'য়ো না। প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাবে থাক্‌তে দাও। মানুষ যদি সকল মনে অকপট আগ্রহে একটা মতের অনুবর্ত্তন করে, তা'হলে দু'দিন আগে হোক্ পরে হোক্, নিজের ভুলভ্রান্তি সে নিজেই বুঝ্‌তে পারে। নিজের ভুল নিজে বুঝ্‌লে আত্মসংশোধন দ্রুত হয়। তর্কের তোড়ে একজন পরাস্ত হ'লে হতে পারে কিন্তু তাতে অন্তরে প্রবোধ আসে না।

উপদেশ দিবে একাত্ম হইয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যারা আনন্দ সহকারে তোমার কথা শুন্‌তে চায়, তোমার মতামত থেকে তাদের বঞ্চিত ক'রো না। গুরু সেজে কাউকে উপদেশ দিতে যেও না, তার সাথে নিজেকে একাত্ম জেনে তবে উপদেশ দেবে! মানে, তাকে ত' উপদেশ দিচ্ছ না, দিচ্ছ যেন নিজেকে, উপদেশ গ্রহণ কচ্ছ যেন স্বয়ং তুমি। মনে ভাব জমিয়ে নেবে, তুমিই বক্তা, তুমিই শ্রোতা, তুমিই নিজের উপকারের জন্য এক দেহে অবস্থিত তোমার মুখ থেকে অন্য দেহে অবস্থিত তোমার কাণে এই অমৃতময় কথাগুলি ঢাল্‌ছ।

উপদেশ দিবে উপলব্ধি করিয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—উপদেশ দেবে, কথাগুলি অন্তরে উপলব্ধি ক'রে। ধার-করা উপদেশে কোনও কাজ হয় না। যে তত্ত্বকে নিজে যতটুকু বুঝেছ, তাকে ততটুকুই ব'লো। ভাষার উচ্ছ্বাস আর বাক্যের কবিত্ব কারো অন্তরে শক্তি-সঞ্চার করে না। শক্তি আসে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে।

ময়মনসিংহ

২১শে পৌষ, ১৩৩৪

নারীর শক্তি

অদ্য জনৈকা ভক্তিমতী মহিলার সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ মা, তোমাদের শক্তি যে কত দূরব্যাপিনী, তা' ভাব্‌তে আমি অবাক্ হই। এক একটী ত্রিলোক-বিজয়ক্ষম দুর্দ্দান্ত

উদ্ধত গর্ব্বিত পুরুষ একটী স্ত্রীলোকের কাছে যেন মেষ-শাবকটীর মত হয়ে যায়। অথচ মেয়েরা জানে না যে, কত শক্তি তাদের। অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থেকে, ক্ষুদ্র চিন্তা, নীচ বুদ্ধি, তুচ্ছ স্বার্থ প্রভৃতির অধীন থেকেই যদি তারা এমন অসম্ভব সম্ভব কত্তে পারে, তবে না জানি স্বাধীন হ'লে তারা কিই কর্ত্তো। পরাধীন মানে পরের অধীন। পর মানে শত্রু। নীচতা, হীনতা, ক্ষুদ্র সুখলোভ, স্বার্থপরতা,—এ সবই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের প্রধানতম শত্রু। এসব শত্রুকে যে জয় করেছে, সেই হচ্ছে স্বাধীন। নারীরা যেদিন স্বাধীন হবে, সেইদিন দেখো ভারতবর্ষে কি এক আশ্চর্য্য কাণ্ড আরম্ভ হয়। মা বল্‌বেন ছেলেকে,—যা, সত্যের জন্য প্রাণ দে। স্ত্রী বল্‌বেন স্বামীকে,- যাও, পরার্থে জীবন সার্থক কর। কন্যা বল্‌বেন পিতাকে,—যান্‌, দেশের তরে প্রাণ দিয়ে ধন্য হোন্‌। নীচতার সেবাকারিণী নারী আজ পুরুষের ঘাড়ের বোঝা, পথের কণ্টক, পায়ের শৃঙ্খল। কিন্তু সেই দিন নারী হবেন পুরুষের ভার-বহনের সঙ্গিনী, পথ-কণ্টক-নাশিনী, লৌহ-শৃঙ্খল-বিচুর্ণন-কারিণী।

নারীর শিক্ষা এক মহাযজ্ঞ

মহিলাটী বলিলেন,—কে কাকে কি বুঝায় বলুন!. শিক্ষা দেবারই যে লোক নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের মধ্য থেকেই তাদের আবির্ভূতা হ'তে হবে মা। তোমাদের শিক্ষার ভার তোমাদের নিজ হাতে নিতে হবে। এ কাজের যোগ্য পুরুষেরা নয়,—এতে তাদের সামর্থ্য কম, সুযোগও কম। প্রত্যেক নারীর প্রাণে জ্ঞানের বহ্নি জ্বালাতে হবে, প্রত্যেক নারীর অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাত্ত্বিকী জ্বালা সৃষ্টি কত্তে হবে।

একটী মানবীকেও বাদ দিলে চল্‌বে না, একটী প্রাণও হেলায় তুচ্ছ করলে চল্‌বে না,—এক মহাযজ্ঞের আয়োজন কত্তে হবে। নারীরাই সে যজ্ঞের পুরোহিত, নারীরাই সে যজ্ঞের যজমান, নারীরাই সে যজ্ঞের বলি।

নারী-জাগরণ ও আত্মোৎসর্গ

মহিলাটী মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাণ দিতে হবে, তবে নারী জাগ্‌বে, অম্‌নি জাগ্‌বে না। কোথায় সুভদ্রা, কোথায় জনা, কোথায় কর্ম্মদেবী, কোথায় পদ্মিনী, ব'লে ব'লে আর হা-হুতাশ কত্তে আমরা পার্ব্ব না। স্ত্রীজাতির মধ্য থেকেই আজ এমন সব মহিলা-দধীচির উদ্ভব সম্ভব কত্তে হবে, যাঁরা অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রের উপাদান হ'য়ে থাক্‌বেন। অশিক্ষিতা নারী পশু থেকে যাচ্ছে, শিক্ষিতা নারী বিবি হচ্ছে! এর প্রতীকার মা তোমরাই কর্ব্বে, আমরা শুধু জয়ধ্বনি দিয়ে তোমাদের উৎসাহিত কর্ব্ব মাত্র।

ময়মনসিংহ

২২শে পৌষ, ১৩৩৪

সদ্‌গুরু-প্রসঙ্গ

বৈকালে সমাগত ভক্ত যুবকদের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্‌গুরু-প্রসঙ্গে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সদ্‌গুরু বল্লেন, – 'হে শিষ্য, আমার চেয়ে যদি কখনো কোন মহত্তর লোক পাও, তখন কি কর্ব্বে?' শিষ্য বল্লেন,—'আজ্ঞে, আমিও ক'দিন ধ'রে ঠিক

সেই কথাটাই ভাব্ছি।' সদ্গুরু বল্লেন,—'তোমাকে আর ভাব্তে হবে না বাছা, আমি নিজেই সব ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি। আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ যখনই পাবে, তখনি আমাকে ছেঁড়া চটিজুতোর মত ত্যাগ কর্ব্বে। আমার দেওয়া পথের চাইতে উৎকৃষ্টতর পথ যখনি পাবে, তখনি সেইটী গ্রহণ কর্ব্বে' শিষ্য বল্লেন,—'কিন্তু আমার মন যদি আপনাকে ত্যাগ কত্তে না চায়? সদ্গুরু বল্লেন,—'সত্যকে যদি গ্রহণ কর, জেনো, তা'হলেই আমাকে গ্রহণ করা হবে; সত্যকে যদি অস্বীকার কর, তাহ'লে আমাকে আঁকৃড়ে ধ'রে থাক্লেও ত্যাগ করাই হবে। সত্যই গুরু, সত্যকে যে ত্যাগ করে, সে-ই গুরু-ত্যাগী।'

সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর আচরণের পার্থক্য

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক শিষ্য গুরুকে অসত্যাশ্রয়ী মনে ক'রে গুরুর সংশ্রব ত্যাগ ক'রে নিজের স্বাধীন পথে, স্বাধীন মতে পরকল্যাণ কত্তে আরম্ভ কর্ল্লেন। অসদ্গুরু তখন তাঁর সকল শিষ্যদের ডেকে এনে একত্রিত ক'রে বল্লেন,—'ওকে তোরা এক-ঘরে ক'রে রাখ্, ওর ধোপা-নাপিত বন্ধ কর্।' সদ্গুরু বল্লেন,—'সে কি? তাতে আর আমাতে সম্পর্ক ত' সত্য নিয়ে, বশ্যতা বা অধীনতা নিয়ে ত' নয়।' তখন তিনি প্রিয় শিষ্যদের ডেকে বল্লেন, —'ওরে দেখ্, তোরা সব গিয়ে সহায়তা কর্; যে বশ্যতা, যে সেবা, যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা তোরা দিচ্ছিলি আমাকে, আজ থেকে তা' ঐ সত্যানুরাগী ছেলেটাকে গিয়ে দে। কেননা, সত্যকে প্রার্থনা ক'রেই ও আমাকে সত্য ক'রে পেয়েছে।'

শিষ্যের দ্রোহে সদ্‌গুরু

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিষ্য এসে বল্লেন,—"গুরুদেব, তোমার সব শিষ্য তোমার বিদ্রোহী হয়েছে।' সদ্‌গুরু জিজ্ঞেস্ কর্লেন,—'কেন রে' ? শিষ্য বল্লেন,—'তুমি আর নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন প্রেরণা দিতে পাচ্ছো না। তাই সবে নূতনের খোঁজে বের হ'তে চাচ্ছে।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—এতদিন ধ'রে যা' দিয়ে আস্‌ছি, এটা তারই অমৃতময় ফল ; তুই ওদের সবাইকে বল্‌গে যা, এই বিদ্রোহের ধ্বজা ধ'রে আগে আগে আমি চল্‌ব, আমি বুড়ো ব'লে পিছনে প'ড়ে থাক্‌ব না।

রুক্ষভাষী শিষ্যের ব্যবহারে সদ্‌গুরু

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিষ্য বল্লেন,—'হে গুরো, তুমি বড় সুন্দর।' সদ্‌গুরু বল্লেন, 'মনে রেখো, তুমি তোমাকেই দেখ্‌ছ, তুমি তোমারই প্রশংসা কচ্ছ।' শিষ্য বল্লেন,—'হে গুরো, তোমার চরিত্রে দোষ আছে, ক্রটী আছে, অসম্পূর্ণতা আছে।' সদ্‌গুরু বল্লেন, 'ঠিকই বলেছ, তোমার কথা সত্য ; আমার গুরু আজ শিষ্য সেজে আমাকে সংশোধিত কচ্ছেন,—তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর।' শিষ্য বল্লেন,—'হে গুরো, তোমাকে আমি ব্যথা দিতে এসেছি।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'বেশ ক'রেছ, ভাল ক'রেছ, ব্যথার জন্য রাজিই আছি কিন্তু বাছা তুমি আবার ব্যথা পেয়ে না ব'স, এইটুকুই আমার প্রার্থনা।' শিষ্য বল্লেন,—'হে গুরো, তুমি আমাকে ভুল পথে চালিয়েছ, ঠকিয়েছ।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'প্রবঞ্চনা যে ধর্‌তে পেরেছ, তা' কখনও ভুলো না বাপ্‌ধন ; সতর্ক হ'য়ে পথ চল, আর কখনও ঠক্‌বে না।'

দুর্ব্বলের সন্ন্যাস

শ্রীশ্রীবাবামণি রংপুর জেলা-নিবাসী জনৈক ত্যাগাকাঙ্ক্ষ যুবককে পত্রোত্তরে লিখিলেন,—

"তোমার ত্যাগবুদ্ধি আমাকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু ত্যাগ-স্পৃহার পশ্চাতে কি তোমার সাংসারিক অক্ষমতা, না জন-সমাজের সেবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহ উৎসরূপে রহিয়াছে, তাহা আমি আগে জানিতে চাহি। আত্মোৎসর্গের স্বাভাবিক প্রেরণা লইয়া যাঁহারা পরার্থে জীবনাহুতি দিবার জন্য কর্ম্ম-যজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়েন, বর্ত্তমান ভারত তাঁহাদিগকে চাহিতেছে। সংসারের সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না বলিয়া, প্রতিপদে নিজ অপদার্থত্ব প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া যাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় গৃহি জীবনের কর্ত্তব্যসমূহকে উপেক্ষা করিয়া আইসে, বর্ত্তমান ভারত তাহাদের অঙ্গে গৈরিকের ত্যাগচ্ছদ দেখিতে চাহে না।"

ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম্ম ও ভগবান

কাছাড়-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্যক্তিটাকে সমাজের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া, সমাজটাকে বিশ্বের মধ্যে নিমজ্জিত করা, আর, বিশ্বকে ভগবানের মধ্যে পাওয়ার নামই ধর্ম্ম। এই কারণেই ধর্ম্ম রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল নীতিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ব্যক্তি-চেতনা না থাকিলে মানুষ হইত উদ্যম-রহিত, সমাজ-চেতনা না থাকিলে মানুষ হইত অন্ধ স্বার্থের উপাসক, বিশ্বচেতনা না থাকিলে সমাজগুলি হইত কূপমণ্ডূক, ভাগবতী-চেতনা না থাকিলে বিশ্ব

হইত অন্ধ প্রকৃতির অন্ধতর মূঢ়তার অজানিত আস্ফালন। ব্যক্তিত্ব-বোধ স্পষ্ট ভাবে জাগ্রত রহিয়াও সমাজের সহিত পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করিতে পারে। আত্মদানের জন্যও ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন। অন্ততঃ ততটুকু ব্যক্তিত্ব-বোধ না থাকিলে আত্মদান অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সমাজ-সচেতনতা যেখানে বিশ্বগত প্রেমের পথ-কণ্টক, সেখানে সামাজিক চেতনাও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কুসংস্কার। বিশ্বে, সমাজে এবং ব্যক্তিতে বিরোধ বিদূরণের যে সহজ পথ, তাহারই নাম ধর্ম্মপথ। ভগবানে বিশ্বাস এই জন্যই ধর্ম্ম-বোধের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি।”

ধর্ম্মের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

“জগতের প্রত্যেকেরই অন্তরের প্রত্যাশা এই যে, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, বক্তা, প্রবক্তা, ব্যাখ্যাতা, প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষকগণ জগদ্বাসীর মনের নাস্তিকতা দূর করিয়া আস্তিক্য-বোধ বাড়াইবেন, পারস্পরিক বিরোধ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ প্রশমিত করিবেন, সকলেই যে এক পরমেশ্বরের সন্তান, সকলেই যে এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের প্রকৃত সম্পর্ক যে আত্মীয়তার, কুটুম্বিতার, প্রেমের, প্রীতির, ভালবাসার, এই প্রত্যয়ে প্রতিটি জীবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু তাহা না হইয়া ধর্ম্মপ্রচারক আদির প্রভাব-গুণে জগতের অধিকাংশ স্থানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ, গণ্ডীতে গণ্ডীতে সংঘর্ষ এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মাচারের প্রশ্রয়ই যেন বাড়িয়া চলিতেছে। এমতাবস্থায় যদি একদল লোক ধর্ম্মকে পৃথিবীর অনাবশ্যক জঞ্জাল এবং মানব-সভ্যতার হীন আবর্জ্জনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে এই কথায় আপত্তি

করিবার যুক্তি তোমাদের কি আছে? কথার দাপটে দুনিয়া উড়ান সহজ কিন্তু কতকগুলি সংস্কৃত আর পালির শ্লোক শুনিয়াই লোকে মানিবে না যে ধর্ম্ম সত্যই প্রয়োজন!"

ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃষ্ট সদুপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ না বাড়িয়া যখন ধর্ম্মের বলে ঐক্য বাড়িবে, মমত্ব, সমত্ব, প্রেম, প্রীতি, আত্মীয়তা, বান্ধবতা বাড়িবে, মত-পথের আপাত-পরিদৃষ্ট পার্থক্যের প্রতি সহিষ্ণু থাকিয়া জগতের এক প্রান্তের বা এক জাতির লোকের সহিত অপর প্রান্তের বা জাতির লোকের স্নেহ-কোমল মধুর আত্মীয়তা সৃষ্টি হইতে থাকিবে, তখন বিনা বক্তৃতায় মানুষের হৃদয়-নিলয়ে ধর্ম্ম তাহার চিরসমাদরণীয় দিব্য আসন অধিকার করিয়া লইবে। ধর্ম্মের স্বপক্ষে তোমরা যত অধিক উৎকট চীৎকার করিতেছ, একদল লোক ধর্ম্মের অভিসন্ধি-বিষয়ে ততই সন্দিহান হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মাচরণ যখন মানুষে মানুষে একতা, সমতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেদনা এবং কার্য্যকর সহানুভূতির হইবে অপরিহার্য্য সহচারক, তখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বক্তৃতার আর প্রয়োজন হইবে না। আচরণের দ্বারা যে প্রচার, তাহাই যথার্থ প্রচার, তাহাই সফল প্রচার।"

চাই সাকল্য মুক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"তোমরা মুক্তি চাহ একার জন্য, তাই সাধনাও কর একাকী।

বিশ্বের সকলের মুক্তি চাহিলে সকলকে লইয়া সাধনা করিতে। সকলকে নিয়া ভগবানকে ডাকার মধ্যে একটা অতি বৃহৎ আনন্দ আছে। অনেকে সেই বৃহৎ আনন্দকে কল্পনায় আনিতে পারে না, অনুভবে ধরিতে চাহে না, বলে,—'দশজনকে নিয়া মাতামাতি ত' এক প্রকারের হুজুগ।' এই ভাবে জীবনের পরম কর্ম্মে চরম ধর্ম্মে দশজনের কাছ হইতে তোমরা দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে ভালবাসিয়া আসিতেছ। তাহারই জন্য তোমাদের ধর্ম্মাচরণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে তোমাদের কুটুম্বিতা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হইতেছে। এই ভাবেই তোমরা ধর্ম্মকে যথেচ্ছ আক্রমণ করিবার জন্য অপরের হস্তে শাণিত অস্ত্র তুলিয়া ধরিতেছ। তোমার একক মুক্তি তোমার জন্য বন্ধন সৃষ্টি করিতেছে। তোমার একক ঈশ্বর-সান্নিধ্য তোমাকে নিখিল জগতের সকলের কাছ হইতে দূরত্বে নিয়া ফেলিতেছে। কেন তুমি সাকল্যে মুক্তি চাহিবে না? কেন তুমি বিশ্বের সকলকে নিয়া ঈশ্বর সন্নিধানে উপনীত হইবে না? কেন লক্ষ লক্ষ নরনারী জান্তব সুখে, শৈব প্রমোদে, ক্ষণস্থায়ী আমোদে, আত্ম-কেন্দ্রিক ইতর প্রমোদে, ভ্রান্তিতে, দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়া কেবলই দুঃখের পর দুঃখ, হতাশার পর হতাশা, আর অশান্তির পর অশান্তি চয়নের জন্য পড়িয়া থাকিবে? কেন নিখিল বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী তোমার মুক্তির সাথে সাথে মুক্তির পথে ধাবিত হইবে না? কেন তাহারা ইতর হইয়া নরকের কলুষ-পল্বলে ডুবিবে, ভাসিবে, গড়াগড়ি দিবে, আর কেনই বা তুমি বিশেষ হইয়া একাকী করিবে জ্ঞানের, প্রেমের, নিষ্কলুষ কর্ম্মশীলতার ভাগবত আস্বাদন। কেন সমগ্র বিশ্ব তোমার তপস্যার সাথে এক হইবে না? মুক্তি যদি চাহ, তবে কেন চাহিবে না সাকল্য মুক্তি?"

বসুধাকে কুটুম্ব কর

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ফোঁটা-তিলক, জটাজূট, মালা-ঝোলা তোমার ধর্ম্মিষ্ঠতার পরিচয় না হইয়া তোমার ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, পরহিতব্রত, নিজ স্বার্থে অনাসক্তি, সর্ব্বজনের কুশলের প্রতি মনোযোগ, নিজেতে ঈশ্বর-দর্শন, সর্ব্বভূতে ঈশ্বরানুধ্যান যেন হয় তোমার ধার্ম্মিকতার প্রকৃত প্রমাণ। বিশ্ব তোমার জন্য কাঁদিতেছে, তুমিও বিশ্বের জন্য কাঁদ। বসুধাকে কুটুম্ব করিবার যোগ্যতা সঞ্চয় কর।"

ময়মনসিংহ

২৩শে পৌষ, ১৩৩৪

স্বাধীনতার সম্মান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক যুবক শিষ্য নিজের ইচ্ছানুযায়ী পথে সমাজের কল্যাণ করিতে চাহেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেই পথ নিজের পক্ষে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন নাই। ভক্ত যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি ইংরাজিতে যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা অনুলিখিত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"The ideal of life of a true child of mine is self-sacrifice,—sacrifice for what I do not know and care little to dictate, Each will himself find out his aim of life. I am not to give him any programme of work but only the strength to fight for any noble cause. I am the giver of strength and not of plan. This is my relationship with a child of mine. In my

eye of affection sometimes he is a son, sometimes a friend, sometimes a brother but never is he a slave unto me, never is he a servant of mine. What I respect most in him is his independence. What I regard most in him is his freedom. In my work of preaching Brahmacharya, I require some assistants of course but that is no reason why everybody should be a preacher. All children of mine are not on the same level of thought and education. There are divisions in opinions, diversities in tendencies and differences in abilities. Let everybody find out his own way by his own investigations. I am not much anxious about if any child of mine takes up the path which I, as a worker and servant of society, have scrupulously forsaken. I have been used in the hands of God as an instrument to kindle the light of spiritual life in him and this can never be any reason towards his taking up the same course of work as that of mine. Let him thrive in his own way, let him evolve his manhood on the lines of his own bent of mind. Let him work out any programme whatever,—no objection. Spirituality will always purify his inten-

tions and enable him for any noble deed. * * * He may not find it convenient to be with me. He may not be able to march along with me. Tastes may differ. Do you think that this should ever be the reason of my wrath or vexation? No! Never! Freedom is my first God, Brahmacharya the second.

বঙ্গানুবাদ

"আমার যে যথার্থ সন্তান, তাহার জীবনের আদর্শ আত্মোৎসর্গ। কিসের জন্য আত্মোৎসর্গ, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই, বলিবারও প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবনের লক্ষ্য বাহির করিয়া লইবে। তাহাকে কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি দেওয়া আমার কাজ নহে, পরন্তু যে-কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য শক্তি দেওয়াই আমার কাজ। আমি শক্তি দিব, কর্ম্মপদ্ধতি দিব না। ইহাই আমার সন্তানের সহিত আমার সম্বন্ধ। স্নেহবশে কখনও আমি তাহাকে পুত্র, কখনও বন্ধু, কখনও বা ভ্রাতা বলিয়া গণনা করি কিন্তু সে কখনই আমার ক্রীতদাস নহে, কখনই আমার ভৃত্য নহে। তার জীবনে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করি তার স্বাধীনতাকে। তার জীবনে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি তার স্বাতন্ত্র্যকে। সত্য বটে ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের কার্য্যে আমার কতিপয় সহকারী প্রয়োজন কিন্তু তজ্জন্য সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারক হইতে হইবে, তাহা নহে। আমার সকল সন্তানই চিন্তার বা শিক্ষার সমান স্তরে বাস করে না। সকলেরই মতামতে বিভিন্নতা আছে, শক্তি-সামর্থ্যে পার্থক্য আছে। প্রত্যেকেই

স্বকীয় অনুসন্ধানের দ্বারা নিজের কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া লউক। সমাজের সেবক এবং কর্ম্মী রূপে আমি যে কর্ম্মপথটি যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিয়াছি, আমার কোনও সন্তান যদি সেই পথটাই গ্রহণ করে, তাহা হইলে তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নহি। তাহার জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার আলোক জ্বালাইবার ব্যাপারে ভগবান কর্তৃক আমি যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছি বলিয়াই যে কর্ম্মিরূপে আমি যে পথ ধরিয়াছি, তাহাকেও কর্ম্মি-রূপে সেই পথই ধরিতে হইবে, এমন কোনও কথা হইতে পারে না। সে নিজের পথেই উন্নত হউক, সে নিজ সংস্কারোচিত পথে চলিয়াই তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করুক। যে-কোনও কর্ম্মপদ্ধতির সে অনুসরণ করুক,—আপত্তি দেখি না। আধ্যাত্মিক-সাধনা তাহার অভিসন্ধিসমূহকে নিয়তই পবিত্র রাখিবে এবং তাহাকে যে-কোনও মহৎ কর্ম্মের জন্য বল-দান করিবে। * * * আমার সঙ্গে কাজ করা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক নাও হইতে পারে। আমার সঙ্গে পথ চলিতে সমর্থ সে নাও হইতে পারে। রুচিরও পার্থক্য হইতে পারে। তুমি কি মনে কর যে, এই কারণে আমি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইব? না, কখনও না। স্বাধীনতাই আমার প্রথম উপাস্য, ব্রহ্মচর্য্য তাহার তুলনায় দ্বিতীয়।"

ময়মনসিংহ
২৪শে পৌষ, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্য ও পরমতে সহিষ্ণুতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক স্কুলের ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল দেখি, ব্রহ্মচর্য্যের যথার্থ প্রমাণ কি?

ছাত্রটী বলিল,—বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্যের প্রমাণ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইহা ঠিক্। কিন্তু বীর্য্যধারণের প্রমাণ আছে। তা' হচ্ছে, বিশ্বগ্রাসিনী উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরমতে সহিষ্ণুতা থাকায়। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের এটা একটা মস্ত বড় লক্ষণ।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উপায়

যুবকটী প্রশ্ন করিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম উপায় হচ্ছে সৎসঙ্কল্পকে মনের মধ্যে প্রবল থেকে প্রবলতর করার জন্য চেষ্টিত হওয়া। মানুষ অভ্যাসের তাড়নায় যা' করে বা কত্তে চায়, তাকে দমন ক'রে চলার শ্রেষ্ঠ সহায়ক হচ্ছে তীব্র সংকল্প। কিন্তু এই সঙ্কল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না, যদি চোখের সামনে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ সমূহকে ধ'রে রাখা না যায়। তারই জন্য সর্ব্বসময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীদের জীবন ও চরিত্র আলোচনা করা উচিত। এই সকল সদালোচনার ফলে মনের ভিতরে সৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্য সাধনের দ্বিতীয় সদুপায় হচ্ছে, মন থেকে অকারণ ভীতি ও আশঙ্কার ভাব দূর করে দেওয়া। এই বুঝি মরলাম, এই বুঝি পড়লাম,—এই জাতীয় দুর্ব্বলতা মানুষকে বড় হতে বাধা দেয়। সবল সুন্দর মন নিয়ে নির্ভয়ে নিজ কর্ত্তব্য ক'রে যাওয়ার সাহস ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর নিয়ত থাকা চাই। ঘরকুণে পলায়নপর কাপুরুষগুলি ব্রহ্মচর্য্য খোয়ায় সর্ব্বাগ্রে। বিপজ্জনক স্থানেও যার মনে আশঙ্কা আতঙ্ক নাই, সে-ই সকল সময়ে সকল স্থানে নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত রেখে চল্‌তে পারে। তাই মন থেকে আশঙ্কা আতঙ্ক আগে দূর করা চাই। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা কত্তে হলে

অতীত জীবনের অন্যায়কে বর্জ্জন ক'রে যাবার জন্য চাই চেষ্টা কিন্তু অতীতকে নিয়ে অতিরিক্ত অনুতাপ কত্তে হবে বর্জ্জন। কেবলি হায়-হুতাশ যারা করে, তাদের আর এগিয়ে যাবার পথ হয় না। কথায় বলে,— মরা ছেলেকে নিয়ে কেঁদে কি লাভ? সত্যই ত, অতীতে কি কুকাজ কখন করেছ, তা ভেবে নিজেকে কেবলি অপরাধী ও দুর্ব্বল বলে ভাবা একটা কম অন্যায় নয়। অতীতে ভুল করেছ বলেই তুমি ভবিষ্যতে নির্ভুল জীবন যাপন কত্তে প্রাণপাত কর্ব্বে এটাই হওয়া চাই ব্রহ্মচর্য্য-পালনেচ্ছুর মনোভঙ্গিমা। জগৎকে বাহুবলে তুমি জয় কর্ব্বে এবং নিজের সুখের জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্য সকল সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেবে,— মনের এই ভাবও ব্রহ্মচর্য্য-পালনের বিশেষ সহায়ক। ক্ষুদ্র স্বার্থকে পদদলিত করার জন্য ক্ষমতা চাই, বৃহৎ কল্যাণকে সকলের করায়ত্ত করে দেবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা চাই। বলীয়ান্ হবার জন্য নিয়ত কামনা কর, দেশের দশের জগতের সকলের কুশলের জন্য তৈরী হবার জন্য নিয়ত আগ্রহী হও। তোমার এই কামনা ও তোমার এই আগ্রহ তোমাকে হাতে ধ'রে ব্রহ্মচারী ক'রে দেবে।

ব্রহ্মচারী ও তাহার ব্যবহার

একটী প্রশ্নের জবাবে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য-পালনেচ্ছু ব্যক্তির আচার, ব্যবহার, আহার, বাগ্‌বিনিময় আদি সকলই হবে সংযত, মধুর এবং রোষ-তোষ-বর্জ্জিত। অর্থাৎ কারো প্রতি তুমি রুষ্টও হবে না, কাউকে আবার তোষামোদও কর্ব্বে না। অপরের প্রতি ক্রোধের চর্চ্চা ব্রহ্মচারীর মনকে বৃহত্তর লাভ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, অপরের খোষামুদি করার প্রয়াস তার মনকে করে দেয় ছোট

ও ইতর। নিজের জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আহার-বিহার, আলাপ-সালাপ, বন্ধুতা-হৃদ্যতা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। যার জীবনলক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে, তার পক্ষে এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষণ অতি সহজ ব্যাপার।

জীবনলক্ষ্যকে স্থির কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং জীবনলক্ষ্যকে আগে স্থির কর। কেউ হয়ত বিবাহিত হ'য়ে জীবন কাটাবে, কেউ হয়ত বিবাহ আদৌ করবেই না। তার ব্যাপারে আগে থেকে কেউ কিছু বলতেও পারে না। তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কত্তেও যেও না। কিন্তু জীবন তুমি কি নিজের সুখের জন্যই কাটাবে, না জগতের হিতসাধনের জন্য প্রয়োগ কত্তে চাও, তা আগে ঠিক কর। নিজের সুখের জন্য জীবন যাপন অতি সাধারণ জীবন, কিন্তু তাই বলে তা নিন্দনীয় নয়। কেউ যদি নিজের সুখের জন্যই জীবন যাপন করে, আর তা যদি কত্তে পারে অপরের কোনও অনিষ্ট না ক'রে, তা হলে তার জীবনও হেয় নয়। কেউ কেউ জগতের কুশলের জন্যই জীবন যাপন কচ্ছেন, এঁরা জগতের সকলের পূজার পাত্র। কিন্তু যাঁরা নিজের সুখের জন্যই জীবন ধারণ ক'রে রয়েছেন অথচ ভ্রমক্রমেও অপরের অনিষ্ট সাধন করেন না, তাঁরা কম যান না, তাঁরাও পূজার পাত্র। আগে ঠিক ক'রে নাও যে, এই দুইটী আদর্শের মধ্যে কোনটীকে দেবে নিজ জীবনে রূপ। এই একটী কথা স্থির হয়ে গেলেই ত তুমি ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের অর্দ্ধেক কেল্লা ফতে করে নিলে। একবার লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল ত' আর কোন দিকে তাকাবে না, কেবল জীবনের ধ্রুব-তারাটীর দিকে তাকিয়ে সকল

কাজ কর, সকল কথা বল, সকল সঙ্গী নির্ব্বাচন কর, সকল অমেধ্য, অহিত, অকল্যাণ বর্জ্জন ক'রে চল।

লক্ষ্যহীনের ব্রহ্মচর্য্য হয় না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লক্ষ্যহীনের ব্রহ্মচর্য্য হয় না। একলক্ষ্য ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্যই সহজে অটুট থাকে।

লালসা-বর্জ্জনের উপায় উদাসীনতা

অপর এক জনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকের উপর থেকে যে পুরুষ লালসার দৃষ্টি তুলে আনতে পারেনি, পুরুষের উপর থেকে যে নারী জৈব আকর্ষণকে টেনে আনতে পারে নি, সে জীবনে খুব বড় একটা সুমহৎ কাজ কিছু কর্ব্বে ব'লে ধারণা করো না। এ হচ্ছে একটা অত্যদ্ভুত পরীক্ষা, যাতে উত্তীর্ণ হতে পারলে তোমার অসাধ্য কাজ আর কিছুই নেই। তাই ব'লে বলা হচ্ছে না যে, পত্নী তার স্বামীকে ভালবাসবে না বা স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর অনুরাগ থাকা অন্যায়, বরং যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর অনুরাগ নেই, তারা একে অপরের হিতকারী না হয়ে অধিকাংশ সময়ে ক্ষতিকারী হয়ে থাকে। নারী নারী-হিসাবেই এক অসাধারণ আকর্ষণ-শক্তির আধার। তার ব্যক্তিত্বটা হয়ত তোমার জানাই নেই। নারীর পক্ষেও পুরুষ পুরুষ-হিসাবেই আকর্ষণের একটা মস্তবড় চুম্বক, তার ব্যক্তিত্বের সাথে হয়ত তোমার কিছুই ঘনিষ্ঠতা নেই। বায়ু যেমন অগ্নিকে টানে, অগ্নি টানে বায়ুকে, ঠিক তেমনি পুরুষও নারীকে টানে, আর নারী টানে পুরুষকে। এই টানটার হাত থেকে জগতের বোধ হয় কেউ মুক্ত নয়। কিন্তু যতক্ষণ এই টান তোমার মনে

লালসার মদিরা সৃষ্টি না কত্তে পাচ্ছে, ততক্ষণ তোমার ভাবনার কিছুই নেই। কিন্তু লালসার মদিরা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে, তার জন্য তুমি অকারণ ঘনিষ্ঠতা এবং নিষ্প্রয়োজন প্রসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে সহজ সরল ভাবে চল্‌লেই নিশ্চিন্ত থাকতে পার। জগৎ-ভরাই সমস্যা, কিন্তু সমাধান করার উপায় তোমার হাতের মধ্যেই যে রয়েছে, এই বিশ্বাসটুকু রেখ। বিশ্বাস রেখ যে, জীবের প্রতি জীবের আকর্ষণ ভগবানই দিয়েছেন এবং এই আকর্ষণ যেখানে কারো গতিপথের বেগ হ্রাস ক'রে তার ক্ষতি কত্তে যায়, সেখানেও ভগবানই নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়ে নূতন হাতিয়ার হাতে তুলে দিয়ে রক্ষা কত্তে সমর্থ। নারীকে নারী ব'লে মনে করো না, পুরুষকেও পুরুষ ব'লে ধারণা করো না। সকলেরই মধ্যে একমাত্র পরমেশ্বর বিরাজ কচ্ছেন, এই ভাবটা অন্তরে জাগরূক রেখে তার নারীত্ব বা পুংস্ত্বের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে উদাসীন হও!

নর-কঙ্কালের শোভাযাত্রা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈরাগ্যবান্ সাধকেরা এই বিষয়ের প্রতীকারের একটা চমৎকার উপায় দেখিয়াছেন। পথ দিয়ে যাচ্ছ, যাকেই দেখতে পাও, মনে মনে লক্ষ্য কর তার কঙ্কালটাকে। বর্ণ-চর্ম্ম-রূপ ভুলে গিয়ে তার ভিতরে তার অস্থিটাকেই কেবল দর্শন কত্তে থাক। চক্ষুগোলক আছে, চক্ষু নেই; বক্ষ আছে, স্তন নেই; হাত পা মেরুদণ্ড আছে, পাকস্থলী নেই, পায়ু নেই, উপস্থ নেই অথচ মানুষটা বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে নিজ কর্ম্মফলকে আহরণ করার জন্য, অন্য কোনও প্রয়োজন তার নেই। দাঁত আছে, ঠোঁট নেই; হনু আছে,

চিবুক নেই ;—দুনিয়ার যত নরকঙ্কালের দল হেঁটে বেড়াচ্ছে। এরা কেউ তোমার আকর্ষণের বস্তু নয়, এরা নিজ নিজ প্রয়োজনেই দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে। যার যখন প্রয়োজন ফুরাবে, সে তখনি শুয়ে পড়বে ধরণীর ধূলায়, তার পরে তার খোঁজ আর কেউ নেবে না। এই ভাবে যদি সর্ব্বদা কেবলই নরকঙ্কালের শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে আর কামনা-লালসা বাড়ীর সীমানার মধ্যেও আসতে পারে না।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ইহা কি দেখা সম্ভব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন, আমি নিজে কমপক্ষে একটা বৎসর জগতের প্রতি মানব ও প্রতি মানবীকে এই নরকঙ্কাল রূপেই দেখতে পেয়েছি। বস্ত্র নেই, অলঙ্কার নেই, সৌন্দর্য্য নেই, লাবণ্য নেই, শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল। তোরা দুই মাস বা দুই সপ্তাহ কালও তা পারবি না ? একটা দিনও যদি সত্য সত্য দেখতে পাস, তা হলে রক্ত-মাংসের পিপাসা আপনি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

শব-সাধনা

এক জন প্রশ্ন করিলেন,—এই জন্যই কি তান্ত্রিকেরা শবসাধনা কত্তেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু এই জন্যই নয়, এই প্রয়োজনটাও অন্যতম, এই মাত্র বলা চলে। তাঁরা শব-সাধনা কত্তেন শিব হবার জন্য। নিজে শব না হলে শিব ত হওয়া যায় না! যেই শবের উপরে ব'সে তাঁরা কত্তেন সাধনা, নিজেকে সেই শবের সঙ্গে কত্তেন অভেদ-জ্ঞান। ফলে শরীরের যত প্রকার বিকারের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে মনের চঞ্চলতা, বিক্ষিপ্ততা, বিহ্বলতা, বিকলতা, সবই হয়ে যেত মন্দীভূত। বাসনা-কামনার এই ভাবে লয় হয়ে যাবার পরে তাঁরা হতেন শিবের সঙ্গে

অভেদ। নিগেকে যে করেছে শিবের সঙ্গে অভেদ, তার আত্মাহমিকা ত আর কিছু রইল না, এমন কি অস্মিতার বোধ পর্য্যন্ত লয় হয়ে গেল, আর যাই অস্মিতা পর্য্যন্ত চলে গেল, তখন হলেন তিনি সকল অভাবের আকর, হলেন তিনি সেই অসতেরও অসৎ, নাই-এরও নাই, যেই অসৎ থেকে সকল সতের আবির্ভাব হয়েছে ব'লে ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে মন্ত্র রচনা হয়েছে।

নববিবাহিতার কর্ত্তব্য

জনৈকা নববিবাহিতা যুবতীর নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী পত্রে লিখিলেন,—

"যে পরিবারের বধূ হইয়া গিয়াছ, সেই পরিবারকে তোমার পর বলিয়া জ্ঞান করিও না। ঐ পরিবারভুক্ত প্রত্যেকটী প্রাণীকে নিতান্ত আপনার বলিয়া জানিবে। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাশুর, ননদ, ননাস প্রভৃতি সকলকে নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিবে। এমন কি ঐ পরিবারের আশ্রিত কুকুর, বিড়াল, গাভী প্রভৃতির প্রতিও তোমার নিজ-জনোচিত কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মমত্বের সহিত স্মরণ রাখিবে। যদিও তুমি ভিন্ন বংশে জন্মিয়াছ, ভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ হইয়াছ, তথাপি আজ এই নূতন পরিবারটীকেই তোমার চিরকালের আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা-ভূমি বলিয়া জ্ঞান করিবে। নিজের ব্যক্তিত্ব এবং অহমিকাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিসর্জ্জন দিয়া এই পরিবারেরই সুখ, শান্তি, ধর্ম্মবল, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং মহিমা-বৃদ্ধির জন্য সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত কর। মনে রাখিও, সম্যক্ নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারাই তুমি এই মহনীয় কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইবে।"

স্বামিকুলের প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"স্বামীর পরিবারের প্রতি তোমার যত প্রকারের কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে, নিজের ত্যাগ, তপস্যা, সংযম, সাধনা, সদানন্দ-ভাব ও সোৎসাহ কর্ম্মোদ্যমের দ্বারা ঐ পরিবারস্থ প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি, সদাচার ও সন্নীতির প্রতি আকৃষ্ট করা। সদাচারিণী দেবস্বভাবা কন্যা বিবাহের পরে স্বামিকুলে গিয়া তাহাদের রাক্ষসবৎ উন্মত্ততা ও পিশাচবৎ অপরিচ্ছন্নতার অনুকরণ করিবে, ইহা কখনও যেন তোমার লক্ষ্য না হয়। স্বামীকে এবং স্বামিকুলের প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে সুকৌশলে সত্য ধর্ম্মের এবং আর্য্য-জনোচিত আচারের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে। জগতে তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রতি। পতিকুলের প্রত্যেকটী প্রাণীকে পরমেশ্বরের চরণের দিকে টানিয়া আনা হইবে তোমার প্রথম দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। স্বামীকে কেবল ইহজগতে সুখী করার চেষ্টাই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম নয়, তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিজন-বর্গকে নিত্যকালের সুখে, অনন্তকালের তৃপ্তিতে, সীমাহীন আনন্দে অধিকারী করিবার জন্য ধর্ম্মের অমৃত পরিবেশন করাও তোমার অতি প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কার্য্যটী করিতে হইবে অন্তরের সীমাহীন সেবা-বুদ্ধির বলে এবং বাহিরের দোষহীন বিনয়-নম্রতার প্রভাবে।"

জন-সেবার আন্দোলন ও স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি একটী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল্ দেখি, জন-সেবার আন্দোলনের মধ্যে ভগবৎ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা কোন্ জায়গায় একেবারে অপরিহার্য্য ?

যুবক কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীবাবামণি তখন নিজেই বলিলেন,—যেখানে জাতীয় উন্নতির জন্য স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্যক, সেখানে প্রত্যেক নর-নারীর ইন্দ্রিয়-সংযমের সামর্থ্যেরও একান্ত আবশ্যকতা। এইখানেই সাধন-শক্তির প্রয়োজন। কেননা, শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার জোরে রক্ত-মাংসের তৃষ্ণাকে সব সময় চেপে রাখা যায় না। সাধন-শক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপার বলেই তা' সম্ভব হয়। এইজন্যেই সাধনের উপরে অত জোর দেওয়া। ভারত-বর্ষের ভবিষ্যতে এমন দিন এল ব'লে, যেদিন নারী পুরুষ পরস্পরের হাত ধ'রে মহৎ কার্য্যে আত্মদান কত্তে অগ্রসর হবে। সেই দিন মানব-মনের পশুটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে কে জানো? সাধন-ভজন। মুখে ভাই-বোন্ সম্বন্ধ কর্ল্লেই ত' আর ভাই-বোন্ হয় না! মুখে মা ব'লে ডাক্‌লেই ত' আর মা ভাবা যায় না! এর জন্যে অনেক সাধন-ভজনের দরকার পড়্‌বে। তাকিয়ে দেখ্ ভবিষ্যতের দিকে। তা' হ'লেই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবি, লক্ষ লক্ষ পরস্পর অপরিচিত নরনারী এসে প্রাণের ডাকে একই ক্ষেত্রে মিলেছে, সবাই সমস্বরে বল্‌ছে,—"আমরা সব এক মায়ের সন্তান, এক মায়ের পুত্র-কন্যা, আমরা সব ভাই-বোন্; আমাদের লক্ষ্য এক, আদর্শ এক, কর্ম্মপদ্ধতি এক; আমাদের ক্ষুধা এক, তৃষ্ণা এক, ধর্ম্ম এক; আমাদের কর্ম্ম এক, ব্রহ্ম এক, সাধনা এক; আমাদের জাতি এক, সমাজ এক, স্বদেশ এক।" সে দিন প্রথম পরিচয়ে যাকে ভগ্নী সম্বোধন ক'রে গ্রহণ কর্ল্লে, দু'দিনের ঘনিষ্ঠতার পরেই যুবকের প্রাণে তার প্রতি তামসিক কামনা জেগে উঠ্‌ল। প্রথম পরিচয়ে যাকে ভাই ব'লে গ্রহণ করা হ'য়েছিল, দু'দিনের ঘনিষ্ঠতার পরেই যুবতীর প্রাণে তার প্রতি নিকৃষ্ট আসক্তি জেগে উঠ্‌ল।

অধিকাংশ স্থলেই হয়ত বিবাহ-বন্ধন অসম্ভব হবে। তখন ফল হবে কি জানো? গুপ্ত ব্যভিচার! তাই সাধনের জোর চাই। সাধনের শক্তি কামের আকর্ষণকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে, পূর্ণ-যৌবন-সম্পন্ন নরনারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ ক'রেও পরস্পরের প্রতি নিষ্কাম ভাব থেকে নিমেষের তরে ভ্রষ্ট হবে না।

জনসেবার আন্দোলন ও আধ্যাত্মিক সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সাধন-ভজনকে একটা বন্ধন ব'লে মনে করা ভুল। মনের শত শত নিকৃষ্ট বন্ধন ও নীচ আসক্তি সাধন-ভজনে কেটে যায়। তখন বাইরের বন্ধন কাট্‌বার চেষ্টাগুলি হয়—নিখুঁত, নির্ভুল। তোরা বল্‌বি, সাধন-ভজন ক'রে দিন কাটালে দেশের সেবা কর্ব্ব কখন? কিন্তু প্রশ্নটাই যে ভুল! দিনের মধ্যে দুই বেলা দুই ঘণ্টা ক'রে সাধন ক'রে দেখ্ না তোর দেশ-সেবার সামর্থ্য দশগুণ বেড়ে যায় কিনা! আর, দিন-রাত শুধু মালা নিয়েই প'ড়ে থাক্‌তে হবে, সে কথা কে বল্লে? কর্ম্মি-লোকের পক্ষে প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় মনটাকে ভগবানের পাদপদ্মে ফেলে রেখে দিলেই যথেষ্ট। অপর সময়ে সে কর্ম্মসাধনার মধ্যেই ভগবৎ-সাধনার ফল পায়, কারণ কর্ম্ম করে সে দেশের, দশের, জগতের কিন্তু ফলার্পণ করে সে ভগবৎ-পাদপদ্মে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের সুগভীর ভগবৎ-সাধনাই তাকে নিষ্কাম ফলার্পণে সামর্থ্য দেয়, অহর্নিশ তার প্রাণের মধ্যে ঐ প্রেরণা জোগাতে থাকে। আজকাল অত নাক টেপাটেপি আর ঘণ্টা নাড়ার ছড়াছড়ি

হ'য়েছে ত' শুধু তোরা অলস, অকর্ম্মণ্য, কর্ম্মবিমুখ ব'লে। দেশ থেকে কর্ম্ম-সাধনা উঠে গেছে, তাই আজ ধর্ম্ম বল্‌তে শুধু ঘটা বুঝায়, তাই আজ স্বদেশ-সেবকেরা ধর্ম্মকে অত ভয় করেন আর ধর্ম্মকে একটা পরিপন্থী শক্তি মনে ক'রে, একটা ভীষণ বন্ধন মনে ক'রে ধর্ম্ম-প্রচারকদের মনের সাধে প্রাণ খুলে গালি দেন। স্বরাজ-পন্থীরা যে ধর্ম্মগুরুদের পার্ল্লে ধ'রে জবাই ক'রে দিতে চাচ্ছেন, তার কারণ গুরু আজ বন্ধন ছেঁড়েন না, বন্ধন বাড়ান। কিন্তু বাপু, বন্ধন থেকে যিনি মুক্ত করেন, তিনিই গুরু,—যিনি বন্ধন বাড়ান, তিনি গুরু নন্। মুক্ত-হস্তে যিনি স্বাধীনতা বিতরণ করেন, তিনিই গুরু,—যিনি তা' করেন না কত্তে পারেন না, তিনি গুরু নন্। যে পথে চল্‌লে বন্ধন থেকে মুক্তি হয়, সে পথই ধর্ম্ম-পথ, যে পথে হাতের শৃঙ্খল বাড়ে, পায়ের বেড়ী বাড়ে, সে পথ অধর্ম্ম-পথ। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সকল বাহ্য-ঘটা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নামটুকুকে সকল ধর্ম্মের সার জেনে তার সাধন কর্, আর বজ্রগর্জ্জন ক'রে বল্, তুই স্বাধীন, তুই বন্ধন-মুক্ত, তুই স্বপ্রতিষ্ঠ। তোর সেই সিংহ-নিনাদ শুনে লক্ষ লক্ষ তন্দ্রাবিষ্টের মোহ-নিদ্রা অপগত হোক্। ভগবানের নামের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোরা শক্তি সঞ্চয় কর্, আর দেশের কাজে সেই শক্তিকে প্রয়োগ কর্।—দেশ-সাধনায় ও ধর্ম্ম-সাধনায় বিরোধ নেই,—যারা বিরোধ দেখে, তাদের চ'খে রোগ আছে জান্‌বি।

স্থূল ও সূক্ষ্ম-সাধন ; সাধন-প্রেরিত দেশ-সেবা

তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সাধনের দুইটী প্রকার আছে। একটী হচ্ছে স্থূল, অপরটী হচ্ছে সূক্ষ্ম। স্থূল-সাধন যে করে নি,

এক চোটেই সূক্ষ্ম-সাধন ক'রে ওঠা তা'র পক্ষে বড় সহজ নয়। ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায়, ছাত্র-জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় সাধনের স্থূলাংশগুলি নিয়েই অনেকটা ব্যস্ত থাকৃতে হয়। এজন্যই এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার হুজুগ বা আন্দোলন থেকে দূরে থেকেই ভগবানের সঙ্গে নিজের যোগ অনুভব কর্ব্বার চেষ্টা পেতে হয় এবং এ ভাবেই আত্মগঠন কত্তে হয়। সাধনের ধর্ম্ম যারা জানে না, সেই সব বালকতুল্য স্বদেশ-সেবীরা এতে ধর্ম্ম-প্রচারকদের উপরে বিদ্বিষ্ট হন। কিন্তু যারা কতকটা নিভৃতে থেকেই, নানাবিধ আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থেকেই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের সাধন ক'রে শক্তি অর্জ্জন ক'রেছে, তারা যখন সূক্ষ্ম সাধনের অধিকারী হয়, তখন তাদের কর্ম্ম-জীবনের প্রত্যেকটা স্পন্দন ভগবৎ-প্রেরণায় ওতপ্রোত হ'তে থাকে। তখন তারা ভগবৎ-প্রেরণায় বাধ্য হ'য়ে দেশের সেবায় নামে এবং নামে যেন বজ্রের মত অব্যর্থ হ'য়ে।

সাধকের অহমিকা

একটী যুবক অন্তরের একটা উন্মাদিত ভাব নিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। ছেলেটার বাড়ী বাইগন-বাড়ী। তাহার মুখে নানা উদ্দীপনামূলক সৎকথা শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বড়ই প্রীত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধন-ভজন কিছু কর ত বাবা ?

যুবক বলিলেন,—অন্তরে অন্তরে নিয়ত কেবলই কামনা করি, আমি যেন আমার লক্ষ্যকে লাভ কত্তে পারি। এইটুকুই আমার সাধনা। আমি অন্য সাধনা জানি না, মানিও না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্তরে অন্তরে নিয়ত একটা সৎকামনা জাগিয়ে রাখার নামই সাধনা। কিন্তু যাতে সেই কামনা কখনও না নিবে যাবার সুযোগ পায়, তার জন্য কৌশলাবলম্বনও সাধনা। তাও অনেকের পক্ষে দরকার হ'য়ে পড়ে। তুমি যে ভাবে অন্তরে অন্তরে সৎকামনার অনুশীলন কচ্ছ, তা ছাড়া অন্য সাধনা তুমি জানো না. এটা খুবই সরল স্বীকারোক্তি। কিন্তু অন্য কোনও সাধনাকে মান না, এমন সাংঘাতিক কথা কখনো বলো না। এর ভিতরে অহমিকা আছে। তুমি আজ যা বুঝেছ, তাই জগতে বা তোমার জীবনে চরম সত্য, এমন অভিমান কত্তে নেই। সাধকের পক্ষে নিজ মতে দৃঢ়তা খুব হিতকর, কিন্তু যতটুকু আজ বুঝেছ, তারপরে আর কখনো অতিরিক্ত কিছু বোঝার বা মানার প্রয়োজন হবে না, এমন অহঙ্কার ক্ষতিকর। সাধকের নিজ মতে দৃঢ়তা তার মেরুদণ্ডকে সবল করে কিন্তু অহঙ্কার তাতে ক্ষয়রোগ ধরিয়ে দেয়।

স্বাধ্যায়

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিছু স্বাধ্যায় প্রত্যহই কর ত ?

যুবক বলিলেন, - স্বাধ্যায় কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের সাধনার পথে নিত্য নব উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিতে যে সদ্‌গ্রন্থ সহায়ক, নিয়মিত ভাবে, ভক্তিভরে, পুণ্য-জ্ঞান ক'রে তা পাঠ করার নাম স্বাধ্যায়। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিনই বেদমন্ত্র পাঠ কত্তেন, তখন বেদমন্ত্র পাঠ করার নাম ছিল স্বাধ্যায়। কিন্তু বেদের মন্ত্রসমূহের আধিক্য ঘটায় ক্রমে বেছে বেছে কয়েকটা মাত্র মন্ত্রকে ত্রিসন্ধ্যাতে পাঠ করার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাকেই প্রচলিত ভাষায় "সন্ধ্যা করা" বলা হয়। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট অল্প কয়েকটা মন্ত্রেরই

মানে বোঝার লোকের অভাব হ'য়ে পড়ল, ফলে এতে নিষ্ঠাও লোকের ক'মে গেল। তখন যে যেই মন্ত্র দিয়ে ভগবানকে ডাকে, সে সেই মন্ত্রের মহিমা-কীর্ত্তনকারী শাস্ত্র পাঠকেই স্বাধ্যায় বলে গ্রহণ কর্ল্ল! এরও পরে সাধারণ লোকের ভিতরে সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার না ক'রে, নানা অঞ্চলে নানা প্রাদেশিক ভাষায় ধর্ম্ম প্রচারিত হতে লাগল। সেই সঙ্গে সেই ধর্ম্মের মতসমূহকে ব্যাখ্যাপূর্ব্বক তদনুকূল দেশজ ভাষায়ই নানা শাস্ত্র রচনা হতে লাগল এবং সাধকেরা নিজ নিজ সাধনে রুচি, নিজ নিজ ধর্ম্মমতে প্রীতি, নিজ নিজ ধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য ও মমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সেই শাস্ত্রকে নিয়মিত ভাবে নিত্য পাঠ কত্তে লাগলেন। তোমারও নিজ সাধন পথের অনুকূল যেই শাস্ত্রবাণী, তা তুমি নিত্য পাঠের চেষ্টা কর্ব্বে।

প্রশ্ন।—আপনি ত কোনও শাস্ত্র পাঠ করেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সকল শাস্ত্র যেই জিনিষটা থেকে আসৃছে, তাই নিয়ত জপ করবার চেষ্টা করি ব'লে আমার স্বাধ্যায়ের বাহ্য প্রয়াস নেই। কিন্তু স্বাধ্যায় আমি ভালবাসি। স্বাধ্যায় মনের মলিনতা-নাশে সহায়তা করে, স্বাধ্যায় নামে অভিনিবেশ প্রদান করে। আর, নামের অর্থ চিন্তা ক'রে যদি নাম করা যায়, তাহ'লে নামের সেবার মধ্য দিয়েও এক প্রকার সূক্ষ্ম স্বাধ্যায় হতে থাকে।

ব্যক্তিত্ব-বোধের ভ্রান্ত প্রয়োগ

আগন্তুক যুবকটী কিন্তু নানারূপ কুযুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং প্রায় প্রতি কথাতেই একটা করিয়া প্রতিবাদ করিয়া যাইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কথা বললেই যে তা মেনে নেও না, এটা তোমার প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। আমি স্বাধীন-চিত্ততাকে পছন্দ করি। কিন্তু যে পরিমাণ স্বাধীন-চিত্ততা তোমাকে ভগবানের সঙ্গে লড়াইতে প্রবৃত্ত করাবে না, মাত্র ততটুকুই ভাল। স্বাধীন-চিত্ততা সবলতার লক্ষণ কিন্তু ভগবানের কাছে নত হতে না চাওয়া নাস্তিক্যের লক্ষণ। যে নাস্তিক হতে চায়, তার জন্য সাধন-ভজনের কোনও ধরা-বাঁধা রাস্তার দরকার নেই, সে ভগবানকে চূড়ান্ত ভাবে অস্বীকার করেই একদা সত্য সত্যই পরম সত্যে এসে উপনীত হবে। পরমদয়াল শ্রীভগবান তাকেও হেলা করবেন না। তিনি আস্তিক নাস্তিক সকলেরই জন্য করুণাঘন হ'য়ে বিরাজ কচ্ছেন। কিন্তু নাস্তিক হতে হলে নিদারুণ প্রত্যক্ষবাদী হতে হয়, আপ্তবাক্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়, অপরের প্রতি বিশ্বাস বিসর্জ্জন দিতে হয়, এমন কি, কে যে তোমার পিতা, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই ব'লে পিতাকেও পিতা ব'লে না মানার দুঃসাহস সঞ্চয় কত্তে হয়। জগতে কারো মতের সাথে তার কোনো আপোষ সম্ভব নয়। কিন্তু এত বড় দুরন্ত অশ্বে আরোহণ কত্তে যদি সাহস না পাও, তবে আর নাস্তিক হবার অভিনয় করো না। সত্য সত্য নাস্তিক হতে না পেরে যারা কেবল লোকের কাছে স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দেবার জন্য নাস্তিক্যের অভিনয় করে, তাদের বুকে এমন চিতার আগুন জ্বলে, যা তারা সহ্যও কত্তে পারে না, প্রকাশ করেও বেদনার লাঘব কত্তে পারে না। এও এক প্রকারের আত্মপ্রবঞ্চনা।

মানুষের মন একটা অগাধ সমুদ্র

যুবকটী চলিয়া গেলে অপরাপর যুবকেরা তাহার সম্পর্কে এক এক জনে এক এক প্রকার মন্তব্য করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উগ্র সাধনার পথে অনেকেরই কিছু কালের জন্য এমন একটা মতিচ্ছন্ন ভাব আসে, যার ফলে ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার, আত্মাভিমান আদি চার দিকে গিজ গিজ কত্তে থাকে। কিন্তু যদি তৎসত্ত্বেও সাধক নিজের আসল সাধন পরিত্যাগ না করে, তাহ'লে দু' দিনেই এ সব ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়, মেঘাবৃত চন্দ্রমা পূর্ণিমার জ্যোছনায় হাসতে থাকে। তোমরা কাউকে একটা ঘণ্টা বা একটা দিন দেখেই তার সম্পর্কে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় দিয়ে ব'সো না। এক একটা মানুষের মন যেন এক একটা অগাধ সমুদ্র। তার একটা মাত্র অংশ দেখেই বলা চলে না যে, আসলে সে কি।

মত ও কর্ম্মের স্বাধীনতা

অদ্য নবীনগর (ত্রিপুরা)-নিবাসী জনৈক যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা-মণি পত্র লিখিলেন। যথা,—

"ভগবানের নাম যে পায়, তাহাকেই সাধক বলে না, নামের যে সাধন করে, নামের রস-সমুদ্রে যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহাকেই সাধক বলে। শুধু নামেই সাধক বলিয়া আত্মপরিচয় দাও, সমগ্র বৎসরে একদিনের জন্যও আকুল চিত্তে অভিনিবিষ্ট মনে নামের সেবা কর না। এইজন্যই তোমরা বুঝিতে পার নাই, সাধক-জীবনের উদ্দেশ্য কি! কিছুদিন যদি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া নামের যথাবিহিত সেবা কর, তবে নিজে হইতেই বুঝিতে আরম্ভ করিবে, জীবনের লক্ষ্য কি, কর্ত্তব্য কি।

"তোমার জীবন-লক্ষ্য আত্মোৎসর্গ। কি জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ করিবে, তাহা তুমিই তোমার নিজ মেধা, মনীষা, বুদ্ধি ও সাধন-শক্তি

দ্বারা বাহির করিয়া লইবে। আত্মোৎসর্গের প্রকার নির্ণয় করিতে তোমার হৃদয়ের টানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ মহাকার্য্যে তোমাকে আত্মদান করিতে হইবে। হৃদয় দ্বিধাহীন কণ্ঠে অচঞ্চল ভাষণে যে পন্থার নির্দ্দেশ করিবে, তাহাই অনুসরণ কর, তাহারই জন্য বুকের রক্ত দাও, তাহারই জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজের কণ্ঠনালী নিজে ছিঁড়িয়া দাও। অপরের কর্ম্মপন্থার সহিত তোমার কর্ম্মপন্থার মিল না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরাঙ্মুখ, বিব্রত, লজ্জিত বা ভীত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। সকল মানুষের হৃদয় এক নহে, সকল মানুষের রুচি-প্রকৃতি এবং প্রাক্তন সংস্কার এক নহে, সুতরাং সকলের আত্মদান এক প্রণালীতে হইবে না। আত্মোৎসর্গ-মূলে সকলে এক হইবে, কিন্তু প্রণালী-মূলে এই বৈচিত্র্য থাকিবেই থাকিবে। আদর্শ মানবের লক্ষ্য পরার্থে স্বার্থত্যাগ,—যিনি যেভাবে স্বার্থত্যাগের যোগ্য ও অনুরাগী, তিনি সেই ভাবেই স্বার্থত্যাগ করিবেন। ত্যাগের যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে যাইয়া কে আগে মাথাটা কাটিয়া দিবে, কে আগে বুকের রক্ত ঢালিবে, কে-ই বা আগে জীবন্ত অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করিবে, ইহা যার যার রুচি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। এইটুকু নির্দ্ধারণের বেলায় অপর কাহারও গুরুগিরির, পাণ্ডাগিরির, দালালীর বা ঘট্‌কালীর আবশ্যকতা পড়িবে না।

"ভগবানের নাম পাইয়া তোমরা স্বাধীন হইয়াছ। নাম তোমা-দিগকে ব্যক্তি-বিশেষের অধীন করে নাই, করিবে না, করিতে পারে না। নামের আনুগত্য সকলের আনুগত্য হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছে। নামের স্বভাব বন্ধন-মোচন, বন্ধন-বৃদ্ধি নহে; মানবাত্মার স্বাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়াই নাম অভিব্যক্ত হইয়াছেন, যুগ-

যুগান্ত ধরিয়া ইহা মানব-মনের পরবশ্যতাই বিদূরিত করিতেছেন এবং করিবেন। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের জীবনকে অনুকরণ করিবার জন্যই নহে কিংবা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের শাসনকে অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মানিয়া লইবার জন্যও নহে, পরন্তু নিজের জীবনের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে নামের অমৃতধারা তোমাদের দীর্ঘকাল-পিপাসিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। যখন প্রবেশ করিয়াছিল, তখন কিন্তু জানিতে না যে, ইহা বীণাধ্বনি কি বজ্র-নির্ঘোষ। কিন্তু একদিন জানিতে হইবে এবং সেই জানা ষোল আনা সত্য হইবে এই ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবন, এই অচিরস্থায়ী নর-দেহ পরার্থে উৎসর্গ করিয়া। 'উৎসর্গ' মানে জান? শুধু মরিলেই উৎসর্গ হয় না, মরিবার মত মরিতে হয়। দহিলে পুড়িলেই আহুতি হয় না, পরের জন্য দগ্ধ হইতে হয়।

"তোমাদের বন্ধুরা ব্রহ্মচর্য্যকে কুসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, করুন। শকুনি-গৃধিনী যেমন পচা মাংস দেখিবামাত্রই গলাধঃকরণ করে, একবার বিচার করিয়া দেখে না, ইহা গরু কি শূকরের মাংস, তোমরাও তেমন শুনিবামাত্রই কোনও কথা গিলিও না। যত বড় লোকের মুখের কথাই হউক, মানিবার আগে তাহার স্বরূপ জানিয়া লইও। নিজেদের বিচার-বুদ্ধি এবং সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়াই আগে কথাটার মূল্য যাচাই করিয়া লইও। তারপর তোমার স্বাধীন মন যদি ব্রহ্মচর্য্যকে কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে কথাটা গ্রহণ করিও। তোমাদের বন্ধুরা বলিতেছেন,—'ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ' এ কথাটা মিথ্যা। কথাটা প্রকৃতই মিথ্যা কিনা, নিজের স্বাধীন মন দিয়া তাহার বিচার কর এবং

তারপরে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে শিখ। স্বাধীন বিচারের দ্বারা যদি বুঝিতে পার যে, অব্রহ্মচর্য্যেই বীর্য্যলাভ হয়, তাহা হইলে তদনুযায়ী চলিবার স্বাধীনতাও তোমার আছে। কেননা, স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের প্রথম লক্ষণ। চিলে কাণ নিয়াছে শুনিয়াই পিছে পিছে দৌড়িও না ; কাণে একবার হাত দিয়া দেখিতে হইবে, কাণটা চলিয়াই গিয়াছে কিনা। আরও একটী কথা মনে রাখিও, যাহারা নিজেরা যথার্থ স্বাধীনতাকে ভালবাসে, তাহারা অপরের চিন্তা, বাক্য এবং ব্যবহারের স্বাধীনতাকে সম্মান করিতে বাধ্য। পরমতে অসহিষ্ণুতা স্বাধীনতা-লিপ্সার লক্ষণ নহে, উহা ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষেরই লক্ষণ। জানিয়া রাখ, তুমি স্বাধীন ; জানিয়া রাখ, তোমার চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম্মের তুমিই একমাত্র নিয়ামক ; তোমার জীবন-যাত্রার জয়ধ্বনি-মুখরিত রাজপথে তুমিই তোমার প্রভু, তুমিই তোমার স্বামী। কিন্তু ইহাও মনে রাখিও যে, অপরের চিন্তা, বাক্য এবং জীবন-যাত্রার স্বাধীনতাকে বৃথা উত্তেজনা বশতঃ অপমানিত করিবার অধিকার তোমার নাই। অন্তরে যাহার প্রকৃত স্বাধীনতার বহ্নি জ্বলে নাই, সে-ই শুধু বাহিরের স্বাধীনতার ভাণকে লোকচক্ষে যথার্থ স্বাধীনতা-লিপ্সা বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য কতগুলি বৃথা চীৎকার করিয়া অপরের কল্যাণ-পন্থাকেও অকল্যাণ বলিয়া প্রচার করে।”

ময়মনসিংহ

২৭শে পৌষ, ১৩৩৪

গুরু এবং শিষ্য

অদ্য ভক্তবৃন্দ সমাগত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্গুরু সম্বন্ধে একটী গল্প বলিলেন,—এক গুরু ছিলেন। তাঁর তিনটী অতিপ্রিয় শিষ্য ছিল।

দীর্ঘকাল গুরুসেবার পরে একদিন প্রথম শিষ্য ভাব্‌লে,—এ লোকটা গুরু হবার যোগ্য নয়, সুতরাং এ-কে ত্যাগ করাই উচিত। শিষ্য আশ্রম ছেড়ে রওনা হচ্ছে দেখে গুরু বল্লেন,—'কোথা যাচ্ছিস্ রে?' শিষ্য বল্লে,—'যেদিকে তু' চ'খ যায়!' গুরু বল্লেন,—'কেন রে? শিষ্য বল্লে,—'আপনাকে পূর্ণ মানুষ ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আপনি অপূর্ণ মানব, আপনার জীবনে অনেক দোষ, অনেক ত্রুটী।' গুরু বল্লেন,—'তারই জন্য চলে যাবি? কেন রে, আমি কি আত্ম-সংশোধন কত্তে পারি না?' শিষ্য বল্লে,—'তা ইচ্ছা হয় করুন গে, কিন্তু আমি আর থাক্‌ব না, পূর্ণ মানুষের খোঁজে আমি চল্লাম।' গুরু বল্লেন,—'যাস্‌নে রে তুই যাস্‌নে, আমি যে তোর গুরু, আমাকে ত্যাগ কর্ল্লে যে তুই অপরাধী হ'বি।' শিষ্য বল্লে,—'আপনাকে আর গুরু ব'লে মানিই না, আপনাকে ত্যাগ কর্ল্লে কোনো দোষ নেই।' গুরু বল্লেন,—'না রে না, ও কথা বল্‌তে নেই, ওতে মহাপাপ হয়, গুরু চিরকালই গুরু, চোর হ'লেও গুরু, ডাকাত হ'লেও গুরু, মাতাল হ'লেও গুরু, লম্পট হ'লেও গুরু।' কিন্তু শিষ্য শুন্‌ল না, সে চলে গেল। গুরু প্রিয়শিষ্যের শোকে অনেক দিন ব'সে ব'সে কাঁদ্‌লেন, কালক্রমে শোক অপনোদিতও হ'ল। হৃদয়ের যে স্থানটা প্রথম শিষ্য অধিকার ক'রে ব'সেছিল, ধীরে ধীরে দ্বিতীয় শিষ্য এসে সেই স্থানটা অধিকার কর্ল্ল। কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যের ছিল চরিত্রে দোষ। গুরু একদিন দেখ্‌লেন, প্রিয় শিষ্য ত' সর্ব্বনাশের পথে চলেছে! তিনি শিষ্যকে ডেকে বল্লেন,—'বাবা, এখনো এ পথ থেকে ফিরে আয়, নইলে বিষম বিপদ ঘট্‌বে, তুই যে ডুব্‌লি হতভাগা।' শিষ্য গুরুর কথায় কর্ণপাতও কর্ল্ল না। তখন গুরু নিরুপায় দেখে ভাব্‌লেন, বন্ধুত্বের শক্তি অপরিসীম, হয়ত ওর বন্ধুরা ওকে কু-পথ থেকে ফিরাতে

পার্শ্বে। তাই, তিনি শিষ্যের বন্ধুদের নিকট গিয়ে বল্লেন,—'দেখ্, তোদের অমুক বন্ধু চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে, পারিস্ যদি তোরা সব তাকে রক্ষা কর্।' কিন্তু বন্ধুরা কেউ কিছু কত্তে পার্ল্ল না, বরং দ্বিতীয় শিষ্য যে গোল্লায় যাচ্ছে, মাঝ থেকে এই কথাটা শুধু শুধু সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জানাজানি হ'য়ে গেল। শিষ্য এতে ব্যথিত হ'য়ে আশ্রম ত্যাগ ক'রে রওনা হ'ল। গুরু বল্লেন,—'ওরে তুই যাচ্ছিস্ কোথা ?' শিষ্য বল্লে,— 'অধঃপথে যাচ্ছি, তুমি আমাকে পেছন থেকে ডে'ক না ব'লে দিচ্ছি !' গুরু বল্লেন,—'কেন রে, কি দোষ আমি করেছি ?' শিষ্য বল্লে,—'ন্যাকা সেজো না, আমার নিন্দা ত্রিভুবনময় ছড়িয়ে দিয়ে এখন ভালবাসা দেখান হচ্ছে।' গুরু বল্লেন,—'তোর ভাল'র জন্যই ত' করেছিলাম রে, তোর মন্দ ত' আমি চাই নি।' শিষ্য বল্লে,—'ভালো-মন্দ বুঝি না মশাই, তুমি আমার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেছ, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।' গুরু বল্লেন,—'হাজার আমি দোষ করি, হাজার আমি ত্রুটী করি, আমি যে তোর গুরু রে ! শেষটায় আমাকে ত্যাগ কর্ব্বি ?' শিষ্য বল্লে,—'তোমার মতন গুরু ত্যাগ করাই উচিত ; শিষ্যের ছিদ্র যে লুকিয়ে রাখতে পারে না, সে গুরু হবার যোগ্যই নয়।' শিষ্য চলে গেল, গুরু কতকদিন ধ'রে তার জন্যে কাঁদ্লেন। ক্রমে শোক অপনোদিত হ'লে তৃতীয় শিষ্যই তার হৃদয়ের সকল স্নেহের আধার হ'ল। কিছুদিন যায়, একদিন তৃতীয় শিষ্যও পড়ল কঠিন ব্যাধিতে, জীবনের আর কোনও আশাই নেই। শিষ্য রোগশয্যায় পড়ে পড়ে চিন্তা আরম্ভ কর্ল্ল,—'রোগ হবার কারণ কি ? আমি ত' আহারের সুনিয়ম, সদাচার, সংযম—এসব থেকে কখনও পরিভ্রষ্ট হই নি।' শেষে ভাব্তে ভাব্তে ঠিক্ কর্ল্ল যে গুরুর কাছে যে মন্ত্র সে নিয়েছে, তারই ফলে এই মারাত্মক

ব্যাধি তাকে ধরেছে, এ সাধন না কর্ল্লে ত' আর ব্যাধি হ'ত না। তাই সে ঠিক কর্ল্ল, মন্ত্র ভুলে যাবে। কিন্তু ভুল্বার জন্য যত চেষ্টা করে, ততই ইষ্টমন্ত্র তার বেশী বেশী মনে আসে। শিষ্য দেখ্‌ল, বিষম বিপদ। তখন সে স্থির কর্ল্ল, গুরুই ত্যাগ কত্তে হবে, নইলে আর মন্ত্র-ত্যাগ করা যায় না। তখন সে রুগ্ন শরীরেই ভাল ক'রে কাঁথা-কম্বল জড়িয়ে রওনা হ'ল। গুরু বল্লেন,—'যাস্ কোথা ?' শিষ্য বল্লে,—'তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি, কারণ তোমার দেওয়া সাধনের ফলেই আমার এ প্রাণান্তকর ব্যাধি হ'য়েছে।' গুরু বল্লেন,—'কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর শীতকাল, পথে বেরুলে যে মারা পড়বি ?' শিষ্য বল্লে,—'মরি না হয় পথে-পগারেই মর্ব্ব, তবু তোমার ওখানে থাকব না, তোমার জন্যেই না আমার এমন ব্যাধি হ'ল, তোমারই জন্যে না আমি ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছি।' গুরু বল্লেন,—আমি শতবার ঘাট মান্‌ছি রে, তবু আমায় ছেড়ে যাস্‌নে, আমি যে তোর গুরু!' শিষ্য বল্লে, –'মুখে বল্লেই গুরু হয় না, গুরুর মত কাজ কত্তে হয়, শিষ্যকে উপদেশ দেবার বেলা হিসাব ক'রে উপদেশ দিতে হয়, যেন তাতে আবার শিষ্যের অনিষ্ট না হয়।' শিষ্য চলে গেল, গুরু কেঁদে আকুল। একে একে তাঁর সব গেল। যাকে ভেবেছিলেন প্রাণের প্রাণ, সেও গেল; যাকে ভেবেছিলেন পরমবুদ্ধিমান্, সেও গেল; সর্ব্ব-শেষে যাকে ভেবেছিলেন সকলের চেয়ে ধীর স্থির, যেতে যেতে সেও গেল। আজ যে আশ্রমের মন্দিরে বাতি দেবার লোকটীও নেই। গুরু তখন ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে বল্‌তে লাগলেন,—'ঠাকুর, বৃথাই শিষ্য খুঁজে বেড়াই আর ভালবাসতে গিয়ে প্রাণভরা জ্বালা আর হৃদয়ভরা বেদনা পাই। না ঠাকুর, কারো সঙ্গে আমি আর কোনো সম্বন্ধ রাখ্‌ব না, এখন থেকে সকল সম্বন্ধ শুধু তোমাতে আর আমাতে।'

এই না ব'লে গুরু বস্‌লেন সাধনাতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এভাবে কেটে গেল। একদিন সহসা তিনি এক দৈববাণী শুন্‌তে পেলেন, কে যেন বল্‌ছে,—'তুই কারো গুরু ন'স, তুই সকলের লঘু, তুই কারো প্রভু ন'স্, তুই সকলের দাস।' দৈববাণী শুনেই গুরু তখন মন্দিরের বাইরে এসে উন্মুক্ত মাঠের মাঝে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই দেখেন, যে দিকেই মুখ ফিরান, সেই দিকেই একজন একজন লোক হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চ'খ তাকাতেই অম্‌নি বলে,—'গুরু পথ দেখিয়ে দাও, প্রভো, চরণাশ্রয় দাও।' 'গুরু বল্লেন,—'ওরে তোরা আমাকে গুরু বলিস্ নে, আমাকে প্রভু ডাকিস্ নে, আমি যে তোদের সেবক মাত্র, তোদের যখন যার যে অভাবটুকু পড়্‌বে, আমি যে সেই অভাবটুকুর পূরক মাত্র! যার প্রাণে যেইখানে আছে বেদনা, সেইখানে আমি হাত বুলিয়ে শুশ্রূষা কর্ব্ব; যার যেখানে ক্ষত, সেখানে নিজের জিভ্ দিয়ে পূয সাফ কর্ব্ব; যার পায়ে কাঁটা ফুট্‌বে, দুই হাতে তার পদতলের পরিচর্য্যা কর্ব্ব। আমি তোদের পায়ের ধূলো, আমি তোদের পায়ের জুতো, আমি তোদের দাস, আমাকে 'গুরু' ব'লে, 'প্রভু' ব'লে গাল দিস্ নে।' হঠাৎ গুরু দেখলেন, তিনজন লোক চ'খে মুখে কাপড় গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গুরু তাদের বুকের কাছে টেনে নিতেই তারা মাটিতে প'ড়ে অশ্রুজলে পদতল সিক্ত কত্তে লাগ্‌ল। বার বার তারা বল্‌তে লাগ্‌ল,—'গুরো, পিতা, আমরা তোমার বিদ্রোহী সন্তান, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।' গুরু বল্লেন,—'সে কি রে, পরমপিতাই একমাত্র পিতা, পরমগুরুই একমাত্র গুরু,—আমি যে তোদের দাদা, তোদের গুরুভাই। শিষ্যেরা বল্ল,—'আপনি কি আমাদিগকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না?' গুরু

বল্লেন,—'পাচ্ছিরে পাচ্ছি, তাই না আজ ভাই ব'লে কোল দিচ্ছি ; তোরা আমার সেই তিনটী হারানো নিধি, তোদের কথা কি কখনো ভুল হ'তে পারে ?' শিষ্যেরা বল্লে,—গুরু, আমরা গুরুত্যাগ ক'রে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আজ স্পষ্ট বুঝলাম, গুরুকে কখনো ত্যাগ করা যায় না, চেষ্টা ক'রেও না।' গুরু বল্লেন,—'আমিও চেয়েছিলাম তোদের উপর গুরুগিরি ফলাতে, কিন্তু আজ স্পষ্ট জান্‌লাম, মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধই নিত্য সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধের আর লয়-ক্ষয় নেই।'

মনে প্রাণে সাধনা

ময়মনসিংহ
২৮শে পৌষ, ১৩৩৪

অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী যুবককে বলিলেন,—জীবনের যে বস্তুটী তীব্রতম কাম্য, তাকে কার্য্যতঃ পাও আর না পাও, ভাবতঃ পাওয়ার জন্যে নিয়ত যত্নবান্ থাকবে। তোমার সমগ্র মনঃপ্রাণ যেন তাই শুধু চাইতে থাকে। Every movement of your mind and body must remember the desired object. (তোমার প্রত্যেকটী দৈহিক ও মানসিক স্পন্দন যেন প্রার্থিত বস্তুকে স্মরণ করে)। তোমার কাম্য ব্যক্তিগত হ'তে পারে, ঈশ্বরগত হ'তে পারে, দেশগত হ'তে পারে, মানব-সমাজগত হ'তে পারে। প্রার্থিত যদি ব্যক্তিগত হয়, তবে বোধ হয় উন্নতি প্রার্থনার চেয়ে বড় প্রার্থনা আর কিছুই নাই। তখন সমগ্র মন-প্রাণকে "উত্থান" শব্দটীর সাথে যুক্ত ক'রে রাখ্‌বে। Every breathing of yours must utter the inspiring word "UPLIFT". If your aim be spiritual, every breathing

of yours must utter the holy word "OM". If your aim be patriotic, every breathing of yours must utter the thundering word "FREEDOM". If your aim be humanitarian, every breathing of yours must utter the sublime word "SERVICE"—(অনুবাদ—তোমার প্রত্যেকটী শ্বাস-প্রশ্বাস যেন "উত্থান" শব্দটী জপ করে। যদি তোমার লক্ষ্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্বাসে ও প্রশ্বাসে পবিত্র নাম "ওম্" উচ্চারণ করা চাই। যদি তোমার লক্ষ্য দেশ-কল্যাণমূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি-শ্বাসে-প্রশ্বাসে বজ্রনাদী মন্ত্র "স্বাধীনতা" জপ করা চাই। তোমার লক্ষ্য যদি মানব-জাতির সেবা-মূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি শ্বাস ও প্রশ্বাসে দিব্য শব্দ "সেবা" জপ করা চাই।)

ব্রহ্মদর্শীর স্বদেশ-প্রেম

বৈকালে ভক্ত-সমাবেশ হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি ব্রহ্মদর্শী পুরুষ, তিনি সর্ব্বভাবের দর্শন পান, তাঁর উপলব্ধি এড়িয়ে জগতের একটী চিন্তাও যেতে পারে না। তাই তিনি কোনো মহান্ ভাবের প্রতিবাদী হন না। এই জন্যই ভগবদ্দর্শী মহাপুরুষের পক্ষে কখনো জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাঁর অনুভূতির ভাণ্ডার অফুরন্ত, সব অনুভূতিগুলিকে তিনি মানব-প্রীতির সূতো দিয়ে পুঞ্জীভূত ক'রে বেঁধে রাখেন। তাই তাঁর জীবনে প্রধানতঃ মানব-প্রীতিই দেখ্তে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এই মানব-প্রীতি কি দেশের লোককে বাদ দিয়ে? জীবসেবা কত্তে হ'লে কি ভারতের লোকগুলিকে বর্জ্জন কত্তে হবে? না, তা' নয়। তাঁর ভিতরেও স্বদেশ-

প্রেম থাকে। তবে শত শত সমকক্ষ মহদনুভূতির সঙ্গে একসাথে থাকে ব'লে গ্রাম্য দর্শক তা' দেখ্তে পায় না। তাই তারা ভ্রম ক'রে সিদ্ধান্ত করে যে, সাধু-পুরুষেরা জাতীয়-স্বাধীনতার শত্রু।

অভিক্ষা

ময়মনসিংহ
২৯শে পৌষ, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার কোনও প্রিয় ভক্তের নিকটে অভিক্ষা-ব্রত সম্বন্ধে এক পত্র লিখিলেন। তাহার অংশ-বিশেষ নিম্নে অনুলিখিত হইল। যথা,—

"* * * এই অবসরে আমার স্কন্ধের বিশাল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যসমূহ তোমাদের স্কন্ধে পড়িবে। আমার শত শত প্রিয়জনের মধ্যে যে দুই-চারিজন আত্মসুখ, সংসার-মোহ ও বিষয়-সেবা হইতে মন গুটাইয়া আনিয়া চির-দারিদ্র্যের ও চির-ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত গ্রহণ করিবে, তাহাদের উপর এই সকল গুরুতর কর্ম্মের ভার স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িবে। অকালবীর্য্যক্ষয়পরায়ণ বালক ও যুবক-সমাজের মধ্যে সংযমের মৃত-সঞ্জীবন পরিবেশন করিবার ভার, বলপৌরুষহীনের প্রাণে শক্তিসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস প্রস্ফুরণের ভার, স্বার্থ-সেবীর মনে পরার্থপরতা ও বিলাস-সেবীর মনে দেশাত্মবোধ উদ্দীপনের ভার আজ হইতে তোমাদের উপরেই পড়িল। ঘরে ঘরে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইবার দায়িত্ব, পথে পথে আলোকমালা সজ্জিত করিবার দায়িত্ব তোমাদের উপরেই পড়িল। জানি, তোমরা এখনও বালক মাত্র, কিন্তু ইহাও জানি, তোমরা শৃগাল-শাবক নহ, তোমরা সিংহ-শিশু।

"আমার কর্ম্মনীতি * অভিক্ষা। অভিক্ষার নিকষ-পাষাণে নিয়ত আমি জীবনকে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। অভিক্ষা দিয়া নিজ জীবনকে চিনিয়াছি, জীবন দিয়া অভিক্ষাকে চিনিয়াছি। তোমরাও অভিক্ষাকেই কর্ম্মনীতিরূপে গ্রহণ করিও। ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বহিয়া দুয়ারে দুয়ারে গিয়া মানুষের অনুকম্পাকে জাগরিত করিতে প্রয়াস পাইও না,—ভিক্ষাবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া, প্রার্থনা-পরায়ণতা পরিহার করিয়া দেশের ও মানবজাতির সেবা করিও। তোমাদের অপ্রার্থী অভিক্ষু জীবনের দীপ্ত পৌরুষ দর্শন করিয়া যেন স্বেচ্ছায় স্বতঃ-প্রণোদিত ভাবে পরার্থে ত্যাগ স্বীকার করিবার আন্তরিক প্রেরণা তোমাদের সৎকর্ম্মকুণ্ঠ দেশবাসী অনুভব করিতে বাধ্য হয়। তোমাদের জীবন যেন কাহারও কৃপা করিবার শক্তিকে আকর্ষণ না করে,—দেশের প্রতি, দশের প্রতি তাহাদেরও যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে, শুধু যেন তাহারই স্মারকরূপে দেদীপ্যমান থাকে।

"এখানে অভিক্ষার একটা সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ আবশ্যক মনে করি। আমার কর্ম্মজীবনে আগা-গোড়া আমি অভিক্ষার পূজা করিয়াছি কিন্তু সকল সময়ে অভিক্ষা বলিতে ঠিক্ একই কথা বুঝি নাই। বিভিন্ন সময়ে অভিক্ষা শব্দটির অর্থ-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অর্থ-পরিবর্ত্তনের মূলে সুবিধাবাদ বা কপটতা কখনই ছিল না। বিভিন্ন সময়ে কর্ম্মজীবনের এমন এক এক প্রকারের অভিনব অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছি, যাহার ফলে আমার সহজ বুদ্ধি এক এক সময়ে অভিক্ষা কথাটার এক একটা মানে বুঝিয়াছে। অভিক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ

* কর্ম্মিরূপে অভিক্ষার সাধনা, সাধকরূপে শঙ্কর-বুদ্ধাদি প্রবর্ত্তিত ভৈক্ষ্য। কর্ম্মীর সঙ্ঘ আছে, সাধকের সঙ্ঘ নাই।

করিয়াছিলাম সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইবার পরে নহে, পরন্তু এই মন্ত্র গ্রহণের পরে নিয়ত প্রত্যক্ষ জীবনে ইহার প্রয়োগ করিতে করিতে দিনের পর দিন ইহার অর্থ আমার নিকটে স্ফুটতর হইয়াছে। ইহাই অভিক্ষা শব্দের অর্থ-পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। কথাটা আমার জীবনের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল দৈবভাবে, কোনও মানুষের বুদ্ধিতে বা অবস্থার চাপে নয়।

কখন কিভাবে অভিক্ষা কথাটার অর্থ করিয়াছি, সেই ইতিহাস বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তোমাদের নিকট অভিক্ষা কথাটার অর্থ কিরূপ হইবে, শুধু তাহাই বলিব। অভিক্ষা শব্দের নানা অসম্ভব মানে করিয়া সরল বিশ্বাসে আমি বহু বৃথাকষ্ট ও আত্মপীড়ন সহিয়াছি। তাই তোমাদিগকে সংজ্ঞাহীনতার বিপদ হইতে আমি রক্ষা করিব।

"অভিক্ষা মানে ভিক্ষা না চাওয়া। মুখে ত' চাহিবেই না, মনে মনেও চাহিতে পারিবে না। স্বভাবসৃষ্ট আনুকূল্যের উপরে তোমাদের বাহুবল প্রয়োগ করিবে,—ইহাই তোমাদের কর্ম্মপন্থা। সাধিয়া না খাওয়াইলে ক্ষুধার সময়েও কাহারও কাছে কিছু চাহিয়া আনিতে পারিবে না। কিন্তু একটী জিনিষ চাহিবার অধিকার তোমাদের সর্ব্বদাই আছে,—তাহা হইতেছে মানুষের শ্রম। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া না দিলে অপর কিছু চাহিবার অধিকার তোমাদের নাই, কিন্তু সৎকার্য্যে শ্রম স্বীকার করিবার জন্য যে-কাহাকেও আহ্বান করিবার অধিকার তোমাদের আছে। লেখককে তোমাদের হইয়া লিখিবার জন্য, গায়ককে তোমাদের হইয়া গাহিবার জন্য, বক্তাকে তোমাদের হইয়া বলিবার জন্য, মজুরকে তোমাদের হইয়া খাটিবার জন্য আহ্বান করিবার

অধিকার তোমাদের আছে। বিত্ত বা ভূমি চাহিবার অধিকার তোমাদের নাই কিন্তু স্বেচ্ছায় কেহ দিলে লইবার বা না-লইবার অধিকার আছে। ভিক্ষা করিবার তোমাদের অধিকার নাই কিন্তু পরিশোধ-সঙ্কল্পে গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। কাহারও জন্য কোনও প্রকার নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শ্রম স্বীকার করিয়া প্রতিদানে অর্থ বা ভূসম্পত্তি লইবার অধিকার তোমাদের নাই কিন্তু দৈহিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে লইবার পূর্ণ অধিকার আছে।

তোমরা যাবতীয় জাতীয়-কল্যাণের মূলদেশে এই অভিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হও। নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে না পারিলে জগতের কোনও জাতি বড় হয় না, তোমরাই কি ছোট-বড় সকল কার্য্যে চির-পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া বড় হইবার সুখস্বপ্ন দেখিবে? আমি জানি, মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র দৃঢ়চরিত্র যুবক যদি অভিক্ষার পূজারী হইয়া সমাজ-কল্যাণ-ব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে অদূরকালের মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ দুর্ভাগ্য মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হইবে।"

ময়মনসিংহ
১লা মাঘ, ১৩৩৪

ভগবানের নাম, জীব-কল্যাণ ও প্রেম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে লিখিলেন,—

"ভগবানের নাম তাহার কাজ অতি সূক্ষ্ম হস্তে করে। এখন ফলের দিকে তাকাইও না, শুধু বীজের উপর নিয়মিত ভাবে জলসিঞ্চন করিয়া যাও। নামের shell (বীজের খোসা) মাটিতে পচিলে তারপরে

অঙ্কুরোদ্গম হয়, তারপরে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখার বিস্তার হয়, তারপরে ফুল ও ফল। কিন্তু নামের কৃপা, প্রভাব ও মহিমা অলঙ্ঘনীয়। ইহার অজ্ঞাতসারে তোমার দেহ, মন, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে জীব-কল্যাণে প্রেরণ করিবে। নীরবে ইহারা তোমার মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিবে, হৃদয় প্রেমবিগলিত করিবে। You are sublime by your love for God, for humanity and for country. Love is your career, love is the sum-total of your life-long achievements. The beginning of love is but the beginning of life, immortal love is but immortal life. Stand steady on this heavenly bliss and live for love and die for love. The holy name of God is the key to the treasury of love and the gate to the kingdom of purity and perfection" (বঙ্গানুবাদ—ভগবৎ-প্রেম, মানব-প্রেম এবং স্বদেশ-প্রেমের দ্বারাই তুমি মহিমান্বিত। প্রেমই তোমার জীবন, প্রেমই তোমার কর্ম্মসাধনা, প্রেমই তোমার সমগ্র জীবনব্যাপী সুকৃতিনিচয়ের সমন্বয়। প্রেমের প্রারম্ভই জীবনের প্রারম্ভ, মৃত্যুহীন প্রেমই মৃত্যুহীন জীবন। এই স্বর্গীয় আশিসের উপরে শক্ত হইয়া দাড়াও, প্রেমের জন্য জীবন ধারণ কর, প্রেমের জন্য মৃত্যু বরণ কর। ভগবানের সুপবিত্র নামই প্রেম-কোষাগারের চাবিকাঠি, নামই পবিত্রতা ও পূর্ণতার রাজ্যের সিংহদ্বার।)

অভিক্ষা

সন্ধ্যার সময়ে স্থানীয় ভক্তগণের সমাগম হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি অভিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—প্রথম যেদিন অভিক্ষার সঙ্কল্প

আমার মনে জাগল, সেইদিন কথাটার মানে যে আমি খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝেছিলাম, তা নয়। কিন্তু অভিক্ষার পথে চল্‌তে পার্‌লে যে দেশের সকল দিকের সকল উন্নতি ধ্রুব, তা' ভগবান আমাকে স্পষ্টই বুঝ্‌তে দিয়েছিলেন। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি বৈষয়িক সংসারে, কি রাজ-নৈতিক প্রযত্নে, সর্ব্বত্র আমরা ভিক্ষুক। ভগবানের কাছে গিয়ে বলি, প্রভো করুণা কর, তপস্যার শক্তিতে ভগবানকে করুণা কত্তে বাধ্য কত্তে পারি না। গৃহস্থের কাছে গিয়ে বলি, দু'মুঠা চাল দাও, পয়সা দাও, নিজেদের জীবনের অপরিহার্য্য প্রভাবকে কার্য্যের দ্বারা প্রসারিত ক'রে স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে সৎকার্য্যে সহায়তা কত্তে কাউকে বাধ্য কত্তে পারি না। ব্যবসায়ের মালিকের কাছে গিয়ে বলি, চাকুরী দাও, নকরি দাও, নিজের যোগ্যতার বলে তাঁকে এসে আমার দুয়ারে সাধাসাধি কত্তে বাধ্য কত্তে পারি না। ইংরেজের কাছে বলি, স্বরাজ দাও, স্বাধীনতা দাও, নিজের শক্তিতে, বাহুর বলে তা' অর্জ্জন কত্তে পারি না। ব্যবস্থাপক সভায় গিয়ে বিদেশী পরধর্ম্মী শাসকের জাতিকে বলি, আমাদের সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন কর, অসবর্ণ বিবাহ চালাও, বাল্য-বিবাহ রহিত কর, কিন্তু নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে সমাজকে সংস্কৃত কত্তে পারি না। এই যে আমাদের সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা, ভগবান চেয়েছিলেন, আমাকে দিয়ে তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে। ধর্ম্মপ্রচারকেরা বল্লেন,—অভিক্ষাটা আত্মাভিমান-প্রসূত কথা, ওটা টিকৃবে না, কেননা ভিক্ষাটন ক'রে বেড়ানই সাধুর কর্ত্তব্য। দেশ-হিতৈষীরা বল্লেন,—কথাটা ভালোই কিন্তু এর সাফল্যের সম্ভাবনা নেই, কেননা, চিরকালই দেশের সকল সৎকাজ ভিক্ষা ক'রে ক'রে হ'য়ে আস্‌ছে। অধিক কি, আমার যাঁরা

ছিলেন কর্ম্মের সাথী, তাঁরাও অভিক্ষায় বিশ্বাস করেন নি। আজও তোমরা অনেকে বিশ্বাস কত্তে পাচ্ছ না, অথচ চ'খের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, ছয় পয়সা দামের তিন শত খানা "কর্ম্মের পথে" * সম্বল ক'রে কত সব হচ্ছে। কিন্তু একদিন সবাইকে অভিক্ষার শক্তিতে বিশ্বাস কত্তে হবে, কারণ, এ পথ আমার আবিষ্কার নয়, এ মন্ত্র আমার মন-গড়া নয়। ভগবান আমাকে দেশের কল্যাণের জন্য এ পথ দেখিয়ে দিলেন, ভগবান নিজে আমার কাণে এ মন্ত্র শুনিয়ে দিলেন। তাই, আমার পথ অভিক্ষা, তাই আমার মন্ত্র অভিক্ষা। গ্রামে গ্রামে একদিন লোক-সেবাকর প্রতিষ্ঠান হবে,—সব হবে অভিক্ষার শক্তিতে নির্ভর ক'রে। মনে কর, একটুখানি ভূমি সংগৃহীত হ'য়েছে, দুটী লোক সেই ভূমি-মাতার সেবা-পরিচর্য্যায় লেগে গেল। মস্ত মস্ত হুজুগ ক'রে লোকের মন মাতাবার চেষ্টা না ক'রে সর্ব্বপ্রথমে তারা শুধু এমন চেষ্টাই কর্ল্ল যেন ঐ ভূমিটুকুই তাদের উদরের অন্ন যোগাতে পারে। এই সময়ে তারা জন-সমাজের এরূপ সেবা কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে, যাতে পয়সা-খরচ আদৌ নেই। তারপর ভূমিলক্ষ্মীর কৃপাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব কাজে হাত দিতে আরম্ভ কর্ব্বে, যাতে অর্থব্যয় অতি অল্প। যেমন ধর, নৈশ-বিদ্যালয়, ব্যায়াম-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালাবার তৈলটুকুর দাম জুটলেই নৈশ-বিদ্যালয় চল্‌তে পারে। দু' এক জোড়া ডাম্বেল, বার্‌বেল, মুগুর কিন্‌বার পয়সার

---

* শ্রীশ্রীবাবামণি প্রণীত "কর্ম্মের পথে" প্রথম সংস্করণ (মূল্য /১০ আনা) কলিকাতার কোনও বন্ধু এক হাজার মুদ্রিত করেন এবং তিন শত পুস্তক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন। ঐ তিন শত খণ্ডই মূলধন হয়। বর্ত্তমানে /১০ আনা সংস্করণের সবগুলি বহি একত্র হইয়া "কর্ম্মের পথে" নামে বাহির হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

সঙ্কুলান হ'লেই ব্যায়াম-বিদ্যালয় সুন্দররূপে আরম্ভ হ'তে পারে। গ্রামের একটী লেখাপড়া-জানা সচ্চরিত্রা বিধবা মাকে মাসিক পাঁচ সাত টাকা ক'রে প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা কত্তে পার্লেই বালিকা-বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্রীর নিজ বাড়ীতে চল্‌তে পারে। তারপরে বেশী পয়সা হয় ত' বই কেন, লাইব্রেরী কর, না হয় ত' গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তিন চার বাড়ীর লোক একত্র ক'রে ব'সে ভাল বই, খবরের কাগজ, ধর্ম্মকথা শুনাও। লাখ টাকা না হ'লে দেশের কাজ হবে না, ওসব আজগুবি মিথ্যা কথা। প্রাণ দেবার লোক যদি থাকে, কাজ হবেই হবে। অভিক্ষার উপরে দাঁড়াতে পার্লে প্রত্যেক দেশ-কর্ম্মীর প্রাণের মূল্য বাড়্‌বে, তাই তাদের দেশ-সেবারও মূল্য বাড়্‌বে।

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পিপাসা

পুরুষ-ভক্তগণ চলিয়া গেলে জনৈকা মহিলা-ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট নানাবিধ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহিলাটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান্‌কে দেখ্‌ব, তাঁর সঙ্গে ব'সে কথা বল্‌ব, এ রকম পিপাসা কেন জন্মে না বাবামণি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—জন্মে নি ব'লে দুঃখ করো না মা, তাঁর নামের সেবা অবিচ্ছেদ ক'রে যাও, সময় মত সে পিপাসা জন্মাবে। রসগোল্লার এক কণিকাও যে কখনো খায় নি, জিনিষটা চ'খেও যে কখনো দেখে নি, তার কি কখনো আস্ত রসগোল্লাটা খাবার লোভ হয়? ভগবানের নাম কত্তে কত্তে যখন তাঁর অপার প্রেমের একটী কণিকারও আস্বাদন পাবে, তখন দেখো তাঁকে ষোল আনা পাবার জন্যে কি ব্যগ্রতা আসে। জেনো, মানব-জন্ম যখন পেয়েছ, তখন ভগবানকেও পাবেই পাবে।

তিনি নিজে এসে তোমাকে দেখা দিতে বাধ্য, নিজে এসে কোলে তুলে নিতে বাধ্য, মা হ'য়ে নিজের বুকের স্তন্যরস পান করাতে বাধ্য। তিনিই এ দেবদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম দান করেছেন, তিনিই নিজের গরজে এ জন্মটাকে সার্থক ক'রে দেবেন। তুমি শুধু সহিষ্ণুভাবে দৃঢ়নিষ্ঠায় তাঁর নামের সেবা ক'রে যেতে থাক। রান্না শেষ হ'য়ে গেলে তবে গিয়ে মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের কাছে ভাত পরিবেশন করেন। ছেলে-মেয়ে তাঁর নাম নিয়ে স্থির হ'য়ে থাক্‌লে, মা তাড়াতাড়ি রান্না সমাপ্ত কত্তে পারেন। যতক্ষণ মা নিজের হাতে খাবার পরিবেশন না কচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁকে বিরক্ত করার দরকার কি? ততক্ষণ ব'সে তুমি একমনে এক ধ্যানে মায়ের মধুর নাম জপ কত্তে থাক।

সচ্চিন্তার শক্তি

অতপর শ্রীশ্রীবাবামণি অপরাপর বিষয় বলিতে বলিতে অবশেষে সচ্চিন্তার বিষয় বলিতে লাগিলেন,—সর্ব্বদাই সচ্চিন্তা কর্ব্বে, সচ্চিন্তায় শরীর শুদ্ধ হয়। যে মহৎ কাজ তুমি কত্তে পার্ব্বে না, তারও বিষয় আকাঙ্ক্ষা কর্ব্বে। তোমার আকাঙ্ক্ষা যদি তীব্র হয়, তবে তোমা-দ্বারা তা' পূর্ণ হোক্ আর নাই হোক্, জগতের কোন না কোন স্থানে কেউ না কেউ তা' পূর্ণ কর্ব্বেই কর্ব্বে। সচ্চিন্তার মৃত্যু নেই। হয়ত তুমি ভাব্‌লে যে, যারা নিজেদের ছোট ছোট মেয়েদের প্রতিপালন কত্তে পারে না বলে অসৎ লোকের কাছে বিক্রি ক'রে ফেলে, তাদের মেয়েগুলিকে সংগ্রহ ক'রে এনে সৎশিক্ষার ব্যবস্থা কর্ব্বে, যেন, তারা সৎপথে থেকে জীবিকা অর্জ্জন কত্তে পারে, আর, সমাজের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। তুমি মনে মনে একথা খুব চিন্তা কত্তে আরম্ভ কর্ল্লে। ভাব্‌তে লাগ্‌লে

যেন একটা বালিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তাতে ছোট ছোট অনাথা অসহায়া মেয়েরা শিক্ষার সাথে সাথে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। এদের মধ্যে কেউ কেউ যোগ্য বর পেয়ে বিয়ে কর্ল্ল এবং স্বামীকে সৎপথে সহায়তা দিতে লাগ্‌ল। যারা বিয়ে কর্ল্ল না, চির-কুমারী রইল, তারা এই রকম আবার শত শত কুমারী-আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর্ল্ল, স্ত্রী-জাতির উন্নতি-কল্পে নানাভাবে প্রাণপণে চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। তোমার এই চিন্তাটা যখন খুব তীব্র হবে, তখন সেই চিন্তাটা এসে তোমাকে বল্‌বে,—"মা, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, খাদ্য দাও, শুধু সৎকাজের কথা ভাব্‌লেই চল্‌বে না, চিন্তাটাকে চেষ্টা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে বাঁচিয়েও রাখ্‌তে হবে,—শুধু প্রসব কল্লেই মা হয় না, ছেলে-মেয়েকে খেতেও দিতে হয়।" তুমি হয়ত বল্লে,—"আমি যে দরিদ্র রে, তুই আর কারো কাছে যা।" চিন্তাটা তোমাকে হয়ত বল্ল,—দারিদ্র্যকে ভয় কর কেন মা, দারিদ্র্য একটা বাধা-ই নয়, লোক-লজ্জার ভয় ছাড়্‌তে পাল্লে'ই সব কত্তে পার মা, সব কত্তে পার।" তুমি হয়ত বল্লে,—"তবু আমি পার্ব্ব না রে, তুই অন্য কারো কাছে যা, তোর মত মহচ্চিন্তাকে চেষ্টা দিয়ে বাঁচাতে যে সাধন লাগে, তা' ত' আমি সঞ্চয় করি নি!" তখন সেই চিন্তা একজনের পর একজন ক'রে জগতের প্রত্যেকের কাছে ঘুরে বেড়াতে থাক্‌বে। কালক্রমে এমন হবে যে, তুমি এখানে ব'সে যে চিন্তাটী কচ্ছ, তাই সিংহলের বা কাশ্মীরের একটী নারীর পবিত্র হৃদয়ে গিয়ে আঘাত কর্ল্ল, তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে দিয়ে এই মহৎ কার্য্যেই মৃত্যু-সঙ্কল্প নিয়ে লেগে গেলেন। চিন্তার এম্‌নি শক্তি! সৎকাজ কত্তে পাচ্ছ না ব'লে কখনো আক্ষেপ কর্ব্বে না, নিয়ত প্রবলভাবে সৎচিন্তা কত্তে থাক্‌বে। সাধনে যদি মন থাকে, তবে জেনো, তোমার একটী সচ্চিন্তাও কখনো

ব্যর্থ হ'তে পারে না। সবাই কি সৎকাজে হাত দিতে পারে? কিন্তু সচ্চিন্তা সবাই কত্তে পার। তাতে নিজেরও লাভ, জগতেরও লাভ।

ময়মনসিংহ
২রা মাঘ, ১৩৩৪

ভারতীয় মুসলমানের উন্নতির উপায়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা রওনা হইবেন। সেহরা-নিবাসী জনৈক ভক্ত মুসলমান যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবার জন্য আগেই আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা মুসলমানের ঘরে জন্মেছিস্ ব'লেই তোদের আত্মোৎসর্গ চাই সবার চাইতে বেশী। যার সমাজ যত পিছনে প'ড়ে, তা'কেই তত বেশী ক'রে আত্মাহুতি দিতে হয়। সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি প্রেমবশে তোরা নিজ সমাজের যখন সেবা আরম্ভ কর্ব্বি, তখন দেখ্‌বি, কত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে; আত্মোন্নতিও হচ্ছে, সমাজেরও উন্নতি হচ্ছে! আজ্‌কের মুসলমানের এ অবনত অবস্থা কেন জানিস্? শুধু শিক্ষার অভাবে। জ্ঞানের অভাবে হাজার হাজার পুরুষসিংহ মোহ-তন্দ্রায় অবশ হ'য়ে আছে। সকল দেশের সকল জ্ঞান, সকল দেশের সকল সত্য, সকল দেশের সকল পূর্ণতা আহরণ কর্ব্বার প্রবৃত্তি এদের ভিতর জাগিয়ে দে। প্রত্যেককে ডেকে বল্,—ওরে তোরা মানুষ, তোরা অমৃতের সন্তান, কারো সঙ্গে তোদের ভেদ-বিসম্বাদ নেই, তোরা প্রেমের জ্যোতিঃ, তোরা শান্তির অগ্রদূত। সবাইকে ডেকে বল্,—যুদ্ধ কর্ব্বি ত' কর্ তোদের অন্তঃকরণের নীচতার সঙ্গে, বুদ্ধির ক্ষুদ্রতার সঙ্গে,

রিপুচয়ের অবাধ্যতার সঙ্গে, জ্ঞানের অল্পতার সঙ্গে। সাম্প্রদায়িক ভাবের কাছে উচ্ছ্বাস না জানিয়ে তোরা সব মনুষ্যত্বের উদ্দীপক সার্ব্ব-ভৌমিক ভাবের কাছে প্রাণের উচ্ছ্বাস জানাতে শিখ্। এই ভাবে সমগ্র মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য তোরা বদ্ধপরিকর হ'। মুসলমান-সমাজের উন্নতির ফলে যদি বিশ্ব-মানব লাভবান্ হয়, তবেই জান্‌বি মুসলমান-সমাজ উন্নত হ'ল। উন্নতির প্রমাণ কি জানিস্? বিশ্ব-মানবকে লাভবান্ করার ক্ষমতারই নাম উন্নতি। নইলে, "আমি মুসলমান", "আমি মুসলমান" ব'লে চেঁচাবার নাম কি উন্নতি? মনুষ্যত্বের গর্ব্ব আজ প্রত্যেকের বুকে বুকে প্রতিষ্ঠিত হোক্, প্রত্যেকের চ'খে জ্ঞানের বাতি জ্বলুক, প্রত্যেকের জিহ্বা ও উপস্থ সংযম ও সদাচারের শাসন মান্য করুক। মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা প্রকৃত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক্, তবে ত' মুসলমান নাম ধরা সার্থক হবে! আমার প্রাণে এক কণাও সাম্প্রদায়িক ভাব নেই, এই জন্যেই আমি জোর ক'রে তোকে এত কথা বল্‌ছি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান—এদের কারো সংখ্যার বৃদ্ধিতে বা হ্রাসে আমার কিছু যায় আসে না, যদি জগতে যথার্থ মনুষ্যত্ববান্ পুরুষের বৃদ্ধি না কমে। এই জন্যই আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, জৈনও নই, খ্রীষ্টানও নই, অথচ একাধারে সব। আমি মনুষ্যত্বের পূজারী, আর্য্যামী বা ইস্‌লামীর ভক্ত নই।

ভারতীয় মুসলমানের অবনতির কারণ

তারপর ভারতীয় মুসলমানের অবনতির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাণের পিপাসা মিটাবার

যোগ্য সাধন পেয়েছেন মনে ক'রে এক সময়ে কতকগুলি হিন্দু যে মুসলমান হ'য়ে গেলেন, ওটা বেশ কাজ করেছিলেন। যে ধর্ম্ম প্রাণের পিপাসা মিটাতে পার্ব্বে না, জোর ক'রে তাকে ধ'রে থাকা একটা বোকামী। কিন্তু হিন্দুর সন্তান মুসলমান হওয়া মাত্রই যে তাঁর হিন্দু-পূর্ব্বপুরুষদের ভাব, ভাষা, বেশ-ভূষা, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য ও সদাচার বিষের মতন বর্জ্জন কর্ল্লেন, ওটা হ'ল তাঁদের বিষম ভুল। এরই ফলে মুসলমান জাতির জনসাধারণের মন মনুষ্যত্বের অনেক বড় বড় শিক্ষায় চির-বঞ্চিত হ'য়ে রইল। এঁরা পূর্ব্ব গৌরব হারালেন, পূর্ব্ব-পুরুষদের জীবনের মনুষ্যত্বের দেদীপ্যমান দৃষ্টান্তসমূহের গর্ব্ব যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-গঠনের সুযোগ দেয়, তা হারালেন। ভীষ্মের মত ত্যাগী ও উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যানকারী অর্জ্জুনের মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা যে এঁদেরি পূর্ব্বপুরুষ, তা' এঁরা ভুলে গেলেন। ফল হ'ল, নৈতিক অবনতি। উন্নতি লাভ কত্তে হ'লে আজকের মুসলমানকে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তে হবে, এর কোনো মানে নেই! স্বধর্ম্মেই থাকুন, কিন্তু নিজেদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে শক্ত করার জন্যে অমুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের জীবনে যে সব মহৎ দৃষ্টান্ত আছে, তার স্মৃতি-পূজা তাঁরা করুন। আমার মনে হয়, এই পথেই হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও প্রশমিত হবে, মুসলমান-সমাজের মধ্যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম প্রভৃতি বিষয়ের চেষ্টা এবং অনুশীলনও বাড়বে। আজকের সমস্যা হিন্দু মুসলমানের নয় রে, প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে পশুত্বে আর মনুষ্যত্বে। সকল সম্প্রদায়ের লোককে নিজ পশুত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কত্তে হবে, পর-নারীর প্রতি মাতৃবুদ্ধিসম্পন্ন হ'তে হবে, পরার্থে স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, সর্ব্বজীবে প্রেম-ভাবে বিভোর হ'তে হবে।

কলিকাতা
৩রা মাঘ, ১৩৩৪

গোপন সাধন

অদ্য বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক ভক্তকে বলিলেন,—সাধকের উচিত সাধনের কথা খুব গোপন ক'রে চলা, অন্ততঃ পক্ষে প্রথম সময়ে। প্রথম সময়েই বিরুদ্ধ চিন্তার সংস্রবে এসে সন্দেহ-সংশয়াতুর হ'লে সাধনে বিষম বিঘ্ন হওয়ার কথা। চারা গাছে ছাগলের মুখ পড়া ভাল নয়, তাতে গাছের বিষম ক্ষতি। কিন্তু গাছ একটু বড় হ'লে দুটা-দশটা ডাল কেটে দিলেও কিছু যায় আসে না। সযত্নে সঙ্গোপনে সাধন কত্তে কত্তে যখন সাধন-জগতের গুপ্ত-রহস্যের দুয়ার খুলে যায়, তখন বিরুদ্ধ কথা, বিরুদ্ধ-চিন্তা, বিরুদ্ধ শক্তি সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়। প্রথম অঙ্কুরকে সযত্নে রক্ষা কর্ব্বে, বাইরে প্রকাশ পেতে দেবে না।

প্রণাম, ভক্তি ও পাদস্পর্শ

এই সময়ে একটী যুবক আসিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া প্রণাম করিলেন। একবার পঞ্চাঙ্গ, একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াও তাঁহার প্রণামের আগ্রহ মিটিল না। কয়েকজন উপবিষ্ট ভক্তকে পদ-বিদলিত করিয়াই তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির পায়ে ধরিয়া প্রণামের জন্য চেষ্টিত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জানো বাছা! প্রণামের দ্বারা অন্তরের ভক্তি-ভাব বৃদ্ধি হয় কিন্তু ভক্তির অভিনয়ের দ্বারা প্রণামের কৌলীন্য নষ্ট হয়। আরো জান্‌বে, প্রণামের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ ইষ্টের নিকটে নিজেকে নিবেদন করা। এ ক্ষেত্রে যাঁকে প্রণাম কচ্ছ, তাঁর পা-দুটো

তোমার স্পর্শ করাই চাই, তা নয়। পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করারও সুফল আছে। কিন্তু তার অন্ধকার দিকটাও দেখ্‌তে হয়। যাঁকে প্রণাম কচ্ছ, তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদও কচ্ছেন। আশীর্ব্বাদ করার কালে তাঁর মন থাকে তাঁর ভ্রূমধ্যে। তাহ'লেই তুমি আশীর্ব্বাদের পূর্ণ সুফলটুকু আহরণ কত্তে পাচ্ছ। তুমি যদি তখন তাঁর পাদস্পর্শ কত্তে যাও, তাঁর মন ভ্রূমধ্য থেকে নেমে পাদপ্রান্তে আস্‌বে। তাতে তাঁর আশীর্ব্বাদের শক্তি ও মূল্য দুটোই কমে যাবে। এই জন্যই কারো কারো অনুমতি না নিয়ে তাঁকে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করা উচিত নয়।

অবৈধ প্রণাম

যুবকটী অপ্রতিভ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাকে গাল দেবার জন্য কথাগুলি বলি নাই। উপদেশ দেবার জন্যই বলেছি। প্রাণের আগ্রহ নিয়ে কেউ কাউকে প্রণাম কত্তে এলে বাধা যদি আসে, তাহ'লে বড়ই মনঃক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রণাম করাটা যাঁরা তোমাদের শিখিয়েছেন, তাঁরা প্রণামের উদ্দেশ্য ও বিধি সম্পর্কে ত কোন শিক্ষা দেন নি! ফলে যেখানে সহজে প্রণাম করা চলে, এমন স্থলেও তোমরা প্রণামকে জটিল ব্যাপারে নিয়ে পরিণত কর। দু'জন সাধু ট্রেণে কোথাও যাচ্ছিলেন। নাম শুনে ভক্তিমান্ লোকেরা সব দেখা কত্তে এলেন। দু'জনকেই ট্রেণ থেকে প্ল্যাটফর্ম্মে নামতে হ'ল। প্ল্যাটফর্ম্ম জুড়ে সাষ্টাঙ্গের ধূম পড়ে গেল। অন্য যাত্রীরা এঁদের দরুণ আটকে গেলেন। এদিকে ট্রেণ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়্‌ল, সিটি পড়্‌ল, ট্রেণ ছাড়ল। সাষ্টাঙ্গকারীদের অবনত-মস্তক অবস্থায় প্ল্যাটফর্ম্মেই ফেলে রেখে একজন সাধু দ্রুত ট্রেণে উঠে পড়লেন,—

সাষ্টাঙ্গকারীরা মুখ তুলে দেখ্‌ল যে, সাধু নেই, তিনি চলন্ত কামরার ভিতরে অদৃশ্য। হায়! হায়! "সাধু দেখলেন না আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, আর আমরা দেখলুম না সাধুর শ্রীচরণ",—এই বলে অনেকের মনে কান্না পেতে লাগ্‌ল। আর, অন্য সাধুটী পরমভক্তদের জবরদস্ত বাহু-বেষ্টন থেকে পদদ্বয়কে সময়মত মুক্ত কত্তে পার্লেন না ব'লে ঐ প্ল্যাটফর্ম্মেই পড়ে রইলেন, তাঁর লোটা-কম্বল, জিনিষ-পত্র অস্বামিক অবস্থায়ই অজানিত দেশ-ভ্রমণে চলে গেল। এসব স্থলে প্রণামের বাড়াবাড়ি, ফুল-মালার কাড়াকাড়ি, ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি দস্তুরমতন অপরাধ। মনে কর, ঘটি হাতে নিয়ে একজন প্রণম্য-ব্যক্তি শৌচাগারে যাচ্ছেন, অথচ তুমি তখনই তাঁকে প্রণাম না ক'রে ছাড়বে না। এর ফলে তিনি খুব একটা অসুবিধায় পড়ে যেতে পারেন। পর্য্যটন বা কঠোর শ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে একজন শুয়ে বিশ্রাম কচ্ছেন, কিন্তু তোমার তাঁকে তখনি প্রণাম করা চাই, নইলে জেলা-হাকিমের কোর্টে তুমি মামলায় হেরে যাবে, কিম্বা হয়ত তোমার তিনটা লাখেরাজ তালুক নিলাম হয়ে বরবাদ হবে। তোমার প্রণাম করার গরজ দেখে মনে হচ্ছে, এর চাইতেও গুরুতর কিছু ঘ'টে যেতে পারে। তাই, খুঁচিয়ে পরিশ্রান্ত ভদ্রলোককে বিছানা থেকে তুললে, তারপরে আড়াই ঘণ্টা বাজে ব'কে, সাত কল্কী তামাক ভস্ম ক'রে বাড়ী ফিরলে। এসব প্রণাম প্রণাম নয়, দস্তুরমতন পাপ। স্নেহের বশে কেউ হয়ত পায়ে ধ'রে প্রণাম করার অনুমতিটা দিয়ে ফেলেছেন, আর অমনি আরম্ভ করলে কি? না, তাঁর পা-টাকে নিয়ে একবার বুকে, একবার পিঠে, একবার মাথায়, একবার কোমরে, একবার চোখে, একবার ঠোঁটে লাগাতে লাগ্‌লে। পা-দুটোর মধ্যে মুখের থুথু লাগাতে পর্য্যন্ত একটুখানি ভয় নেই। নিজেকে ভক্ত

ব'লে বাহ্য-পরিচয় দিয়ে প্রণম্য-ব্যক্তির পা-দুটোকে নিয়ে এই যে অনাচার, এসব হচ্ছে অনার্য্য-পন্থা। প্রণম্য-ব্যক্তি হয়ত জপে বা ধ্যানে বসেছেন, আর তখন গিয়ে তাঁকে প্রণাম আরম্ভ কর্ল্লে। তিনি হয়ত জপ-ধ্যান সমাপ্ত ক'রে ভাব-গম্ভীর এক মানসিক পরিবেশে নিজের আনন্দে নিজে অবস্থান কচ্ছেন, আর তখন তুমি গিয়ে তাঁর ভাব-জলধির স্থিরতা নষ্ট কত্তে হাজির হলে। স্নেহবশে পাদস্পর্শের হয়ত অনুমতি দিয়েছেন আর অমনি তোমরা থপ্ থপ্ ক'রে প্রণাম আরম্ভ কর্ল্লে, কেউ পা-দুটোর উপরে ফেলতে আরম্ভ কর্ল্লে নেকড়ে বাঘের থাবা, কেউ বা গণ্ডারের খড়্গ। ভিড়ের মধ্যে এগুতে পাচ্ছে না ব'লে কেউ হয়ত লাঠির ডগা দিয়ে চরণ-স্পর্শ ক'রে ধন্য হবার চেষ্টা করল, কেউ বা পবিত্র চরণ-তলে একটী বিষাক্ত সূঁচ বা আলপিন ঢুকিয়ে দিয়ে প্রসাদী সূঁচ বা আলপিনটী নিয়ে ঘরে ফিরে এসে নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান কর্ল্ল। * এসব প্রণাম মহাপাতকের তালিকায় পড়ে। এসব তোমরা বর্জ্জন ক'রে চ'লো।

প্রণাম ও ইসলাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদের সমাজে মানুষের পা ধ'রে প্রণাম কর্ব্বার বাড়াবাড়ি নেই। এই বিষয়ে তাঁদের হিসাব বড় সোজা। জগতে শেজ্‌দা (প্রণাম) পাবার যোগ্য মাত্র একজন,— তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর। অন্যের প্রতি শুভেচ্ছা (সেলাম) জানানো চলে, সম্মান (আদাব) জানানো চলে, প্রণাম (শেজ্‌দা) করা চলে না। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যকে প্রণাম করা পাপ। ইসলাম-ধর্ম্ম সৃষ্টির

---

* অনুরূপ ঘটনা সত্য সত্যই ১৩৬২ সালে ঘটিয়াছিল। অঃ সঃ সঃ।

ভিতরে স্রষ্টাকে দেখ্‌বার চেষ্টা সাধকের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে বিবেচনা করেছে, সৃষ্টির ভিতরেই যে স্রষ্টা ব'সে আছেন, এই কথাকে স্বীকার কত্তে অস্বস্তি বোধ কচ্ছে, আবার পরমেশ্বর থেকে সাধকের নিষ্ঠা কোনও প্রকারে না ক'মে যায়, তার দিকে রেখেছে অতি কঠোর ব্যবস্থা, অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাই গুরুর-প্রতি বাহ্য ভক্তি প্রদর্শনটা তারা আমাদের চাইতে কম কত্তে পারে। কিন্তু পীরের যখন আদেশ হয় যে, ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য অমুক কাজটা করা দরকার, তখন এক ডাকে হাজার হাজার মুরিদ্ জান কবুল ক'রে ছুটে আসে। আর তোমরা প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে কেবল সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর, পায়ের ধূলা চেটে চেটে খেয়ে পেটের ভিতরে সুন্দরবনের চর সৃষ্টি কর, কিন্তু কোনও লোককল্যাণকর মহৎ কাজে তোমাদের ডাক্‌লে আর সাড়া দাও না। বল, প্রণামের আতিশয্য দিয়ে তোমরা কি প্রণাম কচ্ছ ?

প্রণাম ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পবিত্র স্নেহ বুঝাতে খ্রীষ্টানরা গালে চুমো খায়। চুমো খাওয়া ব্যাপারটাকে আমরা কখনো শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিনি। আমাদের শাস্ত্রকাররা চুম্বনকে ইন্দ্রিয়-লৌল্যের সঙ্গে সংস্রবযুক্ত ব'লে জ্ঞান করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয় সমাজে পুত্রকন্যারা মাতা-পিতাকে, মাতা-পিতারা বয়স্ক পুত্রকন্যাকে পর্য্যন্ত স্নেহ ক'রে অবাধে গণ্ডদেশে চুম্বন করে। ওষ্ঠের চুম্বন একমাত্র স্বামি-স্ত্রীতে চলে। ওটা স্নেহের বা ভক্তির চিহ্ন নয়, ওটা প্রণয়ের চিহ্ন। স্নেহ বা ভক্তি বুঝাবার জন্য গালে চুমো খাওয়ার চল আছে। কিন্তু তাদের মনের ভিতরে প্রণামের ভঙ্গীটা এনে দেয় যে মুদ্রায়, সেটি হচ্ছে হাত দুটো ঝুলিয়ে সোজা হ'য়ে

দাঁড়িয়ে মাথাটাকে কতকটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা। কেউ কেউ বা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু দুটো একটু ভেঙ্গে মাথায় একটু ছোট হয়ে নেয়। এতে প্রণামের ভাবটা তাদের মনে জেগে ওঠে, যদিও পা-ছোঁয়া-ছুঁয়ি নেই। অথচ প্রণম্য ব্যক্তি ডাক দিয়ে বলুন,—"এস তোমরা অমুক মহৎ কাজে",—সঙ্গে সঙ্গে শত শত স্বেচ্ছাসেবক, আর কোটি কোটি রৌপ্যমুদ্রা সেই কাজের জন্য এসে যাবে। তোমাদের প্রণামের ঘটা খুব বেশী, কিন্তু প্রণম্যের আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ গ্রাহ্য করার রুচি কম।

প্রণামের নিগূঢ় তাৎপর্য্য

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মুসলমানের ও খ্রীষ্টানের শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাবার যে রীতিগুলি রয়েছে, তাতে পাদস্পর্শের প্রয়োজনই পড়ে না। কিন্তু এই আদর, এই শ্রদ্ধা, এই ভক্তি দেখাবার কালে নিজের মনকে ভ্রূমধ্যে রাখলে কত লাভ, তা তারা জানে না। প্রণামের সঙ্গে ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশন এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণবের মধ্যে এই তত্ত্ব যদি প্রচারিত নাও থেকে থাকে, যোগীরা, যাঁরা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবদেরও অনেক আগে থেকে জীবে শিবে অভেদ সাধনার কৌশল আবিষ্কারে মন দিয়েছিলেন এবং যাঁদের কোনও সম্প্রদায়ই নেই, তাঁরা প্রণামের এই নিগূঢ় অর্থ জান্‌তেন। যাঁকেই প্রণাম করি, করি প্রণাম আমার ভ্রূমধ্যস্থিত গুরুকেই। এইটাই প্রণামের গুহ্যাতিগুহ্য ভাব। মুসলমান বা খ্রীষ্টান তাঁর নিজের আদব-কায়দার মধ্যে থেকেও ইচ্ছা কর্লেই এ সময়ে মঙ্গলময় সদ্‌গুরুকে ভ্রূমধ্যে অনুধাবন কত্তে

পারেন। তাঁদের শ্রদ্ধা-সম্মানের বা শুভেচ্ছার মুদ্রাগুলি অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী-গুলি তৎকালে ভ্রূমধ্যে মনঃ-সংযমনের পরিপন্থী নয়।

তোমার ভিতরের শাস্ত্রকার

একজন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন,—শাস্ত্রগুলি বুঝ্‌তে বড়ই কঠিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রগুলি সহজবোধ্য। কঠিন কেবল তার ভাষা। যেখানে দেখবে ভাষার মারপ্যাচে শাস্ত্রার্থ বোধগম্য হ'তে চাচ্ছে না, সেখানে কঠিন অংশগুলি বাদ দিয়েই শাস্ত্র প'ড়ে যেও। তোমার ভিতরেও একজন বিচক্ষণ শাস্ত্রকার বসে আছেন। শাস্ত্র পড়তে ব'সে যে সব সিদ্ধান্ত বা রহস্যকে সুদুরূহ ব'লে মনে হচ্ছে, নিজের একান্ত বিশ্রামের সময়ে নিরুদ্বেগ মনে তোমার ভিতরের বিচক্ষণ শাস্ত্রকারটীকে সেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করবে। প্রথম প্রথম হয়ত কিছুই বুঝবে না কিন্তু কিছুকাল গেলে দেখবে যে, এই মৌনী শাস্ত্রকার কেমন ক'রে অতি সহজ ক'রে তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কলিকাতা
৪ঠা মাঘ, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্য ও স্ত্রীজাতি-ভীতি

ভবানীপুর হইতে সমাগত জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা-মণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য পালনের এমন অবস্থা আছে, যখন সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীজন-সংস্রব বর্জ্জন ক'রে চলাই সঙ্গত। কিন্তু তাই ব'লে স্ত্রীজাতিকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। কর্ত্তব্যের ডাকে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে

আবশ্যকমত মিশ্‌তে হবে, ভীরু কাপুরুষের মত দূরে স'রে থাক্‌লে চল্‌বে না। কিন্তু সব সময় মনকে খুব উচ্চ অবস্থায় উন্নীত রাখ্‌তে হবে। ভগবৎ-সাধন মনের এই উন্নয়ন-সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। যেখানে ভগবানের নাম, সেখানে কাম থাকৃতে পারে না। ভবিষ্যতে এমন দিন আস্‌বে, যেদিন দেশের দশের মঙ্গলের জন্য নারীর স্বাধীনতা আপ্‌নি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। সেদিন নারী পুরুষকে সর্ব্বকার্য্যে সহায়তা দেবে,—বুকের ভিতরে সংযমের শক্তি রেখে, পুরুষ নারীকে সহায়তা দেবে,—প্রাণের ভিতরে পবিত্রতার মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে। ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত-গ্রহণ সেই দিনেই তার প্রত্যক্ষ মহিমাকে প্রকটিত কর্ব্বে। তোমরা ব্রহ্মচারী হচ্ছ সংসার থেকে পালাবার জন্য নয়, সংসারের সকল সংগ্রামে অস্ত্র-চালনায় জয়ী হওয়ারই জন্যে। এইজন্যই ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন হিমাচলের গুহা থেকে বের হ'য়ে জলে স্থলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে।

বাচালতার কারন

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমগ্র দিবারাত্র যত কথা বল, তার মধ্যে কয়টা কথা প্রয়োজনীয় আর কতগুলি নিষ্প্রয়োজনীয়, একটু হিসাব করিলেই তোমাকে চমকিত হইতে হইবে। যত কথা বল, তার অধিকাংশই নিতান্ত অকেজো, বাজে কথা। যে কথায় নিজের জাগে না আত্ম-স্মৃতি, শ্রোতার বা বিশ্ববাসীর জাগে না নিত্যচেতনা, সে কথা সাধারণতঃ বাজে কথা। কলকণ্ঠে যত কথা কহ, তাহার অধিকাংশই তোমার আত্ম-প্রচার। জনান্তিকে দুই বন্ধু বসিয়া কোনও বিষয় আলাপ করিতেছ, হঠাৎ এক তৃতীয় ব্যক্তি

আসিল। দেখিবে, দেখিতে না দেখিতে তোমার কথার ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রয়োজন নাই, তবু দেখিবে, তোমার যে একখানা মটরগাড়ী আছে, তোমার বাড়ীর নায়েব বাবুর মাহিনা যে বার্ষিক ছয় শত টাকা, তোমার ঘাটার ঘাস কাটিবার জন্য যে নয় শত নিরানব্বই জন চাকর সর্ব্বদা হাজির থাকে, ভাবী পুত্রবধূকে দশ হাজার টাকার পাকা সোণার গয়না দিতে যে তোমার ভবিষ্যৎ বৈবাহিক সম্মত হন নাই বলিয়া পুত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ফিরাইয়া দিলে, তুমি যে অমুক সনের অমুক তারিখে রেলে চড়িতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া যাত্রীর নিদারুণ ভিড়ের দরুণ মধ্যম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে, তোমার পরলোকগত পিতার হুকা যে সোণা দিয়া বাঁধান ছিল, তুমি যে তোমার পরমপূজ্য গুরুদেবকে হাতীর দাঁতে বাঁধান খড়ম পরাইয়া কাশ্মীর হইতে আনীত কুঙ্কুমের রেণু দিয়া পূজা করিয়াছিলে, এসব কথাই না ফাঁকে ফাঁকে বাহির হইতে থাকিবে। পরিচিত বা অপরিচিত শ্রোতার কাছে নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার প্রবৃত্তিই যে সুকৌশলে একটার পর একটা করিয়া কথা ঠেলিয়া মুখের বাহির করিয়া দিতেছে, একটু সতর্ক লক্ষ্য দিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ বা সন্তপ্ত হইলে মানুষ বেশী কথা বলে। কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি অত্যধিক আসক্তি আসিলে মানুষ বেশী কথা বলে। কিন্তু নিজেকে অপরের চক্ষে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যত বেশী কথা বলে, এত বেশী বোধ হয় আর কোনও কারণেই বলে না। সুতরাং কথাটী মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই একবার তথ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিও যে, কথাটীর প্রকৃত প্রেরয়িতা কে ? সে কি প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা না অপর কোনও স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনা ?

বাচালতা প্রশমনের উপায়

"কোন্ কথাটী কাহার প্ররোচনায় বলিতেছ, ধরিতে পারিলেই দেখিবে, বাচালতা কমিয়া যাইতেছে। বাচালতা প্রশমনের অপর অমোঘ উপায় হইতেছে, বাক্যের প্রকৃত শক্তিতে আস্থা স্থাপন ; বাক্যই যে বেদ, বাক্যই যে ব্রহ্ম, বাক্যই যে নিত্য সত্য সনাতন শাশ্বত পরমপুরুষ, এই কথাতে পূর্ণ বিশ্বাস-রোপণ ! রুগ্ন ব্যক্তিকে অমোঘ ঔষধ বহুবার সেবন করাইতে হয় না। সুনির্ব্বাচিত সত্য বাক্য দুই চারি বার উচ্চারিত হইলেই প্রত্যাশাতীত সুফল প্রদান করিয়া থাকে। অবিরাম এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে ক্লৈব্য ও বন্ধ্যাত্ব-দোষ-প্রাপ্ত বাক্য আপনিই মরমে মরিয়া সরিয়া পড়ে, বজ্রবীর্য্য, তেজোগর্ভ, ওজঃসারবাক্যাবলি আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, বাচালতা নিবারিত হয়। বাক্-চাপল্য নিবারণের অপর এক প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে, বাক্য-কথনের শক্তি অপেক্ষা একাগ্র একনিষ্ঠ সত্য চিন্তার শক্তিকে অধিকতর অব্যর্থ বলিয়া প্রণিধান করা। একাগ্র সচ্চিন্তার ফলে জগতে অনেক অভাবনীয় ঘটনাসমূহ ঘটিয়াছে। সে সকল ঘটনা এমন অত্যাশ্চর্য্য, যাহা দর্শনশাস্ত্রের বিচারের অতীতে, যাহা বিজ্ঞানের নাগালের বাহিরে। * * * যে কথা কহিতেছ, † লোকের কাছ হইতে তাহার প্রকৃত মূল্য পাইতেছ কি ? কথা ত' অবিরাম বেচিতেছ, কিন্তু বিনিময়ে কি বস্তু পাইতেছ ? পাইতেছ, স্নেহ, শ্রদ্ধা ভালবাসা ও বিশ্বাস ? না পাইতেছ অস্নেহ, অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য ও অনাস্থা ? ঠিক্ ঠিক্ হিসাব করিয়া দেখ, কি কহিয়া কি পাইয়াছ বা পাইতেছ। সমগ্র দিন ব্যবসায় করিয়া যদি মূল্যবান্ বস্তু কিছুই তোমার

† মূল পত্রখানা অতীব কীটদষ্ট অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এজন্য ১৫।৫০ পংক্তিঃ আদৌ পাঠোদ্ধার করা গেল না।

ভাণ্ডারে না উঠিল, তবে এইরূপ ব্যাপারে লাভ ত' প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্ডশ্রম! এই দিকে লক্ষ্য দিলেও তোমার বাচালতা কমিবে। জগতে বাচালকে কেহই দামী লোক বলিয়া মনে করে না, বাচালের বাক্যের কোনও ওজন আছে বলিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং অতিবাক্যের ব্যর্থতার বিষয় অনুধাবন করিয়া মিতবাক্ এবং হিতবাক্ হইবে। বাচালতা প্রশমনের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট উপায়রূপে নিয়মিত ভাবে মৌনব্রত পালন করিবে এবং মৌনকালে মনকে এমন শাসন-শৃঙ্খলায় রাখিতে চেষ্টা করিবে যেন সে নিজের, সমাজের, দেশের বা জগতের অহিত-চিন্তায় লিপ্ত হইতে না পারে। ইহার ফলে স্বল্পভাষিতা তোমার চরিত্রের অন্যতম সম্পদরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে।"

কলিকাতা
৫ই মাঘ, ১৩৩৪

বাক্য-রত্নাবলী

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদের নিকট কবিতায় পত্র লিখিলেন,—

(১)

বীর্য্যবান্ যেই জন, সেই ভাগ্যবান্,
ভক্তিমান্ যেই, সেই পুরুষ-প্রধান।
কর্ম্মবান্ যেই, সেই বীরেন্দ্র-কেশরী,
সেবাপ্রাণ যেই, সেই নররূপী হরি।
পরদুঃখী যেই, সেই সিদ্ধ মহাজন,
পূর্ণ সেই, ব্রহ্ম পদে নিত্য যার মন।

(২)

প্রেম বিনা জীবনের সব অন্ধকার,
চিত্তশুদ্ধি বিনা প্রেম ধরে মিথ্যাচার।
সাধন বিহীন শুদ্ধি বৃথা পণ্ডশ্রম,
নিষ্ফল সাধন বিনা-ইন্দ্রিয়-সংযম।

(৩)

প্রেম যার সর্ব্বজীবে সেই ব্রহ্ম ভজে,
আত্মসুখলুব্ধ শুধু পাপপঙ্কে মজে।

(৪)

প্রথমে করিয়া লও বীর্য্যের সাধন,
তারপরে অন্য কর্ম্মে দান কর মন।
বীর্য্যহীন অসংযমী কামান্ধ মানব,
লম্ফঝম্প দেয় কিন্তু পণ্ড করে সব।

(৫)

ঈশ্বর-পূজন আর অখণ্ড চরিত্র-বল
নিত্যসুখ নিত্যানন্দ বর্দ্ধিত করে কেবল।

(৬)

আত্মজয়ী হয় সুখী পরার্থে করিয়া দান
ধন, জন, মান, যশ, বাক্য, মন, দেহ, প্রাণ।
আত্মসুখী স্বার্থপর রহে যত স্বার্থ-দাস,
বিনা প্রয়োজনে করে অপরের সর্ব্বনাশ।

(৭)

রিপু-সংযমন ছাড়া বিশ্বপ্রেম মিথ্যা কথা,
কামুকের দেশসেবা শত ভাবে হয় বৃথা।
প্রাণপণে লভ আগে মহাবীর্য্য মহাবল।
ইচ্ছামাত্র সর্ব্বকর্ম্ম নিশ্চিত হবে সফল।

(৮)

ইন্দ্রিয়ের বশীভূত প্রজ্ঞাহীন অন্ধ নর
পরেরে আপন করে, আপনারে করে পর।
সুখ-লোভে ত্রিভুবন ভ্রমি' কিছু নাহি পায়,
জরাজীর্ণ বৃদ্ধকালে করে শুধু "হায়, হায়।"

(৯)

আত্ম-সমাহিত চিত্ত প্রজ্ঞাবান্ শুদ্ধ নর
সবারে আপন করে, কেহ নাহি রহে পর।
সুখলোভ নাহি করে, পরের মঙ্গল চায়,
ধরণীর যত সুখ চরণমূলে লুটায়।

কলিকাতা
১০ই মাঘ, ১৩৩৪

বিবাহিত জীবন ও চিরকৌমার

৮ই মাঘ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১৫ই মাঘ বিকাল ৪॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী রহিয়াছেন। ১০ই মাঘ তারিখে বাগ্‌নান (হাওড়া জেলা) হইতে দুইটি যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানাবিধ প্রশ্ন

করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটা কথা লিখিলেন যে,—

"I am neither an advocate of Celibacy nor a preacher of Matrimony. I am but a worshipper of true Manhood. I am satisfied if you are a Man,—married or unmarried I care little to know. Many great men have lived the life of married men while many have not. Only marrying or not-marrying can seldom be regarded as any sign of greatness. Many bachelors have spoiled their lives by not-marrying while truly great men have ship-wrecked their would-be-wonderful careers by accepting a share-holder of life's joys and miseries. Look upon Manhood as your God and not upon any mania or fancy."

বঙ্গানুবাদ

"আমি কৌমার্য্যেরও সমর্থক নই, বিবাহেরও প্রচারক নই। আমি যথার্থ মনুষ্যত্বেরই উপাসক। বিবাহ কর আর না কর, তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না, মানুষ যদি হও, তাহা হইলেই আমি তুষ্ট। অনেক মহাপুরুষ বিবাহিত-জীবন যাপন করিয়াছেন, আবার অনেকে করেনও নাই। শুধু বিবাহ বা অবিবাহ মহত্ত্বের চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অনেক চিরকুমার বিবাহ না করিয়া জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন, আবার অনেক যথার্থ মহৎ লোক সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী গ্রহণ করিবার

ফলে তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। মনুষ্যত্বকেই তোমার আরাধ্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ কর, খেয়াল বা বাতিকের বশবর্ত্তী হইও না।"

কলিকাতা
১১ই মাঘ, ১৩৩৪

গুরু *

(১)

পুলিশ, সিপাহী, জেলখানা, অন্তরীণ, ফাঁসী-কাষ্ঠ, আন্দামান বা ধলন্দা-হাউসের বলে গুরু শিষ্যকে শাসন করেন না। কামান, বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, বেয়নেট, বোমা, রিভলবার দিয়াও গুরু শিষ্যকে শাসন করেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, উপকার-বুদ্ধি প্রভৃতির সহায়তায়ও গুরু শিষ্যকে শাসন করেন না। গুরু শাসন করেন তাঁর শিষ্যকে প্রেমের দ্বারা, যে প্রেমের উৎপত্তি কোনও হেতু-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নহে, যে প্রেমের মূল কোনও কার্য্যে নহে, নিয়ত একত্র অবস্থানে নহে, পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ে নহে, তাহার আশ্রয় শুধু গুরুর প্রেমময় স্বভাব।

* ১৩৩৪ সালের ৮ই মাঘ তারিখ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১৫ই মাঘ তারিখ বিকাল ৪॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র তাঁহাকে ধারাবাহিক বহু প্রশ্ন করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি যে সকল উপদেশ লিখিতভাবে প্রদান করেন, তাহা একটীর পর একটী সাজাইয়াই এই নিবন্ধ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ১১ই মাঘ তারিখ ব্যতীত অন্য দিনের উপদেশগুলি রক্ষিত হইতে পারে নাই।

(২)

শিষ্যত্বের ধর্ম্ম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। ভক্তি-শ্রদ্ধার ধর্ম্ম এই যে, মানুষের যুক্তি-বিচার যতটুকু ঊর্দ্ধে চলিতে পারে, ভক্তি-শ্রদ্ধা ততটুকু পথ যুক্তি-বিচারের সাহচর্য্য করে, কিন্তু যেখানে যুক্তি-বিচার প্রত্যক্ষের অনেক দূরে, সেখানে যুক্তি-বিচার নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অনুমান মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, সেখানে শিষ্যের ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেমময়-স্বভাব শুদ্ধ-চরিত গুরুর আদেশ, উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও ইঙ্গিত সমূহকে বিনা বিচারেই যুক্তি-সঙ্গত এবং বিনা যুক্তিতেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করে।—ইহা শিষ্যের নীচতা বা দাসত্ব নহে। বুদ্ধি যেখানে সত্যকে ধরিতে পারে না, বুদ্ধি যেখানে সত্যের অস্তিত্বে সংশয় উৎপাদিত করে, বুদ্ধি যেখানে দিশাহারা পথিকের ন্যায় নানা পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বাচালের ন্যায় মুহুর্মুহু বিরুদ্ধ কথার সমর্থন করে ও অর্থহীন হট্টগোলের সৃষ্টি করে, ভক্তি-শ্রদ্ধা তখন হয় সন্দিগ্ধের একমাত্র উপায়, অবিশ্বাসীর একমাত্র বল, চঞ্চল-চেতার চিত্তস্থৈর্য্যের একমাত্র পথ।

(৩)

মানুষ নিজেই নিজের গুরু। কতটুকুর গুরু? যতটুকু সে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে। তাহার প্রত্যক্ষের জগতে অপর কাহারও গুরুত্ব নাই, প্রভুত্ব নাই, অনুশাসন নাই। এই প্রত্যক্ষটুকু সে লাভ করিয়াছে, নিজ-ভুজ-বিক্রমে। কিন্তু কোন্ পথে এই বাহুবলকে পরিচালিত করিবে, তার নির্দ্দেশ সে কাহারও নিকট পাইয়াছিল, যাহার নিকট পাইয়াছিল, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি শুধু পথেরই গুরু। পথের গুরুকেই সাধারণ কথায় গুরু বলা হইয়া থাকে।

যাহার যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ নাই এবং যাহার যুক্তি-বিচার যে-পথে শুধু ধোঁয়াটে অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে, তাহাকে সেই বিষয়ে এই গুরু মানিতে হয়, গুরু-বাক্যানুসারে চলিতে হয়, প্রত্যক্ষ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে তাঁহার অনুশাসন মান্য করিতে হয়। মানুষ নিজেই নিজের গুরু, এ কথা যুগাচার্য্যেরা অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মানুষেরই অভ্যন্তরে গুরু বাস করেন, গুরু খুঁজিবার জন্য দেশ-বিদেশ পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই, গুরুর আজ্ঞা সাধনের ফলে ভ্রূ-মধ্যস্থ দ্বিদল-পদ্ম প্রকাশিত হয়, একথা সাধন-শাস্ত্র-নিচয় বহুবার বলিয়াছেন। যোগীর সাধনা মানুষের নিজস্বরূপকেই গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গুরুতে, মন্ত্রে, আরাধ্যে এবং নিজেতে অভেদ উপলব্ধির চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নিজেকে গুরু বলিয়া জানিবার পথ প্রত্যেকের পক্ষেই মুক্ত রহিয়াছে, শুধু প্রয়োজন একটী জিনিষের—তাহা হইতেছে, সাধন। মানুষ নিজেই নিজের গুরু, কিন্তু সাধন করিয়া, সিদ্ধ হইয়া, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তার পরে। যতটুকু সে নিজেকে চিনিয়াছে, ততটুকুর সে গুরু, যতটুকু চেনে নাই, ততটুকুর শিষ্য। সে যে কাহার শিষ্য, তাহা তাহার অন্তরের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তিই জানে, তাহার মুখের বচন-বিন্যাস জানে না। আজ যে শিষ্য, কাল সে গুরু। প্রত্যক্ষের এই পারে যতদিন, ততদিন সে শিষ্য, প্রত্যক্ষের ঐ পারে যখন, তখনই সে গুরু।

(৪)

যতদিন শিষ্য উন্নত সংস্কারের অধিকারী না হইবে, ততদিন তাহাকে উন্নত তত্ত্ব দান করা গুরুর সাধ্যাতীত। এই জন্যই নীচ-বুদ্ধি শিষ্য-সমাজে মহামনা গুরুর আবির্ভাব হয় না। যতদিন গুরু না হইবেন

সম্যক্ প্রকারে নিঃস্বার্থচেতা, ততদিন পর্য্যন্ত হীন-সংস্কারাচ্ছন্ন শিষ্যের মনে উন্নত সংস্কারের জাগরণ অসম্ভব।

(৫)

গুরু দেখিবেন, শিষ্যের সর্ব্ববিষয়িণী পূর্ণতা হইতেছে কিনা। পরস্বাপহারী দস্যুবৃত্তিধারী নররাক্ষস সৃষ্টিও যেমন তাঁহার লক্ষ্য হইবে না, তেমনি আবার কম্বলকৌপীনধারী বৃথাতীর্থচারী বৈরাগীর দল গড়াও তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে না। মাথাটা যেখানে বড় হইবে, হৃদয়টাও সেখানে উদার হওয়া চাই ; বাহুটা যেখানে বল সঞ্চয় করিবে, মনটারও সেখানে বলীয়ান্ হওয়া চাই। একদেশদর্শিতা গুরুত্ব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-শক্তি। সর্ব্বদর্শিত্ব, সমদর্শিত্ব এবং সম্যগ্‌দর্শিত্বই সদ্‌গুরুর লক্ষণ।

(৬)

শক্তি অর্জ্জন শিষ্যকেই করিতে হয়, গুরু খাইলে শিষ্যের পেট ভরে না। গুরু যে সুখাদ্য খাইয়াছেন, তাহার প্রতি শিষ্যের মনকে তিনি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এমন কি তাহা শিষ্যের মুখে পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু চিবাইবার ভার, গলাধঃকরণ করিবার ভার শিষ্যের। শক্তি-অর্জ্জনের পথ অজ্ঞাত-পদ্ধতি শিষ্যকে বলিবার অধিকার গুরুর এবং অর্জ্জিত-শক্তি তামসিকতার প্রভাব বশতঃ আসুরিকী প্রকৃতি ধারণ করিয়া পরের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসার আগুনে ইন্ধন না যোগাইয়া যাহাতে ত্যাগের মধ্য দিয়া, সর্ব্বভূতের কল্যাণার্থে আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া নিজ সার্থকতা সম্পাদন করে, তাহার প্রেরণা যোগাইবার সামর্থ্যও গুরুর। শিষ্যের সাধারণ যুক্তিতে যে কল্যাণ-পথ ধরা পড়িবে না, নিজ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির বলে তাহা দর্শন করিয়া তদনুসারে শিষ্যকে পরিচালনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব গুরুর।

সাধারণ চক্ষে বা সাধারণ যুক্তি-বিচারে কিছু ধরিতে পারে না বলিয়াই যে সে বস্তুটী নাই, এমত প্রমাণ হয় না। যেখানে বস্তু আছে কিন্তু দেখিতে পাও না, সত্য আছে কিন্তু ধরিতে পার না, গুরুর কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র, দায়িত্বের ক্ষেত্র, পরিশ্রমের ক্ষেত্র, সেবার ক্ষেত্র সেইখানে।

(৭)

গুরুর কাছ হইতে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা ও যে প্রেরণা পাইয়াছ, তাহাকে বিশ্বজগতে ছড়াইয়া দিবার নাম গুরু-দক্ষিণা দান। যত স্বার্থ-ত্যাগ তিনি তোমার জন্য করিয়াছেন, জগতের জন্য তোমাকে ততখানি স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। তোমাকে তিনি যতখানি ভালবাসিয়াছেন, জগৎকে তোমার ততখানি ভালবাসিতে হইবে। যতখানি তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন, জগতের জন্য তোমাকে ততখানি কাঁদিতে হইবে। গুরু-দক্ষিণা দেওয়া সহজ কথা নয়, ঋষি-ঋণ অর্থ দিয়া পরিশোধ হয় না।

(৮)

গুরু কে? স্বার্থ-সেবায় সাময়িক সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগের আনন্দকে যিনি অধিকতর কাম্য বলিয়া শিষ্যের মনের উপরে চিহ্ন আঁকিয়া দিতে পারেন। গুরু কে? যাঁহার সংস্পর্শে আসিলে আত্ম-সুখের তৃষ্ণা লজ্জায় মাথা লুকায়, ভোগ-লিপ্সা পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। তিনিই গুরু, যিনি ছোটকে করেন বড়, আর বড়কে করেন বৃহত্তর, যিনি শিষ্যকে প্রেমের শাসনের অধীন করেন এবং কামের বন্ধন, মোহের বন্ধন ও মিথ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। তিনিই গুরু, যিনি পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া দেন। তিনিই গুরু, যিনি সমষ্টিগত সমাজের কল্যাণকে পরাহত না করিয়া ব্যষ্টি-মানবের জীবনের উন্নত

মহিমাকে প্রস্ফুটিত করিতে পারেন এবং ব্যষ্টি-মানবের বিকাশের মহিমাকে খর্ব্ব না করিয়া সমষ্টির মঙ্গলকে দ্রুতগতিশীল করিতে পারেন। এক কথায় তিনিই গুরু, যিনি একটী শিষ্যের সেবা করিয়াই সমগ্র জগতের সেবা করিতে পারেন।

(৯)

শিষ্যের মন প্রবৃত্তির পথে ধাইয়া চলিয়াছে, গুরু কি তাহাকে জোর করিয়া নিবৃত্তির পথে টানিয়া আনিবেন? সে চায় স্বেচ্ছাচার করিতে, সে চায় উচ্ছৃঙ্খল হইতে,—গুরু কি তখন যুক্তির জাল রচিয়া, নিষেধের দেয়াল গাঁথিয়া তাহাকে আটকাইবেন? নিশ্চয়ই না। কেন না, তাহা হইলে উপায়টা হইবে কৃত্রিম, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। স্বভাবেরই শক্তিতে যাহাতে শিষ্যের মন সংযমের পথে, সন্নীতির পথে, সদাচারের পথে ফিরিয়া আসে, আদেশ-নিষেধের মুখ চাহিয়া নয়, পরন্তু, নিজ স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন রুচিতে, স্বাধীন বুদ্ধিতে যাহাতে তাহার মন মঙ্গলের দিকে আবর্ত্তিত হয়, শুধু সেই ব্যবস্থাটুকুই করিবেন গুরু। নিষেধ করিতে শিখিলেই গুরু হয় না, আদেশ করিতে পারিলেই গুরু হয় না, শিষ্যের জীবনকে সর্ব্ববিধ অস্বাভাবিকতার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্য দিয়া তাহার প্রস্ফুটন-সম্পাদনই গুরুর কাজ। এ কাজ সহজ নহে। এই জন্যই গুরু সবাই হইতে পারে না, অতি অল্পসংখ্যক লোকই জগতে যথার্থ গুরুর জগৎপূজ্য স্থান অধিকার করেন।

(১০)

গুরু শিষ্যের অধীন। কি ভাবে অধীন? শিষ্যের ভক্তির অধীন, শ্রদ্ধার অধীন, প্রেমের অধীন। শিষ্যের কল্যাণের অধীন, পূর্ণতার অধীন, মুক্তির অধীন। কিন্তু, যদি তিনি হন শিষ্যের অর্থের অধীন,

শিষ্যের প্রদত্ত অন্নবস্ত্রের অধীন বা তাহার শাসন বা রক্তচক্ষুর অধীন; তবে আর তাঁহাতে গুরুর ধর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারে না। তখন তিনি নামেই গুরু, কিন্তু শিষ্যের জীবনকে মনুষ্যত্বের পথে পরিচালিত করিতে তিনি অক্ষম। কেন না, যে পরাধীন, সে না পারে নিজেকে কল্যাণবন্ত করিতে, না পারে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে।

(১১)

জীবনের সীমাবদ্ধ আদর্শ লইয়া পথ চলিতে গিয়া যাহারা নিজেদিগকে করিয়া ফেলে সসীম এবং নিজেদের চরণ-গতিকে করে শৃঙ্খলিত, তাহাদিগকে জীবনের অসীম আদর্শের প্রতি টানিয়া আনাই গুরুর কর্ত্তব্য। পরম্পরাগত জীবন-ধারাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা তিনি অনেক সময়ই করেন না, পরন্তু নির্জ্জীব প্রাণের মধ্যেও এমন বিদ্যুতের তিনি সঞ্চার করিয়া দেন, যাহাতে জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতেই অভ্রভেদী বিশ্বেশ্বর-মন্দির গড়িয়া ওঠে। এই জন্যই সংযমেচ্ছুরও তিনি গুরু, ভোগী বিলাসীরও তিনি গুরু, পতিব্রতারও তিনি গুরু, কুলত্যাগিনীরও তিনি গুরু, মানুষেরও তিনি গুরু, অমানুষেরও তিনি গুরু, পরার্থকারীরও তিনি গুরু, আত্ম-সুখ-লুব্ধেরও তিনি গুরু। নিজ নিজ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট হইতে পূর্ণতা লাভের পথ পায় বলিয়াই তিনি সকলের গুরু।

(১২)

ভোটের জোরে কাহারও 'গুরুত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয় না, শুধু গুরু-ধর্ম্মের প্রভাবেই ইহা নির্দ্ধারিত হয়। গুরুর অধিকারের সীমা কোথায়, গুরুর কর্ম্মের রীতি কি হইবে, জন-সাধারণের ইচ্ছায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। যে বিশ্বজনীনতা সামান্য মানবকে গুরুর অসামান্য পদবী দান

করিয়াছে, তাহারই নির্দ্দেশ গুরুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। শিষ্যের তামসিকী প্রকৃতি যাহাতে রাজসিকতার রথে আরোহণ করিয়া উন্নীতা ও দ্রুতবিকাশ-ক্ষমা হইতে পারে, শিষ্যের রাজসিকী প্রকৃতি যাহাতে সাত্ত্বিকতার বিমানপোতে আরোহণ করিয়া অনন্তঊর্দ্ধগামিনী ও স্বচ্ছন্দ-গতিশীলা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই তিনি মুক্ত। কে তাহাকে গুরু মানিল, আর কে মানিল না, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার তাঁহার প্রয়োজন নাই। সেবা করিয়াই তিনি কৃতার্থ, মাহিনা ত' তিনি চাহেন না! জগতের সকলেও যদি তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তথাপি তিনি গুরুই থাকিবেন।

(১৩)

অনেক শিষ্য গুরুদ্রোহী হয়। কেন হয়? শিষ্যের বুদ্ধি ও প্রতিভা গুরু-সঙ্গের দ্বারা স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না বলিয়া। শিষ্যের চিন্তা ও কর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটিতে আরম্ভ করিয়া গুরুর শক্তিকে নিজ বিরোধে প্রযুক্ত দেখিতে পায় বলিয়া। আরও এক কারণে শিষ্য গুরুত্যাগী হয়। গুরু যাহা বলিয়াছিলেন, না বুঝিয়া গলাধঃকরণ করিয়া শিষ্য পরিশেষে যখন দেখে যে, উহা জীর্ণ করা কঠিন, তখন সে হয় গুরুর বিরুদ্ধে শস্ত্রপাণি। কখনও শিষ্য গুরুদ্রোহী হয় এই কারণে যে, যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও উন্নত চরিত্রবলের কাছে শিষ্য একদিন মাথা নত করিয়াছিল, আনুগত্য ও বশ্যতার সুযোগ পাইয়া তাহা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া সত্যের পরিবর্ত্তে করে অসত্যের সেবা, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে করে অধর্ম্মের পরিচর্য্যা, ত্যাগের পরিবর্ত্তে করে ভোগ-বিলাসের পাদ-সংবাহন। গুরুদ্রোহ দেখিতে ভয় লাগে। কিন্তু পরিণামে ইহা গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

(১৪)

গুরু কহিলেন,—"হে শিষ্য, তুমি স্বাধীন!" এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে,—"হে শিষ্য, তুমি যে স্বাধীন, তাহা ত' আমি স্বীকার করিলামই, পরন্তু, তোমাকেও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যত ব্যক্তি তোমার সংস্পর্শে আসিবে, কাহারও যুক্তি-বিচারের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার তোমার যেন মন্দ বুদ্ধি না হয়।" শিষ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া গুরু তাহাকে শুধু স্বাধীনতাই দিলেন, তাহা নহে; পরন্তু অপরের স্বাধীনতাকে সম্মান করিতে বাধ্য করিলেন।

(১৫)

গুরু যখন ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হন, লোক-কল্যাণের পবিত্র ব্রত পরিহার করিয়া তুচ্ছ ঐহিকসুখসাধনে বিব্রত রহেন, তখন শিষ্য কাহার ভরসা করিবে? সে তখন নিজের বাহুতে আস্থা স্থাপন করিবে এবং 'জয় ভগবান' বলিয়া গুরু-বর্জ্জন করিবে। কেননা, গুরুর উচ্চ অধিকার শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে জীবনদান ব্যতীত সার্থকতার মহিমায় ধন্য হয় না।

(১৬)

বিদ্রোহী শিষ্যকে বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ আছে বুঝিয়া যিনি উৎসাহিত করিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন। শিষ্য যেখানে অকারণে বা তুচ্ছ কারণে বিদ্রোহী, সেখানে যিনি সহিষ্ণু ভাবে কাল-প্রতীক্ষা করিতে পারেন. তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন। শিষ্য যেখানে গুরুর উপস্থিতিকে জীবনের উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন মনে করে, সেখানে যিনি আত্মবিলোপ সাধন করিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন। গুরুকে গুরু বলিয়া মানিলে যেখানে শিষ্যের অবনতির সম্ভাবনা বা

অভ্যুদয়ের অসম্ভাবনা, সেখানে যিনি নিজের গুরু-গৌরব চাপিয়া রাখিয়া অপরিচিতের মত চলিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন।

(১৭)

একটি দিয়াশলাই দিয়া প্রদীপ ধরাইলে। দিয়াশলাই গুরু, প্রদীপ শিষ্য। প্রদীপে সলিতা ও তৈল না থাকিলে শত দিয়াশলাই পুড়িলেও জ্বলিত না। এই হিসাবে শিষ্যই প্রধান, গুরু অপ্রধান। আবার দিয়াশলাই না হইলে শত সলিতা বা তৈল থাকিলেও আলো হইত না। এই হিসাবে গুরু প্রধান, শিষ্য অপ্রধান। যে দিয়াশলাইতে মশলা নাই, তাহা প্রদীপ ধরাইতে পারে না। যে দিয়াশলাইতে মশলা আছে, কিন্তু কাঠিটী ভাঙ্গা বা ছোট, তাহাতেও আগুন ধরাইতে বড় অসুবিধা। আবার যে প্রদীপে তৈল আছে, সলিতা নাই, তাহা জ্বলে না; যে প্রদীপে সলিতা আছে, তৈল নাই, তাহাও জ্বলে না। একই দিয়াশলাই দিয়া শত শত প্রদীপ জ্বালাইয়াছ, কিন্তু যে প্রদীপের তৈল ভাল, সলিতা ভাল, তৈল বেশী, সলিতা মোটা ও লম্বা, তাহাই ভাল জ্বলে, বেশী জ্বলে। পরন্তু, যে প্রদীপের তৈল খারাপ, সলিতা খারাপ, তৈল কম, সলিতাও ছোট বা সরু, তাহা জ্বলে খারাপ এবং জ্বলে অল্পক্ষণ। কোনও প্রদীপে তৈল ভাল, সলিতা মন্দ বা তৈল মন্দ, সলিতা ভাল—সে সবও ভাল জ্বলে না। এই জন্যই এক গুরুর শত শিষ্য শত প্রকারের হয়। কোন প্রদীপ জ্বালাইতে পাঁচটা দিয়াশলাই লাগে, কোনটাতে বা একটাতেই হয়। এইরূপ বৈচিত্র্য জগৎ ভরিয়াই রহিয়াছে। প্রদীপ যখন সলিতা ও তৈলে পূর্ণ হয়, তখন দিয়াশলাই খুঁজিয়া বেড়ায়; আবার দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে যখন মশলা সংযুক্ত হয়, তখন সে প্রদীপ খুঁজিতে

বাহির হয়। চিরকাল জগতে গুরু শিষ্যকে এবং শিষ্য গুরুকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে।

(১৮)

গুরু কি ঘাড়ের বোঝা, না কাঁধের ভূত? গুরু কি বেয়নেটের খোঁচা না, বর্গী দস্যুর শাণিত কৃপাণ?

(১৯)

শ্রীগুরু-নির্ভরে শ্রীনাম উজ্জ্বল,
শ্রীনাম-নির্ভরে বুক-ভরা বল।

এখানে শ্রীগুরু মানে ব্রহ্ম, শ্রীগুরু মানে উপাস্য দেবতা।

(২০)

মঙ্গলময় ভগবানকে গুরু জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। প্রপন্নের তিনি সর্ব্ব-কুশল স্বহস্তে সম্পাদন করিবেন। তাঁহাকেই ইহপরজীবনের সার-সর্ব্বস্ব জানিয়া নিজের সব-কিছু ঐ চরণে সমর্পণ করতঃ তাঁহাকে তোমার সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার কর। দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায়, কর্ম্মে, বাক্যে, চিন্তায়, অনুধ্যানে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই তোমার একমাত্র অবলম্বন-তরু জ্ঞান করতঃ লতাবৎ নিজেকে অবিরাম তাঁহারই আশ্রয়ে অনন্ত ঊর্দ্ধাকাশ ছায়িয়া বিস্তারিত কর। জীবন ধন্য হউক, জন্ম সার্থক হউক।

জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বৈধ

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাংসারিক জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান, উভয় সম্পর্কেই এত সব সদ্‌গ্রন্থ জগতে লিখিত হয়েছে, যাদের সীমা-সংখ্যা নেই। এক একখানা মূল গ্রন্থকে অবলম্বন

ক'রে এত প্রকারের টীকা, ভাষ্য, বার্ত্তিক, আখ্যান, ব্যাখ্যান আদি জীবহিতকল্পে জগতে প্রচারিত হয়েছে যে, তাদের সঙ্গে তুলনা দিতে হ'লে সমুদ্রের তরঙ্গ-মালার কথা তুলতে হয়। জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের এরা দ্বার-স্বরূপ। কিন্তু জীবনের কর্ম্মকোলাহল বিদূরিত কত্তে না পার্লে এই সকল বই পড়ে কেউ শেষ কত্তে পারে না, এমন কি সত্যযুগের মত তিন চার পাঁচ হাজার বৎসর পরমায়ু পেলেও না। সুতরাং তোমরা যাবে কোথায়? তোমরা করবে কি? কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কেবল জ্ঞান-সমুদ্রে ঝম্প দিতে থাকবে? তাও সম্ভব নয়। কর্ম্ম ছাড়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত সম্ভব নয়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ কর্ল্লেও চলবে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন আর নিত্য নব জ্ঞানাহরণ, এই দুই প্রয়োজনের মধ্যে এইভাবে নিত্যকলহ নিত্যদ্বৈধ লেগেই আছে।

কর্ম্মের মধ্য দিয়া ব্রহ্মচেতনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই দ্বন্দ্বের মাঝে সামঞ্জস্যের একটা সরল পথ আছে। জ্ঞানের চরম হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান। সর্ব্বভূতমহেশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজ কচ্ছেন, তোমার ভিতরেও কচ্ছেন। আবার সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপে তুমিই বিরাজ কচ্ছ প্রতি জীবে, প্রতি বস্তুতে। তিনি ছাড়া বস্তু নাই, আবার তুমি ছাড়া তিনি নেই। তোমাতে তিনি, তাঁতে তুমি। সর্ব্বভূত তোমাতে, তুমি সর্ব্বভূতে। এই চরম অনুভূতিকে নিজের অন্তরে নিয়ত জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা কর আর সঙ্গে সঙ্গে জগতের কর্ত্তব্য কাজ সমূহ দিব্য বুদ্ধিতে ক'রে যাও। যার প্রতি যে ব্যবহার কর, তা কচ্ছ কেবল তার ভিতরে

পরমাত্মা পরমেশ্বরকে জান্‌ছ ব'লে, তোমার নিজের স্বরূপকে সর্ব্বভূতে বিস্তারিত দেখ্‌ছ বলে; তোমার স্বরূপ, জগদ্বাসীর স্বরূপ, কোটি কোটি প্রাণিগণের স্বরূপ কখনও সেই অনন্ত স্বরূপেরই কায়া, কখনো বা তাঁরই কায়া ব'লে। এই একটী সরল কথা অনুক্ষণ অনুধ্যানে অন্তরে জাগিয়ে রাখ। এই ভাবে বিশ্বের সকল ভেদের সঙ্গে তোমার পূর্ণ অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত কর,—আর সঙ্গে সঙ্গে ক'রে যাও তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সিংহবিক্রমে। এতেই জ্ঞানের অসীমত্ব, অপরিমেয়ত্ব আর দুরবগাহত্বের সাথে তোমার সীমিত, পরিমিত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন-কালের এক চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপিত হ'য়ে যাবে, যার ফলে অল্পের মধ্য দিয়েই ভূমাকে, ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়েই বৃহৎকে, তুচ্ছের মধ্য দিয়েই পরমমহৎকে পাবে তুমি করামলকবৎ পূর্ণ আয়ত্তে।

ব্রহ্মজ্ঞ ও বৈষ্ণবে পার্থক্য নাই

একজন বলিলেন,—তবে বৈষ্ণবেরা অত ক'রে বলেছেন কেন যে, নিজেকে হীন, অযোগ্য জ্ঞান কর্লে তবে অন্তরে প্রেমভাব আসে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরাও মিছে বলেন নি। অহমিকা প্রেমের প্রকটনে দেয় বাধা আর হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা-প্রবৃত্তির করে প্রশ্রয়দান। তাই, অহঙ্কারকে সমূলে উৎপাটন ক'রে ফেলার জন্য বৈষ্ণব মহাপুরুষদের অত আয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মচেতনায় আশ্রয় পেয়ে যা হন, বৈষ্ণব মহাপুরুষ নিজেকে পরমেশ্বরের দাসরূপে গণনা ক'রে, জগতের প্রতি জীবকে কখনো পরমেশ্বরেরই বিভূতি বা প্রকাশ ব'লে জেনে অন্তরের ভক্তি দিয়ে পূজা ক'রে, ঠিক তাই পান। কখনো

বা জগদ্বাসী সকলকে সেই একই পরমেশ্বরের করুণাশ্রিত দাস জেনে নিজেকে সকল দাসদের অধম জেনে অন্তরে পূজাবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে সেই পরম কল্যাণই তিনি আহরণ করেন। নিজে পরমেশ্বরকে দেখা, পরমেশ্বরে নিজেকে দেখা, পরমেশ্বরের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে নিজের ভিতরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখা ঔদ্ধত্য নয়,—এক পরম লোভনীয় অবস্থা। আবার নিজেকে দীনাতিদীন জেনে পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে দর্শন ক'রে নিজেকে সর্ব্ববিভূতির দাস জেনে তাঁদের প্রতি সেবাবুদ্ধি নিয়ে চলা, সত্য সত্য হীনতা নয়,—এও এক পরমলোভনীয় অবস্থা। এ দুটীর যে কোনও এক অবস্থায় গিয়ে যিনি পৌছেছেন, তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে অপর অবস্থাটীতেও পৌছে যান। ধর যেমন, দিল্লী থেকে একজন পৌছেছেন হাওড়া, অন্য ট্রেণে একজন সেই দিল্লী থেকেই পৌছেছেন এসে শিয়ালদহ। দুজনেরই ট্রেণ প্রায় একই ষ্টেশনগুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং দুজনেই প্রকৃত প্রস্তাবে পৌছেছেন এসে একই কল্‌কাতায়। দুটা ট্রেণই হয়ত ঠিক একই ষ্টেশানে সমান সময় থেমে থেমে আসে নি, আর, এক ট্রেণের যাত্রীরা কোনও একটা ষ্টেশানে যে সব খাবার-দাবার বা ফলমূল পেয়েছেন, অন্য ট্রেণের যাত্রীরা হয়ত তার চাইতে অন্যরূপ কিছু পেয়েছেন,—এতটুকু পার্থক্য অবশ্য আছে। হাওড়া আর শিয়ালদহ একই কল্‌কাতার দুই প্রান্তের দুই ষ্টেশানের নাম মাত্র।

সংগুপ্ত প্রণব-মন্ত্রের সবল আত্ম-প্রকাশের কারণ

ওঙ্কার-মন্ত্র সম্পর্কে কথা হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রণব নিয়ে হিন্দু-সমাজ নিজেদের মধ্যে কখনো কলহ করে নাই;

যে মতের হোক, যে পথের হোক্, সবাই প্রণব মন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন। এই একটা কারণের জন্যই বিচ্ছিন্ন হিন্দুজাতিকে একত্র মিলিত করার পক্ষে প্রণবের যোগ্যতা সর্ব্বাধিক। এতদিন হিন্দু তার নানা বিচ্ছিন্ন মতবাদের ও বিচ্ছিন্ন পথানুসরণের মধ্যে কোনও ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তেমন তীব্র ভাবে অনুভব করে নাই। আজ এই প্রয়োজন-বোধ প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদিন হিন্দু-সন্তানগণ বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণে বর্ণিত দেবতাদের অস্তিত্ব বা পূজার উপযোগিতা প্রভৃতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। বিলাতী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের পরে দেব-দ্বিজে যে তীব্র অবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করেছিল, যার ফলে অনেক শিক্ষিত ভারত-সন্তান হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই অবিশ্বাস ও তজ্জনিত আন্দোলন-আলোড়ন মুষ্টি-মেয় শিক্ষিত-সমাজের গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। সংবাদপত্রে সেই সময়কার আন্দোলনগুলির বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু জাতির শতকরা পঁচানব্বই জন লোক যে গ্রামগুলিতে দিন কাটায়, সেখানে তার ছায়া-প্রবেশও সম্ভব ছিল না। বড় বড় সহরের মধ্যেই ছিল সেই সব আন্দোলন সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১৯১৪ ইংরাজির মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র পৃথিবীময় অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে সর্ব্বত্র ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণেরা জেগে উঠ্‌ল। কোনও দেশের সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করে বস্‌ল,—ট্যাক্‌স দিব কেন? কোনও দেশের সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করে বস্‌ল,—কেন চিরকাল দরিদ্রেরা ধনীদের দ্বারা শোষিত হবে? এই দেশের সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করে বস্‌ল—কেন মান্‌ব তোমার কালী, দুর্গা, গণেশ, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে? কে তারা? এই একটা ঘটনায় খণ্ড খণ্ড ভাবে পূজিত দেববিগ্রহ

সমূহের ভক্তসংখ্যা দিনের পর দিন হ্রাস পেতে লাগ্‌ল। সহজ-বিশ্বাসী সরল প্রকৃতির মানুষেরা প্রশ্নকারী, তার্কিক, বিতণ্ডাবাদী এবং অবিশ্বাসকারীতে পরিণত হ'ল। এই হচ্ছে পটভূমিকা যার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক সহস্র বৎসরের বিস্মৃতপ্রায় প্রণব-মন্ত্র আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে মানুষের কণ্ঠে মানুষের ভাষায় বল্‌তে লাগলেন,—ঐক্যের অবতারণার প্রয়োজনে এই আমি এসেছি তোমাদের সমক্ষে, তোমরা আমাকে গ্রহণ কর। যুগের আজ প্রয়োজন, জীবের কুশলের জন্যই আজ আবশ্যক, তাই সুদীর্ঘকালের সংগুপ্ত পরমধন সবলে সকলের চক্ষুর সম্মুখে এসে নিজগুণে নিজবলে আত্মপ্রকাশ কচ্ছেন।

সকল মন্ত্রেই প্রণব বিদ্যমান

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—প্রণব-মন্ত্র কি কৃষ্ণনামের চাইতেও বড় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন প্রশ্ন কত্তে নেই। ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতি এবং সর্ব্বমন্ত্রের সমাহার। কৃষ্ণনাম, বিষ্ণুনাম, রামনাম, শিবনাম, দুর্গানাম আদি কোনও নাম, কোনও বীজ, কোনও মন্ত্রকেই ত ওঙ্কার-মন্ত্র অস্বীকার করেন না! ওঙ্কার কোনও মন্ত্র থেকেই ত অনুপস্থিত নেই! তদুপরি, যিনি যে মন্ত্রে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে নিজের দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কত্তে হয়। নইলে সাধনে জোর আসে না, মন বসে না, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কণ্টকে তাঁর সাধন-পথ হয় বিপত্তিসঙ্কুল।

প্রণব মহামহিম্ন

সাধুটী বলিলেন,—সকল নামেই যদি ওঙ্কারমন্ত্র বিদ্যমান, তবে আপনি আলাদা ক'রে ওঙ্কারের মহিমা-কীর্ত্তন কচ্ছেন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রণবের মহিমা-বর্ণন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও করে গেছেন। যিনি মহামহিম্ন, তাঁর মহিমাখ্যাপন সকলেই করে। এতে আপনি রুষ্ট হবেন কেন ? পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে আছে যে, প্রণব হচ্ছেন ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের আত্ম-স্বরূপ। এটা যদি মানতে হয়, তবে ত এ কথাও মানা হ'ল যে, প্রণব উচ্চারণ কর্ল্লে ঐ তিনটী বেদ পাঠ করার সম্পূর্ণ ফল-লাভ হ'ল। পদ্মপুরাণ আরও বল্‌ছেন, - প্রণবে অ, উ, ম এই তিনটী অক্ষর আছে। পদ্মপুরাণের মতে অকার বল্‌তে বিষ্ণুকে বুঝায়, উকার বলতে বুঝায় লক্ষ্মীকে আর ম-কার লক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্যসেবক জীবকে বুঝাচ্ছে। ভেবে দেখুন আপনার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মতেও লক্ষ্মী, নারায়ণ আর জীব এই তিন জন ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে আর কি আছে ? যদি আর কিছু থাকে, তবে তার মূল্যই বা কি ? লক্ষ্মী, নারায়ণ আর তাঁদের সেবক জীবই আসল। এই তিনজনে মিলে যদি প্রণবই হলেন, তবে প্রণবের মহিমা-খ্যাপন বৈষ্ণবের পক্ষে কেন অসম্ভব হবে? বৈষ্ণবের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বিষ্ণুরই সেবক। সুতরাং প্রণবে লক্ষ্মী, বিষ্ণু আর উভয়ের নিত্য-সেবক জীবকে পেয়ে সব কিছুকেই ওতে পাওয়া হয়ে গেল যে !

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কি বিষ্ণুর সেবক ?

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে একজন তন্ত্রমতাবলম্বী সাধুও ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মা আর মহেশ্বর সত্যই কি বিষ্ণুর সেবক, বিষ্ণুর দাস ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একথার সঠিক উত্তর স্বয়ং ব্রহ্মা আর মহেশ্বর দয়া করে এসে দিয়ে না গেলে, আমাদের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্তে আসার উপায় নেই। মহাদেবকে যে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আর্য্য দেব-গোষ্ঠীর ভিতরে প্রবেশ কত্তে হয়েছিল, দক্ষ-যজ্ঞের ইতিহাসে তার ইঙ্গিত মিলে। বিষ্ণু হয়ত এই হিসাবে শিবের চাইতে বেশী কুলীন। কিন্তু অন্য দিকে মহাদেবকে দেবাদিদেব বলা হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নটী বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এক দিক দিয়ে এরও একটা মীমাংসা আছে। বিষ্ণুর পূজক বৈষ্ণব ব্রহ্মা বা মহেশ্বরকে নস্যাৎ ক'রে উড়িয়ে দিতে চান না। এই দুই দেবতাকে তাঁরা গৃহে বা মন্দিরে স্থান দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বিষ্ণু তাঁদের উপাস্য. এমতাবস্থায় বিষ্ণুর সমকক্ষ রূপে কাউকে আদর কর্ল্লে বিষ্ণুর প্রতি নিষ্ঠা কতকটা কমে যেতে পারে। তাই, ব্রহ্মা-মহেশ্বরকে বিষ্ণুর কিঙ্কর রূপে পূজা করার ব্যবস্থা খুব অস্বাভাবিক হয় না। বিষ্ণুর কিঙ্করও বৈষ্ণবের পূজ্য। নিজের ইষ্টনিষ্ঠা হ্রাস না ক'রে অন্য দেবতাকে মান্‌তে গেলে যা করা দরকার, বৈষ্ণবেরা তাই কর্ল্লেন। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর ; তিনই এক, একই তিন, ওঁদের মধ্যে ভেদ নেই,—একথা ভাবতে যাঁর অসুবিধা, আবার একজন ছাড়া বাকী সকলকে অগ্রাহ্য করে দেওয়ারও নেই যার ক্ষমতা, তাঁর সমস্যার সমাধান ত এভাবেই হবে! আপনি যদি মনে ক'রে নিতে পারেন যে, এটী বৈষ্ণবদের ঘরোয়া ব্যাপার, তা হ'লেই আপনার মনে এ নিয়ে কোনও কষ্ট হবার কারণ ঘটবে না।

বৌদ্ধের অবৌদ্ধ ভাবের সহিত আপোষ করার কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোথায় যেন একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত

হয়েছে, যাঁর এক পায়ের তলায় মহেশ্বর অন্য পায়ের তলায় উমা। ওটাকেও যদি বৌদ্ধদের ঘরোয়া ব্যাপার ব'লে মনে করে নিতে পারেন, তা হ'লেও মনঃক্লেশ হবার কারণ ঘটবে না। কিন্তু যেই বৌদ্ধরা একদিন অনীশ্বরবাদী ছিলেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই, সেকথা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান কত্তেন, মানুষের কর্ম্মই তার গতির নিয়ন্তা, সুতরাং মাঝখানে একজন ঈশ্বর আমদানী করার কোনও আবশ্যকতা আছে ব'লে যাঁরা মনে করেন না, তাঁদের ভিতরেই যখন মহেশ্বর উমা আদি দেবদেবী মানবার প্রয়োজন-বোধ জেগে উঠল, তখন তারা বোধিসত্ত্বের পায়ের তলায় সেইসব দেবদেবীকে স্থান না দিলে শেষে নিষ্ঠার খাতায় যে আস্তে আস্তে বুদ্ধদেব একেবারে একটা শূন্য হয়ে দাঁড়াবেন। তাই, বৌদ্ধরা অবৌদ্ধ ভাবের সঙ্গে এই ভাবে আপোষ করেছিলেন।

ওঙ্কারের তান্ত্রিক ব্যাখ্যা

অতঃপর তন্ত্রমতে ওঙ্কারের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অকারে ব্রহ্মা, উকারে বিষ্ণু, ম-কারে মহেশ্বর,—এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তান্ত্রিক আচার্য্যেরা। তাঁরা এই ব্যাখ্যার মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে আমন্ত্রণ করেন নি, কিন্তু আদ্যাশক্তিকে তাঁদের প্রয়োজন। এজন্য চন্দ্রবিন্দুর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তাঁকে এনেছেন। মহিমান্বিত ওঙ্কার এই ভাবে নানা মতের লোকদের দ্বারা নিজ নিজ মতোচিত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। ওঙ্কারকে অস্বীকার কেউ করেন নি।

ওঙ্কারের প্রশংসা সর্ব্বশাস্ত্রে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'ও' এই অক্ষরটার উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু

দিলে যা উচ্চারণ হয়, তা'ই ওঙ্কারের চূড়ান্ত উচ্চারণ নয়। ওঙ্কারের প্রকৃত যা উচ্চারণ, এটা তার নিকটতম অনুধ্বনি। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই একটা শাস্ত্রবাক্য আছে যে, ঈশ্বরের একটী গুপ্ত নাম আছে, যা সাধারণে জানে না। আমার মতে সেই গুপ্ত নামই ওঙ্কার। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে, আদিতে ছিল বাক্য, সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, সেই বাক্যই ছিল স্বয়ং ঈশ্বর। আমার মতে এখানে প্রাচীন খ্রীষ্টান শাস্ত্রকার ওঙ্কারেরই কথা বলেছেন। ওঙ্কারের প্রশংসা সর্ব্বজাতির সর্ব্বশাস্ত্রে। কেউ হয়ত স্পষ্ট জেনে প্রশংসা করেছেন, কেউ অস্পষ্ট জেনে করেছেন, কিন্তু প্রণবেরই মহিমা হয়েছে কীর্ত্তন।

প্রয়োজন প্রণবের সাধনার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং প্রণবের মহিমা-কীর্ত্তন করার আমাদের আর দরকার নেই। আমাদের প্রয়োজন প্রণবের সাধনার। মহিমাকীর্ত্তন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা সহস্র মুখে করেছেন। "প্রণবহীন মন্ত্র জপ কর্লে প্রাণহীন মন্ত্রেরই জপ করা হয়,"—একথা ব'লে ত প্রণবকে চূড়ান্ত সম্মান দান করা হয়েছে। "অন্য সব মন্ত্রে লোককে দীক্ষা দাও কোনো আপত্তি নেই কিন্তু প্রণব মন্ত্রটাকে কুলুপ দিয়ে ভাল ক'রে সিন্ধুকে ঢুকিয়ে রাখ,"—এই উপদেশ লোকের অকল্যাণ কর্লেও প্রণবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন এখন সাধন, একাগ্র, একনিষ্ঠ, অকপট, অবিরাম সাধন। এক লক্ষ লোক যদি প্রণবের সাধনার মধ্য দিয়ে পরম সত্যকে আস্বাদন করার সঙ্কল্পে ব্রতধারী হয়, তাহ'লে এদের তপস্যারই প্রভাবে নিখিল ভুবনের পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটে যাবে। বক্তৃতা ও প্রচার-কার্য্যের দ্বারা যা

হয় না, তা হবে একমাত্র সাধনের শক্তিতে। এই একটা শক্তিতে আমি বড়ই দুরন্ত ভাবে বিশ্বাসী। যুক্তি, বিচার, বিতর্ক আমার এই বিশ্বাসের গায়ে লেগে শতখণ্ডে চূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, জীবনে আমি বহুবার অল্প সাধনেরও অপরিমিত শুভফল প্রত্যক্ষ করিতেছি।

প্রণব-সাধনার যোগ্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীর্ঘকাল তোমরা প্রণব-সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলে। প্রণব-সাধনার কৌশলও সুদীর্ঘকাল তোমাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা সঙ্কীর্ণতাবশতঃই তোমাদের অধিকার-সঙ্কোচ করেছিলেন, তা মনে ক'রো না। তোমরাও উপযুক্ত হবার চেষ্টা কর নি। কেবল নিজের স্বার্থের জন্য তোমরা ভগবানকে ডেকেছ,—কেউ চেয়েছ নিজের ধন, মান, রূপ, বল, যশ ও শত্রু-বিমর্দ্দন, কেউ চেয়েছ কেবল একা একা মুক্তিলাভ করে দুঃখের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ। জগতের সকলের কুশল-চিন্তনকে তোমরা তোমাদের ভাবরাজ্য থেকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে রেখেছিলে। তোমরা চাচ্ছিলে অবিরাম ইন্দ্রিয়সেবাজনিত সুখ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ডাকা। যার দৃষ্টি-ভঙ্গী এত সঙ্কীর্ণ, প্রণব-মন্ত্র ত তার জন্য নয়! তাই তোমরা নিজেদের দোষেই এমন মহৎ মন্ত্রের সাধনাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছিলে। সাধকদের উদারতা অনেকবার তোমাদের হাতে এই অমৃত-ভাণ্ড তুলে দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই অমৃত পাবার পরেও তোমরা উদার হতে চেষ্টা কর নি, একা একাই মুক্তির রস আস্বাদের চেষ্টা করেছ। তারই ফলে দু'দিন যেতে না যেতে তোমাদের সংখ্যাল্পতা ঘটেছে এবং চারদিন যেতে না যেতে, যাদের জিনিষ, তাদের সিন্ধুকে গিয়ে কড়া পাহারায় আবার বন্দী হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ভ্রম-সংশোধন

১৫৫ পৃষ্ঠার উপর হইতে ষষ্ঠ লাইনে "সাই" এর স্থলে "নাই" হইবে।

অখণ্ড-সংহিতা দ্বিতীয় খণ্ডের

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রতিক্রিয়ার নানাবিধ রূপ	৩৬০
প্রয়োজন প্রণবের সাধনার	৪৮১
প্রাণদানের লক্ষ্য	২৬০
প্রাণ দিয়া নামজপ	২৬৭
প্রাণায়ামে সতর্কতা	৪২
প্রেম ও ব্রহ্মচর্য্য	৯১
প্রেমের সংজ্ঞা	৩৭
বধূ-নির্য্যাতন ও দুঃখসহিষ্ণুতা	৪৩
বনচারী তপস্বীদের লোকালয়ে আসার কারণ	২০২
বনবাস ও মহাপুরুষ	৩৪৮
বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে ?	১৫২
বর্ত্তমান গুরুবাদ	২০৯
বর্ত্তমানের যুবক	১৭০
বলিদান	১৬৪
বসুধাকে কুটুম্ব কর	৪০৬
বহু প্রতিমূর্ত্তি-পূজার বিভ্রাট	২০৪
বহু বিগ্রহ-পূজা নিষ্ঠাহানিজনক	২০৫
বাক্য-রত্নাবলী	৪৫৮
বাঘাউড়ার ছালাবুড়ি	৩৫১
বাঘাউড়ার বন্ধু-গোপাল	৩৫০
বাচালতা প্রশমনের উপায়	৪৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাচালতার কারণ	৪৫৫
বাম্‌নালির বড়াই	২৪৪
বাঙ্গলার নিকটে ভারতের দাবী	১৮৯
বাঙ্গালীত্বের পরিচয়	১৮৬
বালিকার ব্রহ্মচর্য্য	১৩১
বাহিরের লোককে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করা	১৪৮
বাহিরের সদাচার	৫৭
বিচার-বিভ্রান্তি নিবারণের উপায়	৩৩৯
বিদ্যার্জ্জনের পরে আশ্রমের ব্রহ্মচারীর জাতিভেদ	২৮৮
বিদ্যার্থী ও গৈরিক-ধারণ	২৮৯
বিদেহ-ভাবনা ও মাতৃভাবের সাধনা	২৮
বিদ্রোহ ও বশ্যতা	৩৪১
বিদ্বেষ জরা-মরণের অধীন	৩৭৩
বিবাহ ও অবিবাহ	৩৬০
বিবাহ করা কি না-করা	২১৫
বিবাহিত জীবন ও চিরকৌমার	৪৬০
বিবাহিত জীবনে সুখানুসন্ধান	২৭৩

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

—

অখণ্ড-সংহিতা

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল্য চারি টাকা
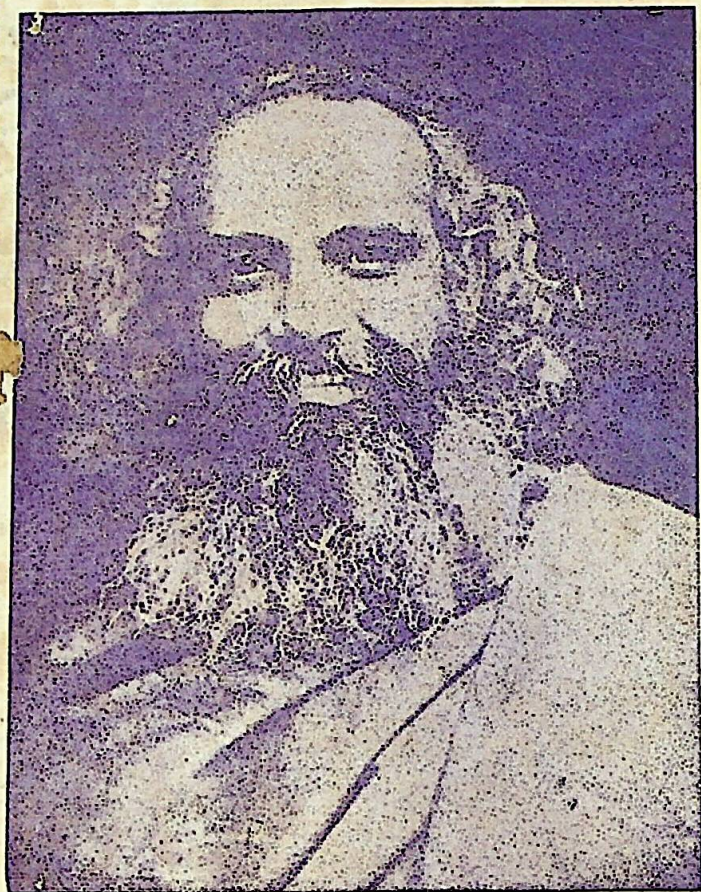
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ স্ট্রীট : বারাণসী : (উঃ প্রঃ)